সেন এণ্ড কোম্পানীর পক্ষ হইতে
শ্রীযুক্ত গোপাল দাশগুপ্ত কর্তৃক
প্রকাশিত।

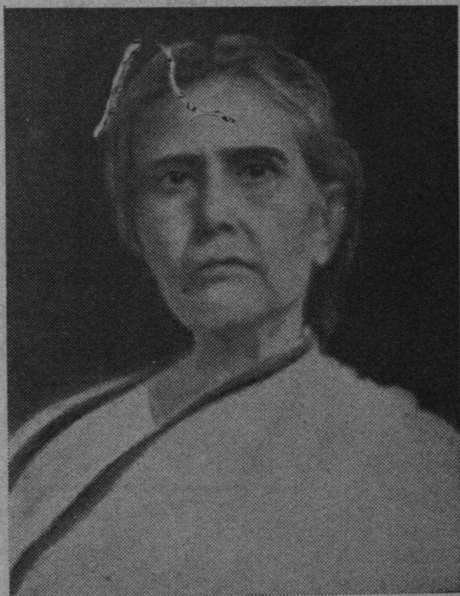
প্রথম প্রকাশ—১৩৬৭

মুদ্রাকর—
শ্রীস্থকুমার নাগ
"ইম্প্রেশন"
৩৩ বি, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৬



সুহাসিনী গাঙ্গুলী

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের চারজন অভিযুক্ত চন্দননগরে
এই দেশ প্রেমিকা মহিলার আশ্রয়ে
আত্মগোপন করেছিলেন।



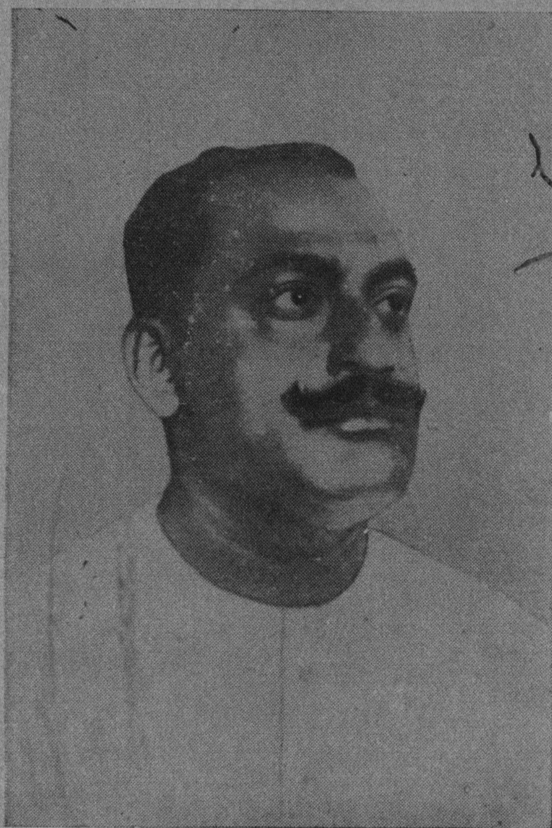
ইন্দুমতী সিংহ

অনন্ত সিংহের ভগিনী। পুরোপুরি ইঁহার চেষ্টায়
ও সাহায্যে ২ বৎসর ধরিয়া যুব-বিদ্রোহের
বন্দীদের মামলা চালানো সম্ভব হয়।

উৎসর্গ

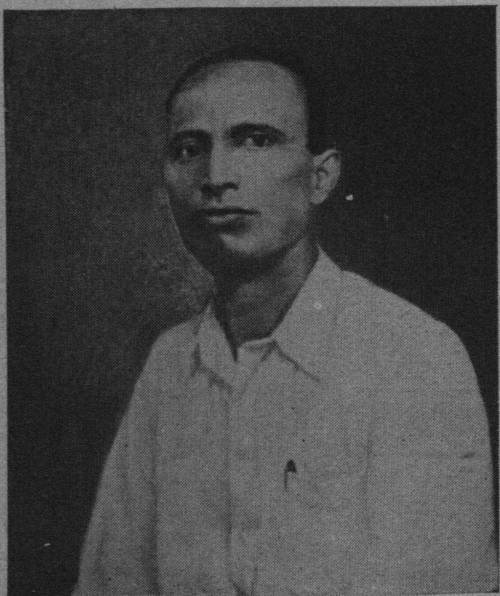
আগামী দিনের চিরনবীন বিপ্লবী প্রাণের নিভৃতে আমার এই রচনা যদি সামান্যতম স্থানও অধিকার করে, তবে তাদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি উৎসর্গ করে কর্তব্য পালনে সফল হয়েছি বলে মনে করবো—

অনন্ত সিংহ



অনুকূল চন্দ্র মুখার্জি

বাঙ্গলার অন্যতম বিপ্লবী নেতা। তাঁহার সুদক্ষ নেতৃত্বে ও পরিচালনায় ১৯১৪ সালে ২৬শে আগষ্ট ইংরেজ বণিকের প্রসিদ্ধ বন্দুকের দোকান রডা কোম্পানী হইতে ৫০ টি মসার পিস্তল ও ৫০,০০০ হাজার কার্তুজ লুণ্ঠীত হয়।



শহীদ তারকেশ্বর দস্তিদার

মাষ্টারদার সঙ্গী রূপে বহু খণ্ড যুদ্ধ বিজয়ী বীর মাষ্টারদার সহিত একসঙ্গে ধৃত হন এবং ১২-১২-১৯৩৪ তারিখে মাষ্টারদার সঙ্গে একইদিনে চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসী বরণ করেন।



শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাস

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হয়ে ৬৩ দিন অনশনের পর ১৩-৯-১৯২৯ তারিখে আত্মবিসর্জ্জন করেন।

ভূমিকা

শ্রী অনন্ত সিংহের লেখা 'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হতে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ও সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের সঙ্গে দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সশস্ত্র সংঘর্ষের বিবরণ প্রথমখণ্ডে বিস্তারিতভাবে অনন্তলাল লিখেছেন। বর্তমান খণ্ডে আছে সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং সামরিক বাহিনীর অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের সুদৃঢ় ও দীর্ঘকালব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের কাহিনী।

যথার্থভাবে বলতে গেলে এই পর্যায়ের সংগ্রামের কাহিনী পূর্ববর্তী যে কোন পর্যায়ের সংগ্রাম অপেক্ষা অধিকতর না হলেও কোন প্রকারেই কম গৌরবোজ্জল নয়। এর কারণ কেবল মাত্র এই নয় যে, একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী যুবক এবং অপরদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তি এবং তাদের প্রতাপশালী সামরিক বাহিনী। এই অসম শক্তিপরীক্ষাতে অপরিমিত রক্তপাত করেও ঐ বিদ্রোহ বহ্নি নির্বাপিত করতে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের লেগেছিল প্রায় পাঁচ বৎসর।

সমগ্র চট্টগ্রাম জেলার বিশেষ কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই বিপ্লবীদের যা কিছু প্রভাব ছিল। বিদ্রোহের মহানায়ক সূর্যসেন অন্য প্রায় সব নেতা ও প্রথম পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে প্রধানতঃ এই কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই বাস করতেন। সরকারের বিবেচনায় রাজনৈতিকভাবে বিপদজনক প্রতিটি গ্রামের অভ্যন্তরেই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ছোট ছোট দুই তিনটি গ্রামকে ভিত্তি করে একটি সশস্ত্র পুলিস 'পিকেট' (ঘাঁটি) অথবা সামরিক-বাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছিল। দিনের বেলায় বা রাত্রে যে কোন সময়েই গ্রাম্য পথ দিয়ে প্রকাশ্যে কেউ চলাফেরা করলে তাকে ঐ সব ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জেরার সম্মুখীন করা হ'ত। প্রায় সমগ্র জেলার ১৬ থেকে ৪০ বৎসর বয়স্ক সমস্ত হিন্দু যুবকদের পুলিসের রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল,—রাজনৈতিকভাবে বিপদজনক, কম বিপদজনক, এবং যাদের বিরুদ্ধে কিছু জানা নেই। এই তিন স্তরের যুবকদের সরকারের দেওয়া তিন রংএর কার্ড (পরিচয় পত্র) সব সময় কাছে রাখতে হ'ত, লাল, গোলাপী এবং সাদা। সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা খুব নিশ্চিন্ত ভাবেই জানতেন যে, বিদ্রোহী নেতারা ঐ স্বল্প কয়েকটি গ্রামের



শহীদ প্রভাস বল



শহীদ নরেশ চন্দ্র রায়

জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর সহিত সম্মুখ সমরে যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।



শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

চাঁদপুরে মিঃ ক্রেন ভ্রমে পুলিশ অফিসার তারিণী মুখার্জীর হত্যাপরাধে ১৯৩১ সালে ফাঁসী বরণ করেন।



শহীদ জীবন ঘোষাল (মাখন)

৩১-৯-১৯৩০ তারিখে চন্দননগরে টেগার্ট সাহেবের পুলিশ বাহিনীর সহিত সম্মুখ সমরে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

মধ্যেই আছেন এবং ঐ কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই সব সময়ে ঘোরাফেরা করেন। গ্রামের জনসাধারণকে বিপ্লবীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার এবং তাঁদের বিরোধী করে তুলবার উদ্দেশ্যে মাস্টারদা এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কর্মীদের গ্রেফতারের জন্যে বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাস্টারদা প্রায় সাড়ে তিন বছর ঐ কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই বাস করেছেন এবং সমগ্র জেলার বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। প্রায় প্রতিদিনই জেলার বিভিন্ন স্থানের এবং বিশেষ করে শহরের কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেছেন। ঐ কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই একান্ত প্রয়োজনে নূতন কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী পুলিস শত চেষ্টা করেও বিপ্লবী নেতা বা কর্মীদের গ্রেফতার করতে পারে নি বা তাঁদের কাজের ধারায় গুরুতর ভাবে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। সরকার বেপরোয়া হয়ে মাঝে মাঝেই প্রচুর সংখ্যক সৈন্য দিয়ে (পুলিস নয়) দু', তিন, পাঁচটি গ্রাম যুগপৎ ঘিরে ফেলে প্রতিটি বাড়ি তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করেছে। মাস্টারদা একাধিকবার এবং অন্যান্য অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মী বহুবার ঐ রকম ঘেরার মধ্যে পড়ে গেছেন এবং সফল ভাবে বেরিয়েও গিয়েছেন। এমনি ভাবে একবার বেরিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি বন্দী হন।

এইরূপ অবস্থার ভিতরে থেকে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালন করা এবং পরিকল্পিত কর্মসূচী অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজন আদর্শে অটুট আস্থা, প্রখর বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিপদ সম্পর্কে উদাসীনতা এবং মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা। সর্বোপরি প্রয়োজন গ্রামের জনসাধারণের উপর নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়ে বিশ্বাস।

মাস্টারদার চিন্তাধারা, কর্মসূচী এবং কাজের কৌশল পরিপূর্ণভাবে না হ'লেও বহু পরিমাণে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে এবং সফলও হয়েছে।

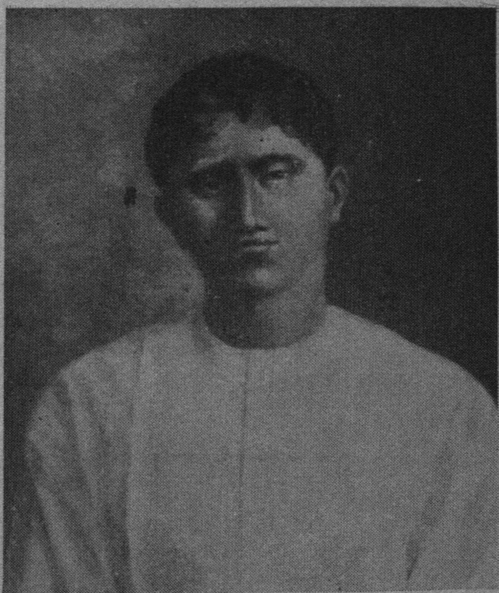
চট্টগ্রাম জেলার ঐ সময়কার ঐ অসহনীয় উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে কেমন করে তা সম্ভব হয়েছিল ?

প্রথমেই বলতে হয় গ্রামের মানুষ বিপ্লবীদের ব্যবহারে কাজে, তাঁদের বেপরোয়াভাবে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সাহসে এবং তাঁদের আত্মদানে প্রগাঢ় ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল ও তাঁদের লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে তাঁদের উপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস ন্যস্ত করতে পেরেছিল। তাই অসন্তোষজনক পরিস্থিতিতে শেষ ফল অতীব শোচনীয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল



শহীদ অপূর্ব সেন

ধলঘাটে ইংরেজ সেনানীদের সহিত সন্মুখ সমরে ১৯৩২ সালে মৃত্যু বরণ করেন।



শহীদ গোপীনাথ সাহা

চার্লস টেগার্ট ভ্রমে মিঃ আর্নেষ্ট ডের হত্যাপরাধে ১-৩-১৯২৪ তারিখে ফাঁসী বরণ করেন।

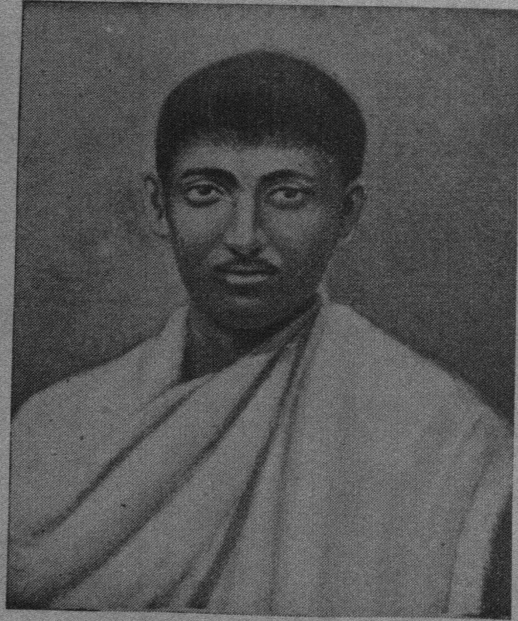
এবং আরও অন্যান্য অনেক গ্রামের অধিবাসীরা নরনারী নির্বিশেষে বিপ্লবীদের সর্বতোভাবে সাহায্যদানে কখনই কার্পণ্য করে নি।

নূতন কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দেবার সময় কয়েকটি ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটেছে; দুই একটি ক্ষেত্রে প্রাণহানিও হয়েছে। বাড়ির মানুষেরা সবই দেখেছে, পাড়ার অধিবাসীদের কাছেও কিছু গোপন রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পুলিস শেষ পর্যন্তও ঐ সব দুর্ঘটনার বিষয় কিছুই জানতে পারেনি।

চট্টগ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় ঐ যুগে বিপ্লবীদের কোনরূপ সাহায্য করেনি, তাঁদের সাথে অসহযোগিতা করেছে বা বহুক্ষেত্রে তাঁদের শত্রুতা করেছে, একথা সর্বৈবভাবেই মিথ্যা। অনেক সময় মাস্টারদা এবং অন্যান্য অনেক আত্মগোপনকারী নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী কর্মীরা গ্রামের বহু মুসলমান গৃহস্থের কুটিরে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছেন; কোন কোন সময়ে যখন সামরিক-বাহিনী গ্রামকে গ্রাম ঘিরে তল্লাসী চালিয়েছে এবং ঐ অবরোধ ভেদ করে তাঁদের পক্ষে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তখন অনেক মুসলমান গৃহস্থ মাস্টারদাকে তাঁদের অন্দরমহলে স্থান দিয়েছেন। কতখানি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস থাকলে এ সম্ভব হয়, সে কথা আজ আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন। তাঁরা একথা ভালভাবে জেনেই স্থান দিয়েছেন যে, ঐ সকল হিন্দু-যুবকেরা "প্রচণ্ডভাবে সরকার বিরোধী এবং বন্দুক হাতে সরকারী ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।" ধরা পড়লে কি পরিণতি হবে সে সম্বন্ধে ঐ সকল সাহসী, দেশপ্রেমিক মুসলমান গৃহস্থদের মনে কোনরূপ ভুল ধারণা ছিল না।

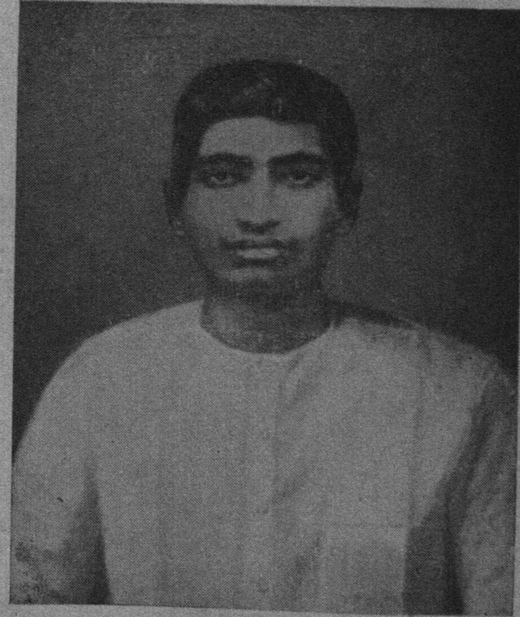
ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে স্থানীয় অধিবাসীদের অতখানি আস্থা, বিশ্বাস এবং ভালবাসা না পেলে মাস্টারদা বা অন্যান্য বিপ্লবী কর্মীদের পক্ষে অত দীর্ঘকাল ঐ সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে সক্রিয় থাকা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না, একথা বলাই বাহুল্য।

অনন্তলাল বিস্তারিতভাবে এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যভাবে ঐ সময়কার ঘটনাবলী তাঁর লেখা দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণনা করেছেন। যে সময়ের ঘটনাসমূহ এই দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে সেই সময়ে অনন্তলাল কলিকাতার আলিপুর জেলে এবং পরে আন্দামান জেলে বন্দী ছিলেন। কিন্তু মুক্তি পেয়েই তিনি প্রায় প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট জীবিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেছেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে তাঁদের কাছ থেকে সত্য ঘটনা জেনেছেন। বহু সংখ্যক সরকারী দলিলও তিনি অতি সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে তার ভিতর



শহীদ অনন্তহরি মিত্র

আলিপুর জেলের স্পেশাল পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ভূপেন ব্যানার্জীর হত্যাপরাধে ২৭-৮-১৯২৬ তারিখে ফাঁসী বরণ করেন।



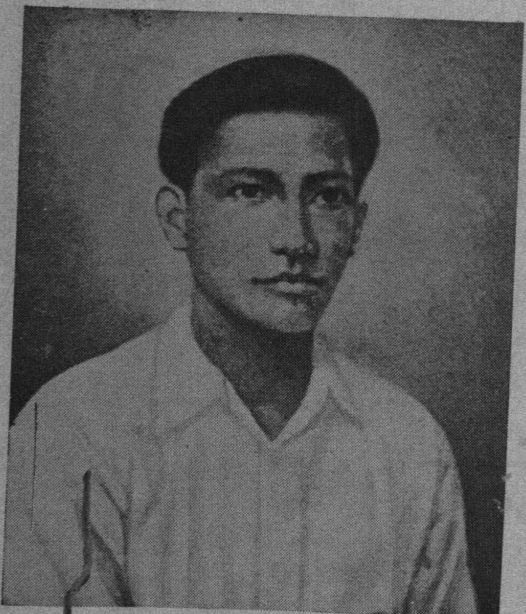
শহীদ প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী

আলিপুর জেলের পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ভূপেন ব্যানার্জীর হত্যাপরাধে অনন্তহরি মিত্রের সহিত একই দিনে ফাঁসী বরণ করেন।

থেকে সত্যটুকু বাছাই করে নিয়েছেন। তাই তাঁর লেখার ভিতর কল্পনার স্থান নেই, অতিশয়োক্তি নেই অথবা কোন ঘটনার গুরুত্ব হ্রাস করবার চেষ্টা নেই। আমিও যতটুকু জেনেছি তাইতে আমার বিশ্বাস যা সত্য তাই-ই অনন্তলালের এই বইতে স্থান পেয়েছে।

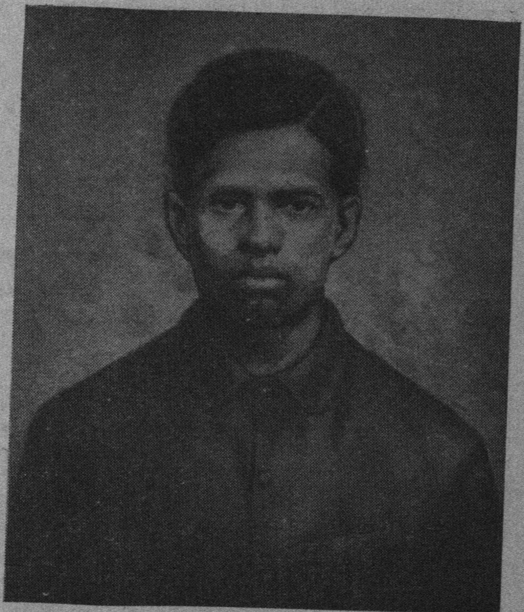
চট্টগ্রাম পাহাড়ের দেশ আর সমুদ্রের দেশ। তাই জেলার মানুষ যেমন সরল তেমনিই কর্মঠ। মুসলমানেরা অত্যন্ত সাহসী। অনেকে বংশ পরম্পরায় জাহাজে কাজ নিয়ে পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। তাই লেখা পড়া না জানলেও তারা উদার-হৃদয় সহিষ্ণু ও বন্ধুবৎসল। হিন্দুরা গোঁড়া নয়; দেশ (চট্টগ্রাম) সম্পর্কে গভীর অভিমান বোধ আছে এবং সকলের সঙ্গে মিলিয়ে চলার মত মনের প্রসারতাও আছে। সম্প্রদায় নির্বিশেষে অধিবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্য অতি নিবিড়, তাই বাংলা দেশের কোন কোন স্থানে যখন সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে এবং কখনও কখনও রক্তপাত ঘটেছে, চট্টগ্রামে তখনও অনুরূপ কিছুই প্রায় ঘটেনি। যখনই কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটেছে বা সাম্প্রদায়িকতার কালো মেঘ দেখা দিয়েছে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বুকদিয়ে সংখ্যালঘুকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। অবশ্যই কোন কোন ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম ঘটেনি তা নয়; কিন্তু সাধারণ ভাবে অধিবাসীদের এই চেহারা, এই চরিত্র, এই-ই বৈশিষ্ট্য। ১৯৩১ সালের আগষ্ট মাসে অত্যাচারী পুলিসের দারোগা আসানুল্লাকে হত্যা করার পর চট্টগ্রাম শহরের মুসলমান অধিবাসীরা ব্যাপকভাবে হিন্দুদের আক্রমণ করেছিল ও প্রভূত পরিমাণে তাদের ক্ষতিসাধন করেছিল বলে কেউ কেউ চট্টগ্রামের মুসলমান অধিবাসীদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ করেন। কিন্তু সেই দাঙ্গা যে মুসলমান অধিবাসীরা আরম্ভ করে নি ও সেই আক্রমণে যে তাদের কোন বিশেষ উৎসাহ বা তৎপরতা ছিল না এবং সেই দাঙ্গা যে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সহ জেলার সব বড় বড় সরকারী অফিসারেরাই (সবই ইংরেজ অথবা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেব) আরম্ভ করেছিল, একথা অনন্তলাল বিস্তারিত ভাবেই লিখেছেন।

১৯৩০ সালের প্রথম দিকে রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের পর হৃতমান সাম্রাজ্যবাদ চট্টগ্রাম জেলায় যে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ের অধিবাসীরাই সেই নিষ্ঠুর নিপীড়নের ফলভোগ করেছে। সাম্রাজ্যবাদ অবশ্যই তাদের বিভেদনীতি অনুসরণ করে হিন্দুদের কাছ থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করবার এবং সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তাদের আকর্ষণ করবার



শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত

৬ই মে কালারপোল যুদ্ধে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সহিত সংগ্রামে আত্মসমর্পনের পরিবর্তে আত্মবিসর্জ্জন দেন।



শহীদ মনোরঞ্জন সেন

৬ই মে কালারপোলের মরণজয়ী যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন।

উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের উপর অত ব্যাপক পরিমাণে নির্যাতন করেনি।

সাম্রাজ্যবাদের অতি নিপুন শাসন ব্যবস্থা ; অত সতর্ক পুলিস পাহারা, অত নিবিড় গোয়েন্দার বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও ১৮ই তারিখ (এপ্রিল) রাত্রিতে বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও সে বিষয়ে কিছু জানা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি কেন ? বিদ্রোহ ঘটবার পরেও অত ব্যাপক সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও পাঁচ বৎসরের আগে সেই বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করা সম্ভব হয়নি কেন ?—এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে গেলে চট্টগ্রামের অধিবাসীদের বাস্তব চরিত্র, মানসিক গঠন এবং তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি জানবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

ওই জেলার মানুষ মনুষ্যত্বের বিচারে ভাল শুধু তাই নয়, চট্টগ্রামের শহর এবং সমগ্র জেলাও অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে গরীয়ান। ঐ জেলা যে কোন দেশেরই গৌরবের সম্পদ।

বন্ধুবর অনন্তলাল চট্টগ্রামে মানুষ হয়েছেন, তাই চট্টগ্রাম সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম ভালবাসা দরদ ও গৌরববোধ। তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর মনের এই পরিচয় অজস্র ও অকুণ্ঠভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

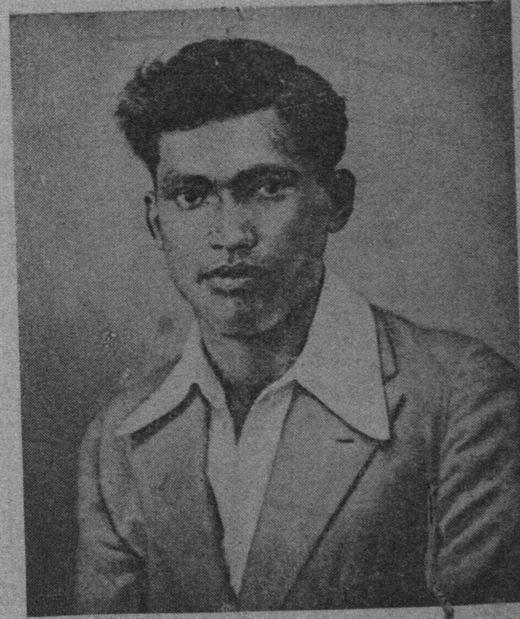
তাঁর লেখা "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের" এই দ্বিতীয় খণ্ড আমার বিশ্বাস সকলেরই ভাল লাগবে।

সত্যেন্দ্র ঘোষ—



শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের অন্যতমা নায়িকা। ইঁহার নেতৃত্বে ২৪-৯-১৯৩২ তারিখে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রান্ত হয় এবং সেইখানেই মৃত্যু বরণ করেন।



শহীদ রজত সেন

জালালাবাদ যুদ্ধের পর ৬ই মে কালার পোলে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সহিত সন্মুখ সমরে মৃত্যু বরণ করেন।

মুখবন্ধ

আমার এই গ্রন্থটির ভূমিকাও সুহৃদ্‌বর শ্রীগণেশ ঘোষ কর্তৃক বিস্তারিত বিশ্লেষণে রচিত। এই ভূমিকার পরে মুখবন্ধে আমার আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। যেটুকু না বললেই নয় সে ক'টি কথায় মুখবন্ধ সমাপ্ত করবো।

অগ্নিযুগের অতি পরিচিত অধ্যায়টি দুটি স্তরে বিভক্ত করে বিভিন্ন খণ্ডের মাধ্যমে পাঠকবর্গের সামনে পরপর উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছি!

১ম স্তরের প্রথম খণ্ড "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম"। দ্বিতীয় স্তরে "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ভিন্ন ভিন্ন অজস্র ঘটনা বিন্যাসে একটি অপরটি হতে সম্পূর্ণ পৃথক। তবু "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" বইটি পড়ার পর "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ" পড়লে প্রস্তুতি পর্ব ও বিভিন্ন ঘটনাবলী সমন্বিত সম্পূর্ণ অধ্যায়টির অর্থগ্রহণ সহজতর হবে মনে হয়।

পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায়—অগ্নিযুগের এই অধ্যায়টি "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের" দ্বিতীয় খণ্ডেও সমাপ্ত করা গেল না। তাই ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল হতে আরম্ভ করে ১৯৩২ সালের ৬ই জুন তারিখের ধল্‌ঘাট রণপ্রাঙ্গনের বিবরণ দিয়েই এই খণ্ডটি শেষ করলাম।

১৯৩২ সালের ৭ই জুন হতে ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রায় দুই বৎসরকালের ঘটনাসঙ্কুল কাহিনীর প্রতি সুবিচারার্থে এই ব্যাপারগুলিরও বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন।

পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রতি আমার ঔদাসীন্য স্বেচ্ছাকৃত ধরে নিয়ে কেউ কেউ আবার কৈফিয়ৎ তলব করতে পারেন, এই আশঙ্কায় যদি এই সমস্ত ঘটনাবলীর কেবলমাত্র উল্লেখ করে যাই তাতে কর্তব্যপালনে ত্রুটি থেকে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। তাই "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ" তৃতীয় খণ্ডে ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণ থেকে সুরু করে ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী মাস্টারদা ও তারকেশ্বরের ফাঁসিমঞ্চের শেষ বিবরণটুকু দিয়ে আমাদের পরিচিত অগ্নি-যুগের অধ্যায়টি সমাপ্ত করবো ইচ্ছে করেছি।

আমার অতি আপন ও শুভানুধ্যায়ীদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার

ফলেই আড়াই মাসের মধ্যে "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ" গ্রন্থটি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকবর্গের কাছে পরিবেশন করা সম্ভব হয়েছে।

শ্রীপরেশ চন্দ্র মৈত্র ও মহাজাতি সদনের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের সৌজন্যেই 'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ' পুস্তকটি মৃত্যুঞ্জয় শহীদদের প্রতিকৃতিতে সমৃদ্ধ।

আমার এই তিনটি গ্রন্থ—'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' এবং "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ভুলভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নয়—তবে তার কোনটাই স্বেচ্ছাকৃত নয়। কোন ভুল তথ্য বা বর্ণনা যাতে পরিবেশিত না হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

পাঠকবর্গের কাছে আমার আবেদন—পরবর্তী সঙ্কলনে যাতে ভুলগুলি সংশোধিত হতে পারে তার জন্য তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে অকুণ্ঠিত চিত্তে আমাকে সাহায্য করেন। এই তিনটি গ্রন্থে বাস্তব ঘটনার কোন বিকৃতি ঘটেনি জানতে পারলে কর্তব্যে ত্রুটি হয়নি ভেবে শান্তি পাবো এবং তাই হবে আমার মহামূল্য পুরস্কার!

আমার নিতান্ত আপনজন ও সুহৃদ শ্রীযুক্ত গোপাল দাসগুপ্ত মহাশয় নিঃস্বার্থ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে না এলে "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ" গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ ও প্রকাশনা এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনমতেই সম্ভব হ'ত না। এই জন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

জালালাবাদের নির্মম যুদ্ধ শেষ—স্মরণীয় ২২শে এপ্রিলের অন্ধকার রাত্রির কালো যবনিকা একটু একটু করে সরিয়ে পূবের আকাশ রাঙিয়ে ধীরে ধীরে দেখা দিল আর একটি সম্ভাবনাময় দিনের ইঙ্গিত—২৩শে এপ্রিলের নির্মল নীল সকাল। এই নিদারুণ রাতটুকু শেষ হওয়ার মধ্যেই ছায়াছবির মত দ্রুত গতিতে পরের পর কত ঘটনাই যে ঘটে গেল! আমাদের প্রধান-বাহিনীর মুষ্টিমেয় ক'জন তরুণ সৈনিকের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে কামান বন্দুকে বলীয়ান বীর ইংরেজের বিশাল বাহিনী বিপর্যস্ত অবস্থায় পালিয়ে বাঁচলো—কিন্তু ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাংলামায়ের অতুলণীয় সম্পদ বারোটি অমূল্য প্রাণ!—বিন্দুমাত্র দ্বিধাহীন চিত্তে হাসিমুখে যারা বরণ করে নিল পরম গৌরবময় মৃত্যুকে!!

আমাদের অবশিষ্ট বিপ্লবী সাথীরা যুদ্ধশেষে মাষ্টারদা ও লোকনাথের সঙ্গে পাহাড় হ'তে নামবার পথে ঘটনাচক্রে দুইটি দলে আলাদা হয়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। আমরা—গণেশ, আনন্দ, মাখন ও আমি সেই রাতেই ফেণী স্টেশনে পুলিশের সঙ্গে একটি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লাম—পুলিশদলের তিনজনকে আহত করে তাদের ব্যূহ ভেদ করে আমরা পালাতে সক্ষম হয়েছিলাম—কিন্তু ছত্রভঙ্গ অবস্থায় মাখন, আনন্দ একদিকে—গণেশ একদিকে ও আমি অন্যদিকে ছিটকে পড়লাম। ২৩শে তারিখে ট্রাঙ্ক রোডের উপর মাখন ও আনন্দের সঙ্গে আকস্মিক ভাবে গণেশের দেখা হয়ে যায়।

২৩শে তারিখেই ঐ দিকে আবার সরকারী ফৌজ জালালাবাদ পাহাড় তন্ন তন্ন করে খুঁজে মৃতপ্রায় অর্ধেন্দু দস্তিদার ও মতিলাল কানুনগোকে গ্রেফ্‌তার করে। অম্বিকাদাও যুদ্ধে আহত হয়ে ঐ পাহাড়ের উপরেই পড়ে ছিলেন—একটু বেশী রাতে অনেক কষ্টে তিনি ঐ পাহাড়ের আধ মাইলের মধ্যেই একটি ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নেন এবং ২৩শে সকাল থেকেই আত্মগোপন করে রাত্রির অপেক্ষায় সেখানেই বসে ছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা ও নিজেদের পরস্পরের কথা তখনও আমরা কিছুই জানি না—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই নিদারুণ ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা—কার কি হয়ে গেল—কে কি অবস্থায় আছে—আবার কখন আমরা সকলে মিলিত হব—কোথায় কিভাবে আবার শক্তি সংহত করব—এই সব প্রশ্নেই মন আচ্ছন্ন!

এই সমস্ত ঘটনার বিবরণ আগেই দিয়েছি। এখন আমার লেখার মধ্যে যাঁদের যেখানে ছেড়ে এসেছি সেখান থেকে সুরু করেই তাঁদের বৃত্তান্ত শেষ করব। আগে আমার নিজের কথাটা একটু বলি। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় অর্ধপাগলের অভিনয় করে, পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে বসে খাওয়া সেরে এক হাতে দু'টি ছোট ছোট কাঁচা আম ও অন্য হাতে পাতা দিয়ে মোড়া বাকি ভাতগুলি নিয়ে মাঠের রাস্তা ধরে হাঁটতে সুরু করলাম। বড় রাস্তায় যে কোন সময় হঠাৎ পুলিসের গাড়ি বা পুলিসদলের সাক্ষাৎ পাওয়ার সম্ভাবনা। আমাদের বহু বিপ্লবীকে এই প্রকার ভুলের জন্য চড়া মাশুল দিতে হয়েছে। কালী চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণের রিভলভারের গুলীতে আই, জি, পুলিস মিঃ ক্রেগের পরিবতে ভ্রমবশতঃ তাঁরই মত দেখতে পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার তারিণী মুখার্জী চাঁদপুর রেল-স্টেশনে নিহত হন। তারপর কালী ও রামকৃষ্ণ ট্রাঙ্ক রোড ধরে নিশ্চিন্ত মনে চলেছে, কুমিল্লার জেলা-শাসক ও ক'জন সশস্ত্র কনস্টেবল ঘটনার সংবাদ পেয়ে মোটরযোগে আসছিলেন—তাঁরা ট্রাঙ্ক রোডের উপর অতর্কিতে এসে ঘটনাস্থল থেকে বহু মাইল দূরে রামকৃষ্ণ ও কালীকে গ্রেফ্‌তার করেন। আগে এই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা আমারও জানা ছিল না। তবু সাধারণ বুদ্ধিতেই সরকারী বড় সড়ক পরিহার করাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলাম। কেবল তাই নয়, দূর থেকেও যদি কোন দোকান, স্টেশন বা লোকের ভিড় দেখেছি তাও এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কিছুটা মাঠ-ঘাট অতিক্রম করে গিয়েছি। কিন্তু তবুও অজানা "বালক শত্রুদের" "আক্রমণ" ও লাঞ্ছনা এড়াতে পারিনি। গ্রামের বা মাঠের পায়ে-চলা সরু পথে দু'একজন গ্রাম-বাসীর সম্মুখীন হলেও হয়ত পার পাওয়া যাবে, কিন্তু পুলিসের সামনে পড়লে তারা যদি সন্দেহ করে "পাগলকেও" না ছাড়ে! এই আশঙ্কায় যতখানি সম্ভব প্রধান সড়ক ত্যাগ করেই পথ চলেছি। আমার সাবধানতার কোন ত্রুটি ছিল না—তবু ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরেও পথে কত রকম অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় আগে থেকে তার সবটুকু জানা সম্ভব নয়। আমি এমন একটি স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, যেখানে মনে হচ্ছে সামনেই একটি হাট বসেছে। অনেক লোক জমা হয়েছে—হৈ-চৈ হুটোপুটি চলছে। মুখ ঘুরিয়ে তখুনি আবার পেছন দিকে হাঁটা সুরু করলাম। তারপর কেমন করে, কোথা দিয়ে বেরিয়ে আবার একটা মাঠে এসে পড়লাম—সূর্য একেবারে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। এই বিস্তীর্ণ মাঠের প্রান্ত ঘেঁষে পঞ্চাশ-ষাট গজ চওড়া একটি অগভীর জলস্রোত বা খাল বয়ে চলেছে। আমার যতদূর মনে পড়ে আমি উত্তরে যাচ্ছিলাম।

খালের সামনে এসে একটু দাঁড়িয়ে কি যেন ভেবেছিলাম। আমার সঙ্গে ছোট একটি পোঁটলায় গোটা পঁচিশেক টাকার নোট ও কিছু খুচ্‌রো লুকানো ছিল। ক্ষুদ্র পোঁটলাটি দাঁতে কামড়ে খালে নেমে পড়লাম। সাঁতরেই পার হতে হ'ল। এই খালটি পেরিয়ে পোয়া মাইলের মধ্যে আমি আবার একটি নদী পেলাম। এই নদীর পাড়ে নোঙর করা দু'একটা ছইটাকা নৌকো দেখলাম। এই নদীটি কোথা থেকে এসেছে বা অন্য কোন্ নদীতে গিয়ে পড়েছে তা' আমার জানা ছিল না। বিলোনিয়ার ত্রিশ মাইলের মধ্যেই কুমিল্লা শহর। কুমিল্লার বুক চিরে গোমতী নদী প্রবাহিত। কাজেই মনে হ'ল গোমতীর সঙ্গে এই নদীর নিশ্চয়ই যোগ আছে। আমার আন্তরিক বাসনা কোনমতে কুমিল্লা পৌঁছনো। সামনেই নদী—নৌকোও আছে, তবে নিশ্চয়ই ধারে-কাছে মাঝিও আছে। যদি একজন মাঝিকেও হাত করতে পারি তাহলে তার নৌকোয় কুমিল্লা যাওয়ার চেষ্টা করব। মাঝি আমার প্রতি একবার সদয় হলে বাকি পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা খুব কঠিন হবে না। আমার সঙ্গে প্রায় পঁচিশটাকা আছে। মাঝি ভাড়া কত নেবে আমার জানা ছিল না। সে সময়ে টাকার মূল্য ছিল অনেক বেশি। পঁচিশটাকা কুমিল্লা যাওয়ার ভাড়া হিসেবে বেশি না হলেও কম বলেও আমার মনে হয় নি। আমি ভেবেছিলাম, মাঝি আমার সব কথা শুনে একবার যদি রাজী হয়, তবে সে বেশি টাকা চাইলেও আমি দেব, অথব আমিই তাকে বেশি টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে কুমিল্লা পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানাব। একবার কোনমতে কুমিল্লা পৌঁছতে পারলেই গোপন আশ্রয়, টাকা-পয়সা, গাড়ি, ইত্যাদি বহুরকমের সাহায্য পাওয়ার সুযোগ আমি পাব। সুতরাং নৌকোর মাঝি কাউকে হাত করবার চেষ্টায় লেগে গেলাম।

প্রথমে একটা নৌকোর কাছে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। একজন মাঝিকে একটু একান্তে পাওয়াই আমার ইচ্ছা। দ্বিতীয় নৌকোটিতে দেখি মাত্র একজন মাঝিই আছে। ভাবলাম—এই তো সুযোগ, একেই বলব। নৌকোর খুব কাছে গেলাম। মাঝি নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমার সেই চেহারা দেখে কারও পক্ষে নির্লিপ্ত বা উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। আশ্চর্য! অসময়ে আমাকে নৌকোর কাছে সেইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখেও মাঝির কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেল না। আমার মনে হ'ল মাঝি একা, তাই সামনে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায়, সবল দেহ এক পাগলকে দেখে

সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে এবং সেই জন্যই নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে পাগলকে নিরুৎসাহ করতে চাইছে। মাঝির ঐ অবস্থা দেখে বা অন্য কোন অজানা কারণে অথবা অনিশ্চয়তার দ্বিধাবোধেই হয়ত আমার মুখ আর খুলল না। বোবা—বোবাই থেকে গেলাম। মাঝিকে কিছু না বলে, কোন প্রস্তাব না করেই সেই স্থান পরিত্যাগ করলাম।

সেই জায়গা থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে আরও একটি নৌকো নোঙর করা ছিল। সেদিকেই পা বাড়ালাম। কিন্তু অতদূরে যাওয়ার আগে কতক-গুলি মাছ ধরা বড় বড় জালের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। গন্ধে মনে হ'ল জেলে পাড়া—চারিদিকেই মাছের গন্ধ। এদিক-ওদিক থেকে দু'একজন লোকের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে সকলেই জেলে। আমি নদীর ধার ধরে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। ইচ্ছে আছে যদি একা কোন জেলের দেখা পাই তবে তার কাছে কিছু সাহায্য পাই কি না চেষ্টা করব। কিন্তু যাকে একা পাব তাকেই তো আর মনের কথা খুলে বলা চলবে না! নানা কথার ভেতর দিয়ে তাকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে; তারপর তেমন ভরসা পেলে তবেই মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে। এখন পর্যন্ত আমি কেবল অর্ধপাগল হাবাগোবা লোক নই—কালা-বোবাও। লোক বুঝে ও প্রয়োজনবোধেই কেবল মাত্র মুখ খুলতে হবে।

সবেমাত্র সূর্য অস্ত গেছে। দিনের আলো কমে গেলেও চারিদিক এখনও উজ্জ্বল। আমার পথের সামনেই একজন আগন্তুককে দেখা গেল। আগন্তুকের খালি গা, হাঁটুর ওপর কাপড়, বলিষ্ঠ দেহ, উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির কম নয়, ফর্সা রং রোদে পুড়ে লালচে দেখাচ্ছে। সে হাঁক দিয়ে কাকে যেন কি বলছিল। দেখে মনেহয় বেশ স্বচ্ছল অবস্থার একজন জেলে এবং তার হাবভাবে মনে হয় প্রতিবেশীদের ওপরও তার বেশ প্রতিপত্তি আছে। আগন্তুক আমার প্রায় সামনে এসে উপস্থিত। সে খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিল—কিছু যেন বলবে বা জিজ্ঞাসা করবে। আমি তাকে সে সুযোগ না দিয়ে আগেই ভান করলাম যেন আমার বেজায় খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে চাই। আমার মুখে কথা নেই। মুখ, পেট ও হাতের নানা ভঙ্গীতে আমার ক্ষুধার জ্বালা তাকে বোঝালাম। সহৃদয় জেলে তৎক্ষণাৎ আমার দুঃখে অভিভূত হ'ল। খুব হৃদ্যতার সঙ্গে তার গ্রাম্য ভাষায় আমাকে বলল—"আয় আয়, আমার সঙ্গে আয়!"

খুব কাছেই তার বাড়ি। একটুখানি হেঁটেই একটা পাড়ায় ঢুকলাম।

জেলে আগে চলেছে আমি তার পেছনে। বাড়ির কাছে এসে কাকে হাঁক দিয়ে ডেকে বলল—"এসো, এসো, দেখে যাও আমার সঙ্গে অতিথি এসেছে।"

আমি তার বাড়িতে ঢুকলাম। মস্ত বড় ঝক্‌ঝকে উঠোন, চারিদিকে বড় বড় মাটির একতলা দালান। বেশির ভাগ ঘরের ওপর ঢেউতোলা টিনের চালা। আমাকে নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে তার হাঁকডাক ও উৎসাহের আতিশয্যে আশে-পাশের পরিবারবর্গের মধ্যেও সাড়া পড়ে গেল। মনে হ'ল, এই জেলেই সেই স্বচ্ছল পরিবারের কর্তা। বাড়ির লোকদের ডেকে সে বল্‌ল—"দেখ, আমার সঙ্গে অতিথি আছে। ভাল করে অতিথি সেবা কর দেখি।" তারপর আবার অপর একজনকে বলল—"একটা বড় পিঁড়ি দাও—একে বসাও। পেট ভরে খেতে দাও।"

চারিদিক থেকে ছেলে-মেয়ে, প্রৌঢ়, বুড়ো সকলে এসে জড়ো হয়েছে। আমি প্রায় উলঙ্গ। আমার ভয়ানক লজ্জা করছিল। প্রাণপণে চেষ্টা করছি যেন অভিনয় করতে গিয়ে ধরা না পড়ি। একাধারে পাগল, হাবাগোবা, কালা ও বোবা—সামঞ্জস্য রেখে এত লোকের মধ্যে অভিনয় করতে হবে। আমি এমন ভাব দেখাচ্ছি যেন কোনদিকেই আমার ভ্রূক্ষেপ নেই—এত লোক জমা হয়েছে, আমি যেন তা' দেখতেই পাচ্ছি না, কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছে না! কিন্তু মনে মনে সত্যিই আমার ভীষণ ভয় করছিল—এত লোক, প্রায় পঞ্চাশজন হবে আমার চারিদিকে ভিড় করেছে!

আমি বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াবার পরেই জেলে-বন্ধু পিঁড়ি দিতে বলেছিল। তক্ষুণি পরিবারস্থ একজন স্ত্রীলোক উঠোনের মাঝে একটা মস্তবড় পিঁড়ি পেতে দিলেন। তাঁকে জেলে-বন্ধুর স্ত্রী বলেই আমার মনে হ'ল।

অতিথি সেবা করবে—কত সমাদর, যত্ন ও আগ্রহ! দেখতে দেখতে বড় কাঁসার ঝক্‌ঝকে থালাতে ভাত এল। মাছ, তরকারি প্রভৃতি তিন-চার পদ থালায় ও বাটিতে সাজান; কাঁসার গেলাসে জল। একটা বড় বাটি ভরে দুধও দিয়ে গেল। আমার কিন্তু পেট ভর্তি—খাবার ইচ্ছে বা প্রয়োজন কোনটাই ছিল না। আমার প্রয়োজন ছিল—একান্তে একজন সহৃদয় লোকের সঙ্গে কথা বলে সাহায্য প্রার্থনা করা। কিন্তু এ কি হ'ল? এ যে এক মহা বিভ্রাট! এ যে পাকেচক্রে ভগবান ভুত!

ভাত-ডাল, তরি-তরকারি, মাছ ও দুধের সমারোহ। মহৎ ভোজ্যং সমুপস্থিতম্! ধনুকের ছিলা নয়—সত্যিই মহৎ ভোজ। কিন্তু ক্ষিধে মোটে নেই অথচ ক্ষিধের ভান করতেই হবে। আমি কিছু খাচ্ছি, কিছু ফেল্‌ছি; কখনও

কেবল ডাল, কখনও মাছ আবার কখনও বা তার সঙ্গে দুধে চুমুক দিচ্ছি। সহৃদয় জেলেভাই আমার পাশে বসে দেখিয়ে দিচ্ছিল কি দিয়ে এবং কি করে খেতে হয়। মাঝে মাঝে জেলে সাথীটি আমার দুর্দশায় দুঃখ প্রকাশ করছে—"আহা, খেতেও ভুলে গেছে! কতদিন যে খায় নি! কোথায় যে বাড়ি—মা-বাবা কোথায় তাও বা কে জানে! কি যে হবে, কি যে করা যায়…… !"

আমার জেলে-বন্ধুই যে কেবল তার মনোভাব ব্যক্ত করছিল তা' নয়, উপস্থিত নানা মতের লোক, 'বিজ্ঞ' ও 'পণ্ডিতেরা'ও আমাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল—"ইস্কুইল্যা পোয়া বুলি মনত্ হয়।" তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আর একজন মত প্রকাশ করল—"হঃ হঃ, চুলর ছাঁট্ আইজ ন যায়।" সকলের মধ্যে যার বিষয়বুদ্ধি' অত্যন্ত প্রখর মনে হয়েছিল, তার সারগর্ভ অভিমত—"এক্কেরে বার—টেক্যা গাউর?" অর্থাৎ, আমার মত বলিষ্ঠ দেহের ক্ষেতমজুরের উপযুক্ত দিন-মজুরী বারো টাকার কম নয়। আমার দেশ, জাত, বয়স, শরীর, পেশা ও বাড়ির অবস্থা সম্বন্ধে যার যা' মনে এসেছে ছোট ছোট কথায় সব প্রকাশ করছিল। এদের কথোপকথন সবটাই আমার কানে আসছে। কিন্তু বিরুদ্ধে তেমন কিছু কেউ বলছিল না। আমার সম্বন্ধে কার অনুমান বা গবেষণা কতখানি ঠিক, তা' নিয়ে পরস্পরের মধ্যে সামান্য তর্ক-বিতর্কই হচ্ছিল। ছোট ছেলে-মেয়েরাও সেখানে উপস্থিত; কিন্তু অতিথি সেবার সমাদর যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তাতে কোন ছেলে-মেয়েই আমার প্রতি কোনরূপ অসৌজন্য প্রকাশে সাহসী হয় নি, কেবল আমার খাওয়ার নানাবিধ ব্যতিক্রম দেখে তারা মাঝে মাঝে হেসে উঠছিল।

এইভাবে প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেল। আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। ভাবছি কিভাবে সবদিক বজায় রেখে সেখান থেকে পালাব। এমন সময় উপস্থিত গ্রামবাসী ও এই বিরাট যুক্ত-পরিবারের মধ্যে যিনি অতি বিচক্ষণ ও চতুর, তিনি তাঁর বুদ্ধির ছিপি খুলে জলদ-গম্ভীর স্বরে সবাইকে চমকে দিয়ে গ্রাম্য ভাষায় বললেন,—"আপনারা যে যাই বলুন না কেন, আমার ধারণা কিন্তু একেবারে অন্যরকম। ইনি পাগল বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হচ্ছে ইনি একজন সি, আই, ডি!" তাঁর এইরূপ ভাবগম্ভীর উক্তিতে অন্যান্য সকলে কতখানি অবাক হয়েছিলেন বা চমকে উঠেছিলেন জানি না, কিন্তু আমি কেবল যে চমকে উঠেছিলাম তা' নয়, আমার রীতিমত আশঙ্কা হচ্ছিল, এইরূপ গবেষণা যদি আরও চলতে থাকে তবে হয়ত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।

আমার তখন মনোভাব—যঃ পলায়তি সঃ জীবতি! 'আমি পাগল নই, একজন সি, আই, ডি,'—এই কথা শোনা মাত্রই উঠতে ইচ্ছে করলেও ওঠা যায় না। তা'তে আরও বেশী সন্দেহভাজন হবার সম্ভাবনা। তাই ঠিক তক্ষুণি নয়, একটু পরে, চারিদিকে ছড়ান ভাত ক'টি মাটি থেকে কুড়িয়ে দিব্যি খেলাম, একমুঠো ভাত সঙ্গে নিয়ে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উঠে উল্টো দিকে হাঁটা সুরু করলাম। আমার সহৃদয় সাথী আমাকে হাতে ধরে ঠিক পথে নিয়ে চলল। জেলে-বন্ধু বলল—"যাই, অতিথিকে পথ দেখিয়ে আসি!"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময় জেলে-বন্ধুটি ছাড়া আমার সঙ্গে কেউ ছিল না। সে আমার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নদীর ধার পর্যন্ত এল। আমার বহুবার ইচ্ছে করেছে তাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলি। কিন্তু কি জানি, বলি বলি করেও বলা হ'ল না—আমি মনস্থির করতে পারছিলাম না। অত লোক দেখেছি, যদি কোন কারণে জেলে-বন্ধুটি সব শুনে নিয়ে আমাকে সাহায্য না করে, তবে এই নিকটবর্তী লোকালয় থেকে আমার বেরিয়ে যাবার কোন উপায় থাকবে না। কোন একজনকে এমন একান্তে চাই, যে সব শোনার পর বিরুদ্ধতা করলেও যেন পালাবার সুযোগ থাকে। এই পরিবেশ আমার পালাবার অনুকূলে ছিল না। তাই এইরূপ সহানুভূতিশীল বন্ধু পেয়েও কিছু বলা হ'ল না। নদীর ধার পর্যন্ত এসে জেলে-বন্ধু আঙুল দিয়ে পথ দেখিয়ে বলল—"যা যা, ঐদিকে যা!" আমি তার নির্দেশমতই নদীর ধার ধরে এগোলাম। বন্ধুটি সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ আগে সূর্য্য অস্ত গেছে—সন্ধ্যার অন্ধকারে মাঠ-ঘাট নদী সব যেন আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ থেকেই দেখছিলাম—নদীটির একটি স্থান দিয়ে লোকেরা হেঁটে এপার-ওপার করছে। আমিও সেই স্থান দিয়েই হেঁটে পার হয়ে গেলাম—প্রায় এক কোমর বা তার চেয়ে সামান্য একটু বেশী জল হবে। গায়ে জামা-কাপড় নেই, কাজেই ভিজে কাপড় গায়ে শুকোবারও বালাই নেই।

নদী পার হয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ ধরলাম।

খানিকটা দূরে একটা হ্যাজাক আলো জ্বলছিল। দেখে মনে হ'ল কোন হাট ভেঙেছে, লোকজন নেই বললেই চলে। হাটের পাশে কোন একটা স্থায়ী দোকানে আলোটি জ্বলছিল। আমি হাটের পাশ দিয়ে আবছা অন্ধকারে গা ঢেকে চলে যাচ্ছিলাম। আলোর আড়ালে লোকদের আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আলোতে দাঁড়িয়ে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই

বলেই তখন মনে হয়েছে। কিন্তু দু-একজন, যারা আলোর একটু তফাতে ছিল, তাদের চোখ আমার দিকে পড়তেই তারা বেশ উৎসুক হয়ে উঠল এবং কেউ কেউ হাঁক দিয়ে আমি কে তা' জানতে চাইল। আমি যেন শুনতেই পাইনি, এমনি ভাব করে খুব দ্রুত বাঁক ঘুরে তাদের চোখের আড়ালে চলে গেলাম। একটু পরেই মনে হ'ল পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। কয়েকটি ছোট ছোট দালানও আমার চোখে পড়ছে। প্রাচীর ঘেরা একটি বাড়ি থেকে আমাকে দেখে কে যেন অপর একজনকে কিছু বলল—বাড়ির দারোয়ান বা চাকরেরা কেউ হবে। পাড়ার গলিঘুঁজি দিয়ে চলতে আমার ভয় করছিল। কি জানি কার বাড়িতে বা কার সামনে গিয়ে পড়ব! তবু চোখ যে দিকে যাচ্ছে সেই দিকেই দ্রুত হেঁটে চলেছি।

যা হোক্, শেষ পর্যন্ত পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। সামনে উঁচু রাস্তা দিয়ে রেল-লাইন গেছে। আমি রেল-লাইনের ওপরে উঠলাম। সন্ধ্যা প্রায় সাতটা হবে। চারিদিকেই ঘন অন্ধকার। কাছাকাছি কোন লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ চোখে পড়ল প্রায় আধ মাইল দূরে যেন আগুন জ্বলছে। উনোনের আগুন নয়, অনেকটা স্থান জুড়ে আগুন জ্বলছিল। খাকী পোশাকে সৈন্যরা সেখানে আছে বলে মনে হ'ল, কিন্তু কেন বা কিসের আগুন তা' তখন বুঝতে পারি নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিউগালের আওয়াজ শোনা গেল—আর সন্দেহ রইল না। তবু আগুন কেন জ্বালিয়েছে তা অনুমান করতে পারলাম না।

আমি রেল-লাইন থেকে আবার মাঠে নামলাম। সামনেই মাঠ—অদূরে পাহাড়। কোথায় আছি, কোন্ দিক্, কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। আকাশের তারা দেখে দিক্ নির্ণয় করাও জানতাম না। দু' বছরে মধ্যে Death Programme নিয়ে প্রস্তুত হয়েছি, কাজেই ঐদিকে কোন ট্রেনিং নেওয়ার প্রয়োজন মনে করি নি। আমি উপস্থিত কি করব, কোন্ দিকে যাব, কার কাছে সাহায্য চাইব, কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না। অজানা স্থানে রাত্রির অন্ধকারে মাঠে ও পাহাড়ে পথ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব; কোন গৃহস্থবাড়িতে ঐ বেশে উপস্থিত হওয়াও মূর্খতা।

চারিদিকে শেয়াল ডাকছে। ঝিঁঝিঁ পোকা ও ব্যাঙের ডাক রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে মাঠের মাঝখানে দিয়ে এক পা এক পা করে হাঁটছি। শরীর খুবই অবসন্ন ও ক্লান্ত, পা দুটি ক্ষতবিক্ষত। দূরে দূরে কয়েকবার দেখতে পেলাম পাঠকাঠির গুচ্ছে আগুন ধরিয়ে কেউ

কেউ মাঠ ও পাহাড়ের পথ অতিক্রম করছে। সহজেই বোঝা গেল ঐদিকে কাছেই কোথাও লোকালয় আছে। কিন্তু অন্ধকারে পথ চিনে আন্দাজে সেদিকে যাওয়া উচিত হবে না ভেবে আমার গতি মন্থর হয়ে এল। মনে মনে স্থির করলাম—এই মাঠেই বাস করতে হবে। শেয়ালের ভয় আর কতখানি! যদি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত মনে করে খেতে আসে তবেই না ভাববার কথা! তা' নইলে ছোটোখাটো বাঘকেও ভয় করি না। পোকামাকড়, পিঁপড়ে, ইত্যাদি চোখে, কানে, নাকে প্রবেশ করতেই পারে—তার আর কি করা যাবে? আর সাপে যদি ছোবল দেয়? সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে মনে হল 'পথের দাবী'র ডাক্তারের কথা, ভারতীকে বলছেন—"সাপ তো আর বিদেশ থেকে চালান আসেনি, এদেরও ধর্মজ্ঞান আছে!" আমাদের দেশের সাপ, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর মত বিশ্বাসঘাতক কেন হবে? কাজেই সাপের ধর্মজ্ঞানের উপর বিশ্বাস রেখে আমি সেই রাত্রে বিলোনিয়ার কোন এক স্থানে মাঠেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করলাম।

চারিদিকে আল দিয়ে ঘেরা একটি ছোট্ট ক্ষেত। ক্ষেতটির এক ধারে বোধহয় একটি আম গাছ। আমি সেই গাছতলায় বসলাম। জমিটা হাল দিয়ে চষা। বড় বড় চাকা চাকা মাটির ডেলা হাল চালাবার পর পড়ে আছে। এখনও জমি পুরো তৈরি হয় নি। কিন্তু এই আধা-চষা জমিই আমার সাহায্যে এল। মাটির ডেলাগুলো সরিয়ে আমি শোওয়ার মত একটা গর্ত করলাম। এপ্রিল মাস, তবু রাত্রিবেলা খালি গায়ে পাহাড়ী বাতাসে আমার শীত শীত করছিল। আমি হাঁটু মুড়ে কাত হয়ে গর্তটার মধ্যে শুয়ে পড়লাম। এখনও মনে পড়ছে, কয়েকটা চাকা মাটি গায়ের ওপর রেখে শরীরটাও ঢাকতে চেষ্টা করেছিলাম।

শুয়ে শুয়ে বন্ধুদের কথা—নিজের কথা, এরপর কি কর্তব্য—এইসব ভাবতে ভাবতে কোন এক সময় ঘুমে দুই চোখ বুজে এল। নিদ্রাদেবীর শীতল স্পর্শ আমার ক্লান্ত দেহকে অনেকখানি সুস্থ করে তুললো।

দূরে মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘুম ভাঙলেও উঠে বসতে ইচ্ছে করছিল না। সমস্ত গায়ে হাতে-পায়ে অসহ্য ব্যথা। মনে এমনই অবসাদ যে, ভাবলাম এই মাঠে থেকে আর কোথাও যাব না। যে চাষী এই মাঠে আসবে তাকেই সব কিছু বলে তার সাহায্য প্রার্থনা করব। কি আশ্চর্য! এত অবসাদ! বুদ্ধি খাটিয়ে এত সাবধানতা অবলম্বন করে এত ধৈর্যের সঙ্গে এত

দূর এসেছি—সহজে কাউকে বিশ্বাস করি নি; এখন সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে না জেনে না বুঝে, এই মাঠে চাষীর হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া কি উচিত হবে? না, এ হতেই পারে না—উঠে পড়লাম।

এখনও অন্ধকার আছে। ভোর হতে সামান্য বাকি। যতদূর সম্ভব ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে একটা সরু পায়ে-চলা পথ ধরে এগোতে লাগলাম। আমার গতি অতি মন্থর। অদূরেই চাষীদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। আমার পেছন থেকে একজন চাষী লাঙল কাঁধে গরু নিয়ে আসছে। আমার পাশ কাটিয়ে সে চলে গেল—আমাকে দেখেও কোন কথা বলা প্রয়োজন মনে করল না। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম সব কথা বলব কিনা। কিন্তু একেও শেষ পর্যন্ত কিছু বলা হ'ল না। আমি আর একটু এগিয়ে যাবার পর অপর এক চাষী পাশের আর একটি হাঁটা-পথে আমার রাস্তায় এসে উঠল। তার কাঁধেও লাঙল ও সঙ্গে একজোড়া বলদ। সেও আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তাকেই নির্ভর করে সব কথা বলব স্থির করলাম। একটু দ্রুত হেঁটে তার পেছনে, খুব কাছে এসে বললাম—"ভাই, একটু দাঁড়াও। আমার একটা কথা শুনবে?" গ্রাম্য ভাষায় সে উত্তর দিল—"কি কইবা কও, আমার গরু যায় গিয়া।" সত্যিই দেখলাম তার দাঁড়াবার উপায় নাই। কথা যখন আরম্ভ করেছি তখনই তা' শেষ করে বুঝতে হবে সফল হ'লাম কিনা। আমি তার পেছনে পেছনে চলতে চলতে বললাম—"দেখ ভাই, আমি স্বদেশী। দেশের স্বাধীনতার জন্য আমি সাহেবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, তাদের অনেককে মেরেছি, আমি তোমার সাহায্য চাই, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও!" আমার কথা শুনে তার যে কোন মানসিক ব্যতিক্রম ঘটলো তা' বোঝা গেল না। সে হাঁটতে হাঁটতেই আমাকে প্রশ্ন করল—"মাইরা ফেলাইছ? মারলা কেন্?" চাষীটির চেহারা ও গলার স্বরে কোন মিল ছিল না। চেহারা শান্ত অথচ রুক্ষ স্বর। আমাকে প্রশ্ন করছে—কেন সাহেবদের হত্যা করলাম? আমার উত্তর না দিলে চলবে না। আমি বললাম—"ভাই, বলেছি তো আমি স্বদেশী। দেশের স্বাধীনতার জন্যই সাহেবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি!" কৃষকটি তার গরু নিয়ে এগোতে লাগল। আমি আমার সঙ্গের সব টাকা তার হাতে দিয়ে বললাম—"ভাই, এই আমার সম্বল। সব তুমি নাও। আমাকে এখন একটু আশ্রয় দাও। তারপর আমাকে কুমিল্লা পৌঁছে দিতে পারলে আরও অনেক টাকা দেব।" টাকাটা সে নিল কিন্তু যেমন মাঠের দিকে

যাচ্ছিল ঠিক তেমনি এগোতে থাকলো। আমি আবার বললাম—"ভাই, আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে চল। লোকজন ওঠার আগে না গেলে কেউ দেখে ফেলবে!" চাষী উত্তর দিল—"ভয় নাই, আইয়, আমার লগে আইয়।" আর কি করি; তার কথামত তার সঙ্গে মাঠে গেলাম। আমাকে বসতে বলে সে লাঙল নিয়ে মাঠে নেমে মাঠ চষতে সুরু করল—কোন বিকার নেই। সূর্য উঠেছে। অদূরে বিউগাল বাজছে। আমি অস্থির হয়ে তাকে ডেকে বললাম—"ভাই, আর কতক্ষণ? চল ভাই, আমাকে নিয়ে চল।" তখনও সে আমাকে অভয় দিয়ে বলছে—"ভয় নাই, বইয় বইয়।" কিছুক্ষণ পরে আর একজন চাষী এল। তার হাতে লাঙল ও গরুর ভার দিয়ে আমাকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোল। কাছেই তার বাড়ি। পথে দু'একজন আমাকে তার সঙ্গে দেখল কিন্তু যেন খুব একটা আশ্চর্য হ'ল না। বোধ হয় কুকী প্রভৃতি উপজাতীয়দের এই বেশে দেখে তারা অভ্যস্ত। যা হোক্ চাষীটির বাড়ির সামনেই একটা পুকুর। সে আমাকে পুকুরে ডুব দিয়ে আসতে বলল। আমি চট্ করে স্নান সেরে এলাম। তাদের ঢেঁকি ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হ'ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আমাকে একটা ধুতি ও সার্ট দিয়ে গেল পরতে। দশ-পনেরো মিনিট বাদে এক বাটি চিঁড়ে ও গুড় আর এক গেলাস জল পাঠিয়ে দিল। তারপর সেই এসে আবার বাটি ও গেলাস নিয়ে গেল এবং বলে গেল ওখানেই যেন ভাত খেয়ে শুয়ে থাকি। সে দুপুরে থাকবে না, মাঠে যাবে; সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবে। চাষীটি চলে গেল। আমি ঢেঁকিঘরে নিশ্চিন্ত মনে সন্ধ্যা অবধি তার অপেক্ষায় সময় কাটাতে লাগলাম।

কে এই সামান্য চাষী? আমাকে একজন খুনী ও রাজদ্রোহী জেনেও বিনা দ্বিধায় নিজ গৃহে আশ্রয় দিল? প্রতিদিন লাঙল কাঁধে মাঠে যায়, নিজ হাতে চাষ করে—নির্ঝঞ্ঝাট জীবন তার, সে কেন বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে এত বড় বিপদ মাথায় তুলে নিল? সে যুগে কৃষকের দাবি নিয়ে বা কৃষক-বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিতে কোন সংগঠন গড়ে ওঠে নি। বাংলার বুকে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন—ক্ষুদিরাম, কানাইলাল প্রমুখ বিপ্লবীদের রিভলভার-গর্জন, অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন এবং অহিংস সংগ্রাম ভারতের ও বাংলার অশিক্ষিত কৃষক সমাজকেও সেইদিন ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ বাংলার ঘরে ঘরে গাথা হয়ে রইল। ফাঁসির আগে ক্ষুদিরাম গাইল—"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি"—জেলের কয়েদীরা মুখে

মুখে তা ছড়িয়ে দিল বাংলার গ্রামে গ্রামে—ঘরে ঘরে। এই চাষীটিও হয়ত এই হৃদয়গ্রাহী ও জনপ্রিয় গানটি বহুবার শুনেছে। সেও নিশ্চয়ই বাংলার বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের প্রভাবমুক্ত ছিল না। তারই মানবতার কাছে, তারই দুয়ারে আশ্রয়প্রার্থী একজন রাজদ্রোহী—বিদ্রোহী! স্বদেশপ্রেমের কোন এক সূক্ষ্ম সূত্রে বাঁধা এই মহৎপ্রাণ, বাংলার এক অসহায় তরুণ রাজদ্রোহীর প্রতি করুণায় বিগলিত হ'ল।

কৃষকবন্ধুটি পরম যত্নে তার পর্ণকুটিরে আমাকে আশ্রয় দিয়ে নিশ্চিন্তমনে সারাদিনের জন্য আবার মাঠে চলে গেল। এই বাড়িতে সব চাইতে নির্জন ও নিরাপদ স্থান বোধহয় এই ঢেঁকিঘরটি—নিচু চালার ঘর, আর তারই শোভাবর্ধন করছে গৃহস্বামীর সম্পদ এই ঢেঁকিটি।

বৃটিশ রাজশক্তি সৈন্য, কামান, বন্দুক, ইত্যাদি প্রচুর রণসম্ভারের অধিকারী—তার প্রভুত্ব ও নিষ্ঠুর শাসন তখন ভারতের সর্বত্র বিরাজমান। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস—আমি এখন দলছাড়া, একেবারে একা! আমার সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই নেই। নিঃস্ব, রিক্ত ও অসহায় আমি, কিন্তু তাই বলে কি বৃটিশ রাজশক্তির কাছে মাথা নোয়াব? 'আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত' কিন্তু আমার শান্ত হবার দিন তো এখনও আসে নি!

মাথায় তখন নানারকম প্ল্যান ঘুরছে। পথ খুঁজে পেতেই হবে। এই অবস্থার পরিবর্তন' চাই।

শত্রুর দুর্ভেদ্য দুর্গের পরিবর্তে এই পর্ণকুটির, সহস্র অস্ত্রের বদলে আমার শূন্য হস্ত, লক্ষ লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে এখন আমার মাত্র একজন কৃষক সাথী। তুলনাহীন অসমান শক্তির মধ্যে আমরণ সংগ্রাম—তবু ভারতের বিপ্লবীরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র সংবরণ করেন নি। আমারও অস্ত্র সংবরণের অধিকার ছিল না।

ঢেঁকিঘরটি 'মন্ত্রণাকক্ষে' পরিণত হ'ল। সাধারণ কৃষক—আমার ক্ষণিকের সাথী, সুরেনই আমার একমাত্র পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা। সুরেনের কি পদবী আজ ভুলে গেছি। ছোট্ট বিলোনিয়াতে আমার মনে হয় সুরেন বললেই তাকে সকলে চিনবে। সে আজ কোথায়—বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না। তবে আমার কাছে সে অমর। সুরেন তার কথামত ঠিক সন্ধ্যার পরেই আমার কাছে এল। ভাবের কোন পরিবর্তন নেই—চিন্তা করবার বা মাথা ঘামাবার কিছুই নেই, এটা যেন তার কাছে অতি তুচ্ছ অতি সামান্য একটা ব্যাপার। একজন রাজদ্রোহী যুবক ইংরেজ রাজপুরুষদের খুন করেছে—বিপদে পড়ে সে

একটু আশ্রয় চেয়েছে, আর সে তার পর্ণকুটিরে তাকে একটু স্থান দিয়েছে মাত্র!" উপরন্তু, পর্ণকুটিরে বিপ্লবীকে যথাযোগ্য সেবা করতে পারছে না বলে সে নিজেই লজ্জিত ও সঙ্কুচিত।

আমার অসময়ের বন্ধুটি ভাবতেই পারছিল না তার সঙ্গে আমার পরামর্শের কি থাকতে পারে? তার কথা হচ্ছে, যতদিন ইচ্ছে আমি সেখানে থাকতে পারি, তার কোন আপত্তি নেই। কাজেই, আমি কখন এবং কত শীঘ্র তার গৃহত্যাগ করব, সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না তার। সুরেন ঢেঁকিঘরে ঢুকেই প্রথমে আমায় জিজ্ঞেস করে—"ভাই আপনার খাওয়া-দাওয়া ঠিক হয়েছে তো? কিছুটা বিশ্রাম করেছেন কি?"

আমি—"খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম খুবই ভাল হয়েছে। আমি এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি।"

সুরেন—"আপনি কিছুদিন এখানে থাকুন। আপনার আরও বিশ্রামের প্রয়োজন।"

আমি—"দেখ ভাই, তোমার এখানে বিশ্রাম নিতে পারলে তো ভালই হ'ত কিন্তু আমার মনে হয় যত শীঘ্র সম্ভব আমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।"

সুরেন আমাকে যেন ঠিক বুঝতে পারলো না। সে ক্ষুণ্ণ হ'ল, অভিমান ভরে বলল—"আমরা গরীব চাষী। আপনার মত লোকের এখানে সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে। না, না, ঠিক বলেছেন—আপনার যাওয়াই উচিত। এখানে আমরা আপনাকে সেরূপ যত্ন করতে পারব না…।"

কি মুস্কিল! সরল চাষীবন্ধু তার অক্ষমতার জন্য সঙ্কোচবোধ করছে। তার ধারণা, আমার সেবা-যত্নের ত্রুটি হচ্ছে। অভিমান ও সঙ্কোচের কারণ বুঝতে পেরে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম—"দেখ ভাই, তুমি আমাকে বড্ড ভুল বুঝেছ। আমার প্রতি তোমার যত্নের বিন্দুমাত্র অভাব নেই। আমি তোমার কাছে রাজসুখে আছি। তুমি মানবে কি—আমি তোমার বন্ধু, তুমিও আমার অসময়ের খাঁটি বন্ধু? বল ভাই, বন্ধুর প্রতি কি বন্ধুর কর্তব্য নেই? তুমি তোমার কর্তব্য করেছ। কৃতজ্ঞতাবোধ হারালে আমার চলবে কেন? তোমার ওপর কোন বিপদ যাতে না আসে, তার জন্য কি আমার কোন কর্তব্য নেই? তুমি বিশ্বাস কর বন্ধু, তোমার আতিথ্য অবহেলা করার শক্তি আমার নেই। তোমার নিরাপত্তার জন্যই আমি চিন্তিত। আমার মাথার ওপর বিপদ আছে—থাকবেও। তুমি নিজের বিপদ ও ক্ষতির পরিমাণ হিসাব না করেই তোমার গৃহে

আমাকে আশ্রয় দিয়েছ। তোমার সরল মন দিয়ে তুমি বুঝতে পারছ না, আমাকে আশ্রয় দিয়ে কতখানি রাজরোষের কারণ হয়েছ তুমি। আমি মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার জন্য তোমার ক্ষতি হোক্ তা' আমি চাই না। তোমার সাহায্যে কুমিল্লা পর্যন্ত যদি আমি নিরাপদে যেতে পারি তবে হয়ত বিপদের মধ্যেও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার সুবিধে পাব। তাই বলছিলাম যে, এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে। তোমার এখানে যদি আমাকে শত্রুরা গ্রেফ্‌তার করতে সক্ষম হয়, তবে তোমাকেও তারা রেহাই দেবে না—আমার আশ্রয়দাতা বলে বন্দী করবে ও নানা অত্যাচার চালাবে। তাই পরামর্শ করতে চাই, তোমাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রেখে আমি খুব শীঘ্র কিভাবে কুমিল্লা যেতে পারি?"

আমার কথায় বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতাবোধ, অন্তরবেদনা ও অনুভূতির প্রকাশ তাকে বোধহয় আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। সুরেন আপন মনে বিড়ি টানছিল, কিন্তু বিড়ি টানবার প্রত্যেকটি বিশেষ ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল সে গভীর মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলি শুনছে। আমার কথার মাঝে মাঝে সে মৃদু স্বগতোক্তি করছিল—হুঁ, হ্যাঁ। তারপর সব শুনে উঠে বসে আমাকে প্রশ্ন করল—"আচ্ছা ভাই, আপনি এখন কোথায় যেতে চান? বলুন, আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? আপনি আমাকে বিপন্মুক্ত করতে চাইছেন—আমি হয়ত নিরাপদে থাকব। কিন্তু আপনার কি হবে? আপনাকেও তো নিরাপদে থাকতে হবে। আপনি খুনের আসামী—ধরা পড়লে ফাঁসি হবে। আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে ইংরেজ সরকারের পুলিস নেই। বিলোনিয়া বোধহয় আপনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান। এখানে আপনার সেবা করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। খুব ভেবে, সবদিকে বিবেচনা করে তারপর যা' করতে হয় ঠিক করবেন।"

সেদিন ভাবিনি বা মনেও ওঠে নি, কি করে সুরেন বলেছিল—ইংরেজ শাসনাধীন এলাকা হতে ত্রিপুরা রাজ্যের বিলোনিয়া আমার পক্ষে বেশি নিরাপদ স্থান? তার গৃহে থাকা আমার পক্ষে বাস্তবে কতখানি সম্ভব হ'ত সে বিবেচনা না করে এখন ভেবে অবাক হচ্ছি, একজন 'সামান্য অশিক্ষিত কৃষক' সে যুগে দেশাত্মবোধে কতখানি সচেতন ছিল! সুরেন হয় একজন পাগল ও নির্বোধ—নিজের ভাল-মন্দ বোঝবারও তার শক্তি ছিল না, আর তা' না হলে, সুরেনের নিঃস্বার্থ হৃদয়ের গভীরতার পরিধি কোথায়?

সুরেনের কাছে প্রস্তাব করলাম—"দেখ ভাই, কাল বিলম্ব না করে, যত

শীঘ্র সম্ভব আমি কুমিল্লা শহরে যেতে চাই। কোন্ পথে সব চাইতে নিরাপদে যাওয়া যায়—রেল, নৌকো, নাকি হাঁটা পথে? রেলে যাওয়া বোধহয় খুব নিরাপদ নয়। কোন নদী বা নদীর শাখা-প্রশাখা ধরে কি কুমিল্লা যাওয়া সম্ভব?"

সুরেন—"নৌকো করে হয়ত যাওয়া যায়। আমার সেরূপ নদীপথ জানা নেই। অজানা পথে না গিয়ে আমার মনে হয় জানা পথেই কুমিল্লা যাওয়ার চেষ্টা করা ভাল।"

আমি—"কোন্ পথে? পথের একটু বর্ণনা দিতে পার?"

সুরেন তখন বিলোনিয়া-কুমিল্লা নতুন সড়কের কথা বলল। পাহাড় কেটে প্রায় চোদ্দ মাইল বা তার কিছু বেশি রাস্তা হয়েছে কুমিল্লার সীমানা চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত। চৌদ্দগ্রামের Out Postএ সব সময় পুলিস মোতায়েন থাকে—বিলোনিয়া আসতে-যেতে পুলিসের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সুরেন বলল যে, নতুন রাস্তায় এইটুকুই যা' বাধা। তবে গমনাগমনের জন্য পুলিস কোনপ্রকার বাধার সৃষ্টি করে না—নিয়মরক্ষার্থে রুটিন মাফিক ডিউটি দেয় মাত্র।

এই সমস্ত শুনে ও আরো বিশদ বিবরণ জানার পর আমরা দু'জন পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, সুরেন নিজে আমার সঙ্গে কুমিল্লা পর্যন্ত যাবে। তারপর আমার নির্দেশমত আমাকে কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেবে।

আমার কুমিল্লা যাওয়ার সব ভার নিল সুরেন। সে আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে অনুরোধ জানিয়ে বার বার জোর দিয়ে বলল—"আমার দায়িত্ব। আমি আপনাকে যে কোন উপায়ে হোক্ নিরাপদে কুমিল্লার ঠিকানায় পৌঁছে দেব।" তখন রাত প্রায় দশটা। কাল সকালে ভোরের আলো দেখা দেওয়ার পূর্বে তাকে আবার লাঙল কাঁধে মাঠে ছুটতে হবে। তাই সুরেনকে বললাম—"তুমি ভাই এখন ঘুমোতে যাও। কাল ভোরেই আবার তোমায় মাঠে ছুটতে হবে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি—কোন্ দিন কোন্ সময়ে আমরা রওনা হব?"

সুরেন যখন দায়িত্ব নিয়েছে, তখন সে এবিষয়ে উদাসীন তা' আমি ভাবি নি। তবে, সে সংসারী লোক, বাড়ি ছেড়ে দু'তিন দিনের জন্য হঠাৎ চলে যাওয়া তার পক্ষে হয়ত সহজ নাও হতে পারে। সব দিকের সব ব্যবস্থা করে তবেই তাকে বিলোনিয়ার বাইরে যেতে হবে। তাই আমি ভয়ানক উৎকণ্ঠিত—কবে সুরেন আমাকে নিয়ে যাত্রা করবে? আমি প্রশ্ন করে তার জবাবের

অপেক্ষায় রইলাম। সে যাবে জানি, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় তারই জন্য আমার অস্থিরতা। সুরেন হিসেব করে জানাল, সেই রাত ও পর পর আরও দু'টি রাত সেখানেই কষ্ট করে থাকতে হবে আমাকে।

১৯৩০ সাল, ২৪শে এপ্রিলের রাত্রে বিলোনিয়ার এই 'মন্ত্রণাকক্ষে' সুরেনের সঙ্গে ঠিক হ'ল ২৫শে ও ২৬শে রাত্রি সেই ঢেঁকি ঘরে কাটিয়ে ২৭শে তারিখ খুব ভোরে আমরা চৌদ্দগ্রাম রওনা হব।

সুরেন ঘুমোতে গেল। আমার সহজে ঘুম এল না। ভয়-ভাবনা কিছুই নয়, কোন কষ্টও নয়, তবু আরও সুদীর্ঘ তিনটি রজনী একান্তে এখানেই কাটাতে হবে, এ কথা ভাবতে যত না দুশ্চিন্তা হয়েছে তার চেয়ে এই অসহায় অবস্থার নিশ্চেষ্টতা আমাকে অনেক বেশি অস্থির করে তুললো। উপায় নেই, সময় কাটাতেই হবে—২৭শে তারিখ ভোর পর্যন্ত আমাকে স্থির হয়ে থাকতেই হবে।

সারাদিন সুরেনের সঙ্গে আমার দেখা হ'ত না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সুরেন প্রথম দিন থেকেই ঠিক করে রেখেছিল। তার বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী খুব যত্নের সঙ্গেই সব কিছু তদারক করতেন ; পাছে আমার সামান্য অসুবিধাও হয়, সদাসর্বদা সেদিকে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি ছিল। আমি যথারীতি অবস্থানুযায়ী প্রাতঃকৃত্য ও স্নানের সময়ের পরিবর্তন করেছিলাম। সুরেন মাঠ থেকে ফিরে এলে, সন্ধ্যার পর, আমার সকাল হ'ত। রাতের অন্ধকারে স্নানাদি সম্পন্ন করতাম—রীতিমত বৈচিত্র্য—তাও ভাল লেগেছে, আনন্দ পেয়েছি।

প্রতিদিন রাত্রে সুরেন আমার কাছে এলে আমরা আলোচনা করতাম—স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র কামনা, যুদ্ধ করতেই হবে, জীবন দিয়েও স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে—এই সমস্ত কথা, যা' তখন প্রেরণা দিয়ে বুঝেছিলাম, সুরেনকে বলেছি। তার মনে কতখানি সাড়া জাগাতে পেরেছিলাম জানি না, কিন্তু তাকে শ্রোতা পেয়ে আমি নিজের অন্তরে সাড়া অনুভব করেছি। তাকে আর বলারই বা কি ছিল? সে যে বিপ্লবী কৃষকশ্রেণীর একজন—শ্রেণীগত চরিত্র হিসেবেই সে বিপ্লবী। একথা অবশ্য তখন আমার জানা ছিল না। আজ বুঝি, যত সহজে সুরেন আমাকে একজন খুনী ও রাজদ্রোহী জেনেও আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয় নি, তত সহজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সেইরূপ সমর্থন পাওয়া দুষ্কর।

সুরেনের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলাম কি বেশে ও কি ভেক্ ধরে তার সঙ্গে যাত্রা করব। ধুতি-সার্ট বা কামিজ পরা স্থির হ'ল। খালি পা,

হাতে ছাতা থাকবে। হাঁটু ঢেকে ধুতি পরা হবে, তবে বাবুদের মত পা পর্যন্ত ঢাকা থাকবে না। অর্থাৎ, পোশাকটা হবে বাবুর নয়, গ্রাম্য চাষীর। আমার বন্ধুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমার বেশভূষা করতে হবে। সঙ্গে একটা মাত্র ছোট্ট কাপড়-জামার পোঁটলা থাকবে এবং সেটা বইবে কৃষকবন্ধু।

২৭শে তারিখে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি দু'জনেই তৈরি হয়ে নিলাম। চিঁড়ে, গুড় ও জল দিয়ে গেলেন সুরেনের স্ত্রী। আমরা খাচ্ছিলাম, আর সুরেনের বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনেই নির্বাক দর্শকের মত স্থির নয়নে আমাদের দেখছিলেন। সুরেন তাঁদের কি বলেছে বা কতটুকু বলেছে তা' আমি কখনও জিজ্ঞাসা করি নি। আমার মনে হয়েছে সুরেনের কাছে ইতিমধ্যে তাঁরা সব কিছুই জানবার সুযোগ পেয়েছেন। আর যদি ধরেও নিই যে, তাঁরা সবটুকু জানেন না, তবু আমার অস্বাভাবিকভাবে ঢেঁকিঘরে আত্মগোপনের উদ্দেশ্য যে বিপদ এড়াবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, সে সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। তবে কে আমি? কেন সুরেন আমাকে আশ্রয় দিয়েছে? বিপদ জেনেও কেন সুরেন আমার সঙ্গে যাচ্ছে, কোন অমঙ্গল হবে না তো?—স্ত্রীর মনের স্বাভাবিক প্রশ্ন, মায়ের অন্তরের আকুল জিজ্ঞাসা। তবু তাঁরা দু'টি প্রাণী নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে নীরবে অন্তর্যামীকে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন যেন আমাদের মঙ্গল হয়।

আমাদের খাওয়া শেষ হ'ল। সুরেন মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিলে মা প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। সুরেনের স্ত্রী গড় হয়ে প্রণাম করলেন। স্ত্রীর চোখে জল। মায়ের হৃদয়ের ঘন ঘন স্পন্দন ও তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পেলাম।

সুরেনের দেখাদেখি আমিও বৃদ্ধা মাকে প্রণাম করলাম। আমি পরের ছেলে, সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাকে আগে তিনি কখনও দেখেন নি, আবার কখন দেখবার সম্ভাবনাও নেই বললেই হয়। তবু কি আশ্চর্য! নিজের ছেলে যখন পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বিদায় নিল তখন মা কাঁদেন নি, কিন্তু আমি পা স্পর্শ করতেই মায়ের দুই চোখ দিয়ে বিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ল। মনে হ'ল সুরেনের স্ত্রীও কাঁদছেন। পাছে স্বামীর অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে প্রাণপণে অশ্রু সংবরণ করছিলেন। সুরেন এই অবস্থার জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিল না। আমি সেখানে উপস্থিত থাকায় সে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। গ্রাম্য ভাষায় তাদের সম্বোধন করে সুরেন বলল—"মা, তোমরা এ কি করছ? অযথা তোমরা অস্থির হচ্ছ কেন? আমি তো বলেছি কুমিল্লা গিয়েই আমি

ফেরত আসব। আমাদের বিপদ হবে ভাবছ কেন? না না, শুধু শুধু তোমরা ব্যস্ত হবে না। ইনি কি ভাবছেন বল তো?"

সুরেনের কথা শুনে তাঁরা হয়ত কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। আমিও বললাম —"মা ভাববেন না। আপনার আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে রইল, কোন বিপদ হবে না। সুরেন দু'দিন পরে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।" সুরেনের স্ত্রীকে হাত তুলে নমস্কার জানালাম। আমরা হাসিমুখে বিদায় নিলাম। সুরেনের মা ও স্ত্রী সেখানে দাঁড়িয়ে যতদূর দেখা যায় এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। বিলোনিয়ার 'মন্ত্রণাকক্ষের' অভিজ্ঞতা, বাংলার কৃষক-মাতার মাতৃস্নেহের ক্ষণিক স্পর্শের স্মৃতি ও বাংলার সতী স্ত্রীর এক অপরূপ রমণীমূর্তির বাস্তব চিত্র মানসপটে এঁকে আমি সুরেনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। সুরেনের এই পর্ণকুটির আমার জীবনের রাজপ্রাসাদ। নিভৃত অন্তরে বিলোনিয়ার এই 'গোপন দুর্গের' প্রতি সহস্র প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের নিচে কাঁচা পথ ধরে চলেছি—কিছুক্ষণের মধ্যেই চৌদ্দগ্রামের নতুন রাস্তায় পড়ব।

ছদ্মনামে কালা ও বোবার ছদ্মবেশে সুরেনের সঙ্গে পথ দিয়ে চলেছি। আমার পরিচয়—আমি সুরেনের আত্মীয়, ঐ গ্রামেরই লোক। পথে সুরেনের পরিচিত লোকের অভাব নেই। অনেকের সঙ্গেই দেখা হচ্ছে এবং কথাবার্তা বা খবর দেওয়া-নেওয়া চলছে। সকলেই আমার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করছে। সুরেন সবাইকেই আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ও আমি যে বাল্যাবধি কালা ও বোবা তার ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছে। প্রত্যেকেই আমার শ্রবণশক্তি ও বাচন-ক্ষমতার অভাবের প্রতি কম বা বেশি সমবেদনা জানাচ্ছে। আমি তাদের কথাবার্তার মাঝে কিছু না শোনা ও না বোঝার ভান করে হাবাগোবার অভিনয় করতে করতে চলেছি।

বিলোনিয়া-চৌদ্দগ্রাম রাস্তাটি বহু লক্ষ টাকা খরচ করে ও অগণিত শ্রমিকের রক্ত-জল-করা-পরিশ্রমে তৈরি করিয়েছেন ত্রিপুরার মহারাজা। এই চোদ্দ মাইল পথের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে খুব বেশি দিন হবে না। মোটর চলার মত কাঁচা রাস্তা। রাজার গাড়ি ও অন্যান্য প্রাইভেট মোটর গাড়ি মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করে। পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হয়েছে। কখনও সমতলভূমির ওপর, কখনও বা অনেক উঁচুতে স্লোপ বেয়ে উঠে ক্রমে আবার স্লোপ দিয়ে নেমে গেছে। সুদীর্ঘ চোদ্দ মাইল পথটির অনেক জায়গাতেই দু'-পাশে পাহাড়। দু'দিকেই ছোট-বড় নানা ধরনের গাছপালা। মাঝে মাঝে

খানিকটা পথ আমরা খোলা জায়গা দিয়েও অতিক্রম করেছি। মাথার ওপর প্রখর সূর্যতাপ—একটু হেঁটেই খুব তৃষ্ণার্ত বোধ করেছি। সোজা সমতল-ভূমির ওপর দিয়ে পথ চললে তেমন ক্লান্তি লাগে না। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ী পথে হাঁটতে গেলে পরিশ্রান্ত হতেই হবে। আমাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তবে মহারাজার ব্যবস্থা—পথের ধারে এক বা আধ মাইল অন্তর বড় বড় মাটির জালা করে ঠাণ্ডা জল রাখা আছে। এই পথে যদি জলের ব্যবস্থা না থাকত তাহলে পথিকের কষ্টের সীমা থাকত না। এই জলের সাহায্যে আমরা বহুবার তৃষ্ণা নিবারণ করেছি।

এখন প্রায় দুপুর। ঘণ্টায় তিন মাইলের বেশি হাঁটি নি। তা'ছাড়া মাঝে মাঝে জল খাবার সময়েও এক-আধটু দেরি হয়েছে। আর কিছু পথ এগোলেই চৌদ্দগ্রাম। পুলিস Out Post দেখা যাচ্ছে। সীমান্তরক্ষীর ব্যবস্থা যা জেনেছি তা'তে ভয়ের কারণ নেই বটে—তবু মন সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত করতে পারি নি। আমার চাষীবন্ধুর অবশ্য কোন মানসিক পরিবর্তন দেখি নি। পথে আমাদের অনেক রিহার্সেল হয়ে গেছে—অনেকের কাছে আমার বন্ধু সাজিয়ে-গুছিয়ে সত্যি-মিথ্যা অনেক কথা বলেছে, আর আমিও নির্বাক অভিনয় করেছি। পুলিসের কাছেও সেইরূপ অভিনয় ও ভান করা হবে। তবে আর ভাবনা কেন?

স্বাভাবিক ক্ষেত্রে কোনরূপ চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় আমি মুহূর্তের [illegible] কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। কথাটি হচ্ছে—যদি Out Post-এ আমার চেনা কোন পুলিস কর্মচারী থাকে? তার কাছে কালা-বোবা, ছদ্মনাম বা ছদ্মবেশ, কোন কিছুই কাজে লাগবে না। সেই অবস্থায় কি করব? চিন্তার গতি অতি দ্রুত নানা শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আমার মন আচ্ছন্ন করে ফেললো। বন্ধু একটুও টের পায় নি যে, এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় আমি কতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছি!

আর দু-চার মিনিটের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে যাবে কোন পরিচিত পুলিস Out Post-এ আছে কি না—তেমন অবস্থায় আমার বন্ধুটিরই বা কি গতি হবে? বাস্তব বা অবাস্তব চিন্তার শিকার কেন হয়েছিলাম তা' নিয়ে গবেষণা করা যায় বটে, কিন্তু মাথার ওপর শত্রুর খাঁড়া নিয়ে প্রতি পদে আশঙ্কা ও সাবধানতার সঙ্গে লড়াই করে যাদের চলতে হয় তাদের মনে অনিশ্চয়তার প্রশ্ন উঠবেই এবং তার সমাধানের জন্য আগে থেকে প্রস্তুত থাকবার কথাও যে মনে আসবে তা'তে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমার তাই অভ্যাস। অভ্যাসবশতই ঐরূপ চিন্তা করে বিচলিত হয়েছিলাম। তাই বলে Out Post-এ যাবার ঝুঁকি

নেব না, তা' হতে পারে না। আমাদের হাঁটা বন্ধ ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই Out Post-এ দারোগার সামনে এসে হাজির হ'লাম।

সৌভাগ্যবশতঃ Out Post-এ আমার পরিচিত কেউ ছিল না। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হ'ল দারোগাবাবুর তেমন দাপট নেই। কলম হাতে টেবিলের দিকে মুখ রেখেই তিনি প্রশ্ন করে গেলেন—নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, কোত্থেকে আসছি, কোথায় যাচ্ছি ইত্যাদি। আমার বন্ধুই সব প্রশ্নের উত্তর দিল, দারোগাবাবু খাতায় লিখে নিলেন। আমরা নমস্কার করে হুজুরের কাছে বিদায় নিলাম।

চৌদ্দগ্রাম বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। বহু দোকানপাট আছে। লোকজনও মন্দ নেই। প্রধান রাস্তার ধারেই আমার বন্ধুর এক আত্মীয়ের কামারশালা ছিল। স্থরেন তার দোকানে গেল। তিনি স্থরেনকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। মনে হ'ল তাদের পরস্পরের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। স্থরেনের গন্তব্যস্থল আপাতত আমার সঙ্গে কুমিল্লা জানতে পেরে তিনি বললেন যে, আজ বাস চলাচল বন্ধ আছে। কুমিল্লা পর্যন্ত কুড়ি-একুশ মাইল পথ হেঁটেও যাওয়া যায়। কিন্তু স্থরেন হেঁটে আমার সঙ্গে যাবে না। তা'ছাড়া সেই ভদ্রলোকও ছাড়বেন না—এতদিন পরে আত্মীয় এসেছে, সাধারণ একটা লৌকিকতাও তো আছে! স্থরেনও তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারছিল না। বাস যখন চলবে না এবং স্থরেনেরও কুমিল্লা যাওয়া হচ্ছে না, তখন তো অনুরোধ এড়াবার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি যে বোবা, কথা বলতে পারি না! তাই বাস না চলার কারণও জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। পরে জানলাম যে একটি বাস কুমিল্লা শহরে কারখানায় সারানো হচ্ছে। অপর একটি বাসের spring ভেঙে গেছে—তাই কোন যাত্রী বহন করবে না। যাত্রী ছাড়া কোন এক সময়ে, হয়ত বিকেলের দিকে, কুমিল্লা রওনা হবে। এখন কি করি? কামার ভদ্রলোক ও স্থরেন আমার সামনে অথচ শ্রুতির বাইরে, আকারে-ইঙ্গিতে ফিস্‌ফাস্ করে কিছু যেন বলাবলি করল। তাদের হাবভাব দেখে মনে হ'ল আমার সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করছে।

স্থরেন আমাকে বলল, আমি যেন নির্ভয়ে কামারশালায় অপেক্ষা করি, সে আত্মীয়বাড়ি থেকে ঘুরে আসবে। আমার এতে অমত করা চলে না। একটা লম্বা বেঞ্চ ছিল—আমি তাতে বসলাম। আমরা এই কামারশালায় আসবার আধ ঘণ্টার মধ্যে স্থরেন আমাকে এখানে একা বসিয়ে তার আত্মীয়ের বাড়ি গেল। এই সময়ে আশে-পাশের বিভিন্ন লোকের মধ্যে যা কিছু কথা হয়েছে তাতে

মনে হ'ল চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ ও ফেণী সংঘর্ষের বিষয় এখানকার লোকদের জানা আছে, কিন্তু জালালাবাদ যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের মুখে কোন কথাই শুনতে পেলাম না।

সুরেন ও তার আত্মীয় চলে গেছে বহুক্ষণ। প্রায় দু' ঘণ্টা বা আরও কিছু বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে, এখনও তারা ফিরল না। হ'ল কি? সুরেন না ফেরা পর্যন্ত আমার কিছু করবারও নেই। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তারা এল। সুরেন আমাকে জানাল বাসটি কিছুক্ষণের মধ্যেই কুমিল্লা রওনা হবে কিন্তু কোন যাত্রী নেবে না। কামার ভদ্রলোক বাসচালক ও সহ-চালকের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছে তারা কেবল আমাকেই নেবে, অন্য কোন যাত্রী নেবে না। আমি সুরেনকে ডেকে একটু নিরালায় জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি ভাই যাচ্ছ না?" সুরেন অজুহাত দিয়ে বলল যে, তার মাথা ধরেছে, জ্বরও হয়েছে; কাজেই সে আর কুমিল্লা যেতে পারবে না। আমার কোন ভয় নেই, বাস ড্রাইভার আমাকে ঠিক পৌছে দেবে ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক কিছুই বলল সে।

বাস তখনই ছাড়বে। আমাকে ডাক দিল। আমি শুনেও শুনলাম না। কামার ভদ্রলোক ও সুরেন আমাকে বাসে তুলে দিল। বাসে যাব, কিন্তু আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। টাকা-পয়সা সব আমি প্রথম সাক্ষাতেই সুরেনকে দিয়েছি। সে না দিলে আমি টাকা পাব কোথায়? সুরেনের কাছে টাকা চাইলাম। সে আমাকে টাকা দিল না—তাড়াতাড়ি বাসে উঠতে বলল। আমি বাসে উঠে জানালার ধারে বসেছি, সুরেন বাইরে দাঁড়িয়ে। তার কাছে হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিতে টাকা চাইলাম। আশ্চর্য! টাকা সে দিল না। বাস ছেড়ে দিল।

সুরেনের এই আকস্মিক পরিবর্তন আমার কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক বোধ হ'ল। একি সেই সরল, সাহসী, নির্ভীক চাষী যুবক! যে সমস্ত জেনে শুনে আমাকে তিনদিন তার গৃহে আশ্রয় দিয়েছে! সুরেনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র রাগ হ'ল না—দুঃখ বা অভিমানও নয়। আমার সব রাগ ও আক্রোশ গিয়ে পড়ল ঐ কামারের ওপর।

শহরের দুষ্টবুদ্ধি গ্রামের সরলতাকে বিনষ্ট করেছে। কামারের হীন ও নীচ স্বার্থ চাষী-যুবকের আত্মত্যাগের মহান প্রতিভাকে সংক্রামিত করেছে। শহরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত কামার কুটিলতার আশ্রয় নিয়ে আমার বন্ধুকে সেই পাপে লিপ্ত হতে সাহায্য করেছে! তবু সুরেন আমার প্রকৃত বন্ধু। তার প্রতি তখনও আমার কোন্ বিরূপ মনোভাব হয় নি আর আজ সাঁইত্রিশ বছর পরেও সুরেনের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা অটুট আছে।

বাস খুব ধীরে ধীরে চলছিল। হিসেব করে দেখা গেল প্রায় সাড়ে চারটা পাঁচটার সময় কুমিল্লায় পৌঁছবো। আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। মুখ বন্ধ, কথা বলতে পারি না, কেউ কিছু বললেও শুনি না। কুমিল্লা পৌঁছে টাকা দিতে না পারলে আমার কি অবস্থা হবে? কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না। মুখ বুজে বসে রইলাম। বাস আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই কুমিল্লা শহরে প্রবেশ করবে।

আমার যে কি নিদারুণ অসহায় অবস্থা, তা' আমি ছাড়া আর কেউ জানে না! সঙ্গে একটি পয়সাও নেই। বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধে বাসের কণ্ডাক্টার দয়াপরবশ হয়ে স্প্রীংভাঙা বাসটিতে এই কালা ও বোবা যাত্রীটিকে কুমিল্লা পর্যন্ত নিয়ে যেতে রাজী হয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কুমিল্লা পৌঁছবো। প্রায় বিশ মাইল পথ চলার শেষে বাস-কণ্ডাক্টার যদি আমার কাছে ভাড়া চায় তখন আমি কি করে বাস-ভাড়া না দিয়ে পার পাব। যদি ভাড়া না দিই তবে কি আর করবে তারা—এইরূপ ভাবা খুবই সহজ। আমার মাথার উপর শত্রুর কৃপাণ উদ্যত না থাকলে আমিও ভাড়া না দিয়েই বাস থেকে অনায়াসে নেমে পড়তে পারতাম। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস-কণ্ডাক্টার এবং ড্রাইভারের সঙ্গে ঝগড়া করার ঝুঁকি নেওয়া আমার পক্ষে কোনমতেই উচিত নয়। তাই সমস্যাটি ভেবে ভেবে আমার বুকের ভেতরটা ক্রমশঃ শুকিয়ে আসতে লাগল। সমস্যা যত কঠিনই হোক্ না কেন—পরীক্ষার আগেই পরাজয় স্বীকার না করলে সমাধানের একটা না একটা উপায় নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যায়।

বাস কুমিল্লা টাউনের দিকে এগোতে লাগলো—মনে মনে ভেবে স্থির করলাম—কালা-বোবার পার্ট করা আর চলবে না—এবারে আমায় মুখ খুলতেই হবে। একেবারে বোবা একটি লোক হঠাৎ কথা বলা স্বরু করলে অন্যদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া কি হবে সেটাও ভাববার কথা। যাই হোক্, আর চুপ করে থাকার সময় নেই—তাই অনেক কষ্টে যেন বলছি, সেই রকম ভান করে আধো আধো ভাঙা ভাঙা ভাবে কখনও একটি অক্ষর কখনও বা একটি শব্দ অস্পষ্ট উচ্চারণ করে ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টারকে বোঝালাম—ধর্মসাগর, কান্দিরপাড়, কামিনীবাবুর বাড়িতে যেন আমাকে তারা দয়া করে পৌঁছে দেয়—আমি রাস্তা-ঘাট বাড়ি-ঘর কিছুই চিনি না; সেখানে গিয়ে আমি তাদের বাস-ভাড়া ও পারিশ্রমিক দেবো। কথাগুলি অবশ্য খুব ভয়ে ভয়েই বলেছি—পাছে তারা আমাকে পৌঁছে দিতে অস্বীকার করে—যদি বলে পৌঁছে দেওয়ার কাজ তাদের নয়; আবার এ ভয়ও ছিল, যদি সন্দেহ করে সোজা থানায় নিয়ে যায়!

তাই এত ভেবে ভেবে সাবধানে ও সন্তর্পণে পা ফেলতে হচ্ছে! সুদীর্ঘ যাত্রাশেষে যদি সামান্য ভুলের জন্য বিপর্যয় ঘটে যায়, তবে তার চাইতে মর্মান্তিক আর কি হতে পারে! শেষ মুহূর্তে জয়-পরাজয়ের উৎকণ্ঠা—ঘাটে ভেড়ার আগেই নৌকো যদি ডোবে!

কিন্তু পরে দেখা গেল আমার ভুল হয় নি। বোবা লোক হঠাৎ কথা বলতে সুরু করে দিল, অতি দীনবেশধারী নাম-পরিচয়হীন একটা লোক—তাকে কুমিল্লার সুবিখ্যাত আইনজীবী কামিনীবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলল, সে বাড়িতে আমার মত একজন অতি সাধারণ যুবকের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? কামিনীবাবুরই বা আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক যে, সেখানে নিয়ে গেলেই তাঁরা আমার বাস-ভাড়া ও পথপ্রদর্শকের পারিশ্রমিক দেবেন? বাসচালকেরা দু'জনেই মুসলমান ভদ্রলোক। দু'জনেরই বয়স চল্লিশের উপর হবে। কামিনী-বাবুর বাড়ি পৌঁছে দেবার প্রস্তাব শুনে তাঁরা কোন প্রতিবাদ তো জানালেনই না—এমন কি সামান্য একটি প্রশ্নও করলেন না। তাঁদের কথায় জানতে পেরেছিলাম কামিনীবাবুর বাড়ি বাস-স্ট্যাণ্ডের খুবই নিকটে—মাত্র ৮।১০ মিনিটের পথ।

আমার হাতে মামলার কোন নথীপত্র নেই—কাজেই প্রসিদ্ধ উকিল কামিনীবাবুর বাড়ি আমার যাওয়ার প্রয়োজন যে মামলার পরামর্শের জন্য নয় তা' সহজেই অনুমেয়। আমার নগ্ন পা, দীনবেশ, চেহারাতেও বিন্দুমাত্র আভিজাত্যের ছাপ নেই—অতবড় খ্যাতিমান আইন-ব্যবসায়ী—কুমিল্লা শহরে যাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি, গাড়ি ও প্রচুর ধন-সম্পদ, তাঁর সঙ্গে আমার যে কোন আত্মীয়তা থাকা সম্ভব, তা-ও ভাবা কঠিন। আমাকে কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার বলে হয়ত অনুমান করা যেত, কিন্তু আমার পরনে নেই খদ্দর, মাথায় নেই গান্ধীটুপি! কামিনীবাবুর বাড়িতে সকলেই নির্ভেজাল খদ্দর ব্যবহার করতেন। কংগ্রেস আন্দোলনে কুমিল্লায় তাঁদের অবদান সকলের সুবিদিত। আমার সঙ্গী মুসলমান বাসচালক দু'জনও কামিনীবাবু সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সকল তথ্য অবগত ছিলেন। কাজেই মনে হয় বাসচালক দু'জন বুঝতে পেরেছিলেন—এ আমার ছদ্মবেশ, না হ'লে কামিনীবাবুর পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার ছদ্মবেশ ও অভিনয় যদি তাঁরা বুঝেই ফেলে থাকেন তবুও আমার তা'তে কোন ক্ষতি হয় নি। তাঁরা হয়ত অনুমান করেছিলেন আমি একজন পলাতক বিপ্লবী—কারণ, চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রায় নয়-দশ দিন পরে বাংলার ছোটবড় সব শহরেই সশস্ত্র বিপ্লবীদের সম্বন্ধে

বহুবিধ রঙীন আলোচনা হ'ত। তাই মনে হয় বাসচালকেরাও বিপ্লবীদের সম্বন্ধে আলোচনায় উদাসীন ছিলেন না। আমার প্রস্তাব শুনে তাঁরা আমাকে সোজা পুলিসের কাছে না নিয়ে কামিনীবাবুর বাড়িতেই পৌঁছে দিলেন।

কুমিল্লা একটি ছোট শহর। এই শহরে আমার বাবার মামার বাড়ি। খুব ছোট্ট বেলায় দাদুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি। এই কুমিল্লা শহরে নরসিংজীর আখ্‌ড়ায় অতি অল্প বয়সে আমার ও আমার দাদার পৈতা হয়েছে। অত ছেলেবেলার কথা কিছুই প্রায় মনে নেই। রাস্তাঘাট কোনটাই চিনি না। ধর্মসাগর একটা খুব বড় দীঘি। দীঘিটার চারিদিকের পথ-ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কান্দিরপাড় পাড়াটি ধর্মসাগরের কাছাকাছি। কামিনীবাবুর বাড়ি কান্দিরপাড়ে তা' আমার জানা ছিল। কিন্তু তাঁদের বাড়িতে আগে কোনদিনই আমার যাওয়ার সুযোগ হয় নি—আজই প্রথম তাঁদের বাড়ি যাব—কি রকম অভ্যর্থনা পাব তা' ভেবে উঠতে পারছিলাম না। এত বড় প্রতিষ্ঠাবান ও ধনী পরিবার কি আমাকে নিজ বাড়িতে স্থান দেবেন? আমাকে আশ্রয় দিয়ে বৃটিশ রাজশক্তির নিষ্ঠুর আক্রোশের সম্মুখীন হতে কি তাঁরা প্রস্তুত? অহিংসা-ধর্মের পবিত্রতা সশস্ত্র বিদ্রোহীর সংস্পর্শে কি ক্ষুন্ন হবে না? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কামিনীবাবুর বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হ'লাম—বোধ হয় কলিং-বেল বাজিয়েছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল। বাইরে এলেন ননীদা। এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে দীন মলিনবেশে আমাকে তাঁদের বাড়ির দরজায় দেখে ননীদা প্রথমে চমকে উঠলেন। ননীদার প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় পেলাম। একটিও কথা না বলে, কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই আমাদের দু'জনকে ভেতরে ডেকে নিলেন। আমার বেশভূষা ও সঙ্গী মুসলমান বাস-চালককে দেখে ননীদা মুহূর্তেই বুঝে নিয়েছিলেন যে ব্যাপারখানা বেশ জটিল। ইতিমধ্যে যদি তিনি ১৮ই তারিখে চট্টগ্রাম দখল, ২২শে জালালাবাদ যুদ্ধ ও সেই রাত্রের ফেণী স্টেশনের সংবাদ না রাখতেন তবে ২৭শে তারিখে আমাদের দেখে ব্যাপার বুঝতে তাঁর হয়ত দেরি হ'ত।

বাসচালককে গাড়িবারান্দায় দাঁড়াতে বলে আমাকে সোজা বাড়ির অন্দর-মহলে নিয়ে গেলেন। ঠিক মনে নেই, তিনতলা বা দোতলায় ছোট্ট একটি চোরকুঠুরীতে আমাকে বসিয়ে রেখেই বাসচালককে বিদায় করতে ছুটে গেলেন। বাসচালক খুব সন্তুষ্টচিত্তেই বিদায় নিয়েছিলেন।

স্বর্গত কামিনীবাবু এবং আমার বাবা সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। আমাদের দুই

পরিবারের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য ছিল তার তুলনা বহু আত্মীয়দের মধ্যেও বিরল। ননীদা (শ্রীসরোজকুমার দত্ত) Bengal Immunity কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার—কামিনীবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বছর দুই আগে ননীদা যাবদপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছেন। সেদিন তাঁকে আমি বাড়িতে পাব আশা করি নি। ননীদা সব সময়ে খদ্দর পরতেন। চট্টগ্রামে আমাদের বাড়িতে তিনি প্রায়ই আসতেন। তাঁর বন্দুক ও রিভলভারের নিশানা ছিল অব্যর্থ। উড়ন্ত পাখী লক্ষ্য করে তিনি গুলী ছুঁড়তেন এবং সেই পাখী গুলীবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে পড়বার আগেই তাকে চলন্ত মোটর গাড়ি থেকে লুফে নিতেন। ননীদার লাইসেন্স করানো বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি ব্যবহার করার সুযোগ আমি বহুবার পেয়েছি। মনে মনে খুব ইচ্ছেও ছিল ননীদাকে বিপ্লবীদলে যোগ দিতে বলব; কিন্তু বিভিন্ন জেলায় ও বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বাস—তাই তাঁর কাছে ঐ রকম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করবার বিশেষ সুযোগ পাই নি।

আমার মনে হ'ল ননীদা আমাকে দেখে খুব উৎসাহিত হয়েছেন—সশস্ত্র যুববিদ্রোহের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়া যেন একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং তা' বিলম্বে হলেও, শেষ পর্যন্ত ঘটেছে বলে তিনি যেন সশস্ত্র বিপ্লবকে স্বাগত জানাচ্ছেন। এই পরিবারটি গান্ধীজীর অহিংস ভাবধারার প্রভাবে যতখানি না প্রভাবিত তার চাইতে সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র বিপ্লব চিন্তার গতিপ্রবাহে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই এই বাড়িতে সাহায্যপ্রার্থী হিসাবে উপস্থিত হতে আমি সাহসী হয়েছিলাম।

সুরেনের মত একজন সাধারণ লোক আমাকে আশ্রয় দিয়েছে জানতে পারলে বৃটিশ রাজশক্তি তাকে একেবারে নিষ্পেষিত করত সত্য, কিন্তু কুমিল্লার তথা বাংলার রাজনৈতিক নেতা কামিনীবাবুর মত ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি আড়ালে থেকে বিপ্লবীদের সমর্থন ও সাহায্য করছেন—আশ্রয় দিচ্ছেন, এই সংবাদে তারা আরও অনেক বেশি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠত!

দাদা, দিদি ও আমি ননীদার মা-বাবাকে কাকাবাবু ও কাকীমা বলে ডাকতাম। ননীদা, অজিতদা (শ্রীঅজিতকুমার দত্ত) ও তাঁদের অন্য সব ভাইয়েরা আমার বাবা-মাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন ও মাসীমা মেসোমশাই বলে ডাকতেন। শুধু আমাদের দুই পরিবারের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ওপর নির্ভর করেই যে আমি কামিনীবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নিতে সাহসী হয়েছিলাম তা নয়, আমার সাহসের কারণ এই পরিবারটির গভীর স্বদেশপ্রেম। আমরা জানি কত ছন্নছাড়া বিপ্লবী

যুবককে তাদের আত্মীয়-স্বজন ছাড়তে হয়েছে, তাদের বন্ধুবিচ্ছেদ হয়েছে—এমন কি পিতামাতাও পুলিসের নিগ্রহের ভয়ে আপন পুত্রকে গৃহ হতে বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই একবারও যদি মনে করি আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন বর্তমান ছিল বলেই কাকাবাবুর (কামিনীবাবু) বাড়িতে আমার আশ্রয় পাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল, তবে তাঁদের গভীর স্বদেশপ্রেমকে, বাংলার বিপ্লবীদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাকে বিকৃত করে দেখা হবে—স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অপরিসীম অবদানকে অবমাননা করা হবে। একবার অন্তরের গভীরে অনুভব করলেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব—কতখানি জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম থাকলে পরে আমার মত একজনকে আশ্রয় দিয়ে এবং সাহায্য করে তাঁরা বিপদ ও নিষ্পেষণের সম্মুখীন হতেও ভয় পান নি!

মাস্টারদার নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা তাদের সংগঠন, বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও সীমিত সাফল্যের জন্য কামিনীবাবু, বসন্ত মজুমদার, শরৎবাবু (শরৎচন্দ্র বোস), ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত (Bengal Immunity-র মালিক) প্রমুখ দেশ-বরেণ্যদের নিকট হতে অনেক সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছে। স্বাধীনতা-যুদ্ধে আমরা এই সমর্থন পেয়েছিলাম বলেই সফলতার সঙ্গে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পেরেছি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ ও বৈপ্লবিক সমর্থনের ইতিহাস যতখানি মূল্যবান, এঁদের মত সমৃদ্ধিশালী খ্যাতনামা ব্যক্তিদের ঐতিহাসিক অবদানের মূল্যও ঠিক ততখানি। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বিপ্লবের সার্থক রূপায়ণে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অভিজাত ঘরের সন্তান ফ্রেডরিক্ এঙ্গেলস্-এর অবদানকেও সমান মূল্যবান বলে মনে করা হয়ে থাকে। Analogy-র ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, এভাবে তুলনা করাটাও হয়ত সকলের কাছে সমীচীন বলে বোধ হবে না, তবুও পাঠকবর্গ আমার বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারবেন বলেই আশা করি।

বাসচালককে বিদায় করে ননীদা এসে আমার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিলেন। আমরা চারজন কিভাবে দগ্ধ অবস্থায় হিমাংশুকে নিয়ে প্রধান-বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম এবং ফেণীতে পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে পালাবার সময় আমাদের চারজনের আবার দলভ্রষ্ট হয়ে পড়বার আদ্যোপান্ত বিবরণ তাঁকে দিলাম। তারপর আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই গত পাঁচদিন ধরে আমি যে কুমিল্লা ও বিলোনিয়ার পথে পথে আত্মগোপন করে কাটিয়েছি, তাও বললাম। আমার সঙ্গে কোন রিভলভার বা পিস্তল নেই জেনে ননীদা খুব বিচলিত হয়েছিলেন। ১৮ই

এপ্রিল রাত্রির পর থেকে ২৭শে পর্যন্ত কোন সংবাদপত্র দেখতে পাই নি—আমাদের সাথীদের কোন খবরই জানি না। ননীদা আমাকে সব খবর দিলেন। ফেণীর ঘটনার পর কেউ ধরা পড়ে নি। ফেণী স্টেশনে পুলিস কর্মচারীদের আক্রমণ করে গুরুতরভাবে আহত করার ব্যাপারে আততায়ীদের গ্রেফ্‌তারের জন্য নোয়াখালির জেলা-শাসক প্রত্যেকের মাথাপিছু এক হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। জালালাবাদে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে—বিপ্লবীদের দশ-বারজন মারা গেছে। শত্রুপক্ষের ও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে বলে জোর গুজব শোনা যাচ্ছে। ননীদা বললেন, স্টেশন-কর্মচারীদের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছেন—গভীর রাত্রে আহত ও মৃত সৈন্য বোঝাই দু'খানা ট্রেন কুমিল্লা স্টেশন অতিক্রম করেছে। ননীদা আরও জানায়—মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা, গণেশ ও আমাকে বন্দী করতে সাহায্য করলে প্রত্যেকের জন্য জেলা-শাসক পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দান করবেন। তখনও আমাদের মধ্যে কেউ ধরা পড়ে নি দেখা যাচ্ছে। খবর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না বললেই হয়। কেবলমাত্র Statesman সংক্ষিপ্ত censored খবর যা দেয় তা' থেকে অর্থ বার করে বোঝা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তবু দশদিন পরে আমাদের মোটামুটি সব খবর ননীদার কাছেই প্রথম পেলাম। পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে আমরা প্রাথমিক তথ্যাদি বিনিময় করলাম। আমার স্নানের ও কাপড়-চোপড়ের সব ব্যবস্থা হ'ল। স্নান সেরে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে ভদ্রলোক সাজলাম। কাকীমা থালাহাতে আমার জন্য খাবার নিয়ে এলেন। তাঁকে প্রণাম করতে তিনি আমার মাথায় দু'হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। অজস্র আবেগ, উৎকণ্ঠা ও স্নেহ-মমতায় তাঁর সমস্ত অন্তর উদ্বেলিত। আমার কি হবে? আমার বাবা-মা, দাদাবৌদি এবং দিদি কোথায় ও কি অবস্থায় আছেন? মাস্টারদা ও অন্যান্য ছেলেরা এখন কোথায়? তাদের কি হবে? আমি সারাজীবন কেমন করে আত্মগোপন করে থাকব? আমাকে তিনি কোথায় লুকিয়ে রাখবেন? কি করে নিরাপদে রাখবেন? —ইত্যাদি ইত্যাদি নানা চিন্তা ও উদ্বেগ সেদিন তাঁর প্রতিটি কথায় প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁর সেইদিনকার সেই উদ্বেগাকুল মূর্তি এই দীর্ঘকাল পরেও আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে! আমি কাকীমাকে যথাযথ উত্তর দিয়েছি—কখনও অভয় দিয়েছি, কখনও গীতা উদ্ধৃত করে বলেছি—আমরা কৃতকর্মের জন্য ফলের আশা করি না; কখনও বুঝিয়েছি—দেশের জন্য আমাদের মৃত্যুপণ, এটা ভুললে চলবে না—আর, মা-মাসীর এত আশীর্বাদ এত শুভকামনা কখনও ব্যর্থ হতে

পারে না—তিনি যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন—এইসব কথা বার বার বলে তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছি।

এই চোরকুঠরীতে ননীদা ও কাকীমা ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। তাঁদের সাহচর্যে এই ঘরে আমি রাত প্রায় নটা-দশটা পর্যন্ত ছিলাম।

আমি এখানে আসার ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের মধ্যেই কাকাবাবু কোর্ট থেকে ফিরলেন। কাকাবাবুর সঙ্গে তখনও আমার দেখা হয় নি। কোন কাজে বা মামলা উপলক্ষে চট্টগ্রাম গেলে তিনি আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গে আমার খুব সামান্যই কথাবার্তা হ'ত। কথা স্বভাবতই তিনি কম বলতেন—বেশ রাশভারী লোক ছিলেন। লম্বা-চওড়া ফর্সা চেহারা কণ্ঠের আওয়াজ ভারী—এক কথায় খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। এ বাড়িতে আজ আমার যেরূপ সমাদর হয়েছে এবং তা' যে দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে, তারই মাধ্যমে কাকাবাবুর বর্তমান চিত্র আমি মানসপটে এঁকে নিয়েছি। তাঁর সাহায্য, সমর্থন ও আন্তরিকতা থেকে যে বঞ্চিত হব না, তা' জানাই আছে। এখন প্রয়োজন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কলকাতা পৌছবার একটি নিরাপদ পথ ও উপায় উদ্ভাবন করা।

ননীদা ইতিমধ্যে একবার বলে গেলেন—আমার আসার খবর কাকাবাবু পেয়েছেন—লোকজনদের সবাইকে বিদায় করে তিনি রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

রাত প্রায় দশটার সময় ননীদা আমাকে কাকাবাবুর চেম্বারে নিয়ে গেলেন। ঘরে কাকাবাবু ও আরও দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন—বসন্ত মজুমদার এবং মৌলভী মক্লেশ্বর রহমান—ইনি কুমিল্লা জেলা-কংগ্রেসের সেক্রেটারী। বসন্তবাবুর (এঁকেও কাকাবাবু বলে ডাকতাম) সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না—তবে তিনিও বোধ হয় আমার বাবার সহপাঠী বা দু-এক বছর আগে-পরে পাশ করেছেন। ইনি কুমিল্লার প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। আগে বিপ্লবী দলে ছিলেন—তারপর অসহযোগ আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। আমি ঘরে ঢুকতে তিনজনেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁদের অসামান্য ব্যক্তিত্বের কাছে আমার নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। বোধ হয় মনের অন্তরালে ছিল—আমার পিতার সমতুল্য কাকাবাবু ও বসন্তকাকা (বসন্ত মজুমদার) যে বিপ্লবী হৃদয়ের আবেগে আমাকে স্নেহভরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন তার কাছে আমি অতি নগণ্য! আর মৌলভী মক্লেশ্বর রহমানকে যদিও আমি এই প্রথম দেখছি, তবু যে পরিবেশে কাকাবাবু ও বসন্তবাবুর পাশে তাঁকে দেখলাম

তা'তে আমার বুঝে নিতে একটুও দেরি হয় নি যে, তিনি কে ! তাই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে এল। আমার বসবার জন্য একটি সোফা খালি ছিল—আমি সোফায় না বসে কাকাবাবুর সোফা ঘেঁষে তাঁর পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসে পড়লাম।

বসন্তকাকা খুব উৎসাহী। আক্রমণ, যুদ্ধ, ইত্যাদি কেমন হ'ল, ইংরেজদের ক্ষতি কি পরিমাণ হ'ল ও তাদের prestige কতখানি গেল তা নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে তিনি আলোচনা করলেন। প্রায় দেড়ঘণ্টা সেই ঘরে ছিলাম। সেইখানেই—২৭শে তারিখ রাত্রে আমার পরবর্তী কর্মসূচীর প্ল্যান স্থির হয়ে গেল।

প্ল্যান অনুযায়ী—আমি মৌলভী মক্লেশ্বর রহমানের সঙ্গে ২৮, ২৯ ও ৩০শে তারিখ পর্যন্ত কংগ্রেস অফিসে থাকব। তারপর মে মাসের প্রথম তারিখ ভোরে মোটরযোগে দাউদকাঁধি যাব। মৌলভী এরাদুল্লা (ইনিও একজন কংগ্রেসকর্মী) কলকাতা পৌঁছনো পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবেন। নদীপথে নৌকো, ফেরী-ষ্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে নারায়ণগঞ্জ যাব। তারপর বাহাদুরাবাদ ফুলছড়ি ঘুরে কলকাতা পৌঁছবো এবং কলকাতায় শ্যামবাজারে কাকাবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর নরেন দত্তের বাড়িতে গিয়ে উঠব। সেখানে গিয়ে নরেন কাকার সঙ্গে পরামর্শ করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করব—আর তেমন প্রয়োজন হলে, কলকাতায় আমি হয়ত নিজের ব্যবস্থা করেও নিতে পারব।

পরদিন আমি মৌলভী মক্লেশ্বর রহমানের সঙ্গে চলে গেলাম। তিনদিন তাঁর সঙ্গে কাটল। একসঙ্গে খেয়েছি, এক বিছানায় ঘুমিয়েছি—সারাটা সময় তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনায় কাটিয়েছি—কত কথা—কথা যেন আর ফুরোয় না—সশস্ত্র বিপ্লবের কত রঙীন চিন্তা, কত পরিকল্পনা দু'জনে মিলে করেছি! সময় তো কাটাতে হবে—শুধু কথায় সময় কাটলেও বিপ্লবী মনের subjective প্রস্তুতিতে এই সব কথা যে সাহায্য করেছে তা' অস্বীকার করা যায় না। কংগ্রেসের আন্দোলন সম্বন্ধেও নানা আলোচনা হয়েছে। কাজেই গান্ধীজির অহিংসা-ধর্ম ও সুভাষের সশস্ত্র বিপ্লবের মতবাদও আলোচিত হ'ল। অহিংসার কর্মসূচী কৌশল হিসেবে প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের কারও দ্বিমত ছিল না। কিন্তু বিপ্লবী ভারত অহিংসা-ধর্মকে যে অবাস্তব মনে করে এবং নীতি হিসেবে তা' যে আমরা কখনই গ্রহণ করব না, ইত্যাদি বিষয়ও আলোচিত হ'ল। মোট কথা, তিনদিন ও তিনটি রাত্রি মৌলভী সাহেবের সঙ্গে খুব ভালই কাটল। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও বেশ জমে উঠেছিল। এই তিন দিনের মধ্যে মৌলভী এরাদুল্লার সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু আমি যে অনন্ত সিং—সেকথা তাঁকে তখনও

জানান হয়নি। তাঁকে বলা হয়েছিল আমি চট্টগ্রাম যুব-বিপ্লবীদের একজন। পরে, যেদিন আমি তাঁর সঙ্গে কলকাতায় রওনা হ'লাম, সেদিনই তিনি আমার সঠিক পরিচয় জানতে পারলেন।

১লা মে খুব ভোরে মোটরে বেরিয়ে পড়ব, তাই আগের দিন রাত্রে কাকাবাবু ও কাকীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বসন্ত কাকাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি প্রথমে কাকীমার সঙ্গে দেখা করি। তাঁর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বললাম—"কাকীমা, কাল ভোরে যাচ্ছি। কলকাতায় নরেন কাকার কাছে যাব। পথেই হয়ত কোন বিপদে পড়তে পারি, আর নয়ত সেই বিপদ আমার অজান্তে অন্য কোথাও অপেক্ষা করছে। কিন্তু বিপদসাগরে যে ভেসেছে তার এই সমস্ত বিপদকে ভয় করলে চলবে কেন?" আমি সব কথাগুলিই খুব হেসে হেসে হাল্কা করে বলেছিলাম। তারপর আরও বলতে গিয়ে গলাটা আমার অজান্তেই ভারী হয়ে এল। বললাম—"আপনাদের সঙ্গে হয়ত আর দেখা হবে না। জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে আপনাদের আশীর্বাদ মাথায় নেবার সুযোগ পাব ভাবি নি। আপনাদের আশীর্বাদ আমার জীবনের পরম সঞ্চয় হয়ে থাকবে। ১৮ই এপ্রিল মায়ের আশীষ নিয়ে ইংরেজদের সৈন্যঘাঁটি আক্রমণ করেছি; আর আজ আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে ছুটে যাচ্ছি। যদি আর ফিরে না-ও আসি, মা'র কাছে যদি কোনদিন আর যেতে না-ও পারি, আমার মাকে বলবেন আমি আপনার আশীর্বাদ নিতে এখানে এসেছিলাম।"

এই সমস্ত কথাতে কোন মায়ের পক্ষেই হৃদয়াবেগ সংবরণ করা সম্ভব নয়। কাকীমাও অভিভূত হলেন। অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে বহু আশীর্বাদ জানালেন— "আমার অন্তরের আশীর্বাদ নাও। তোমরা দীর্ঘজীবী হও। তোমার মাকে সব বলব। তার আশীর্বাদই তোমাকে সর্বসময় সব কিছু হতে রক্ষা করবে। কাকীমাকে ভুলো না।"

কাকীমার কাছে বিদায় নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে ফিরে এলাম। কাকাবাবু ও বসন্তকাকার সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার পথে যেসব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। মুসলমানের ছদ্মবেশেই আমার যাবার ঠিক ছিল। লুঙ্গি, কামিজ, লাল ফেজ ইত্যাদি ইতিমধ্যেই যোগাড় করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে মক্কেশ্বর রহমানের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। ৩০শে তারিখের রাতও মৌলভী সাহেবের সঙ্গে কাটল।

খুব ভোরে ননীদা প্রাইভেট মোটর নিয়ে উপস্থিত। গাড়িটা একটু দূরে

রাখা হয়েছে খবর পেয়ে আমরা তিনজন—মৌলভী এরাতুল্লা, মৌলভী মক্লেশ্বর রহমান ও আমি, মুসলমান বেশে মোটরে উঠলাম। ননীদাও গাড়িতে ছিলেন। গাড়ি সোজা পশ্চিমদিকে ছুটল—একেবারে শেষ মাথায় মেঘনার তীরে দাউদকাঁধি নৌকো ঘাটে। কথা ছিল, আমাকে ও মৌলভী এরাতুল্লাকে সেই নৌকো-ঘাটে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি ননীদা ও মক্লেশ্বর রহমানকে নিয়ে তক্ষুণি কুমিল্লা ফিরে যাবে। প্রায় পঁচিশ মাইল পথ মোটরে এলাম। ননীদাকে নিয়ে গাড়ি ফিরে গেল, মৌলভী মক্লেশ্বর রহমান কিন্তু ফিরলেন না। আমাকে নিরাপদে কলকাতা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর। মৌলভী এরাতুল্লা সাহেবই এই কাজের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তবু মক্লেশ্বর রহমান মনস্থ করলেন আমাদের জলপথে বৈদ্যবাজার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবেন। নৌকোতে আঁকা-বাঁকা পথে নদী ঘুরে আমরা বৈদ্যবাজারে এলাম। তখন বোধ হয় বেলা প্রায় দশটা সাড়ে দশটা হবে।

মনে পড়ে বৈদ্যবাজারে আমরা কিছু খাওয়া-দাওয়া করেছিলাম। এখানে পৌঁছে আমরা মৌলভী মক্লেশ্বর রহমানের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মৌলভী সাহেবের সঙ্গে মাত্র এই চারদিনের জানাশোনা, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন কত যুগ যুগ ধরে তিনি আমার বন্ধু ছিলেন—বিপ্লবী সাথী ছিলেন। তখন পর্যন্ত যদিও আমরা একসঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরি নি বা সেই সুযোগ আমাদের আসে নি তবু ভবিষ্যতে—বন্ধু—বিপদের একান্ত সাথী, মৌলভী মক্লেশ্বর রহমানকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে রাইফেল হাতে আমাদের পাশে পাব না, তা' ভাবতে পারছিলাম না। বন্ধুবর আন্তরিক বিদায় অভিবাদন জানালেন। আমি বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে বললাম—"ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকব। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব!" তিনি উদ্ভাসিত নয়নে সম্মতিসূচক অভিব্যক্তিভরা হাসিমুখে আমার দিকে এমন ভাবে চাইলেন, যেন তিনি সর্বদাই প্রস্তুত।

বৈদ্যবাজার থেকে হেঁটে প্রায় ছ'সাত মাইল পথ অতিক্রম করে আমাদের একটা ফেরী-স্টীমার ঘাটে আসতে হ'ল। এই ঘাটটির নাম মনে পড়ছে না। মনে হয় ফেরী-স্টীমারটি ফৌতুল্লা থেকে ছেড়ে এই ঘাটে থামে এবং এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল নদীপথে ওপারে নারায়ণগঞ্জ গিয়ে পৌঁছয়। আমরা এই ফেরী-স্টীমার ঘাট থেকে দু'খানা নারায়ণগঞ্জের টিকেট কিনলাম। অপর পারে নারায়ণগঞ্জ দেখা যাচ্ছে। স্টীমারটির এতক্ষণে এসে পৌঁছনো উচিত ছিল। এখন প্রায় পাঁচটা বেজেছে। নমাজের সময় অতিবাহিত হতে চলেছে।

মৌলভী সাহেব নমাজ পড়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি ঘাট থেকে নদীতীরে দূরে সরে গেলেন। আমি "মুসলমান" হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকব আর তিনি নমাজ পড়বেন এটা খুবই অস্বাভাবিক। তাই একটু তফাতে থেকে নমাজ পড়লেন, আমি যদি ভুল-ভাল নিয়ম অনুসরণ করেও তাঁর সঙ্গে নমাজ পড়বার চেষ্টা করি তবে অন্যেরা দূর থেকে তা' বুঝতে পারবে না।

১লা মে, ১৯৩০ সাল, মেঘনা নদীতীরে আমিও নমাজ পড়বার অভিনয় করলাম। আমি কখনও কোন ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবার স্পর্ধা রাখি না। যার যা' ধর্ম, তা' তার একান্তই নিজস্ব জিনিস—ধর্মের ওপর অনাবশ্যক হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা বাল্যবয়সেও আমি খুঁজে পাই নি। কত মুসলমান অভিনেতা-অভিনেত্রী থিয়েটার মঞ্চের মন্দিরে পূজো দিচ্ছেন, আবার কত হিন্দু আর্টিস্ট সিনেমার পর্দায় মসজিদে প্রার্থনা জানাবার অভিনয় করছেন। কাজেই সামান্য একজন যুবক বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্রের বাস্তব স্টেজে প্রয়োজনবোধে যদি নমাজ পড়ার অভিনয় করে থাকে সেটা কখনও মৌলভী সাহেবকে বা মুসলমান ধর্মকে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা করার জন্য নয়।

স্টীমারটি বাঁশি বাজাতে বাজাতে প্রায় সাড়ে ছ'টায় নোঙর ফেললো। নৌকো করে গিয়ে জাহাজে উঠলাম। জেটিতে লাগিয়ে স্টীমার ভেড়াবার ব্যবস্থা নেই, কারণ, নদীর গভীরতা এখানে কম। প্রায় সাতটায় স্টীমার ছাড়ল। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই নারায়ণগঞ্জ পৌছবো। বাকি ব্যবস্থা তারপরে।

স্টীমারে এইটুকু পথ অতিক্রম করার মধ্যেই যে এমন ভীষণ কাণ্ড ঘটে যেতে পারে তা' কে ভেবেছিল? শোঁ শোঁ শব্দে দেখতে দেখতে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠল। ঝড়ের ঝাপ্টায় স্টীমারটি দোল খেতে লাগল। স্টীমার থেকে বিপদ-সঙ্কেত বেজে উঠল—বাঁশি একটানা সুরে সব যাত্রীকে হুঁশিয়ার করছে, নারায়ণগঞ্জের কর্তৃপক্ষকে বিপদবার্তা জানাচ্ছে। খালাসী ও কর্মচারীরা পাগলের মত চারিদিকে ছুটোছুটি সুরু করল। জাহাজের ওপরের ডেকের পাশে পাশে বৃষ্টি আটকাবার জন্য যে সব পর্দা খাটানো ছিল, নিমেষে সব খুলে ফেলা হ'ল। আমরা ওপরের ডেকে ছিলাম। প্রবল বায়ুবেগ কোনমতেই যেন পর্দায় বাধা না পায়; সেজন্য সারেঙদের হুকুমে নিচের ডেকের পর্দাও সব খুলে ফেলা হয়েছে। বৃষ্টির জলে যাত্রীরা সকলেই একেবারে ভিজে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন ভেজার প্রশ্ন বড় নয়, প্রাণ বাঁচাতে হবে—স্টীমার যেন না ডোবে।

খালাসীরা সব যাত্রীকে একেবারে স্টীমারের মাঝখানে এসে বসতে অনুরোধ জানাচ্ছে, জোর করছে, টেনে আনছে। তাদের ভারী ভারী মালগুলি

টেনেহিঁচড়ে স্টীমারের কেন্দ্রস্থলে আনবার চেষ্টা করছে। চারিদিকেই হৈ-হল্লা, চেঁচামেচি। এইসব ব্যবস্থা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শেষ হ'ল। ঝড়ের দ্রুত বর্ধমান বেগ ও তার গুরুত্ব বোঝা যাত্রীদের পক্ষে একটুও শক্ত ছিল না। এতবড় প্রকাণ্ড স্টীমারটি গন্তব্যপথে কোনমতেই একটুও এগোতে পারছে না। ঝড়ের ঝাপ্টায় ও প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে একটা ছোট্ট নৌকোর মত সামনে পেছনে সমানে ভীষণ ভাবে দোল খাচ্ছে।

যাত্রীদের আতঙ্কের সীমা নেই। সে এক নিদারুণ অবস্থা! অনিশ্চয়তা, ভয়, উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের করুণ দৃশ্য! যাত্রীরা সকলেই চীৎকার করে হরিনাম, কৃষ্ণনাম, কালী নাম করছে। কয়েকজন মিলে হরি-সংকীর্তনও সুরু করেছে। মুসলমান যাত্রীরা সমানে আল্লার নাম করছে। কোন কোন মহিলা যাত্রী চীৎকার করে কাঁদছে। ডেকে যে সব বালক-বালিকা ও বাচ্চা ছিল তারাও এই ভয়াবহ ও ভীতিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে দিশেহারা হয়ে সমানে তারস্বরে চীৎকার করে চলেছে।

আর মাত্র দু' একশ' গজ এগোতে পারলেই স্টীমারটি জেটিতে ভিড়তে পারে। কিন্তু তা' একেবারেই অসম্ভব। কোন মতেই তাল রাখা যাচ্ছে না, সারেঙরা ভয়ানক ভীত—এই বুঝি জেটির সঙ্গে সংঘর্ষে স্টীমারটি চুরমার হয়ে যায়! সেখানেই তারা নোঙর ফেলল—ডবল নোঙর। কড়্ কড়্ করে শিকলের আওয়াজ হচ্ছে, যেন শিকল ছিঁড়ে প্রচণ্ড ঝড়ে গোটা স্টীমারটাই উল্টে যাবে। যাত্রীরা সকলেই প্রাণটি হাতে নিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত মরণ-বিভীষিকায় কাটাচ্ছে!

মৌলভী এরাদুল্লা সাহেবের মানসিক অবস্থা আমি সঠিক জানতে পারি নি। তবে তাঁকে ভয়ে বিহ্বল হতে দেখি নি। এখন আমার নিজের কথা বললে মনে হবে বড়াই করছি। কিন্তু যাই মনে হোক্, জীবনের এত বড় একটা বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমার নিজের মনস্তত্ত্বটি একটু বলি। আগে "অগ্নিগর্ভ-চট্টগ্রামে" লিখেছি, নজরবন্দী অবস্থায় গোয়ালন্দে চলন্ত স্টীমার থেকে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলাম; অন্তরীণ থাকাকালে গ্রামে বাঘ খুঁজে বেড়াতাম—বাঘ মেরে আমিও "বাঘা যতীন" নাম কিনব বলে, শারীরিক শক্তির সঠিক অনুমান না করেই, অসম্ভবকেও সম্ভব করবার ইচ্ছে হ'ত আমার। তাই সেই সময়েও ভাবছিলাম, স্টীমার যদি উল্টে যায়, ডুবে যায়, তবু আমি বাঁচবো—তীরে আমি উঠবই!

এরকম ভয়ঙ্কর ঝড় আমি আর দেখি নি। স্টীমারে বসে তখনও সম্যকরূপে বুঝতে পারি নি বাইরে কি তাণ্ডব ঘটে গেল। সেই দুর্যোগের মধ্যে

ষ্টীমারটি নোঙর ফেলে সেখানে প্রায় দেড়ঘণ্টা বসেছিল। তারপর নারায়ণগঞ্জে নেমেও বুঝতে পারি নি ধ্বংসলীলার পরিধি কতখানি। এর একদিন পরে, খবরের কাগজ দেখে, ঝড়ের ধ্বংসলীলার খবর জানতে পারলাম। প্রচণ্ড ঝড়ে বহু স্থান বিধ্বস্ত, চাঁদপুরে অনেক নৌকো ও লঞ্চ জলমগ্ন, শিকল ছিঁড়ে জেটি ভেসে গেছে—প্রাণহানির সংখ্যা অবশ্য নেই। সবচেয়ে বড় খবর, ছবি দিয়েছে, গোয়ালন্দ ষ্টীমারের সাইজের একটি ষ্টীমারকে এই প্রবল ঝড় ঠিক যেন পাঁজাকোলা করে নদীবক্ষ থেকে তুলে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা চড়ার ওপর শুইয়ে দিয়েছে।

এরকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আর হয় নি। অভিজ্ঞতাই বটে—তাই লিখলাম। যাত্রীদের আতঙ্কের যে দৃশ্য দেখেছি, যে ব্যস্ততা ও উদ্বেগ সারেঙ ও খালাসীদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি, তা' মনে রাখবার মতই। সেদিনের ঝড়ে আমাদের ষ্টীমারটি কেন ডোবেনি তার কারণ আমি জানি না। সেদিন ষ্টীমারটি ডুবলে আজ হয়ত আমার স্মৃতিচারণ নিয়ে পাঠকদের সামনে উপস্থিত হতে পারতাম না।

যাই হোক্, আস্তে আস্তে ঝড় থামল। দুর্যোগ কেটে আবহাওয়া বেশ শান্ত হয়ে এল। নোঙর তুলে ষ্টীমার জেটিতে নিয়ে বাঁধা হ'ল। যাত্রীরা সকলেই ভিজে একেবারে যেন নেয়ে উঠেছে। আমাদের দু'জনেরও জামা-কাপড় সমস্তই ভিজে সপ্‌সপে। সঙ্গের পুঁটলীতে আর একজোড়া লুঙি ও সার্ট ছিল, তাও একেবারে ভিজে—তাই কাপড় বদলাবার কোন হাঙ্গামাই নেই—কাপড়-চোপড় যা পরনে আছে—গায়েই শুকোতে হবে। নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে অনেক সরাইখানা আছে। আমরা দু'জনে একটা মুসলমান হোটেলে গেলাম। মুসলমান সরাইখানা—বসে খাওয়ার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। আসনে বসে সামনে প্রায় দশ-বার ইঞ্চি উঁচু লম্বা চৌকিতে থালা রেখে খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। তখনকার দিনে একবেলা পেটভরা খুব ভাল খাবারের মূল্য কোন-মতেই এক টাকার বেশি হ'ত না—তাও খেয়ে শেষ করা যেত না। আমরাও খুব পেটভরেই খেলাম।

Via বাহাদুরাবাদ ও ফুলছড়ি—কলকাতার দু'টি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটা হ'ল। এখন আমার সঠিক মনে নেই—একই সঙ্গে কলকাতার through টিকিট কেটেছিলাম, নাকি পর পর বিভিন্ন স্টেশনে টিকিট কেটে বাহাদুরাবাদ দিয়ে ঘোরা পথে কলকাতায় পৌছেছিলাম। তবে বাহাদুরাবাদ দিয়েই সুনির্দিষ্ট পথে ঘুরে যাবার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ট্রেন ছাড়বে একেবারে শেষ রাত্রে। ততক্ষণ স্টেশনে বসেই সময় কাটালাম। যতদূর মনে পড়ে ভোর

চারটে বা সাড়ে-চারটের সময় আমাদের নির্দিষ্ট ট্রেনটি ছাড়লো। বেলা একটার সময় বাহাদুরাবাদ ঘাটে এসে পৌছলাম।

বাহাদুরাবাদ থেকে ফেরী-স্টীমারে ওপারে ফুলছড়ি যাওয়ার পথে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে আমি ও এরাদুল্লা সাহেব ওপরের ডেকে ছিলাম। নদী পার হতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে। হঠাৎ শুনতে পেলাম আমাদের ব্যাপার নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে খুব উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলছে—ফেণীর গুলীচালনার নাটকীয় বর্ণনা। আততায়ীরা বোমা ফাটাল, গুলী চালাল—চতুর্দিক অন্ধকার করে উধাও হয়ে গেল! আরও বেশি উদ্দীপনাবশে আর একজন বললেন—পাঁচ-সাতজনকে বিপ্লবীরা গুলী করে মেরে ফেলেছে! গুর্খাপল্টন তাদের পিছু ধাওয়া করেও কাউকেই ধরতে পারে নি। নোয়াখালী জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট আততায়ীদের প্রত্যেককে জীবিত বা মৃত ধরবার জন্য এক হাজার টাকা করে পুরস্কার দেবেন বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আর একজন জানালেন, চট্টগ্রামের জেলা-শাসক—অনন্ত সিং, লোকনাথ বল ও অন্যান্যদের গ্রেফ্‌তার করতে সাহায্য করলে প্রত্যেকের জন্য পাচ হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আলোচনা শুনতে খুব মজা লাগছিল। আমারই সামনে আমাকে নিয়ে কথা—আর আমি মুখ বুজে সব শুনছি! এই তো বাবা তোমাদের সামনেই আমি বসে আছি—আত্মরক্ষার জন্য আমার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই। এমন সুযোগ তোমরা আর পাবে না—ধরিয়ে দিলেই পাঁচটি হাজার টাকা পুরস্কার!

দেশের লোক এত অকৃতজ্ঞ নয়। সেদিনকার পাঁচ হাজার টাকার মূল্য যদিও কম নয়, তবু আমার ধারণা টাকাই সকলের কাছে সব সময়ে বড় নয়। আমার পরিচয় পেলেই যে লোকে আমাকে তখনই ধরিয়ে দিত, সেটা আমি বিশ্বাস করি না—অন্তত বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ১৯২৪ সালে ভাটিয়ারীতে সেই বৃদ্ধ নিজের জীবন তুচ্ছ করেও আমাকে কেন আশ্রয় দিয়েছিলেন? নাগারখানা পাহাড়ের পুলিস বেষ্টনীর ছিদ্রপথ দিয়ে সেই রাখাল আমাকে পথের সন্ধান কেন দিয়েছিল? খুনী ও রাজদ্রোহী জেনেও অতি সাধারণ গ্রাম্য লোক সুরেনও নিজ গৃহে আমাকে স্থান দিতে পিছপাও হয় নি! সুরেনের আত্মীয় সেই কামার ভদ্রলোকটি আমার সম্বন্ধে সব জেনেশুনে—আমাকে আশ্রয় দিয়ে বিপদের ঝুঁকি নেওয়া থেকেই কেবল সুরেনকে নিরস্ত করতে চেয়েছেন! এঁদের প্রত্যেকেই ইচ্ছা করলে আমাকে অনায়াসেই পুলিসের হাতে সমর্পণ করতে পারতেন। তাই আমার পরিচয় জানলেই সকলে আমাকে

ধরিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে ও দেশদ্রোহী নাম নেবে, তা' আমি ভাবি নি—তবু আমাদের সাবধান হতেই হয়। কারণ, বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কাজের দায়িত্ববোধ কতকগুলি নিয়ম পালন করতে আমাদের বাধ্য করে।

বিকেল তিনটে-চারটের সময় ফুলছড়ি থেকে ট্রেন ছাড়লো। সারা রাত ট্রেনে কাটল। শেষ রাতে, প্রায় চারটার সময়, শিয়ালদহ স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। বড় বড় স্টেশনে সাদা পোশাকে পুলিস-ডিউটি সব সময়েই থাকে। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর পুলিসী তৎপরতা সাধারণভাবে প্রচুর বেড়েছে এবং তুলনামূলকভাবে স্টেশনে ডিউটি দেওয়ার জন্য যে বিচক্ষণ পুলিস-কর্মচারীরা নিযুক্ত হয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। আমি ও এরাতুল্লা সাহেব অনেক পরামর্শ করলাম—আগের কোন স্টেশনে নেমে পড়লে ভাল হবে, নাকি সোজা শিয়ালদহ স্টেশনেই নামা উচিত? আগের কোন স্টেশনে নেমে পড়ার চালাকি পুলিসও জানে। পুলিসের নজর এড়াবার জন্য অনেক সময় গন্তব্য স্থানের আগেই বিপ্লবীরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ার রীতি অনুসরণ করেন। তাই ভাবলাম, যেখানে পুলিস যত বেশি কড়া সেখানে তাদের complecence (অলস আত্মতৃপ্তির ভাব) তত বেশি থাকাই সম্ভব। No risk no gain! তাই বলে অসাবধান হলেও চলবে না। অসাবধান না হওয়ার অর্থ আবার false sense of security—ভেবে ভেবে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। অনেক ক্ষেত্রে তাতে ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা থাকে। আবার false sense of security না থাকার শ্লোগান তুলে নিজেদের looseness (ঢিলেমিকে) প্রশ্রয় দেবার মনোবৃত্তিকে প্রথম থেকেই শাসন না করলে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করার স্বপ্ন কখনও সফলতায় রূপায়িত করা সম্ভব নয়। তাই সাহসের সঙ্গে, অথচ সাবধানতার ত্রুটি না রেখে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই উচিত।

আমি ও এরাতুল্লা সাহেব শিয়ালদহ স্টেশনেই নামলাম। দু'জন মুসলমান ভিড়ের মধ্যে মিশে স্টেশন পার হয়ে এল। ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের পুলিস হিন্দু যুবকদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে করলে তবেই তো তাদের গ্রেফ্‌তার করবে! মুসলমান সেজে কেউ আসছে মনে করে আন্দাজে কেবল যদি মুসলমান খুঁজে বেড়াতে হয়, তবে হিন্দু যুবকদের যে অবাধগতি! দলের ভিতরের খবর পেলেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্যে ওয়াচ করার জন্য পুলিস নিযুক্ত হয়। তা'ছাড়া পুলিস কি করে জানবে যে, আমাকে সাহায্য করছেন মৌলভী মক্লেশ্বর রহমান, মৌলভী এরাতুল্লা সাহেব! কি করে জানবে

মৌলভী এরাদুল্লা সাহেবের সঙ্গেই অনন্ত সিং মুসলমান সেজে আসছে? তাই আমার অভিজ্ঞতা বলে—inner treachery না হলে দূর থেকে মনস্তত্ত্ব বুঝে চল্লিশকোটি লোকের মধ্যে পুলিস বিপ্লবীদের হাতেনাতে ধরে ফেলেছে, তা' কখনই হতে পারে না। পুলিসের সম্বন্ধে এইরকম ভুল ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, বিশ্বাসঘাতকতাকে চাপা দেওয়া। এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারটি যদি করে রাখা না হয় যে, পুলিশ সবই বুঝে ফেলে, অথবা বেচারা দানেশ মিঞা প্রমুখকে scape goat করা না হয়, তবে সরল বা অনভিজ্ঞ সভ্যদের কাছে diversion সৃষ্টি করা যাবে কি করে?

তাই concrete case-টি বিবেচনা করে কোন false sense of security -র ওপর অতিরিক্ত জোর না দিয়ে আমি সোজা পথে শিয়ালদহ স্টেশনে নামা অন্যায় মনে করি নি।

আমরা একটি ট্যাক্সি নিয়ে ক্যাপ্টেন দত্তের বাড়ির একটু দূরে নেমে পড়লাম। এই বাড়ি এরাদুল্লা সাহেবের সুপরিচিত। সঞ্জীব দত্ত কামিনীবাবুর তৃতীয় পুত্র। সে মেডিকেল কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তো। আমি সঞ্জীবকে আগে কখনও দেখি নি—সেও আমাকে চিনতো না। এরাদুল্লা সাহেবের মারফত কাকাবাবু চিঠি পাঠিয়েছেন এবং মৌলভী সাহেবের কাছ থেকে সঞ্জীবকে সব শুনে নিতে লিখেছেন। সঞ্জীব আমার পরিচয় পেল। তার ওপর নির্দেশ ছিল নরেন কাকাকে সে আমার কথা সব বলবে ও আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। সঞ্জীব সব ভারই নিল।

নরেন কাকা অবিবাহিত। দাদার ছেলেরাই তাঁর চোখের মণি—পুত্রতুল্য স্নেহের পাত্র! তিনি শ্যামবাজারের বাড়িতে থাকতেন না—ধর্মতলায় Bengal Immunity-র অফিসেই থাকতেন। সঞ্জীব সন্ধ্যার সময় নরেন কাকার সঙ্গে দেখা করে তাঁর নির্দেশ মতই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলো। এরাদুল্লা সাহেব তার পরদিন কি সেইদিনই ফিরে গেলেন।

অসময়ের বন্ধু—কত বিপদ মাথায় নিয়ে আমার সঙ্গে এত দূর এসেছেন! তা' ছাড়া, কে জানতো, সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ে স্টীমারটি যদি ডুবেই যেত! সে দিনও মৌলভী সাহেবের চোখে মুখে এতটুকুও বিরক্তি বা অভিযোগের চিহ্ন দেখি নি! যদি তাঁর মনে অন্য কোন ভাবের লেশমাত্রও থাকত, তবে সেই ভীষণ ঝড়ের মুখে তা ধরা পড়ে যেতই! খাঁটি লোক এরাদুল্লা সাহেব। জীবনে তাঁর কথা ভোলা যাবে না! তাঁদের মত লোকের এত সমবেদনা ও সাহায্য পেয়েছি বলেই হয়ত ভবিষ্যৎ আমাকে ডাক দিয়ে বলে—'ভুল না তোমার

অতীতকে !' এরাতুল্লা সাহেবের সঙ্গে আমার এই ক'টি দিন সুখে দুঃখে ও বিপদে যেমনভাবে কেটেছে, সেই স্মৃতি আমার বাকি জীবনের মূল্যবান সঞ্চয় হয়ে থাকবে !

আমি শ্যামবাজারের বাড়িতেই আছি। সেইদিন রাত্রে সঞ্জীব নরেন কাকার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। পরের দিন রাত আটটার সময় তিনি ধর্মতলার অফিসে, তাঁর শোবার ঘরে, আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে পাঠিয়েছেন। পরের দিন পূর্বনির্ধারিত সময়ে আমি নরেন কাকার কাছে গেলাম ! এতদিন নরেন কাকার সঙ্গে নামেই পরিচয় ছিল—আজই আমাদের দু'জনের সাক্ষাৎ পরিচয় হ'ল। তিনি সস্নেহে আমাকে তাঁর সামনের আসনে বসতে বললেন। তিনি নানা সূত্রে আমাদের সংবাদ রাখেন। কাজেই গল্প শোনার চাইতে তাঁর কাছে বড় প্রশ্ন—আশু কর্তব্য—কি করে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায় ! মনে হ'ল তিনি ভাবছিলেন Front Line থেকে যারা ফিরে এসেছে তারা আত্মগোপন করে থাকুক—তাদের বাঁচতে হবে ; আর ভাবীকালের যুবকেরা তাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করুক। যদিও সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত তাঁর কথার মাধ্যমে পাচ্ছিলাম, তবু সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার কোন তর্ক করার ইচ্ছে ছিল না। কারণ, তাঁর সেইরূপ অভিমতের পরিণতি নির্ভর করে আমি যদি সেইরূপ পথ বেছে নেওয়াই শ্রেয় মনে করি। কাকাবাবু যদি একবার বুঝতেন আমার মুক্ত-কৃপাণ আমি কটিবদ্ধ করব না—যতদিন স্বাধীন না হই বা স্বাধীনতার যুদ্ধে শহীদ না হই—তবে কি তিনি উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে আমার মরণ সংকল্পকে বিসর্জন দিতে বলতেন ? তবে কি বলতেন—'তোমার এখন বাঁচতে হবে, আত্মগোপন করে থাকতে হবে।'

স্নেহান্ধ পিতামাতা বা তত্তুল্য আত্মীয়েরা হয়ত কখনও সেইরূপ প্রস্তাব করতে পারেন। কিন্তু নরেন কাকাকে যেরূপ practical বলে আমার মনে হয়েছিল তাতে বুঝেছিলাম তিনি আমাকে কখনই মায়ের স্নেহ বা স্ত্রীর অঞ্চলে আবদ্ধ থাকতে পরামর্শ দিতেন না। বাংলা দেশের বরেণ্য বিপ্লবী নেতাদের অবসরপ্রাপ্ত জীবনযাপনের ইতিহাস বিচার করেই হয়ত ভাবছিলেন—আমি অবসর নিতে চাই—আত্মগোপন করে থাকাই বর্তমানে শ্রেয় মনে করছি। আমি একেবারে চুপ করেই ছিলাম—কোন মতামতই প্রকাশ করি নি। অগত্যা তিনি আমাকে বললেন, "তুমি এক কাজ কর—দু'একদিনের ভিতর office hours-এর মধ্যেই আমার কাছে চাকরির জন্য একটি দরখাস্ত দাও। আবেদনপত্রের নকলটি আমি সঞ্জীবের হাতে তোমাকে পাঠাবো।

তোমার দরখাস্ত পেয়েই আমি তোমাকে officially appointment letter দেব। তুমি চাকরিতে যোগ দেবে। ছোট্ট একটি গবেষণাগারে তোমার কাজ নির্দিষ্ট থাকবে। সেখানে তেমন কেউ যাবে না। তুমি একা বসেই গবেষণা কাজের ভান করবে। তারপর তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় কিভাবে হবে তাও বলব।"

আমি অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনলাম। কতখানি দরদ! কতখানি স্বদেশপ্রেম! কতখানি স্বার্থত্যাগ! কতখানি বিপদ মাথায় তুলে নিতে সাহসী হয়েছেন! আরও ভাল লাগল এই ভেবে যে, আমরা মাস্টারদার নেতৃত্বে সীমিত সফলতা অর্জন করতে পেরেছি বলে এবং আমাদের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার কোন আশঙ্কা নেই স্থির জেনেই নরেন কাকার মত প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিও সেইরূপ সাহস করতে পারেন।

সেদিন আমি বুঝেছিলাম বাংলার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির গৃহও 'দুর্গে' পরিণত করতে পারি, যদি তাঁদের মনে একবার প্রত্যয় জন্মান সম্ভব হয় যে, তাঁদের নিরাপত্তা কখনও বিঘ্নিত হবে না এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কোন ভয় নেই।

আমাদের সেদিনকার বৈঠক শেষ হ'ল। নরেন কাকাকে আমার কোন অভিমত জানালাম না, তিনিও আমার মতামত শুনতে চান নি। তিনি বুঝেছিলেন আপাতত প্রথম কাজ আমার নিরাপত্তা-বিধান। তাই তাঁর সুচিন্তিত প্ল্যান আমাকে দিলেন। আমি শ্যামবাজারের বাড়িতে ফিরে এলাম।

আত্মগোপনের জন্য তাঁর প্ল্যান তুলনাহীন। Bengal Immunity-র মালিক স্বয়ং সব ব্যবস্থা করছেন। এত সুযোগ কোথায় পাওয়া যাবে? কিন্তু তখন আমার মনে শুধুমাত্র আত্মগোপনের পরিকল্পনা বা কর্মসূচীর স্থান ছিল না। আমাদের বৈপ্লবিক দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য প্রায় এক পক্ষকাল নানা দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে পৌছেছি। ফেণী shooting-এর পর এই হল দ্বিতীয় round সফলতা—মাখন, গণেশ ও আনন্দ; কেউ তখনও ধরা পড়েনি, কাজেই অনুমান করা কঠিন নয় যে, তারাও ইতিমধ্যে কলকাতায় এসেছে বা শীঘ্রই এসে পৌছবে। তাই আমার তৃতীয় round কর্মসূচী—যে কোন উপায়ে তাদের খুঁজে বার করা।

নরেন কাকার কাছ থেকে চলে আসার পরদিন আমি সঞ্জীবের হাত-ঘড়িটি ও সাইকেলটি চেয়ে নিলাম। সন্ধ্যার সময় সাইকেলে চেপে বেরলাম।

স্মাগ্‌লারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সময়ে আমি খুব সাইকেল ব্যবহার করতাম। কাজেই সাইকেল চালাতে আমি বেশ অভ্যস্ত। পকেটে তেমন টাকার জোর নেই যে ট্যাক্সি চড়বো। ট্রামে-বাসে ঘোরা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। কারণ, যে কোন মুহূর্তে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে; আর শত্রুদের সঙ্গেও যে হঠাৎ মোলাকাত হয়ে যাবে না, তাও কেউ বলতে পারে না। তাই সাইকেল সম্বল করেই বেরিয়ে পড়লাম।

মনস্থ করলাম অনুকূলদার সঙ্গে দেখা করব। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের কয়েক মাস আগে যখন জোর গুজব রটে গেল আমি অনুকূলদার মারফত আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করছি, তখন পুলিস-কর্তৃপক্ষ ছ'জন watcher-কে সব সময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবার নির্দেশ দিয়ে আমাদের চিনিয়ে দেয়—এবং আমাদের সামনেই watcher-দের duty বুঝিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। ফেণীতে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। জালালাবাদ যুদ্ধের পর সবাই আত্মগোপন করে আছে। এমতাবস্থায় আমরা একে একে এসে হয়ত কলকাতায় একত্র হব, পুলিস সেই রকমই অনুমান করেছে। এই ইঙ্গিতও তারা ফেণীর ঘটনা থেকেই পেয়েছে। সেই জন্য তারা যে বিশেষ করে অনুকূলদার উপরেই সবচাইতে বেশি নজর রাখবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ ঘটার পরও পুলিস অনুকূলদাকে গ্রেফ্‌তার করে নি। ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছিল—আমরা অনুকূলদার কাছে নিশ্চয়ই আসব এবং সেই সুযোগে আমাদের বন্দী করবে। তাদের সেইরূপ ফাঁদ সত্যই নির্ভুল ছিল—বাস্তবক্ষেত্রে আমরা সেই সব ফাঁদে পা দিয়েছি। আমাদের সঙ্গে যাদেরই পুরনো পরিচয় বা সম্পর্ক ছিল, পুলিস তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠও হয়েছে। পুলিসের এইরূপ modus operandi সম্বন্ধে আমরা পরে খুব ভালভাবেই জেনেছি।

অনুকূলদার বাড়ি এই কারণেই সব চাইতে বেশি vulnarable ও ভয়ের স্থান বলেই আমার বাস্তব ধারণা ছিল। কিন্তু তবু risk না নিয়ে আমার কোন উপায় ছিল না। মাখন-আনন্দরাও অনুকূলদাকে চিনতো। তারা তেমন ঘনিষ্ঠভাবে আর কাউকে জানতো না যাঁর সাহায্যে আমাদের বা আমার খোঁজ পাবে। আমার ধারণা ছিল, গণেশও অনুকূলদার কাছেই আমার খবর নেবে। যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করে অনুকূলদার বাড়িতে গেলাম। পুলিস watcher-রা থাকলেই যে তাদের ফাঁকি দেওয়া যায় না, তা' নয়। সেদিন আমি তাদের ফাঁকি দিলাম। অনুকূলদার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগোপাল মুখার্জী

সেই সময় বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে দেখে গোপালবাবু খুব খুশি হয়েছিলেন। বয়স কম হলেও তাঁর কাকার সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে গোপালবাবু তা' জানতেন। গোপালবাবু জানালেন, তাঁর কাকা বলে দিয়েছেন আমরা কেউ এলে যেন তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করি। পরে আবার আসব বলে আমি ফিরে এলাম।

তারপর আমাদের পুরানো বন্ধু স্বকুমার বিশ্বাসের restaurant-এ গেলাম। স্বকুমার আমাদের সমবয়সী। দেখা হওয়াতে সে খুব আনন্দ প্রকাশ করলো। বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে বহু বছর তার কোন যোগাযোগ ছিল না। চট্টগ্রামের নন্দন-কাননে—আমাদের সংলগ্ন পাড়ায় তারা থাকতো এবং তাদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক ছিল। প্রেমানন্দ তারই মামা। এইরূপ অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে তার কাছ থেকে কিছু সাহায্য নেব আশা করেই তার কাছে যাই। স্বকুমারকে সঙ্গে নিয়ে জুলুদার বাড়ি গেলাম—তখন রাত প্রায় আটটা। আমি একটু দূরে দাঁড়ালাম—স্বকুমার জুলুদাকে ডেকে নিয়ে এল। জুলুদা আমাকে দেখে খুব উৎসাহিত বোধ করছেন বলেই মনে হ'ল। কিন্তু কথাবার্তা তখন বিশেষ কিছু হ'ল না—পাছে কেউ দেখে ফেলে, সেইজন্য চারিদিকে তাঁর সতর্ক সচকিত দৃষ্টি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিদায় নেওয়া সমীচীন মনে করলেন তিনি। ঠিক হ'ল পরের দিন সকালে স্বকুমারের সঙ্গে আবার তাঁর কাছে যাব—স্বকুমার তাঁকে ডেকে আনবে তারপর যাহয় একটা কিছু করবেন। আমরা সেদিন রাতের মত বিদায় নিলাম।

স্বকুমারকে একটু কাজে যাচ্ছি ও ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তার বাড়িতে ফিরে আসছি বলে, আমি আবার অনুকূলদার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অনুকূলদাকে এবারে বাড়িতেই পেলাম—নমস্কার করে তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি প্রথম প্রশ্ন করলেন—'বুড়োর ব্যাঙ্কটা মেরে দিলি না কেন?' Urban Co-operative Bank-এর কথাই তিনি বলছিলেন। কংগ্রেসে আমাদের বিরুদ্ধ দলের নেতা, মহিমচন্দ্র দাস মহাশয়, এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাই অনুকূলদার এই উক্তি। কিন্তু অনুকূলদার এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত আক্রোশের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে আমরা ভুল করব। বাংলার বিপ্লবীদের প্রচুর টাকার প্রয়োজন। বাংলাদেশের বিপ্লবীদের যদি কেউ সত্যিই কয়েক কোটি টাকা জোগাতে পারত, তবে সহস্র গুণ বেশি বৈপ্লবিক কর্মস্থচী কাজে পরিণত হ'ত। টাকা থাকলে অস্ত্রের অভাব থাকত না—shelter, custody সবই হ'ত। তাই নিরবচ্ছিন্নভাবে বৈপ্লবিক

প্রোগ্রাম চালিয়ে যেতে হলে টাকার উৎস থাকা চাই। ছুটকো-ছাটকা ডাকাতি করার পর পুলিসের আক্রমণ সামাল দিতেই সব শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। তাই অনুকূলদার জিজ্ঞাসা—এত সুযোগ পেয়েও বাংলার বিপ্লবীদের অর্থ-সমস্যা দূর করার প্রোগ্রাম নিলাম না কেন?

অনুকূলদার সেই জিজ্ঞাসার যৌক্তিকতা ছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষেও এই বিষয়ে যুক্তি ছিল, যার জন্য কোন ব্যাঙ্ক লুট করার ছুটকো প্ল্যান আমরা নিতে পারি নি। যদি সামরিক বিপ্লবী সরকার শহরের বুকে স্থাপিত হ'ত, তবে সব ব্যাঙ্কই আমরা নিয়ন্ত্রিত করতাম। কিন্তু টাকা লুঠ করে নিলে যুব-বিদ্রোহের character-টিই দেশবাসীর কাছে অন্য রূপ নিত। আমরা যুব-বিদ্রোহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে চেয়েছিলাম।

তা'ছাড়া দু' বছরের "মৃত্যু-সঙ্কল্প প্ল্যানের" মধ্যে কয়েক কোটি টাকা মজুত করে বাংলার বিপ্লবী দলের financial problem দূর করার একটি ব্যাপক কার্যকরী পরিকল্পনা নেওয়া বাস্তবে সম্ভব ছিল না। কয়েক কোটি টাকার জিম্মা কে বা কারা নেবে? অত টাকা কোথায় জমা রাখা হবে? কাদের বা কোন্ কোন্ সংগঠনকে টাকা দেওয়া হবে? তা'রা কা'রা—যারা নাকি সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগঠনের জন্য ঠিক ঠিক টাকা ব্যয় করবে? ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রশ্ন এই পরিকল্পনার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত বলেই ব্যাঙ্ক লুঠ করার কর্মসূচী বর্জন করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। কেবল টাকা লুঠ করলেই প্রোগ্রাম শেষ হয় না—কি করে সেই টাকার গুরুদায়িত্ব বহন করে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলা যায় তার সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-প্রণালীও পূর্বাহ্নে নির্ভুলভাবে ঠিক করা না হলে সেইরূপ ডাকাতির প্রোগ্রাম নেওয়ার নৈতিক অধিকার কারও না কোন সংগঠনেরই থাকে না। আমাদের যুব-বিদ্রোহের 'মৃত্যুপণ প্রোগ্রামের' সঙ্গে এইরূপ কোন কর্মসূচী খাপ খায় না বলেই টাকা লুঠ করার কোন চেষ্টাই আমাদের ছিল না।

অনুকূলদার কাছে জানতে পারলাম—মাখন ও আনন্দ কলকাতায় এসে গেছে এবং ভাল আছে। গণেশও এসেছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। তিনি জানালেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করবেন এবং আমি যেন পরে এসে তাঁর কাছ থেকে সব খবর জেনে যাই।

অনুকূলদার সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপন করার পর আমি আবার সুকুমারের কাছে ফিরে গেলাম। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা হলের ওপরের তলায় সুকুমারের বাবা সপরিবারে থাকতেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে

আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা আগেই বলেছি। তাই কারো সঙ্গে পাছে দেখা হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় আমি স্থকুমারকে নিচের উপাসনা ঘরে রাত্রে আমার সঙ্গে ঘুমোতে বললাম। আমরা রেস্তোর াঁয় মাংস-পরোটা খেয়ে উপাসনা ঘরে দু'টি বেঞ্চে দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম।

আমার সতর্ক থাকার অভ্যাসবশতঃ আমি স্থকুমারের ধুতির এক প্রান্ত আমার হাতে বেঁধে রেখেছি। সে যদি টের পায় তবে আমাকে কি ভাববে? হয়ত অপমানিত বোধ করবে—রাগ করবে—অন্তত মনক্ষুণ্ণ তো নিশ্চয়ই হবে! কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার মতে কোন আপোষই চলে না—স্থকুমার যদি রাগও করে তবু আমায় সাবধান থাকতেই হবে।

সাক্ষাৎ হওয়ার পর স্থকুমারই কথায় কথায় বলেছিল—স্পেশাল স্থপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট স্বর্গত রায় নলিনী মজুমদার বাহাদুর মহাশয় তাদের কিরূপ আত্মীয় হন। তিনি স্থকুমারকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছেন, আমাদের কোন খোঁজ পেলেই তাঁকে যেন খবর দেয়—এতে যেন কোন ভুল না হয়। এই কথাটি সব সময় বারে বারে আমার মনে হচ্ছিল। বুঝেছিলাম স্বয়ং নলিনীবাবু আমাদের ধরতে চেষ্টা করছেন এবং সেই জন্য স্থকুমারকে সম্ভাব্য source মনে করে টোপ্ ফেলে রেখেছেন। একটি ভাত টিপলে হাঁড়ির সব ভাতের অবস্থা বোঝা যায়—এই তথ্য থেকে আমি বাংলার আই, বি, ডিপার্টমেণ্টের তখনকার বিশেষ technique বুঝতে চেষ্টা করেছি। কেবল স্থকুমার নয়—আমাদের পূর্ব পরিচয়স্থত্রে পুলিসের খাতায় যাদেরই নাম আছে—তাদের সবাইকেই তারা এইরূপ অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিল, অবশ্য যাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার প্রস্তাব করার মত সম্পর্ক ছিল।

স্থকুমার সরল মনে আমাকে যখন সব বলেই দিল—তারপরেও সারারাত তার ধুতির খুঁট ধরে রাখা কি আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি নয়? মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমার কারবার! ভুল হয়ত আমি অনেক করেছি, কিন্তু মানুষের মানসিক বৈচিত্র্যের নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে—আজ যে সরল, নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ সেই হয়ত 'কাল', না 'কাল নয়,' কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই একেবারে সম্পূর্ণরূপে বদলে যেতে পারে! তবু সেইরূপ প্রকৃতির লোকের সঙ্গেও আমাদের বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করতে হয়েছে—কেবল লক্ষ্য রেখেছি—thus far and no farther! অর্থাৎ, লক্ষ্য করার কথা সেই Zero-hour-টি, যার পরে তার সঙ্গে আর conspiracy করা চলে না। যদি দলের কেউ পুলিসের এজেন্ট হয় তবে exposed না হয়েই তাকে পুলিসকে সাহায্য করতে হবে।

তাই একজন দলদ্রোহীর কাছ থেকে খবরাখবর পেয়ে—সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিস তক্ষুণি action নিতে পারে না; তাহলে তাদের এজেন্টরা exposed হয়ে পড়ে। এজেন্টরা যদি আতঙ্কে থাকে, এই বুঝি exposed হয়ে গেলাম—তবে সরকার আর agents পাবে না। এই কারণে আমার conspiracy করার অভিধানে কাউকে কখনও চিরন্তনভাবে বিশ্বাস করার কথা নেই, আবার পুলিসের চর জেনেও তার সঙ্গে সব রকম ভয়াবহ কাজ করেছি শুধুমাত্র সেই পর্যন্ত, যখন betray করলেই সে exposed হচ্ছে। Diversion সৃষ্টি করে ধরবার সুযোগ কোন এজেন্টকেই দিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তাই conspiracy-র সফলতার জন্য সেই zero-hour-টি বেছে নেওয়া সার্থক conspirator-দের অপরিহার্য গুণ। আজ আমার এই কথাগুলি থেকে কেবল তারাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে, তাদের আমি নির্ভুলভাবে চিনতে পেরেছিলাম—এবং zero-hour-টি ঠিক বেছে নিয়ে তাদের অপচেষ্টাকে নির্মূল করেছি—diversion সৃষ্টি করে বাঁচবার সুযোগ দিই নি।

সুকুমারের সঙ্গে আজ রাত্রে আমি এই বাড়িতে থাকবো, একথা জানতাম মাত্র আমরা তিনজন—আমি, জুলুদা ও সুকুমার। 'অগ্নিগর্ভ-চট্টগ্রামে' এক স্থানে লিখেছি—মাত্র দু'বছর আগে একজন Retired Police Officer বলেছেন, স্বয়ং Sir Charles Tagert সেই দিনটিতে আমাকে 'dead or alive' ধরবার নির্দেশ দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের চারপাশের রাস্তা পাহারা দিতে সাদা পোশাকে তাঁদের মোতায়েন করেছিলেন। সাদা পোশাকে কেন?—লাল-পল্টন যদি সোজাসুজি বাড়ি ঘেরাও করে তবে যে দলের গোয়েন্দা exposed হয়ে পড়বে! তাই diversion প্রয়োজন—সাদা পোশাকে পুলিস আমাকে দেখে ফেলল আর অমনি টপ্ করে ধরে ফেলল। বাঃ! টেগার্ট সাহেবের চমৎকার ফন্দি—অনন্ত সিং কিছুতেই তাহলে বুঝতে পারতো না তাঁদের agent-কে—সেই খবর পুলিসকে কে দিয়েছিল—আমরা তিনজনে—না, হয় দু'জনে—নয়ত একজনে! পুলিসের কাছে আমি শিখেছি—কোন তথ্য যদি তাঁরা দু'জনের কাছ থেকে জানতে পারেন, তবে গুরুত্ব বুঝে action নেন; যেখানে কেবলমাত্র একজন agent-এর কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যায় সেখানে তার exposed হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলে যতদিন বা যতক্ষণ অন্য কোন দ্বিতীয় source থেকে সেই খবর পাওয়া না যায়, ততদিন বা ততক্ষণ পুলিস সাধ্যমত সেই action স্থগিত রাখার চেষ্টা করে। গুরুত্ব বুঝে অবশ্য এর ব্যতিক্রমও তাঁরা করে থাকেন।

অগ্নিযুগের যুব-বিদ্রোহের অধ্যায়টি লিখতে বসে এই সমস্ত অবান্তর প্রসঙ্গে বইয়ের পৃষ্ঠা বাড়িয়ে পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো কেন?—এইরূপ প্রতিবাদের গুঞ্জন বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোথা হতে জন্ম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করার ব্যর্থ চেষ্টা করবে তার সম্যক উপলব্ধি আমার আছে। C. I. A. সংগঠন ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপক intelligence ডিপার্টমেণ্ট এবং তাদের এজেণ্টরাই সব চাইতে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন এবং তাঁরাই প্রচার করবেন অগ্নিযুগের 'যুব-বিদ্রোহের' পৃষ্ঠায় এই সমস্ত অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্যে অনন্ত সিংহের নিজস্ব প্রচারমূলক "অভিসন্ধির" উদ্দেশ্য যতখানি প্রখর—ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ ততখানি ম্লান। সত্যই এই মত যাঁরা পোষণ করবেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে এই চৌষট্টি বৎসর বয়সে আমি লিখতে বসি নি। আমার লেখার মধ্যে এই বিশেষ দিকের অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ 'যুব-বিদ্রোহের' একটি বিশেষ অপরিহার্য ঐতিহাসিক অঙ্গ। তাই কালির পরিবর্তে বুকের রক্ত দিয়েই আমার এই ইতিহাস রচনার প্রয়াস! বিশেষ করে তাদের জন্যই এই লেখা, যাঁরা গল্পের বহির্দর্শনের চাইতে অন্তর্নিহিত মূল ঐতিহাসিক তথ্যের অপরিহার্য বৈপ্লবিক দিক্‌গুলিকে উপেক্ষা করে যাবেন না। বইটিকে সর্বজন সমাদৃত করবার উদ্দেশ্যে আপোষের মনোভাব নিয়ে লেখা আর নিজেকে প্রতারণা করা আমার কাছে একই কথা। তাই বইয়ের commercial value বাড়াবার চাইতেও Revolutionary intrinsik value-র উপযুক্ত মূল্য দিতে সামান্য গণ্ডির মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা আমার লেখাকে যাচাই করবেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

সকালবেলা জুলুদার সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত সময়ে ও স্থানে দেখা হ'ল। জুলুদা সঞ্জীবের ঘড়ি ও সাইকেলটি ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বললেন সুকুমারকে। আমাকে বলে দিলেন আমি যেন আর সেখানে না যাই। আমি রিস্টওয়াচ ও সাইকেলটি সুকুমারের জিম্মায় ছেড়ে দিলাম। তারপর আমাকে নিয়ে জুলুদা একদিকে আর সুকুমার সাইকেল চেপে অন্যদিকে চলে গেল। আজও আমার পরিতাপ ও অনুশোচনার সীমা নেই যখনই মনে হয়—কেন আমি নিজে গিয়ে সঞ্জীবকে সাইকেল ও ঘড়ি ফিরিয়ে দিয়ে এলাম না! সঞ্জীবের কথা যথাস্থানে বলা হবে। সে এখন কোথায়—এই বিরাট জিজ্ঞাসার যে উত্তর চাই!

জুলুদা আমাকে নিয়ে একটি বাড়ির নিচের তলায় ছোট্ট একটি ঘরে বসিয়ে রেখে চলে গেলেন। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে এসে আমাকে নিয়ে আর একটি

বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সেখানে আমি পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে দেখতে পাই। সেও বোধহয় সেখানেই আত্মগোপন করেছিল। তার সহোদর অর্ধেন্দু দস্তিদার জালালাবাদ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। আর এক ভাই সুখেন্দু দস্তিদার দ্বীপান্তর দণ্ড নিয়ে আমাদের সঙ্গে কালাপানি ঘুরে এসে বর্তমানে পাকিস্তানে আছে। পূর্ণেন্দুর অন্যান্য সব ক'টি ভাই-ই সময়োপযোগী রাজনীতিতে এখনও সক্রিয় আছে বলে শুনেছি। Morning shows the Day! ১৯২৮-১৯৩০ সালেই বুঝেছিলাম তাদের সবার revolutionary potentiality-র পরিধি কতখানি! পূর্ণেন্দুকে কাছে পেয়ে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। আবার হয়ত আসবেন বলে জুলুদা ১৫।২০ মিনিট পরে চলে গেলেন।

বেলা প্রায় একটা-দু'টোর সময় মনোরঞ্জন রায়—(ইনি বর্তমানে অনেকের কাছে কেবলাদা নামে সুপরিচিত) এখন BPTUC-র সেক্রেটারী—সেই বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ হওয়াতে আমার আরো ভালো লাগলো। আমাদের চট্টগ্রাম দলের যাঁরা কলকাতায় ছিলেন, তাঁরা কে কি ভাবছেন ও কিরূপ উৎসাহিত হয়েছেন তার বিবরণ পেলাম।

সন্ধ্যা প্রায় আটটার সময় জুলুদা আবার এলেন। খুব ড্রামাটিকভাবে বললেন—"চট্ করে চলে এসো—একটুও দেরি করা চলবে না।" সেই বাড়ির বৃদ্ধা মাসীমা রা'ত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন—খাওয়া আর হ'ল না—জুলুদার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

ভূপেনদা (দত্ত) রাস্তায় গাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন—আমরা দু'জনে গাড়িতে উঠে বসলাম। ভূপেনদা সারাক্ষণ আমার হাত দৃঢ়ভাবে ধরে, মনে হ'ল যেন আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। আমরা তিনজন একটি বাড়িতে ভূপেনদার shelter-এ গেলাম। গণেশও সেখানে ছিল।

২২শে এপ্রিল রাত্রে ফেণীতে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি—আজ মে মাসের ছ'সাত তারিখ হবে—মাঝখানে মাত্র এই কয়টি দিনের ব্যবধান—তবু মনে হচ্ছিল যেন বহু বছর পরে গণেশের সঙ্গে দেখা হ'ল! কি দুর্যোগের মধ্যে—কতখানি উৎকণ্ঠা ও বিপদের মধ্যে আমাদের দিন কেটেছে! আমরা বেঁচে থাকবো, আবার অক্ষত দেহে পরস্পর মিলিত হব—এ কথা কখনও ভাবি নি! এ যেন এক স্বপ্নজগৎ বলে মনে হচ্ছিল! আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা একের পর এক মনের মধ্যে সাজিয়ে দেখলাম—না স্বপ্ন নয়, সত্যই গণেশ আমার সামনে দাঁড়িয়ে! মুহূর্তে ভবিষ্যতের চিন্তায় মন আবিষ্ট হ'ল।

ভূপেনদা ও জুলুদা তখুনি চলে যাবেন—কথাবার্তা সামান্যই হ'ল। মাখন

ও আনন্দ কলকাতায় এসেছে খবর দিলাম। ভূপেনদা জানালেন দু'এক দিনের মধ্যে আমাদের থাকার ভালো বন্দোবস্ত করে তাদেরও নিয়ে আসবেন। আপাতত হাল্কা কথাই হ'ল! ভূপেনদা কথায় কথায় ফেণী থেকে আমাদের আশ্চর্যভাবে পালাবার কথা তুললেন। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন—"first fire open করল কে?" ইতিমধ্যে মাখন ও আনন্দের কাছে গণেশ সব শুনেছে, তাই সে বলল—"অনন্ত।"

ভূপেনদা উৎসাহভরে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পাঠকবর্গের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, বড়াই করার উদ্দেশ্যেই আমার এই প্রসঙ্গ তোলা। চৌষট্টি বৎসর বয়সেও বড়াই করার সুযোগ পেলে হয়ত কেউই তা ছাড়ে না। তাই আমিও বা ব্যতিক্রম হব কেন? সেইজন্য কেউ যদি আমাকে এইরূপ ভাবেন তবে সেটি তাঁর পক্ষে দোষের নয়! আমি নিজের defence-এ কিছু বলবো না। প্রত্যেকেরই নিজ মত গঠন করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমার নিজের ইচ্ছা—first fire open করার অর্থটি জানানো। ভূপেনদা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানতেন তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'কে first fire open করেছে?' আমার জিজ্ঞাসাও তাই—'first fire open করবে কে?' বিপ্লবীর কাছে এই চিরন্তন প্রশ্নের মৃত্যু নেই!

সেই বাড়িতেই গণেশ ও আমার থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। জুলুদা ও ভূপেনদা আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে গেলেন। আমরা কার বাড়িতে এবং কার আশ্রয়ে ছিলাম তা' আজ আর মনে নেই। মনে না থাকার কারণ হচ্ছে, আমরা সেই বাড়িতে বোধহয় দু'একদিনের বেশি ছিলাম না এবং ষড়যন্ত্রমূলক কাজের রীতি অনুযায়ী সেইরূপ জিজ্ঞাসাবাদও নিয়মবহির্ভূত ছিল। আমরা এইটুকুই শুধু জানতাম যে, ভূপেনদার সূত্রেই বাড়িটি আমাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে যোগাড় করা হয়েছে।

সেই রাত্রেই আমি গণেশের কাছে ফেণীর ঘটনার পর থেকে এই পর্যন্ত যে সঙ্কটময় অবস্থা সে অতিক্রম করে এসেছে, তার প্রাথমিক বিবরণ শোনবার কৌতূহল প্রকাশ করলাম। কি করে ফেণীতে সে পুলিসের কবল থেকে মুক্তি পেল, আবার ঘটনাচক্রে, অবাস্তব ঔপন্যাসিক কল্পনাকেও ম্লান করে, কি ভাবে সে মাখন ও আনন্দের সঙ্গে মিলিত হ'ল, আর কেমন করেই বা এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে কোন্ পথে সে কলকাতা এসে পৌছলো এবং এলই যদি তবে সঙ্গে মাখন ও আনন্দই বা থাকল না কেন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে জানবার এত অদম্য আগ্রহ ছিল যে, সব না শোনা পর্যন্ত কিছুতেই

স্থির থাকতে পারছিলাম না। বলা বাহুল্য, আমার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত গণেশকে আগেই বলেছি।

গণেশের মুখে তাদের কলকাতায় আসার পথে বিভিন্ন ছোটখাটো ও অতি সঙ্কটময় ঘটনার বর্ণনা শুনতে শুনতে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল—প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি ধরা পড়ে গেল; কিন্তু তারা আশ্চর্যজনকভাবে একটুর জন্যই বারে বারে বেঁচে গেছে—প্রায় বন্দী হতে হতে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

মাখন ও আনন্দের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, তারা গাছতলায় একটু বসেছে। অমানুষিক পরিশ্রম ও ক্লান্তির শেষে নিশ্চিন্তে কিছুক্ষণ গাছতলায় বসে যে বিশ্রাম নেবে তারও উপায় ছিল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সকাল হবে, বড় রাস্তার ওপর লোক-চলাচল সুরু হবে। ফেণী-স্টেশনের মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে, ট্রাঙ্ক রোড়ের ওপর পুলিস পাহারা দেবে না বা "আততায়ীর" অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকবে না—এইরূপ ভাববার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। কাজেই, ভোরের আগেই বড় রাস্তা বাদ দিয়ে, মাঠের অজানা মেঠো-পথ ধরেই তারা হাঁটতে সুরু করলো।

ভারতীয় গণতন্ত্রীবাহিনীর সৈনিকদের প্রত্যেকেরই একটা বিষয়ে নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে। জালালাবাদ পাহাড়ে প্রধান-বাহিনীর প্রত্যেককে, এবং ফেণী-স্টেশনের সংঘর্ষের পরেও আমাদের প্রত্যেককে কোন-না-কোন সময়ে বুকফাটা নিদারুণ তৃষ্ণার জ্বালায় ছটফট করতে হয়েছে। জালালাবাদে বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য গাছের পাতা বা ঘাস চিবিয়েছে, mobil oil-ও খেয়েছে। ফেণী সংঘর্ষের পর আমিও লতাপাতা আর পথে-ফেলা আধ-খাওয়া আম চিবিয়েছি এবং নর্দমার পচা জলও পান করেছি। গণেশও বলছিল, মাঝে মাঝে এমন সময়ও এসেছে যে, তৃষ্ণায় ঠোঁট, গলা ও বুক একেবারে শুকিয়ে গেছে। এক ফোঁটা জলের অভাবে হাত পা অবশ হয়ে এসেছে, মনে হয়েছে আর বুঝি হাঁটা যাবে না—মাঠেই পড়ে মরতে হবে! তৃষ্ণার জ্বালা যে কি ভীষণ হ'তে পারে তা' বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে ঠিক বোঝা যাবে না। উপন্যাসে ইতিহাসে, যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় জলের বিভ্রাটে ও পিপাসার যন্ত্রণায় সৈন্যদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কথা হয়ত আমরা জানি। তবু বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। একবার থিয়েটার মঞ্চে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁকে সিরাজের জীবনরক্ষার্থে শিহরণ জাগানো করুণ সুরে আর্তনাদ করতে শুনেছিলাম—"কে আছ কোথায়, আমার সিরাজকে বাঁচাও! এক বিন্দু

জল দিয়ে সিরাজের জীবন রক্ষা কর। এক বিন্দু জলের বিনিময়ে আমি বাংলার মস্‌নদ তার হাতে তুলে দেব!" আমি থিয়েটারের এই অভিনয়ে সামান্য এক বিন্দু জলের বদলে নবাব আলিবর্দি খাঁর বাংলার মস্‌নদ ছেড়ে দেবার অভিপ্রায়ে মনে খুব পীড়া অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সেদিন গণেশের কাছে বুকফাটা তৃষ্ণার বাস্তব বর্ণনা শুনে এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও মনে হয়েছিল নবাব আলিবর্দি খাঁর আর্তনাদ অভিনয় হলেও তার মধ্যে সত্য আছে।

প্রখর রৌদ্র মাথায় নিয়ে বিপ্লবী সাথীরা পথ চলেছে। অনাহারে, অনিদ্রায়, পরিশ্রমে ও তৃষ্ণায় সকলেই অবসন্ন কাতর। পথ-চলা কালে লতাপাতা বা ঘাস, সামনে যা পেয়েছে, চিবিয়ে তারা শুষ্ক জিহ্বা ভেজাবার চেষ্টা করেছে। মাঠ বা পথের ধারে ছোট ছোট গর্তে জমা পচা পাতার দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা জল পান করতেও দ্বিধা বোধ করে নি। এভাবে আকণ্ঠ পিপাসা ও ক্ষুধা নিয়ে রোদে পুড়ে পথ চলতে চলতে তারা ক্রমেই অধিকতর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ক্ষুধা মেটাতে অন্তত কিছু হলেও খাওয়ার প্রয়োজন। বড় রাস্তা ছাড়া দোকানপাট মিলবার কোন সম্ভাবনাই নাই অথচ প্রায় চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে বড় রাস্তায় খাবারের সন্ধানে যাওয়াও একেবারে চিন্তার বাইরে।

এই এলাকায় ছোট ছোট টিলা বা পাহাড়ের মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ মাঠ। এখানকার বাসিন্দা বেশীরভাগই সাঁওতাল। ছোট ছোট কাপড় পরা, খালি গা, তীর ধনুক হাতে সাঁওতালদের এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা গণেশের চোখে পড়ছিল। ক্ষুধার জ্বালায় গণেশ অগত্যা একজন সাঁওতালকে ডেকে বলল—"দেখ ভাই, আমাদের বড্ড খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দেবে আমাদের?" এইরূপ প্রস্তাব সাঁওতালটি তার জীবনে বোধ হয় প্রথম শুনলো। সে ঠিক বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় গণেশরা কোত্থেকে এসেছে জানতে চাইল। ইতিমধ্যে তাদের কথাবার্তা শুনে আরও চার-পাঁচজন সেখানে ভিড় করেছে। সকলেই নানা প্রশ্ন করতে সুরু করলো এবং তাদের সব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হ'ল—নইলে সন্দেহ বাড়তে পারে। ভাগ্যে ফেণী সংঘর্ষের বিবরণ তখনও এদের কানে পৌঁছয়নি! ঘুণাক্ষরেও যদি তারা সেইঘটনার কথা জানতো, তা'হলে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ হ'ত না।

যা হোক্‌, সাঁওতালটি সব কথা শুনে গণেশকে বলল, গণেশরা যদি সাঁওতাল সর্দারের বাড়ি যায় তবে হয়ত তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। ক্ষুধার জ্বালায় নেহাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গণেশ, মাখন ও আনন্দ সর্দারের বাড়ি যেতে রাজী হ'ল। সাঁওতালটির সঙ্গে দু'চারজন গ্রামবাসীও সর্দারের বাড়ি এসে

হাজির। একটা ছোট্ট টিলার ওপর সর্দারের বাড়ি। গণেশদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সাঁওতালটি সর্দারকে তাদের খাবার দেবার কথা জানাল।

সর্দারকে দেখে খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলেই মনে হচ্ছিল। সে যে খুব বিচক্ষণ তাতে সন্দেহ ছিল না। সর্দার পুলিসের মতই তাদের জেরা করছিল এবং ঘন ঘন সন্দেহের দৃষ্টিতে সকলের আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিল। গণেশকে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ না দিয়ে, তারা কোত্থেকে আসছে, কি করে, সেখানে তাদের কে থাকে, কি প্রয়োজনে তারা এল, কি জাত—ইত্যাদি নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। গণেশ যতদূর সম্ভব বুদ্ধি খাটিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। কিন্তু বিচক্ষণ ও ধুরন্ধর সাঁওতাল সর্দার যে তার সব কথা বিশ্বাস করছে না, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। গণেশের কাছে তারা ধোপা জেনে কিছুতেই তা' বিশ্বাস করল না সর্দার। মাখন ও আনন্দকে ধোপা বলে চালানো সত্যিই সহজসাধ্য নয়। ধপধপে ফর্সা রং, সুন্দর চেহারা, কম বয়সী স্কুলে-পড়া ভদ্রঘরের ছেলে ছাড়া তাদের অন্য কিছু মনে হওয়া মুস্কিল। সর্দারও তাই বুঝেছে। গণেশরা মিথ্যা বলছে বুঝে সে প্রশ্ন করল—"ওর গায়ে রক্তের দাগ কেন? তোমরা ধোপা নও—ডাকু আছ···।" ধোপা নাও হতে পারি, কিন্তু একেবারে ডাকু ভাবল কি করে?

গণেশ বুঝল অবস্থা বড়ই বেগতিক। সময়মত psychologically react করতে না পারলে অবস্থা হয়ত আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। কাজেই সর্দারের অপমানসূচক নানা তিক্ত কথা শোনবার পর ধীর মস্তিষ্কে খুব সূক্ষ্মভাবে সর্দারের বুদ্ধিমত্তার দম্ভকে একটু আঘাত দিয়ে বলল—"একি বলছ সর্দার? তোমার মত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কি করে ভাবলে এই দু'টি বালক কখনও ডাকাতি করতে পারে! আমরা ধোপা তো বটেই, তবে এই খোকারা এখনও পড়ে। পাহাড়ে রাস্তায় পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছে। তুমি সর্দার, জীবনে ভাল মন্দ বহু লোক দেখেছ—আমার বিশ্বাস তুমি লোক দেখলেই চিনতে পার। তুমি না হয়ে অন্য কেউ যদি আমাদের ডাকাত বলত, তাহলে আমাদের খুব রাগ হ'ত। কিন্তু তোমার মত লোকের মুখে এ কথা শুনে খুব দুঃখ পেয়েছি। তোমার মত বিজ্ঞ লোক কি কখনও ভাবতে পারে যে, এই ছোট ছোট ছেলেরা ডাকাত?"

ওষুধ কাজে লাগলো। বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সাঁওতাল সর্দার এতক্ষণে তার ভুল বুঝতে পারলো। তার কথার সুর বদলে গেল। সে খুব লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইল। তারপর গণেশদের বসতে বলে অতিথি আপ্যায়নে তার ঘরের সব চাইতে

উপাদেয় খাদ্য নিয়ে এল—থালায় করে যথেষ্ট পরিমাণে চাল ও এক ঘটি জল। ও বাবা! চাল চিবোতে হবে? অবশ্য এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই—এমন এমন সময় গেছে, যখন কিছু কাঁচা চাল ও জল খেয়েই ডন কুস্তি করতে হয়েছে। ক্ষিদেয় তখন পাকস্থলী চোঁ চোঁ করছে, সেই চাল ও ঘটি ভর্তি জলই তারা অমৃত মনে করে খেয়ে নিল।

ইতিমধ্যে সর্দার ও গ্রামবাসীরা গণেশদের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। খাওয়ার পর সর্দার তাদের বিশ্রাম করতে বলল। ঐরূপ পরিশ্রান্ত অবস্থায় বিশ্রাম নিতে পারলে খুবই আরামের হ'ত, কিন্তু গণেশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেইস্থান পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করলো। চৌকিদার দফাদার ও বিভিন্ন গ্রামের মোড়ল এবং সর্দারেরা প্রত্যেকটি থানার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে এবং তারা বৃটিশ রাজত্বের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে থানা-পুলিসকে সাধ্যমত সাহায্যও করে। এই সাধারণ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানই গণেশকে সেই স্থান পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। সুতরাং তারা সর্দার ও অন্যান্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিল।

মাঠ ভেঙ্গে আবার হাঁটা সুরু হ'ল। প্রায় মাইলখানেক হাঁটবার পর একটা ছোট্ট পাহাড়ের ওপর গাছের ছায়ায় তারা একটু বিশ্রামের জন্য বসলো। তাদের ইচ্ছে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আবার যাত্রা সুরু করবে।

ফেণীর পাহাড়ে-জঙ্গলে ও মাঠে মাঠে হাঁটলেই চলবে না, যে কোন মতে হোক্ কলকাতা পৌঁছতেই হবে। কাছেই কোন স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরা চাই। কিছু আগেই একটা ট্রেনের শব্দ শোনা গেছে—বোঝা গেল কাছেই কোন একটা স্টেশন আছে। প্রত্যেকেই নিদারুণ পরিশ্রান্ত এবং দিনের বেলা হেঁটে স্টেশনে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনা করেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত, প্রায় দু'তিন ঘণ্টা, তারা সেখানেই বিশ্রাম নিল। তারপর ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে ট্রেনের শব্দ লক্ষ্য করে মাঠ ধরে সোজা পথে স্টেশনের আশায় আবার হাঁটা সুরু করলো। স্টেশনের কাছে বাজার-হাট বা কিছু দোকানপাট থাকার সম্ভাবনা বলে তারা আশা করেছিল সেখানেই খাওয়া-দাওয়ার কোন-না-কোন বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করা যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। সামনে একটা গেরস্ত বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল। সেখানে সেই গ্রাম ও পাশের গ্রামের লোকেরাও জড়ো হয়ে আসর জমিয়েছে। গণেশ ভাবল, কীর্তন যখন হচ্ছে তখন প্রসাদ চাইলে অন্তত বাতাসা ও জল তো পাওয়া যাবে! কীর্তন

শেষ হতে যদি দেরিও হয় তবু সেখানে কাউকে অনুরোধ জানাবে একটু প্রসাদ ও জল দিতে। কীর্তনের আবহাওয়ায় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা হয়ত তাদের সেইরূপ সহানুভূতি হতে বঞ্চিত করবে না! এই আশা নিয়ে তিনজন সোজা কীর্তনের আসরে উপস্থিত হ'ল। সেখানে যাওয়া মাত্রই তাদের প্রতি গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। একজন উৎসাহী ব্যক্তি ছুটে এসে তাদের প্রশ্ন করলো—"তোমরা কারা ?" গণেশ বলল—"আমরা পাশের গ্রামে থাকি।" লোকটি গণেশের কথা অবিশ্বাস করে অভদ্র ভাষায় বলল—"পাশের গ্রামের সব লোকদেরই আমরা চিনি। তোমাদের তো সেখানে কখনও দেখি নি! তোমরা মিথ্যা বলছ। কে তোমরা ?"

গণেশ বুঝলো এখানে নরম হলে চলবে না। তাই সেও মেজাজ দেখিয়ে বলল—"দেখুন, আমরা আপনার এই ধরণের কথা শুনতে রাজী নই। আপনি যদি আমাদের কোনদিন নাও দেখে থাকেন, তাতে আমাদের কিছু করবার নেই।" গ্রামবাসীরা সংখ্যায় বহু। গণেশের কথা শুনে তারা নিরস্ত হ'ল না—নানাভাবে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলো। কয়েকজন আবার গণেশের কথার প্রতিবাদে তাদের চ্যালেঞ্জ করলো—"পাশের গ্রামে থাকেন বলে আপনি যতই বড় গলায়ই বলুন না কেন, আমরা কিন্তু তা বিশ্বাস করি না…।" অপর একজন যুবক গণেশদের উক্তি মিথ্যা প্রমাণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে—"আপনাদের বাড়ি যখন পাশের গ্রামে, নিশ্চয়ই দিক্ চিনতে ভুল হ'বে না—আচ্ছা বলুন তো উত্তর কোন্ দিকে ?"

এ কি ঝামেলা! পাশের গ্রামে থাকে বলে উত্তর কোন্ দিকে তাদের কাছে প্রমাণ দিতে হবে! যুবকের তীক্ষ্ণ প্রশ্নে গ্রামবাসীরা সকলেই খুব উত্তেজিত—এবার ধরা পড়ে যাবে তারা মিথ্যা বলছে। সমানে প্রশ্ন চললো—"বলুন না মশাই, চুপ করে আছেন কেন ? পাশের গ্রামে বাড়ি, 'উত্তর দিক' ঠিক করতে পারছেন না… ?" এই প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি হওয়ার কোন কারণ নেই—হয় মুখে বলতে হবে, নয়ত দেখাতে হবে উত্তর দিক্ কোন্‌টি। এই সময় আনন্দ বালকসুলভ বুদ্ধি খাটিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লো। সে বলল "বা রে! আপনারা তো বেশ লোক—ঐ দেখুন উত্তর দিক্।" সকলে একসঙ্গে হো হো শব্দে হেসে উঠলো। আনন্দের ঢিল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। গ্রামবাসীরা সুযোগ পেয়ে নানাপ্রকার বিদ্রূপ করতে ছাড়লো না। শুধু ঠাট্টা বিদ্রূপ করেই যদি ক্ষান্ত হ'ত তাহলেও কোন ক্ষতি ছিল না; কিন্তু তাদের মনে যে সন্দেহের উদ্রেক

হয়েছে! কাজেই, আর কোন যুক্তিতর্ক বা বোঝাবার চেষ্টা নয়, কোনমতে পালানোই শ্রেয়।

পালাতে হলেও মানানসই একটা অজুহাত তো চাই! নিমেষের মধ্যে গণেশ আরও রাগভাব দেখিয়ে বলল—"ছোট ছেলে দিক্ নির্ণয়ে ভুল করেছে, তা' বলে এত হাসি ঠাট্টারই বা কি আছে? এরকম অভদ্র ব্যবহার কেন করছেন? আমি এক্ষুণি থানায় ডায়েরী করব। আয়, চল, আমরা যাই।" এই বলে রাগে গরগর করতে করতে আনন্দ ও মাখনকে নিয়ে গণেশ দ্রুতপদে হাঁটতে লাগলো। ভাবখানা এমন, যেন সত্যিই থানায় রিপোর্ট না করে ছাড়বে না।

স্থানীয় লোকেদের অত বোকা ভাবলে চলবে কেন? পেছন থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল—"ও কর্তা! রাগ কইরা যান কই? 'উত্তর পান'? ঐ মুহে না—এই পানে।" গণেশ কিছুই যেন শুনতে পায় নি—চোখ কান বন্ধ করে ছুটলো। এই ঘটনার অবশ্য এখানেই সমাপ্তি হয়েছে। ভাগ্যে সেখানে তেমন কেউ জবরদস্ত লোক ছিল না।

অন্ধকারে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মেঠো পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় মাইল দুয়েক অতিক্রম করার পর রেল-স্টেশনের আলো চোখে পড়লো। স্টেশনের কাছে একটা ছোট বাজারও আছে। বাজারে যদি চেষ্টা করা যায় তবে হয়ত কিছু আহার্য মিলেও যেতে পারে। কিন্তু স্টেশনে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক নানা উদ্দেশ্যে ঘুরছে—কার মনে কি সন্দেহ হবে কে জানে! বাজারে ও স্টেশনে পুলিসের সামনে পড়বারও যথেষ্ট সম্ভাবনা। ভয় ভাবনা মাথায় নিয়েই পথ চলা সুরু হয়েছে—মাঝপথে থেমে যাওয়া গণেশের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যতই আশঙ্কা থাকুক না কেন, এগোতেই হবে। আদ্যোপান্ত ভেবে তারা শিলং ঘুরে কলকাতা যাবে স্থির করলো। আনন্দের মাসীমা শিলং-এ থাকতেন। তিনি গভর্নমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ নারী কর্মচারী—District Inspectress of Schools.

প্ল্যান স্থির করে ফেলবার পর অনেক কাজ—খাওয়া-দাওয়া সারা, টিকেট কাটা, ট্রেনে চাপা ইত্যাদি। টিকেট কিনতে আবার স্টেশনে যেতে হবে! ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়! এবারে তাই আরও সাবধানতার সঙ্গে আঁটঘাট বেঁধে তবে টিকেট কিনতে যেতে হবে।

তাদের জামাকাপড়ের যা' অবস্থা, তার ওপর অনাহারে ও অনিদ্রায় রোদে ঘুরে ঘুরে চেহারা যা' হয়েছে, তাতে পুলিসের সামনে পড়লে আর রক্ষা থাকবে

না। তাই তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হ'ল পোশাক বদলে একটু ভদ্রস্থ হওয়া। সন্ধ্যে প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটায়, অন্ধকারে গ্রামের বাজার ও স্টেশনের আশেপাশে, পথ চলায় খুব অসুবিধে ছিল না; কিন্তু আনন্দ ও মাখনকে সঙ্গে নেওয়া গণেশ উচিত মনে করলো না। সে একাই একটা কাপড়ের দোকান থেকে তিন জোড়া লুঙ্গি ও তিনটি টুপি কিনে নিয়ে এল। মাখন ও আনন্দ সঙ্গে গেলে পোশাক কেনা হ'ত কিনা সন্দেহ, তবে পুলিস হাজতে যে যেতে হ'ত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তাদের তিনজনকে ঐরূপ বিধ্বস্ত অবস্থায় লুঙ্গি ও টুপি কিনতে দেখলে কেউ বিশ্বাস করত না যে তারা মুসলমান। কেবল মুসলমানের পোশাক পরলেই হয় না—তাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলনের বৈশিষ্ট্যগুলি ও বজায় রাখতে না পারলে যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়বার সম্ভাবনা। যাই হোক্, তিনজনেই মুসলমান সেজে পরস্পরের সম্পর্ক ঠিক করে নিল। চাল-চলনও সামান্য কিছু বদলাবার চেষ্টা করলো। তবু মাখন ও আনন্দকে খানিকটা দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে গণেশ একাই টিকেট কাটতে স্টেশনে গেল।

ভালোয় ভালোয় টিকেট কেনা হ'ল। ট্রেন ছাড়তে কিছু দেরি আছে। ইতিমধ্যে তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল। স্টেশনের নাম বোধহয় দরিয়াগঞ্জ; রাত্রেই ট্রেন ছাড়লো। পরের দিন সকালে তিনজনে আখাউড়া জংসনে পৌঁছলো। স্টেশনে পুলিসের তৎপরতা খুব বেড়েছে বলেই মনে হ'ল। ফেণীর ঘটনার পর 'চারজন আততায়ীকে' গ্রেফ্‌তারের জন্য পুলিসের কাছে নির্দেশ গেছে। আততায়ীদের বন্দী করার জন্য নোয়াখালির ম্যাজিস্ট্রেট এক হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তাই বড় বড় স্টেশনে ও জংসনে পুলিস যাতে কড়া দৃষ্টি রাখে তার ব্যবস্থাতেও কর্তৃপক্ষ কোন ত্রুটি রাখেন নি।

মাখন ও আনন্দ ট্রেনে জানালার ধারে বসেছিল। একজন কন্‌স্টেবল আনন্দের পাশ দিয়ে কয়েকবার পায়চারি করার পর তাকে নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করে। আনন্দ যে মুসলমান তা' পুলিস বিশ্বাস করতে চাইছিল না। সেই কন্‌স্টেবলটি হাবিলদারকে ডেকে আনলো। হাবিলদার মাখনকেও জেরা করতে থাকে। মাখন ও আনন্দের সঙ্গে আর কে আছে—এই খোঁজটাই তখন পুলিসের কাছে প্রধান মনে হয়েছিল। ফেণী স্টেশন থেকে চারজন আততায়ী উধাও হয়েছে। দু'জনকে তো পাওয়া গেছে। বিবরণ যা পুলিসের জানা আছে, তাতে আনন্দ ও মাখনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু তারা মুসলমান বেশে আছে বলেই হিসেব মিলছে না। বাকি আর দু'জনকে যদি পাওয়া যায় তাহলে তারা মুসলমান কি না তখন পরখ করা হবে এবং প্রয়োজন হলে পুলিস

তাদের থানায় যেতেও বাধ্য করবে। পুলিসের দৃঢ় বিশ্বাস তাদের সঙ্গে আরও দু'জন সেই ট্রেনেই কোথাও আছে এবং সেই উদ্দেশ্যে মাখন ও আনন্দকে বার বার ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করছে—"বলুন আপনাদের সঙ্গে আর কে আছে?" গণেশ ওপরের Bunk-এ শুয়ে ছিল। তার সমস্ত শরীরে চিকেন-পক্স দেখা দিয়েছে। তাই সে ট্রেন-যাত্রীদের চোখের আড়ালে থাকবার চেষ্টা করছিল। চিকেনপক্সে আক্রান্ত যাত্রীকে কর্তৃপক্ষ ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবে বলে তৃতীয় শ্রেণীর Bunk কষ্টকর হলেও গণেশ সেইটিকেই অধিকতর নিরাপদ মনে করেছিল। কিন্তু পুলিসের হাঁক-ডাক শুনে এবং উত্তেজিতভাবে মাখন ও আনন্দকে জেরা করতে দেখে Bunk-এর ওপর থেকেই পুলিসদের একটু ধমকে গণেশ বলল—"আপনারা পেয়েছেন কি? কেন ছোট ছেলেদের এভাবে জ্বালাতন করছেন? ওরা আমার সঙ্গে যাচ্ছে। আপনারা যাত্রীদের অযথা হয়রান করবেন না।" পুলিসেরা কামরায় ঢুকল। তারা গণেশকে দেখল এবং তার সঙ্গে দু'চারটা কথা বলে, সঙ্গে আর কেউ নেই—তারা মাত্র তিনজন, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে হাবিলদার সাহেব ট্রেন থেকে নেমে গেলেন—তিনি ধরেই নিলেন, এরা 'আততায়ী' হতেই পারে না—আততায়ীরা যে চারজন!

ট্রেন ছাড়তে আরও কিছু দেরি আছে। এই বিভ্রাটের পর গণেশ উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বিবেচনা করে দেখলো কলকাতা পৌঁছতে আরও অনেকটা পথ। এর মধ্যে এই প্রকার বিভ্রাট, বাধা-বিপত্তি ও অনিশ্চয়তা নিশ্চয়ই দেখা দিতে পারে। সর্বক্ষেত্রে হয়ত পরিত্রাণও পাওয়া যাবে না। এইজন্য আনন্দ ও মাখনের সঙ্গে রিভলভার না রাখাই গনেশ যুক্তিযুক্ত মনে করলো। সে একাই সব ক'টি রিভলভার—তার নিজস্ব দু'টি ও তাদের তিনটি নিজের সঙ্গে রাখবে স্থির করল। কোনক্ষেত্রে যদি আনন্দ ও মাখনকে সন্দেহবশে বন্দীও করে তবু সঙ্গে অস্ত্র পাওয়া না গেলে তাদের হয়ত ছেড়েও দিতে পারে। এইসব ভেবে গণেশ আনন্দ ও মাখনকে তার প্রস্তাবটি জানাল। স্বাভাবিক নিয়মেই তারা প্রথমে গণেশের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে। বিপ্লবী যুবক ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছে, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু তাই বলে প্রাণের চেয়েও প্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রকে বিদায় দিতে তারা কোনমতেই সম্মত হ'ল না। গণেশ তখন নিরুপায় হয়ে বলল—"দেখ, আমি আদেশ করছি উপস্থিত তোমরা তোমাদের আগ্নেয়াস্ত্র আমাকে দাও। কোনমতে নিরাপদে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছলে তোমাদের রিভলভারের অভাব হবে না। এখন যদি ধরা পড়ি আমাদের কাউকেই পুলিস ছাড়বে না। সেইক্ষেত্রে আমি চাই সবকিছু আমার

ওপর দিয়ে যাক এবং তোমরা অন্তত নিরাপদে কলকাতা পৌঁছে আমাদের কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করে যাও। যুব-বিদ্রোহের আগুন এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সশস্ত্র বৈপ্লবিক অ্যাক্‌শনের মারফত জ্বালিয়ে রাখতে হবে। তাই আশা করি আমার সিদ্ধান্ত তোমরা মেনে নেবে।"

মাখন ও আনন্দ গণেশের 'আদেশ' মেনে নিল। সবসুদ্ধ পাঁচটা রিভলভার ও প্রচুর কার্তুজ জামা-কাপড়ের ছোট্ট একটা পোঁটলার মধ্যে গণেশ বেঁধে ফেললো। তখন পর্যন্ত তারা একই ট্রেনের যাত্রী। বদরপুর জংশনে ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ থামে। সেখানে রেল-কোয়ার্টারে গণেশের এক আত্মীয় থাকেন, তাঁর কাছ থেকে গণেশ কিছু টাকা নেবে স্থির করলো। তারপর মাখন ও আনন্দ শিলং ঘুরে কলকতা যাবে এবং গণেশ অন্য পথে বাংলার রাজধানীতে প্রবেশ করবে।

বিকেলের দিকে বদরপুরে ট্রেন পৌঁছলো। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে তারাও খুব তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো। গণেশের আত্মীয়ের কোয়ার্টার খুব দূরে না হলেও অন্তত মিনিট পনেরোর পথ। আবার ফিরে আসতে হবে। কাজেই তারা বদরপুর জংশনের রেল-লাইন আড়াআড়িভাবে পার হয়ে short cut পথে কোয়ার্টারে যাচ্ছিল।

হায় রে! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়! চীৎকার কানে এল —'Halt'! ম্যাগাজিন রাইফেলে সঙ্গীন আঁটা একজন Railway Battalion-এর ইংরেজ অফিসার দশ-বারোজন ভারতীয় সৈন্য সঙ্গে নিয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন অথবা কোন বিশেষ নির্দেশ মত হয়ত 'আততায়ীদের' অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত ছিলেন। সৈন্যদের মধ্যে কেউ আবার চেঁচিয়ে বলল—"কোন্ হ্যায়? কাঁহা যাতা? ইধার আও!" সেপাইরা High-post-এ রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছে। স্থির দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে আছে—পালাবার কোন উপায় নেই। পালাবার চেষ্টা করলেই গুলী করবে—বারোটা রাইফেল প্রস্তুত। বাধ্য হয়ে তিনজনেই সৈন্যদের হুকুম তামিল করতে এগিয়ে গেল। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ! তাই তারা ভাবল, কথামত কাছে গেলে যদি সাধারণ লোক ভেবে নিষ্কৃতি দেয় তাহলেই বাঁচোয়া। সৈন্যদের নেতা—সাহেবটি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ। গোঁফ ছিল। ছোট গোঁফ বটে তবু এমনভাবে সাহেব গোঁফে তা দিয়ে রেখেছেন যেন সবাইকে তিনি চ্যালেঞ্জ করছেন। গণেশ বলেছিল, ইংরেজ সৈনিকপুরুষের চোখ দু'টি বাঘের মত জ্বলছিল। সাহেব যে পরিমাণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে দৃপ্ত ভঙ্গিতে সেখানে দাঁড়িয়ে, ঠিক সেই পরিমাণে নম্র, বিনয়ী ও সরল তিনজন নিরীহ যাত্রী তাদের উন্মুক্ত সঙ্গীনের মুখে এসে দাঁড়াল।

সাহেব ঘন ঘন তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। বিচক্ষণ ইংরেজ অফিসার স্বয়ং প্রশ্ন করলেন—"কাঁহা যাতা ?" গণেশ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—"মামাবাড়ি, Uncle house Sir।" এই উত্তর দিতে দিতে হাতের তালু কপালে ঠেকিয়ে সাহেবকে সেলাম করেই গণেশ সটান মাটিতে বসে পড়লো।

সাহেব—"উধারসে কিঁউ যাতা ?"

গণেশ—"Short cut Sir !"

সাহেব—"Suit-case কাঁহা ?"

গণেশ—"Poor man Sir, no suit case।"

গণেশের সঙ্গের সেই "কাপড়ের পোঁটলাটি"র প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে সাহেব প্রশ্ন করলেন—"উস্‌মে ক্যা হায় ?" প্রথম থেকেই গণেশ এই ভয় করে এসেছে—এই বুঝি 'পোঁটলাটি' search করবে! পোঁটলার দিকে লক্ষ্য করে যখন প্রশ্ন করেছে এবং সুদক্ষ ইংরেজ সৈনিকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি যখন পোঁটলা ও তার অধিকারীর অন্তস্তল পর্যন্ত সব দেখে ফেলছে, তখন কি আর নিস্তার আছে ? অপেক্ষা না করেই গণেশ মুহূর্তে তার "কাপড়ের পোঁটলাটি" পাশ থেকে সামনে টেনে এনে সাহেবকে খুলে দেখাবার ভান করে বলল—'See Sir, cloth Sir, আর কুছ্ নাই স্যার্ !"

সাহেব—"আচ্ছা ঠিক হ্যায়—চলা যাও।"

বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ইংরেজ সৈনিক "সাধারণ, নিরীহ, গরীব যাত্রীদের" চিনতে ভুল করেন নি! তিনি একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে দুঃস্থ যাত্রীদের পোঁটলা খুলে হয়রানি না করে মুক্তি দিলেন। সাহেবের অপরিসীম দয়া! সাহেবের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে যদি কেউ নারাজ হন, তবু তাঁর অসীম দয়া বললে চলবে না—পোঁটলা পরীক্ষা না করেই যাত্রীদের চলে যেতে বলেছেন। হায়রে সাহেব! যাদের খোঁজে তুমি অতন্দ্র প্রহরী হয়ে বসে আছ, তারাই যে তোমার আঙিনা দিয়ে চলে গেল! সাহেবের জানবার সুযোগ হ'ল না যে, ভারতীয় গণতন্ত্রীবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার ফিল্ড-মার্শাল তারই উন্মুক্ত ও উদ্যত সঙ্গীনের মুখ থেকে এইমাত্র পালিয়ে গেল—এই তিনজনকে ধরতে পারলে তিনি অনেক টাকাই পুরস্কার পেতেন।

এই ঘটনা একটুও অতিরঞ্জিত বা সাজানো নয়। মাখন ও আনন্দের কাছে এই বিবরণ আমি আরও বিশদভাবে শুনেছিলাম। সৈন্যদের সামনে দাঁড়াবার সময় তারা কী ভীষণ উৎকণ্ঠায় ছিল, তা ঘটনার বিবরণ দেবার সময় আমাকে তারা বলেছে। আরও বলেছিল—"সাহেব পোঁটলা লক্ষ্য করে যখন গণেশদাকে

জিজ্ঞাসা করেছিল—'উস্‌মে ক্যা হ্যায়'—তখন আমাদের বুক দুর্‌-দুর্‌ করছিল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল—মনে হচ্ছিল আর বুঝি রক্ষা নেই! তারপর গণেশদার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সহজ সরল যাত্রীর অভিনয় যখন ইংরেজ সৈনিককে বোকা বানাল, তখন আমাদের যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা' আর কি বলব—!" কত যুগ পরে এই ঘটনাটির বিবরণ লিখতে গিয়ে আজ আমারও খুব ভাল লাগছে। কি জানি কেন মনে প্রশ্ন উঠছে—আমি হলে কি পারতাম?

আমি ও গণেশ সেই রাত্রে ভূপেনদার গোপন আশ্রয়ে খুব আরামে ও নিরাপদেই কাটালাম। আমরা পরস্পর খবরা-খবর আদান-প্রদানের পর অনেক রাত্রে ঘুমোতে গেলাম। পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে নিজেদের মধ্যে আশু কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হ'ল। কিন্তু সর্বপ্রথমে বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত না করে কোনরকম কর্মসূচী গ্রহণ করাই সম্ভব নয়। এই জন্যেই মাখন ও আনন্দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং চট্টগ্রামে মাস্টারদাদের সঙ্গে কার্যকরীভাবে যোগাযোগ-সূত্র রচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলাম। কিন্তু ভূপেনদার পরামর্শ ছাড়া কেবল আমরা দু'জনে আলাপ-আলোচনা করে এই সমস্ত বিষয় ঠিক করবার কোন উপায় ছিল না। ভূপেনদাও অনুমান করেছিলেন যে, চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর আমরা কলকাতাতেই আসব এবং সেই বুঝে তিনি সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। আমরাও ঐ সমস্ত বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য বলেই মনে করেছি।

চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠার পর সারা বাংলার বিভিন্ন দিকে বিপ্লবী যুব-সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা গেল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করবার জন্য বিপ্লবী প্রাণে সাড়া জাগালো! ভূপেনদা সাপ্তাহিক "স্বাধীনতার" সম্পাদকীয়তে "ধন্য চট্টগ্রাম" শিরোনামা দিয়ে বীর শহীদদের আত্মদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় তরুণ বাংলাকে দিকে দিকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিতে ডাক দিলেন। ইংরেজ সরকার যুগান্তর-পার্টি পরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রিকা "স্বাধীনতাকে" প্রেস-আইনে বে-আইনী ঘোষণা করলো। এদিকে তখন "লবণ-আইন-ভঙ্গ আন্দোলন" তীব্র আকার ধারণ করেছে। বিপ্লবীদের বোমা-পিস্তলের গর্জনে ইংরেজ প্রভুরা আতঙ্কগ্রস্ত। বৃটিশ শাসকবর্গ দিশেহারা—বৈপ্লবিক প্রচার বন্ধ করে ভারতবাসীর কণ্ঠরোধ করা চাই। এই উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার প্রেস-আইনের জোরে সব জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে

রাখতে চেষ্টা করলো। প্রতিবাদে সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেল। দৈনিক খবর জানতে না পেরে দেশবাসী, বিশেষ করে বাংলার রাজধানী কলকাতার নাগরিকবৃন্দ নিদারুণ, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় দিন অতিবাহিত করছিল। এই অবস্থায় বিভিন্ন সংস্থা গোপনে, সাইক্লো করে, বুলেটিন ছেপে খবর সরবরাহ করেছে। যথারীতি খবরের অভাবে নানারকম গুজবের জন্ম হতে লাগলো—লোমহর্ষক সংবাদ সব মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। অহেতুক কৌতূহল ও উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চললো। সে এক অস্বাভাবিক অবস্থা—অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!

এই সময় ভূপেনদা আত্মগোপন করে বিপ্লবীদলকে পরিচালনা করছিলেন। তিনি আমাদের নিরাপত্তা রক্ষা ও ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক কর্মসূচী কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগঠনকে যতদূর সম্ভব সুদৃঢ় করে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন।

ভূপেনদা দ্বিতীয় দিন এই বাড়িতেই আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর তিনি জানালেন, আমরা চারজনের একত্রে থাকার পক্ষে উপযুক্ত একটা বাড়ি তিনি ঠিক করছেন এবং দু'একদিনের মধ্যেই আমাদের সেখানে স্থানান্তরিত করতে পারবেন। ইতিমধ্যে আনন্দ ও মাখনের সঙ্গেও যোগাযোগের ব্যবস্থা হ'ল এবং অনুকূলদার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাঁর সাহায্যে আমি মাখন ও আনন্দকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলাম। পাঠকবর্গ আগেই জেনেছেন—ওরা দু'জন গণেশের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আনন্দের মাসীর বাড়ি শিলং ঘুরে ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে।

খিদিরপুর বস্তি অঞ্চলে এক সাধারণ ক্রীশ্চান পরিবারের আতিথ্যে আমাদের চারজনের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। জীবনের সেই ক'টি দিনের স্মৃতি এখনও মানসপটে ছবির মতই ভাসছে। সাঁইত্রিশ বছর পরে আজ লিখতে বসে শ্রীমতী কাঞ্চনলতা চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর ভরে উঠছে। কতখানি নিবিড় স্বদেশপ্রেম, দেশভক্তির কত গভীর অনুভূতি এবং স্বার্থত্যাগের মহান্ আদর্শ এই সাধারণ ক্রীশ্চান পরিবারের শ্রদ্ধেয়া কাঞ্চনলতাকে শত-বিপদ অগ্রাহ্য করে দ্বিধাহীন-চিত্তে আমাদের আশ্রয় দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল! স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর চাকরি বজায় রেখে স্বামী ও দু'টি সন্তানের পরিচর্যার পরেও তিনি অম্লানবদনে আমাদের থাকা-খাওয়ার সব ভার নিলেন। তাঁদের কোন ঝি-চাকর ছিল না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলেই সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন। বস্তিতে খোলার বাড়ি। পাশের বাড়ির সকলেই আমাদের দেখেছে। তাঁরা আমাদের আত্মীয় বলেই সবার কাছে পরিচয় দিয়েছেন।

আমরাও তাঁদের কাকাবাবু ও কাকীমা বলে সম্বোধন করেছি এবং আমাদের প্রতি তাঁদের অপরিসীম স্নেহ ও ভালবাসায় অভিভূত হয়েছি। এক-এক সময় অবাক-বিস্ময়ে ভেবেছি, আমাদের নিরাপত্তার জন্য তাঁরা কি করে এত নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন? ঘরের বাইরে আমাদের প্রায় আসতেই দিতেন না। একটা মাত্র বড় ঘর, তার সামনে ছোট্ট একটু বারান্দা। আমাদের চারজনকে ঘরজোড়া একটা বড় খাটে শুতে দিয়ে তাঁরা মেঝেতে বা বারান্দায় শোয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বস্তিতে হঠাৎ কোন চেনা লোক পাছে আমাদের দেখে ফেলে এই আশঙ্কায় তাঁরা সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতেন এবং এই জন্যই খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের থালা-বাসন সব তাঁরাই মাজতেন। এই দরিদ্র পরিবারের দৈন্য যেমন দেখেছি, তেমনি আবার অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি বাহ্যিক দৈন্যের অন্তরালে এই ক্রীশ্চান দম্পতি কি মহান্ ও দুর্মূল্য ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন! মনে মনে ভাবি, শহীদদের চরম আত্মত্যাগের ইতিহাস যে মহান্ আদর্শের গ্রন্থিতে বাঁধা, স্বদেশপ্রেমের সেই একই সূক্ষ্মতন্ত্রীতে গাঁথা এইসব মহাপ্রাণ—যাঁরা অমানুষিক দুঃখকষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেছেন, চরম বিপদও যাঁদের উপেক্ষার বস্তু। প্রতি মুহূর্তে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রাণনাশের আশঙ্কাও যাঁদের কাতর করে নি তাঁদের অবদানও কি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে না?

এই বাড়িতে থাকা কালেও গণেশের চিকেন-পক্স সম্পূর্ণ সারে নি। একটা ঘরে আমরা প্রায় দিনরাত বন্ধ আছি। চিকেন-পক্স খুব ছোঁয়াচে রোগ, কাজেই দিনের পর দিন এত নিকট সংস্পর্শে থেকে আমরাও এই সংক্রামক রোগের কৃপাদৃষ্টি হতে বঞ্চিত হলাম না। মাখন ও আনন্দ যথাক্রমে চিকেন-পক্সে আক্রান্ত হ'ল। এই বাড়িতেই কাকীমার ছোট ছোট দুটি ছেলে আছে; বস্তি অঞ্চলে সব পাশাপাশি বাড়ি—আলোবাতাসের একান্ত অভাব; আমাদের আশঙ্কা ছিল, চিকেন-পক্স এই বাড়ি ও বস্তিতে সহজেই ছড়িয়ে পড়বে।

ভূপেনদাকেই এই সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। সরকার আমাদের চারজনের মাথার মূল্য মোট ষোল হাজার টাকা ঘোষণা করেছে। পুলিস ও ছদ্মবেশী বন্ধু-বান্ধব আমাদের খোঁজখবরের জন্য যে খুব তৎপর হয়ে উঠেছে, সে সংবাদ মাঝে মাঝে আমাদের কাছে আসছে। বহুদিনের পুরনো বন্ধুরা, যাঁরা বাংলার বাইরে আত্মগোপন করেছিলেন, কেউ কেউ বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্তরের আবেগে আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সেই দূরদেশ

থেকেও ছুটে এসেছেন এবং পুরনো গোপন সূত্রে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য খবর পাঠিয়েছেন।

আমাদের চারজনকে সশস্ত্র অবস্থায় কোন নিরাপদ আশ্রয়ে রাখাই এক সমস্যা। কারণ, যে কোন সময়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে আমাদের খণ্ডযুদ্ধ হতে পারে এবং তাতে আশ্রয়দাতা ও তাঁর পরিবারবর্গের জীবন বিপন্ন হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা। এইরূপ আশঙ্কা সত্বেও যাঁরা আমাদের আশ্রয় দেবেন, তাঁদের সংখ্যা নিশ্চয়ই প্রচুর নয়। তার ওপর গণেশের চিকেন-পক্স। কাজেই এই অবস্থায় খিদিরপুরে কাকীমার বাড়িই খুব নিরাপদ মনে হয়েছিল। কিন্তু আরও দু'জন, মাখন ও আনন্দ, চিকেন-পক্সে আক্রান্ত হওয়াতে এই বাড়ি ও বস্তির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ভুপেনদা আমাদের অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করলেন। কাকীমার বাড়ির মায়া কাটিয়ে আমরা অপর একটি বাড়িতে উঠে গেলাম।

এই বাড়িটি ঠিক কোথায় ছিল তা' আজ আর আমার সঠিক মনে নেই। তবু যতদূর মনে পড়ছে বোধ হয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে কোথাও হবে। বাড়িটা কা'র সেটা আমাদের জানবার কোন কারণ ছিল না। এখনও পর্যন্ত আমি সেই গৃহস্বামীর পরিচয় কিছুই জানি না বলেই তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারলাম না। এ-রকম আরও কত অনামী বন্ধু, কত স্বদেশপ্রেমী, কত নীরব কর্মী গোপনে সাধারণের অজ্ঞাতে যবনিকার অন্তরালে নিজেদের প্রচ্ছন্ন রেখে জীবন তুচ্ছ করে, বাংলার ও ভারতের বিপ্লবীদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন, সবতোভাবে সাহায্য করেছেন—এঁদের সকলের হিসেব আমরা হয়ত রাখি না। ভারতের বিপ্লবীযুগের ইতিহাস কখনই পূর্ণাঙ্গরূপ নিতে পারে না যদি এইসব নীরব দেশভক্তের স্বার্থত্যাগ অনুক্ত থেকে যায়। আমাদের অনামী গৃহস্বামীর প্রতি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তবে আশা করি, কোনদিন হয়ত তাঁর পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকে সমৃদ্ধিশালী করবে।

এই বাড়িতে ভুপেনদা মাখন ও আনন্দের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছিলেন। ডালহৌসী-বোমা মামলার প্রখ্যাত সীতাংশু সরকার, মেডিকেল কলেজের ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, প্রতিদিনই মাখন ও আনন্দকে দেখে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করতো। সীতাংশু খুব ছোট বয়সে চট্টগ্রামে আমাদের একটা বাড়ির ভাড়াটে হিসেবে তার মা-বাবার সঙ্গে থাকত। তার পিতা শ্রীশিরীষচন্দ্র সরকার চট্টগ্রামে একজন পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। আমি বোধ হয় তখন মিউনিসিপ্যাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, আর সীতাংশু পড়ত

চট্টগ্রাম গভর্নমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে। তারপর বহু বছরের ব্যবধান। তাই সে আমাকে দেখেও চিনতে পারে নি এবং আমিও আমার পরিচয় দিই নি। মাখন, আনন্দ ও আমার সঙ্গে আলাপের মধ্যে সীতাংশু চট্টগ্রামে তার অল্প বয়সের অভিজ্ঞতা ও অনন্ত সিংহের দুরন্তপনার কথা বলত। আমরাও সেসব কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনতাম এবং প্রচুর মজা পেতাম ; কিন্তু তবু নিজেদের পরিচয় দিই নি। গুপ্ত-সমিতির তাই নিয়ম ছিল।

মাখন ও আনন্দের আরোগ্য লাভের পর ভূপেনদা আমাদের আরও নিরাপদ ও সুদৃঢ় কোন ঘাঁটিতে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করছিলেন। এই উদ্দেশ্যে যুগান্তর বিপ্লবী দলের সভ্য ও সভ্যাদের মধ্যে একজন ছেলে ও মেয়েকে স্বামী-স্ত্রী সাজিয়ে তাদেরই তত্ত্বধানে কোন বাড়ি ভাড়া নিয়ে একটা নিরাপদ আস্তানা তৈরি করবার বাস্তব প্ল্যান কার্যকরী করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। আনন্দ ও মাখন আরোগ্য লাভ করে ওঠার পর অবশ্য আমার পালা। আমি যে জল-বসন্তে অক্রান্ত হব না, এ আমরা কেউ ভাবতে পারি নি। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, বদ্ধ একটি ঘরে সবক্ষণ একসঙ্গে থেকেও আমি কি করে মাতা শীতলাদেবীর কৃপা হতে বঞ্চিত হলাম—আমার চিকেন-পক্স হ'ল না।

যুব-বিদ্রোহের পর প্রায় এক মাস গত হতে চলেছে—বিস্তারিত খবর আমরা এখনও তেমন কিছুই জানতে পারি নি। ২২শে এপ্রিলের জালালাবাদের যুদ্ধ-সংবাদ জেনেছি, কিন্তু এখনও সঠিক জানি না—যাঁরা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন সেই বারোজন শহীদ কারা ? বিপ্লবী দলের আহতের সংখ্যাও আমাদের অজানা। তবে নেতৃস্থানীয় কেউ-ই যে বন্দী হন নি ও সরকার পক্ষের কেউ-ই হত বা আহত হয় নি, এখবর আমাদের কাছে পৌছেছে। ঐ তারিখের ফেণী সংর্ষের বিবরণও আমাদের কাছে পৌছয়। আরও একটি ঘটনার খবর পেলাম—অমরেন্দ্র নন্দীর তপ্তরক্তে ফিরিঙ্গী বাজারের রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আমাদের অতি প্রিয় সাথী অমরেন্দ্র—তার ওপর আমাদের অটুট আস্থা ছিল। জালালাবাদ যুদ্ধের আগে মাস্টারদা পাহাড়ের ঘাঁটি থেকে বাছাই করে অমরেন্দ্রকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টায় পাঠিয়েছিলেন। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমাদের খোঁজ পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি—উপরন্তু পাহাড়ে ফিরে গিয়ে সে বিপ্লবী-দলের দেখাও পায় নি—তারা তখন স্থানত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে। কাজেই আবার সে শহরে ফিরে আসে এবং ২৪শে তারিখে তার সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষ হয়। আমাদের মামলার সময়েই এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ আমরা জানতে পারি। সরকারী কর্মচারী, পুলিস এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে শুনেছি—একা

অমরেন্দ্র—আর তাকে ঘিরে অগণিত পুলিস ও সৈন্য! আত্মসমর্পণ করার জন্য শত্রুপক্ষ অমরেন্দ্রের কাছে চরম দাবি জানায়—স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে রাইফেলের গুলীতে তার বক্ষ বিদীর্ণ হবে!

প্রবল শক্তির অধিকারী বৃটিশ কর্তৃপক্ষ দম্ভভরে যার আত্মসমর্পণ দাবি করছে, জানে না যে, স্বয়ং সূর্য সেন প্রধান-বাহিনীর সকলের মধ্যে শহরে পাঠাবার জন্য তাকেই বাছাই করেছিলেন। অমরেন্দ্র শহরে এসে তারই তরুণ বন্ধু অর্ধেন্দু গুহ, যাকে সে নিজেই দলভুক্ত করেছিল এবং যাকে আমরা প্রচার-পত্র বিলি করার ভার দিয়েছিলাম, তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে। অর্ধেন্দু ইতিমধ্যে বন্দী হয়েছে কাজেই তার সঙ্গে দেখা হ'ল না। সে তার নিজের বাড়িতে বা ভবতোষের বাড়িতে যেতেও সাহস করলো না। সে ভেবেছিল, ভবতোষের বাবা, তার বাবা ও মাখনের বাবা আমাদের ওপর খুবই বিরক্ত, কাজেই তাঁদের কাছে সে কোন সাহায্যের আশা করে নি। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর আমাদের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট ও স্নেহশীল হন। আমাদের মামলার সময় দেখেছি মাসের পর মাস নানাভাবে তাঁরা আমাদের মামলার তদ্বির করেছেন। অমরেন্দ্র কেন তাঁদের কাছে গেল না সেজন্য আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, অমরেন্দ্র যদি তাঁদের কারো কাছে যেত তবে পুলিসের পক্ষে তাকে পাওয়া সহজ হ'ত না—এবং আমাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার ব্যাপারেও তাঁরা অমরেন্দ্রকে সাহায্য করতে পারতেন।

অমরেন্দ্র ভুল করেছিল কি ঠিক করেছিল তা' এখন বলা যায় না। মা-বাবার নিছক স্বার্থ ও অন্ধ-স্নেহ যদি অমরেন্দ্রকে আবদ্ধ করতে চাইত এবং সেইরূপ কোন আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির উপলব্ধিই যদি তাকে নিজ বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রেখে থাকে—তবে হয়ত অমরেন্দ্র ঠিকই করেছিল।

২৩শে তারিখ রাত্রে তাদের বাড়ির কাছেই কোন এক ভদ্রলোকের গোয়ালঘরের মধ্যেই সে আত্মগোপন করেছিল। ২৪শে তারিখ সকালে সেখানে তাকে কেউ কেউ দেখে ফেলে। তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে সে সদরঘাট রাস্তার ওপর যাত্রামোহন সেন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কম্পাউণ্ডের পাঁচিল টপকে স্কুল-বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেই সময় লবণ-আইন-ভঙ্গ আন্দোলন তীব্রভাবে চলেছে। এই স্কুলও কংগ্রেস আন্দোলন এবং সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের প্রভাব মুক্ত ছিল না। স্কুল-কর্তৃপক্ষ এই শিক্ষায়তন বন্ধ রাখতে

বাধ্য হন। সেই পরিত্যক্ত স্কুলের নির্জন কক্ষের একটিতে অমরেন্দ্র আশ্রয় নিয়েছে। সকাল আটটা হবে! শহরের রাস্তা গাড়ি-ঘোড়া ও লোক চলাচলে মুখরিত। অমরেন্দ্র সেই পাড়ার সেরা ছেলে—লেখাপড়ায় ভাল—সদরঘাট ক্লাবের সদস্য—বলিষ্ঠ দেহ—শারীরিক ক্রিয়া-কৌশলে প্রায়ই অংশ গ্রহণ করে। ভলান্টিয়ার-বাহিনীতে সামরিক পোশাকে পাড়ার সবাই তাকে দেখেছে—সকলেই তাকে চেনে।

সরকারীপক্ষের কথা—একজন চেনা পুলিস-কনস্টেবল সেই স্কুলগৃহে তাকে দেখতে পায় এবং ছুটে গিয়ে সদরঘাট পুলিস বিটে খবর দেয়—সে অমরেন্দ্রকে চেনে, যাত্রামোহন স্কুল-ভবনে অমরেন্দ্রকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে এবং কেবল যে দেখেছে তা' নয়—অমরেন্দ্রের এক হাতে পিস্তল ও অন্য হাতে রিভলভার আছে তাও দেখেছে। "এই খবর" পেয়ে ইন্সপেক্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ড পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জনসনকে খবর পাঠান।

পুলিসের বিবরণ থেকে পাচ্ছি যে, পুলিস-কনস্টেবল একেবারে রাস্তা থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে পুলিস বিটে খবর দিয়েছে। আমাদের মতে এটিই সাজানো। প্রকৃত কারণ—তাদের গুপ্তচরকে আড়ালে রাখার উদ্দেশ্যেই কনস্টেবলের অকস্মাৎ দৃষ্টি আকর্ষণের গল্পটির আমদানি। আমরা জানি পরিচিত লোকই অমরেন্দ্রর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাদের মামলা চলার সময় অভিভাবকদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, গোয়ালঘর থেকে পালিয়ে স্কুল বাড়িতে আশ্রয় নেবার সময় অমরেন্দ্রকে যারা দেখতে পেয়েছিল তাদের মধ্যেই কোন একজন তাকে ধরিয়ে দেয়। পুলিসের বক্তব্য থেকে যখন আমাদের জানান হচ্ছে, কনস্টেবলটি অমরেন্দ্রর দু' হাতে দুটি পিস্তল ও রিভলভার দেখেছে—সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তখনই ধরে নেওয়া যায় যে, পুলিসের শিক্ষানুযায়ীই কনেষ্টবল মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে।

অমরেন্দ্রর কাছে সত্যই একটি অটোমেটিক পিস্তল ও একটি আর্মি রিভলভার ছিল। সেই দুটি অস্ত্রই তার একমাত্র বন্ধু—বিশ্বাসী সাথী। তাই বলে কনষ্টেবলটির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য সে কি দু'হাতে দু'টি খোলা রিভলভার নিয়ে বসেছিল! এই কাহিনী পুলিসের নিছক উদ্দেশ্যমূলক ও সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের মামলার রায়ে জজ সাহেব লিখেছেন—

"On the morning of 24th April Constable Chandra Kumar De saw Amarendra Nandy with a pistol in either

hand inside the empty house of J. M. Sengupta on Sadarghat road. He ran to the Sadarghat beat house and informed Macdonald who went to Kotwalli P. S. and informed the superintendent of Police."

কনস্টেবল চন্দ্রকুমার দে বাহাদুর বটে। দু' হাতে দু'টি পিস্তল দেখেই ছুটে গিয়ে ইন্‌স্পেক্টার সাহেবকে খবর দিয়েছে। তারপর যথারীতি জেলা-পুলিস সাহেব খবর পেলেন। সংবাদটি পেয়েই কুখ্যাত জেলা-পুলিস সাহেব মিঃ জনসন তৎক্ষণাৎ তাঁর লুপ্ত মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। তাঁর নাকের ডগার ওপর দিয়ে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল গোপনে প্রস্তুত হয়েছে, মিঃ জনসনের অসংখ্য গুপ্তচরের দৃষ্টি ও পুলিস-বাহিনীর সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও যুব-বাহিনী শহর দখল করেছে—বিপ্লবী সরকার স্থাপন করেছে, ২২শে এপ্রিল জালালাবাদে বিপ্লবীদের মরণপণ প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণের কাছে পরাস্ত হয়ে পুলিসসাহেবকে নত শিরে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে, ফেণীতে চট্টগ্রামের যুবক দলের এক অংশ পুলিসবেষ্টনী ভেদ করে তাদের চোখের সামনেই যেন অশরীরী জীবের মত বাতাসে মিলিয়ে গেল—প্রতিটি ঘটনাই তো জনসন সাহেবের পক্ষে একেবারে মর্মান্তিক! আজ আবার সশস্ত্র অমরেন্দ্র একা শহরের বুকে—অসহ্য! অসম্ভব! এখনি প্রতিকার করতে হবে। ক্ষিপ্ত জনসন সাহেব পুলিস ও মিলিটারী ফোর্স সাধ্যমত সন্নিবেশিত করে, তাদের এক বৃহৎ অংশ নিয়ে অমরেন্দ্রের সমস্ত গতিপথ রুদ্ধ করে দিলেন। সদরঘাট রাস্তার উত্তর ও দক্ষিণ দিক হতে মিঃ স্থুটার ও মিঃ লুইস্ দু'টি সৈন্যদল নিয়ে স্কুল কম্পাউণ্ডের দিকে অগ্রসর হলেন। একই সঙ্গে মেজর বেকার আর একটি সৈন্যদল নিয়ে গণেশদের কাপড়ের দোকানের সম্মুখ দিয়ে সদরঘাট রাস্তার পূর্ব হতে পশ্চিমে ছুটে গেলেন, যাতে অমরেন্দ্র এই দিকে পালাবার কোন সুযোগ না পায়। যাত্রামোহন স্কুলের প্রায় পাঁচ শ' গজ দূরে পলায়নের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে আলকরণ রোডে সৈন্য মোতায়েন হ'ল। ক্যাপ্টেন টেইট ও ক্যাপ্টেন রবিন্‌সন এই সৈন্যদল পরিচালনার ভার নিলেন। একটি গলিপথ সদরঘাট ও আলকরণ রোড দু'টিকে সংযুক্ত করেছে। এই গলিপথে ডি, আই, জি, মিঃ ফারমার ও স্বয়ং জেলা পুলিসসাহেব মিঃ জনসন বীরদর্পে আর একদল সৈন্য নিয়ে প্রবেশ করলেন। কি অপূর্ব সমাবেশ! একা অমরেন্দ্র—অচল-অটল-নির্ভীক! আর তার চারপাশে—মিঃ লুইস্, মিঃ স্থুটার, মেজর বেকার, ক্যাপ্টেন টেইট, ক্যাপ্টেন রবিন্‌সন, মিঃ ফারমার ও মিঃ জনসন প্রত্যেকেই এক-একটি

সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত! এ যেন অভিমন্যু বধার্থে সপ্তরথীর দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা।

এই বেড়াজাল পাতা সমাপ্ত করে জনসন সাহেব বাছাই করা একদল সৈন্য নিয়ে, প্রত্যেকে রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে মিলিটারী কায়দায় অমরেন্দ্রের আশ্রয়কক্ষে প্রবেশ করলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অমরেন্দ্রকে সে ঘরে পাওয়া গেল না। তবে তাড়াতাড়িতে অমরেন্দ্র সব জিনিস গুছিয়ে নিতে পারে নি বলে, সেখানে এমন ক'টি বস্তু ফেলে যায় যা কিছুক্ষণ আগেই তার সেখানে উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করছিল। Judgement-এ মিঃ জে, ইউনী লিখেছেন—

"Mr. Johnson with an armed force surrounded and searched the house but found nobody there. In a small room on the ground floor, however a khaki tunic, dhuti, bed-sheet and a broad green belt were discovered. The neighbourhood and some houses were searched...."

আমরা সরকারী ভাষ্য থেকে স্পষ্ট জানতে পারছি তারা অমরেন্দ্রের বাড়ি ঘেরাও করেছিল এবং অমরেন্দ্রকে সেখানে না পেয়ে আশেপাশের এলাকার কতকগুলি বাড়িতেও 'অনুসন্ধান' করেছে। বাস্তবে যা ঘটেছিল—তা কেবল অনুসন্ধান নয়, ক্ষিপ্ত জন্তুর মত জনসন সাহেব তাঁর পুলিস-বহর নিয়ে প্রতিবেশীদের বাড়ি 'আক্রমণ' করেছেন—প্রতিটি বাড়ি তছনছ করেছেন, জিনিসপত্র ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন। বাড়ির মেয়েদের প্রতি ভদ্র আচরণে জনসন সাহেব উদাসীন তো ছিলেনই উপরন্তু কোন কোন বাড়িতে চরম অভদ্রতাও করেছেন।

অমরেন্দ্র যাত্রামোহন স্কুল থেকে ঠিক সময়ে উধাও হয়ে প্রতিবেশীদের কারও বাড়িতে সাহেবদের অজ্ঞাতে আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিসের অত্যাচর ও পীড়নের নমুনা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সে ভাবল, যতক্ষণ সে শত্রুব্যূহের মধ্যে আছে, ততক্ষণ সাধারণ ও নিরীহ লোকের ওপর এই পুলিসী জুলুম ও তাণ্ডবের পরিসমাপ্তি হবে না। পরবর্তী ঘটনার বিবরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, অমরেন্দ্র সেই ভেবেই বেপরোয়া হয়ে দিনের আলোতেই প্রতিবেশীদের বাড়ি পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। কারও বাড়ির দেওয়ালের আড়াল থেকে যুদ্ধ করলেও অসমান শক্তির মোকাবিলার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের বাস্তব উপলব্ধি থেকেই অমরেন্দ্র বুঝেছিল যুদ্ধে তার মৃত্যুর পরে বা আগেও গুলী বর্ষণের

সময় সেই বাড়ির নিরীহ লোকেদের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হতে পারে। এই উপলব্ধি থেকেই অমরেন্দ্র শেষ চেষ্টা হিসাবে গৃহস্থ বাড়ি থেকে বেরিয়ে, যত দূর সম্ভব নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে, আলকরণের অপেক্ষাকৃত নির্জন গলিপথ অনুসরণ করে সৈন্য ও পুলিস রচিত ব্যূহের শেষ প্রান্তে ছুটে যায়। সামনের রাস্তার ওপর প্রবল শক্তিশালী পুলিসবাহিনী উদ্যত বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে। পাহারায় নিযুক্ত সৈন্যঘাঁটিটি অতিক্রম করতে পারলে অমরেন্দ্র হয়ত নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছতে পারত। কিন্তু দিনের আলোয় অত বড় সেনাদলের দৃষ্টির অগোচরে রাস্তাটি অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। সামনে রাস্তার ওপর পুলিসের 'কর্ডন' আর পেছনে ক্ষিপ্ত জনসনের পুলিস-বহর—অমরেন্দ্র এই দুইয়ের একেবারে শেষ সীমায় এসে উপস্থিত। এই উভয় বেষ্টনীর মাঝে পড়ে তার এগোবার বা পেছোবার কোন উপায় ছিল না। এই অবস্থায় অমরেন্দ্র বুকে গড়িয়ে মিলিটারী কায়দায় রাস্তার ওপরের একটি সরু কালভার্টের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। এই কালভার্টের ভেতর অমরেন্দ্র যদি গোপনে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে অপেক্ষা করতে পারতো, তবে হয়ত রাতের অন্ধকারে পুলিসবেষ্টনী ভেদ করার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও সম্ভব হ'ল না।

একটি নিরীহ বালকের অহেতুক কৌতূহল অমরেন্দ্রকে সেই সুযোগ হতে বঞ্চিত করলো! বালকটি অমরেন্দ্রকে ঐরূপ অস্বাভাবিক ছোট একটি ড্রেনের সুড়ঙ্গে প্রবেশ করতে দেখে কৌতুহলভরে হঠাৎ চীৎকার করে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জনসন সাহেব তাঁর পুলিসবাহিনী সমেত কাছাকাছিই উপস্থিত ছিলেন। বালকের চীৎকার ও আশেপাশের লোকদের মধ্যে হঠাৎ আলোড়ন লক্ষ্য করে পুলিসবাহিনী সেখানে ছুটে আসে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানে যে, একজন যুবক ঐ সুড়ঙ্গে আত্মগোপন করে আছে। জনসন সাহেব হুইসেল বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে long blast-এ (লম্বা টানে) চারিদিক থেকে পর পর হুইসেল বাজিয়ে শত্রুপক্ষ সঙ্কেতধ্বনি দিতে লাগলো। তারপর জনসন সাহেবের হুকুমে সেপাইরা দশ-বারো রাউণ্ড রাইফেল ফায়ার করলো। একটা বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হ'ল। পুলিসের উদ্দেশ্য, অমরেন্দ্রকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তার পক্ষে পলায়নের চেষ্টা বৃথা—আত্মসমর্পণ করতেই হবে, নইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

ইতিমধ্যে জনসন সাহেবের ফোর্স সাবধানতার সঙ্গে আড়ালে থেকে বুকে হেঁটে কালভার্টের কাছে উপস্থিত হ'ল। তখনও তারা অমরেন্দ্রের দৃষ্টির বাইরে। জনসন সাহেবের এখন চিন্তা কি করে অমরেন্দ্রকে বন্দী করবেন। তিনি হেম

দারোগাকে আদেশ দিলেন সে যেন চেঁচিয়ে অমরেন্দ্রকে আত্মসমর্পণ করতে হুকুম করে। যথারীতি আদেশ পালিত হ'ল। দারোগামহাশয় কাগজের চোঙার মাধ্যমে চীৎকার করে বললেন, "দেখ, তোমার কোন ভয় নেই। তোমার ওপর কোন অত্যাচার হবে না। তুমি ধরা দাও। তোমার ভালর জন্যই বলছি—তুমি ধরা দাও।" কালভার্টের নিচ থেকে জবাবের আশায় পুলিস কান খাড়া করে আছে। মূর্খ পুলিসের দল—ততোধিক মূর্খ জনসন সাহেব ভেবেছিলেন বিপ্লবী অমরেন্দ্র গুলীর ভয়ে বা প্রাণের মায়ায় পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করবে! চাকুরে জনসনসাহেব ও ভাড়াটে সৈন্যদল অতলস্পর্শী স্বদেশপ্রেমের গভীরতার সন্ধান কেমন করে পাবে? মোহে অন্ধ জনসন সাহেব তখনও আশায় আছেন অমরেন্দ্রকে জীবন্ত গ্রেফতার করবেন; তাই নিজে একবার শেষ চেষ্টা করলেন। সেই নিস্তব্ধ কালভার্টের উদ্দেশ্যে জনসন সাহেব চীৎকার করে বললেন—"দেখ, তুম্ ডর মাৎ। তুম্‌হারা কৈ খারাবী নহি হোগী। তুম্ surrender কর। তুম্‌হারা ভাগ্‌নেকা কৈ রাস্তা নহি হায় ভাগ্‌নেকা কোশিশ্ মাৎ কর। গোলিসে মর যাওগে। তুম্ নিকাল আও। তুম্‌কো বহুৎ মদৎ করেঙ্গে। আ যাও—নিকাল আও—surrender কর...!" কি আকুল আবেদন? কি করুণ মিনতি—"একবার তুমি ধরা দাও।"

সকলের দৃষ্টি কালভার্টের দিকে নিবদ্ধ—এই বুঝি আসামী বেরিয়ে আসবে। সকলেই উত্তরের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু হায়রে দুরাশা! নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে উত্তর এল—"গুড়ুম্" "গুড়ুম্"! সপ্তরথীর চক্রব্যূহকে বিদ্রূপ করে অমরেন্দ্রের হাতের পিস্তল ও রিভলভার গর্জন করে উঠল! বিপ্লবী অমরেন্দ্র আত্মসমর্পণ করতে পারে না—স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক অমরেন্দ্র দেশজননীর চরণে আত্মদান করেছে।

আমাদের মামলার জাজ্‌মেণ্ট থেকে উদ্ধৃত করছি—

"Eventually Amarendra was found hiding in a culvert, a short distance off in Alkaran lane. He was called upon to surrender but the only response was the report of a pistol—shot fired from inside the culvert. Mr. Johnson then fired two shots at the culvert. The culvert was eventually broken open and Amarendra Nandy was brought out mortally wounded. He had a revolver in one hand and a small automatic pistol in the other."

আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাবের উত্তরে কালভার্টের নিচ থেকে পিস্তলের শব্দ শোনা গেল—ধরা দেবার বদলে অমরেন্দ্র নিজেই নিজেকে গুলী করেছে ; তবু জনসন সাহেব কালভার্ট লক্ষ্য করে দু'বার গুলী ছুঁড়লেন—কিন্তু, কেন? অবশেষে কালভার্টটি ভেঙে ফেলে মৃত্যুহীন প্রাণ শহীদ অমরেন্দ্রের নশ্বর দেহটিকে বাইরে টেনে আনা হ'ল, তখনও তার এক হাতে একটি রিভলভার, অন্য হাতে একটি ছোট অটোমেটিক পিস্তল।

আজ সাঁইত্রিশ বছর পরেও আমি সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর কুখ্যাত পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ জনসনের অমানুষিক অত্যাচারের কথা ভুলতে পারি নি! সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন মনোভাবের জন্যই অতীতকে ভুলতে চাই না। অমরেন্দ্রর মৃতদেহ লক্ষ্য করে জনসন সাহেব দু'বার গুলী ছোঁড়েন। জনসনের সেই কুকীর্তির কথা সরকারপক্ষ খুব সতর্কতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে গোপন করতে চেয়েছেন।

আমাদের মামলার সময় পুলিসের একজন বৃদ্ধ কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টর (তাঁর নাম ভুলে গেছি) আমাকে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কালভার্টের নিচ থেকে অমরেন্দ্রের মৃতদেহ টেনে বার করা হলে জনসন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নিশ্চল নিস্পন্দ মৃতদেহের ওপর বার বার বুটের লাথি মেরেছিলেন এবং গুলী করেছিলেন। ভারতের বুকে ইংরেজ শাসনের এবং অত্যাচারের যত নির্মম এবং ঘৃণিত ইতিহাস আছে সে তুলনায় এটা হয়ত তেমন কিছুই নয়। তবু সেই বৃদ্ধ কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন—"কি বলবো মশাই, একটি স্কুলের ছাত্র—কি বা তার বয়স! surrender করে নি—এই তার অপরাধ। তাই বলে মৃতদেহের ওপরে পদাঘাত! জনসন ব্যাটা সেই নিষ্পাপ তরুণ ছাত্রটির মৃতদেহকে গুলীবিদ্ধ করেছে—শবের ওপর বুটের লাথি মেরেছে—যে কেউ দেখবে তারই অন্তর ক্রোধে ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে যাবে। আমাদেরও রাগ হয়েছে—ঘৃণা হয়েছে—কিন্তু কি করবো, পেটের দায়ে আমরা আজ সরকারের গোলাম! আমাদের দাসত্ববোধই এই অমানুষিক অত্যাচার নিজের চোখে দেখেও মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করে যেতে আমাদের বাধ্য করেছে।"

আমাদের মামলার সময় এই জনসন সাহেবকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় জেরা করবার সুযোগ পেয়ে তাঁর ও তাঁদের মুখোস খুলে দেবার জন্য আমি প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলেছি। আমার জেরার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :—

I—"However, Mr. Johson do you consider this to be sheer

discredit on your part that you completely failed to stop this armed upsurge of the youth ?

Johnson—I did my duty.

I—I see, Mr. Johnson, you did your duty ! But did you do your duty after the kick you got ?

President—I disallow the question.

I—If that pleases your honour certainly your honour may disallow the question but the glaring fact remains. ....well tell me now why did you fire two shots at the "culvert ?"

Johnsan—It was necessary.

I—Was it necessary for your self-protection ? Did Amarendra fired at your direction ?

Johnson—I heard the report of a pistol fire inside the culvert.........

I—I put it to you that you definitely heard that the revolver banged twice inside the culvert.

Johnson—Might be that inside the culvert Amarendra used his revolver twice. But I remember one distinct sound.

I—Did you get any other response from inside the culvert in reply to your shouts for surrender ?

Johnson—No. We did not get any response.

I—Did you not infer that Amarendra was refusing to surrender and was turning a deaf ear to your repeated command and allurement ?

Johnson—Probably we made such inferences about him....

I—That is right. Now tell me, did you not similarly feel that he fired shots inside the culvert to himself rather than surrender to the British imperialist agents ?

Johnsnn—I was not sure of his suicide.

I—I put it to you, Mr. Johnson, you were absolutely sure that Amarendra did not shot aimlessly in the absence of any visible target, but he fired two successive shots inside the culvert to kill himself. Do you deny this ?

Johnson—Probably it was so.

I—Mr. Johnson, I put it to you squarely that even knowing fully well that Amarendra commited suicide you fired two shots at his dead body out of nervous apprehensions lest the ghost of Amarendra might shoot you.

President—The question is disallowed.

I—If your honour has objection to my suggestion that Mr. Johnson had a nervous apprehension to be shot by the ghost of Amarendra then I may put the next question.

Well Mr. Johnson, if it was not any apprehension about the ghost, then was it for punishing him that you fired two shots at the corps of Amarendra.

President—I disallow the question.

I—I see !"

বিচারকক্ষে প্রেস ও সাধারণের সম্মুখে জনসন সাহেবের অপকীর্তি উদ্ঘাটিত করাই বিপ্লবীদের শেষ কর্মসূচী, তা' আমরা কেউ মনে করি নি। তবু সুযোগ পেয়েছি বলেই দেশবাসীর মনে ইংরেজের প্রতি ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত করার অভিপ্রায়ে জনসন সাহেবকে ঐভাবে জেরা করে পর্যুদস্ত করতে চেষ্টা করেছি।

ভূপেনদার আশ্রয়ে কলকাতায় থাকাকালে ফিরিঙ্গিবাজারে পুলিসবেষ্টিত অবস্থায় অমরেন্দ্রর আত্মহত্যার কাহিনী আমরা শুনেছিলাম। তার প্রায় চার-পাঁচ মাস পরে আদালতে জনসন সাহেবকে জেরা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। কলকাতার বাড়িতে উড়ন্ত বুলেটিন ও নানা সূত্রে চট্টগ্রামের ঘটনাবলীর খবর আমাদের কাছে পৌঁছচ্ছিল। যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী—সেই সময়কার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর এই খবরে বাংলার জনসাধারণ

বিচলিত ও উদ্বেলিত! কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় আইন-অমান্য আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাংলা তথা ভারতের সমস্ত জেলখানা ভর্তি হয়ে গেছে। বাইরে শোনা যাচ্ছে—আলিপুর জেলের পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো—জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন কারণে রাজনৈতিক বন্দীদের গোলযোগ ঘটেছে। তারপরেই একদিন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল—চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গ ও জেল-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ সোমদত্ত সামনে দাঁড়িয়ে থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর লাঠি ও গুলী চালিয়েছে আর সুভাষ বসু আহত হয়েছেন—এই সংবাদ বাংলার যুবকবৃন্দকে বিশেষভাবে প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে।

ভূপেনদার সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা স্থির করলাম—আপাতত চন্দননগরে একটি নিরাপদ ঘাঁটিতে আমাদের শক্ত হ'য়ে বসা দরকার, চট্টগ্রামে মাস্টারদার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা এবং একটি ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিকল্পনা নেওয়া চাই।

অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভূপেনদা তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রিত যুগান্তর পার্টির এক অংশের সমর্থনে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের জন্য চন্দননগরে একটি আশ্রয়-স্থল যোগাড় করলেন। যোগাড় করেছেন বললে ভুল হবে—প্ল্যান করে নিজ বিপ্লবীদলের বাছাই করা একজন সভ্য ও সভ্যাকে বাড়ির কর্তা ও কর্ত্রী সাজিয়ে বসালেন। এই বাড়ি কোন দরদী বন্ধুর বাড়ি নয়—এই বাড়িটি বিপ্লবীদলের নিজস্ব ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। আত্মগোপনকালীন অবস্থায় পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে ষড়যন্ত্রমূলক কাজের প্রস্তুতি ও শিক্ষা প্রভৃতির জন্য নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এইরূপ একটি বাড়ির প্রয়োজন আমরা সকলেই অনুভব করেছি—বহু বাধা ও বিপদের মধ্যেও ভূপেনদা আমাদের সেই অভাব মিটিয়েছেন।

কলকাতার আশ্রয়স্থল ছেড়ে আমাদের নিরাপদে চন্দননগর পৌছতে হবে। সন্ধ্যার পর গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে মোটরে চন্দননগর রওনা হওয়া স্থির হ'ল।

আমাদের পথ-প্রদর্শক হিসেবে গাড়িতে থাকবেন চন্দননগর গোন্দলপাড়ার অধিবাসী শ্রীযুত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ওখানকার বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ও মাননীয় ব্যক্তি—বয়স পঞ্চাশের কিছু ঊর্ধ্বে। সৌম্য-সুন্দর গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা—বক্ষ জুড়ে ছড়ানো কালো দাড়ি। বসন্তদাকে আমরা আগে কখনও দেখি নি—ভূপেনদাও তাঁর কথা আমাদের কখনও বলেন নি। তাঁরই বিশেষ চেষ্টায় আমাদের জন্য চন্দননগরের এই বাড়িটির ব্যবস্থা হয়েছিল। আমাদের এই বাড়িটিও গোন্দলপাড়ায় বসন্তদার বাড়ির নিকটেই।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। আমাদের কলকাতার বাসস্থানের দরজায় একটি কালো রং-এর প্রাইভেট মোটরগাড়ি এসে থামলো। আমরা চারজন আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। ভূপেনদা একটু আগেই এসেছেন। তিনি বসন্তদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়িতে তুলে দিলেন।

কলকাতার রাস্তা ধরে শোঁ শোঁ করে গাড়ি ছুটে চলল—কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ট্রাঙ্ক রোডে এসে পড়লাম। ফরাসী চন্দননগরে যাওয়া-আসার পথে Border Police Out-Post অতিক্রম করতে হয়। বৃটিশ অধিকৃত এলাকায় ইংরেজ সীমান্তরক্ষীরা বরাবরই নিয়মমাফিক প্রত্যেকটি গাড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করে। চন্দননগরের ঐতিহাসিক বিপ্লবী ঐতিহ্যবশতঃ চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহের পরও বাংলাদেশে সমকালের বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য চন্দনগরের সীমান্তরক্ষীরা অপেক্ষাকৃত বেশি তৎপরতার সঙ্গে পাহারা দেয়। প্রতিদিনই শত শত গাড়ি আসা-যাওয়া করে। সীমান্তরক্ষীরা সাধারণভাবেই পাহারা দেয়। খুব কিছু একটা ভয়ের বা ভাবনার তেমন কোন কারণ নেই, তবু কেন জানি না—ট্রাঙ্ক রোডে পড়েই আমার মনে একটা অনিশ্চয়তার আতঙ্ক হচ্ছিল—হয়ত বা গণেশ, মাখন ও আনন্দের মনেও অনুরূপ অজানা আশঙ্কার অনুভূতি ছিল।

আমাদের সঙ্গে গাড়িতে বসন্তদা ছিলেন। বৃদ্ধ না হলেও তাঁর দাড়ি-গোঁফ সব মিলিয়ে প্রথম দর্শনেই তাঁকে বেশ বয়স্ক বলেই মনে হয়। সীমান্ত প্রহরীর দল যদি বিশেষ কোন নির্দেশ না পেয়ে থাকে যে, অত নম্বর গাড়িটিকে তাদের রুখতে হবে—তবে গাড়িতে বসন্তদার উপস্থিতিই যথেষ্ট—পুলিস আমাদের সন্দেহ করবে না।

আমাদের চারজনের কাছে পাঁচটি রিভলভার—গণেশের কাছে দুটি। আর দু'এক মিনিটের মধ্যেই চন্দননগরে প্রবেশ করব। তার আগেই বৃটিশ সীমান্তরক্ষী ও ফরাসী চন্দননগর সীমান্তরক্ষীর দল routine duty করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তা' হ'লই বা—এত ভাববার কি আছে? কত গাড়ি তো আসছে যাচ্ছে, সবাইকে কি ধরছে? কালেভদ্রে হয়ত কাউকে সন্দেহ করছে! আমাদের তারা কেন ধরবে? কেন সন্দেহ করবে? তবু আমাদের বুক দুরু দুরু করছে—সহস্র ভাবনায় মন তোলপাড়! পাঁচটি রিভলভার সঙ্গে নিয়ে চলেছি তদুপরি আমাদের প্রতিটি মস্তকের জন্য বহু সহস্র টাকার পুরস্কার ঘোষিত—হয়ত বা সেই জন্যই আমাদের সহজ ভাবের এত অভাব।

সীমান্তরক্ষীরা যথারীতি গাড়ি থামালো—আমাদের নিরীক্ষণ করলো—

গাড়ি অবরোধ করার কোন কারণ পেল না। বসন্তদার বয়স ও বড় বড় কালো চাপ দাড়িই আমাদের পাশপোর্ট।

বসন্তদার নির্দেশমত চন্দননগরের পথে ঘুরে ঘুরে গাড়িটি একস্থানে থামলো। বসন্তদা বললেন—"একটু হেঁটে যেতে হবে—বাড়ির সামনে পর্যন্ত গাড়ি যাওয়ার মত রাস্তা প্রশস্ত নয়।" আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে বিছানাপত্র কিছুই নেই—কাজেই হেঁটে যেতেও কোন অসুবিধে নেই! তবে গাড়ি বাড়ির দরজা পর্যন্ত যাওয়ার পক্ষে রাস্তা বেশ প্রশস্তই ছিল। সব সময়ে সেই রাস্তায় গাড়ি চলে এবং সেই বাড়ির সামনেও গাড়ি দাঁড়াবার ব্যবস্থা ছিল। কলকাতার ড্রাইভার এই বাড়িটির বিশেষ অবস্থানটি যেন জানতে না পারে তার জন্যই বসন্তদা ড্রাইভারকে অতদূরে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন।

বসন্তদার সঙ্গে আমরা একটি দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। মজবুত কাঠের প্রকাণ্ড দরজা বাড়ির ফটক সুরক্ষিত করে দণ্ডায়মান! বসন্তদা বিশেষ সাঙ্কেতিক শব্দে ফটকের দরজার কড়া নাড়লেন ভেতর থেকে ফটকের বিশাল দুটি ভারী কাঠের কপাট খুলে গেল। গৃহস্বামী আমাদের অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। বসন্তদাও আমাদের সঙ্গে ওপরে দোতলায় এলেন। দু'তিন মিনিট পর বসন্তদা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

আমাদের জন্য দু'টি কামরা আলাদা রাখা ছিল। রান্নার জন্য পাশে একটি ছোট ঘরও ছিল। এই ঘর তিনটির সামনে দিয়ে বারান্দা—বারান্দার নিচে ছোট্ট উঠোন—প্রায় ১৮।২০ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে এই উঠোনটি ঘেরা। বাড়ির ভেতরে—এমন কি দোতলার বারান্দার ওপরেও আমাদের চলা-ফেরা বাইরে থেকে দেখার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের এই তিনটি ঘরের দক্ষিণে আরও দু'টি কামরা ছিল। বাড়ির 'কর্তা' ও তাঁর 'স্ত্রী' সেই ঘর দুটিতে থাকতেন। কোনদিন যদি ধরা পড়ি সেই অবস্থায় অমাদের সদুত্তর ঠিক করে রেখেছিলাম—বাড়ির কর্তা ওই ঘর দু'টি ও রান্নাঘর আমাদের Sub-let করেছেন। তাই রান্নার বন্দোবস্তও আমাদের প্রস্তুত ছিল, প্রতিকূল অবস্থায় যেন আমরা প্রমাণ করতে পারি, আমাদের ও বাড়িওয়ালার মধ্যে অন্য কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রান্না-বান্না কিছুই করতাম না, আমাদের খাওয়া-দাওয়া সবই সেই পরিবারের সঙ্গেই চলতো। এই বাড়িতে কোন চাকর-বাকর বা ঝি রাখা হ'ত না। পঞ্চাননবাবু,—দলের একজন সভ্য, ভূপেনদার নির্দেশমত মাঝে মাঝে এসে বাজার করে দিয়ে যাবেন—এই ব্যবস্থাই ছিল।

বসন্তদা চলে যাওয়ার পর বাড়ির 'কর্তা' আমাদের ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। রাত প্রায় দশটায় আমাদের খাবার ডাক এলো। গৃহকর্ত্রী এতক্ষণ রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের রান্না ও খাওয়ার ঘর নিচের তলায় আমরা চারজন ও গৃহস্বামী নিচে খাওয়ার ঘরে পাঁচটি আসনে খেতে বসলাম ঘরে ইলেকট্রিক্ আছে—খুব কম পাওয়ারের একটি বাল্ব জ্বলছে। খাওয়ার ঘরের এক কোণেই রান্নার ব্যবস্থা। খাওয়ার সময় তেমন কিছু কথাবার্তা হ'ল না। গৃহকর্ত্রী বিনয় সহকারে কয়েকবারই বললেন—'রান্না হয়ত ভাল হয় নি, আপনাদের খেতে কষ্ট হচ্ছে' ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বভাবতই আমরাও বিনম্র উত্তর দিয়েছি—"অপূর্ব রান্না! কত পদ করেছেন?—কি যে বলেন! আমাদের খুব সঙ্কোচ হচ্ছে সারাক্ষণ আপনি একা একা এত পরিশ্রম করেছেন আর আমরা দিব্যি আরামে বসে বসে খাচ্ছি"—ইত্যাদি। প্রথম দিনে আর বেশি কথাবার্তার সুযোগ হ'ল না। রাতও হয়েছে—সবাই নিজেদের ঘরে ঘরে শুতে চলে গেলাম।

তারপরের দিন আমরা তাঁদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলাম। Impersonification-এর চার্জে পাছে অভিযুক্ত হন সেই জন্য তাঁদের পরিচয় তাঁরা গোপন করেন নি। "শশধর আচার্য" রেলে চাকরি করতেন আর তাঁর "স্ত্রী" সুহাসিনী গাঙ্গুলী চন্দননগরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধানা শিক্ষিকার পদে নিযুক্তা ছিলেন। বসন্তদা বোধ হয় সেই স্কুলের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে প্রধান পদেই আসীন ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় সেই স্কুলে সুহাসিনীদির চাকরি হ'ল—"স্ত্রী" স্কুলে চাকরি করবেন তাই তো তাঁর "স্বামী" শশধর আচার্য চন্দননগরে বাড়ি ভাড়া নিলেন! এত সব প্ল্যান করে তবেই ভূপেনদা এই বাড়ির বন্দোবস্ত করেছেন! ডক্টর ভূপেন দত্ত নয়—সেই যুগের "স্বাধীনতা" পত্রিকার সম্পাদক ও যুগান্তর পার্টির অন্যতম নায়ক ভূপেনদা।

বহুদিন পর্যন্ত তাঁরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় জানতেন না। তাঁদের শুধু বলা হয়েছিল—আমরা বিপ্লবী, আমাদের বিরুদ্ধে গ্রেফ্তারী পরোয়ানা আছে—তাই আমাদের আত্মগোপন করে থাকতে হবে এবং সেইজন্য তাঁরাই আমাদের গোপনে ও নিরাপদে রাখতে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন। আমাদের নাম তাঁদের বলা হয় নি।

দু'তিনদিন পরেই এই বাড়িতে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। খুব কাঁপিয়ে জ্বর উঠল, প্রায় সময়ই একশ' চার-পাঁচ ডিগ্রী জ্বর থাকত। ভূপেনদা ডাক্তারের ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তার ইন্‌জেকশান দিয়ে যেতেন। আমার যতদূর মনে

পড়ে ডাঃ নারায়ণ রায়ও বোধ হয় একবার পরীক্ষা করে আমার ওষুধ ও পথ্যের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান দিয়েছিলেন। আমার অসুস্থতার সময় সুহাসিনীদি ও শশধরদা আমার ওষুধ-পথ্য ও শুশ্রূষাদির জন্য নানাভাবে ব্যস্ত থাকতেন। আমার আজও মনে আছে—আমার বমি ভর্তি পাত্রখানা সুহাসিনীদি যখন অবলীলাক্রমে হাতে করে পরিষ্কার করবার জন্য নিচে নিয়ে যেতেন আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতাম এবং লজ্জিত হতাম।

আগে যখনই কোন অসুখ হয়েছে—মা ও দিদি ছাড়া কারো কাছ থেকেই কোন সেবা-যত্ন আমি নিই নি। পরিচিতা বা অপরিচিতা কোন তরুণীর সান্নিধ্যেই আমি এর পূর্বে কখনও আসি নি! সুহাসিনীদি বিদুষী, স্কুলের শিক্ষিকা, চাল-চলন কথাবার্তা পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত মার্জিত এবং সুন্দর—তাঁর সেই ফর্সা সুন্দর দু'টি হাতে আমার ঘরের মেঝে পরিষ্কার করবেন—আমার বমিকরা পাত্র পরিষ্কার করবেন—তা যেন আমি সহ্য করতে পারছিলাম না! নিদারুণ লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করছিলাম।

একদিন বমি করেছি—তখন আমার ঘরে কেউ ছিল না। পাছে সুহাসিনীদি এসে পড়েন সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি বমির পটটি পরিষ্কার করবার জন্য নিজেই নিচে নিয়ে গেলাম। আমার টেম্পারেচার তখন ১০৫° ডিগ্রী। তার ওপর পাঁচ-ছ'দিন পর্যন্ত ভুগে ভুগে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছি—আমার পক্ষে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামা কোনমতেই উচিত হয় নি—তাছাড়া ঐ বমিতেই আমাকে সবচেয়ে বেশি কাবু করে! কথায় আছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। এমনই কপাল ফিরে আসার সময় সিঁড়ির গোড়ায় সুহাসিনীদি পট-হাতে আমাকে দেখে ফেললেন। আর যাই কোথায়! তিনি ভীষণ চটে গেলেন—রাগ করে অনেক বকলেন আমাকে—"কে আপনাকে নিচে আসতে বলেছে? বাড়িতে কি আর কেউই ছিল না, আপনাকেই পট ধুতে আসতে হ'ল? আপনার যদি এত সংকোচ, এত দ্বিধা, এত কিন্তু ভাব—তবে লোকের বাড়িতে থাকা কেন? রাস্তায় বা ফুটপাতে থাকলেই পারতেন। ভেবে দেখুন আপনি আমাকে কতখানি অপরাধী করেছেন—এই প্রচণ্ড জ্বর গায়ে আপনি কিনা নিচে নেমে এসেছেন বমির পাত্র পরিষ্কার করতে? যদি মাথা ঘুরে পড়ে যেতেন তাহলে কি হ'ত?"

সুহাসিনীদি অতি কঠোরভাবে আমাকে তিরস্কার করছিলেন। আমি দু' একবার আমার অপরাধ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি—কিন্তু বলবার সুযোগ পাই নি—তিনিই আমাকে সমানে বকাবকি করে গেলেন। আমার হাত থেকে

পটটি টান দিয়ে নিয়ে গড়-গড় করে ওপরে চলে গেলেন। শুনতে পেলাম—"বেশ তো ভালই হ'ল। ভূপেনদাকে বলবো—এখানে আমার আর প্রয়োজন নেই!"।

তখনও জানি না—বুঝি নি, কে এই স্নেহশীলা দরদী তরুণী? কেন সেই বয়সে বাইরের সব আকর্ষণ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে বিপ্লবীদের একটি গোপন ঘাঁটির ভার নিয়ে আমাদের সব রকম ভাল-মন্দের ভাগী হয়েছেন? অজানা, অচেনা চারজন তরুণ বিপ্লবীর (যাদের প্রকৃত পরিচয় তাঁর জানা নেই) মঙ্গলের জন্য ভূপেনদার কথায় জীবন উৎসর্গ করেছেন? কে তিনি—কি তাঁর অবদান ভারতের মুক্তিসংগ্রামে?

চন্দননগরের বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে বসে আমরা চারজন—মাখন আনন্দ, গণেশ ও আমি, পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণের চেষ্টা করছি। কিন্তু জালালবাদ যুদ্ধের গণতন্ত্রীবাহিনীর সাথীদের জন্যই আমাদের ভয়ানক দুশ্চিন্তা। আমরা কেবল চিন্তা করছি তারা বর্তমানে কোথায়? ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কাজে পরিণত করবার জন্য তাদের পক্ষেও নিরাপদ ও শক্ত ঘাঁটির একান্ত প্রয়োজন। আমাদের চন্দননগরের আস্তানার বিবরণ দেবার আগে প্রধান-বাহিনীর পরিস্থিতি ও অবস্থানের কথা যা' জেনেছিলাম সেই সম্বন্ধে একটু লিখছি।

আগেই বলেছি, জালালাবাদ যুদ্ধের পর সেই পর্বত-শিখরে বারোজন শহীদকে অন্তরের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বাকি একচল্লিশজন বিপ্লবী সৈনিক পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল। প্রথমে একজন বাদে এক সঙ্গেই চল্লিশজন নেমে আসে। অম্বিকাদা প্রায় দু'তিন ঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে, একা একা সেই দুর্গম পাহাড়ের পথ কিছুটা অতিক্রম করে একটা নির্জন ও নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করছিলেন। বাকি চল্লিশজনের মধ্যে দু'জন গুরুতর আহত অবস্থায় অন্যান্যদের সঙ্গে পা ফেলে মার্চ করে চলেছে। এই প্রধান-বাহিনীও মার্চ করার সময় দু'ভাগে বিবক্ত হয়ে পড়লো। একদল লোকনাথ, কালী চক্রবর্তী ও সুবোধ চৌধুরীর নেতৃত্বে একদিকে গেল এবং অপরদল মাস্টারদা ও নির্মলদার সঙ্গে ভিন্ন পথে গ্রামের উদ্দেশ্যে পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে অগ্রসর হ'ল। মাস্টারদা ও নির্মলদার নেতৃত্বে যারা মার্চ করছিল, তাদের কথা আমি আগেই লিখেছি। লোকনাথের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিষয়ও পরে আমি বলতে চেষ্টা করবো।

নির্মলদার পরিচালনায় প্রায় কুড়ি-একুশজন সাথী পাহাড়, জঙ্গল ও মাঠ ভেঙে চলেছে। ভোর হবার আগেই কোন একটি নির্জন ও নিরাপদ পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হবে। ভোরের মাত্র আর দু'তিন ঘণ্টা বাকি। সকলেই এত

ক্লান্ত যে তাদের হাঁটার গতি অতি মন্থর। তবু ভোর হওয়ার বেশ কিছু আগে জালালাবাদ পাহাড়ের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যেই, চাষী বা গ্রামবাসীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়, এরকম একটি নির্জন পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে তারা শিবির স্থাপন করলো। দুপুরের রৌদ্র মাথার ওপর আগুনের হল্কা ছড়াচ্ছে, বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর অবসন্ন দেহ বিপ্লবী দৃঢ়তার প্রতিকূলে মানসিক ধৈর্য্যের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহী হয়ে উঠছে! সে এক চরম মুহূর্ত! তবু মাস্টারদা ও নির্মলদার নেতৃত্বের সম্মোহনী শক্তি সবাইকে উজ্জীবিত করেছে—প্রেরণা দিয়েছে। সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থাকেই গণতন্ত্রীবাহিনীর সৈনিকেরা জয় করেছে।

রাতের অন্ধকারে আবার তারা মার্চ স্বরু করলো। এবারেও তারা ভোরের আগেই আর একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিল এবং এই দ্বিতীয় পাহাড়টিতে সারাদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অনিদ্রা, শ্রান্তি ও ক্লান্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে করে আরও একটি দিন কাটিয়ে দিল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, অন্ধকারে গা ঢেকে বিপ্লবী সাথীরাও পাহাড় পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে নিচে নামলো। আজ রাত্রে তারা সুপরিচিত গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করবে। পুলিসের তালিকার বাইরে দলের সদস্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং দলের নিরাপদ ঘাঁটিগুলির অবস্থাও দেখতে হবে। কিন্তু তাদের পরিধানে মিলিটারী পোশাক, হাতে রাইফেল এবং কোমরে বন্দুক—এই অবস্থায় কারও বাড়িতে যদি সাময়িকভাবে আশ্রয় এবং বেশভূষা পরিবর্তনের সুযোগ পাওয়া যায়, তবেই বিপ্লবী সৈনিকদের পক্ষে ছোট ছোট দলে ও ব্যক্তিগতভাবে নিরাপত্তা বজায় রেখে ভবিষ্যতের কর্মসূচী স্থির করা সম্ভব। কাজেই এখন প্রধান ও একমাত্র সমস্যা হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল যোগাড় করা!

মাস্টারদা উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এমন কেউ আছ কি যে নিজের বাড়ি বা আত্মীয়ের বাড়ি অথবা কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে হলেও আমাদের সকলের অন্তত একদিনের জন্য থাকবার ব্যবস্থা করতে পার? প্রকৃত প্রভাব না থাকলে আন্দাজে কারও বাড়িতে উপস্থিত হলে কিন্তু নানা বিভ্রাট ঘটতে পারে। তাই আমার জানবার উদ্দেশ্য নিরাপদে থাকবার মত কোন বাড়ি কারো সন্ধানে আছে কি?" সবাই নীরব—সকলেই চিন্তা করছে। সাময়িক আস্তানার আশু প্রয়োজনীয়তা সবাই বুঝেছে। অবশেষে দলের মধ্যে যে সকলের ছোট, সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো। সে বলল—"মাস্টারদা, আমি বয়সে ছোট—মাত্র দশম-শ্রেণীর ছাত্র। এই বয়সে বাড়ির ওপর আমার প্রভাব বা

ক্ষমতা কতটুকুই বা থাকতে পারে—আপনার মনে এইরূপ প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক। আপনার কথা শুনে আমি খুব চিন্তা করে দেখলাম, আমার প্রভাব বাড়ির ওপর কতখানি—আমি সত্যিই আপনাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যেতে পারি কিনা। সব দিক ভেবেই বলছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার বাড়িতে আমরা সকলেই যেতে পারি এবং বাড়ি থেকে সাহায্যও পাবো।" সবার দৃষ্টি এই সাথীর দিকেই নিবদ্ধ। এত ছোট—তবু কি করে সাহস করছে এত বড় দায়িত্ব নিতে? মাস্টারদা ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—"আমি তোমার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখি। তুমি তোমার বাড়ির অবস্থা এবং তোমার বাবা-মা'র মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন বলেই এই গুরু কর্মভার নিতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছ। এই দায়িত্ব আমরা তোমায় দিলাম। ঝুঙ্কু, তুমি এখন আমাদের পরিচালনা কর। সুবোধ রায়—বালক ঝুঙ্কু, বিশজন সশস্ত্র বিপ্লবী সাথীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

সুবোধ রায়ের (ঝুঙ্কু) বাড়ি নয়াপাড়া গ্রামে। দু' তিন মাইল দূরে হালদা নদী তাদের গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ করে প্রবাহিত। রাত প্রায় বারোটা। নদী পার হতে হবে। খেয়াঘাটে এত রাত্রে মাঝি পাওয়া যাবে কি না ভাবনার কথা। তা'ছাড়া সশস্ত্র মিলিটারী পোশাকে বিশজন লোক দেখে মাঝিরা কি ভাববে এবং তাদের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন যদি হতে হয় তবে সে আবার এক নতুন বিভ্রাট! এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সকলে খেয়াঘাটে উপস্থিত হ'ল। অদূরে তীরে কয়েকটি নৌকো বাঁধা; সবগুলিই খালি, একজন মাঝিকেও দেখা গেল না। আপাতদৃষ্টিতে অসুবিধে মনে হলেও বাস্তবে এইটিই তাদের সব চাইতে মঙ্গলের হ'ল। নিজেরাই দু'টি নৌকো বেয়ে হালদা নদী পার হ'ল; কেউ তো দেখতে পেলই না, উপরন্তু পরের দিনও কেউ বুঝতে পারলো না যে, কারা নৌকো নিয়ে গেছে বা কি করে নৌকো দু'টি ওপারে গেল? পুলিসে খবর দিয়েছিল কিনা তা' আমাদের জানা নেই। পুলিস ডাকলে যত না সুবিধে, তার চাইতে অসুবিধে আরও অনেক বেশি। তাই বোধহয় এই ছোট্ট ব্যাপারে কেউ আর পুলিসে খবর দেয় নি।

হালদা নদীর এই খেয়াঘাট থেকে সুবোধ রায়ের (ঝুঙ্কু) বাড়ির দূরত্ব প্রায় চার মাইল। সুবোধ রায় চট্টগ্রাম জজকোর্টের প্রখ্যাত উকিল ৺রাতুলকুমার রায়ের পুত্র। রাতুলবাবুর শহরে বাড়ি, গ্রামে বাড়ি এবং প্রচুর জায়গা-জমি—জমিদার বলেই তিনি পরিচিত ছিলেন। ১৮ই এপ্রিল সকলের অগোচরে

সুবোধ তার বাবার দোনলা বন্দুকটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। আর আজ ২৪শে তারিখ রাত্রে বাড়ি ফিরে এলো বাবাকে তাঁর দোনলা বন্দুকের বিনিময়ে ইংরেজ সুরক্ষিত অস্ত্রাগারের বিশটি রাইফেল ও বিশটি রিভলভার উপঢৌকন দিতে! পিতা-মাতার কাছে স্নেহমমতার দাবি অন্তর থেকে অনুভব করেছে বলেই এবং বাড়ির ওপর বিশেষ প্রভাব থাকায় ঝুঙ্কু সাহস করে মাস্টারদাকে বলতে পেরেছে—"...সে ভার আমি নিতে চাই, আমাকে বিশ্বাস করে সে দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন।"

বড় বাড়ি। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ না করে চুপি চুপি তারা বিশজন বাইরের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। সুবোধ একটা ঘরের দরজায় মৃদু করাঘাত করে ডাকলো—"ষষ্ঠীদা! ষষ্ঠীদা!" দু' তিনবার ডাকার পর ষষ্ঠীদা দোর খুলে বাইরে এলেন। বৃদ্ধ ষষ্ঠীদা, বাড়ির পুরনো 'ভৃত্য'। কিন্তু বাড়ির ছেলের কাছেও যখন উনি ষষ্ঠীদা, তখন তিনি যে কেবল মাত্র ভৃত্যস্থানীয় নন, তা' সহজেই অনুমেয়। ষষ্ঠীদা বাইরে এসেই হকচকিয়ে গেলেন। এ কি! বিশজন সৈনিকবেশী রাইফেলধারী নওজোয়ানের পুরোভাগে তাঁর দাদাবাবু! ১৮ই তারিখের যুব-বিদ্রোহের রণরোল ২৪শে তারিখেও ষষ্ঠীদার কানে পৌঁছয় নি—এ হতে পারে না। তা'ছাড়া, সেই দিন থেকেই দাদাবাবু উধাও, বাড়ির বন্দুক নিখোঁজ, মা-বাবার দুশ্চিন্তা—এই সব মিলিয়ে বিশজন সৈনিকের সাথে দাদাবাবুর আজ রাত্রের উপস্থিতি যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে, তা'তে ষষ্ঠীদার কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। আজ ষষ্ঠীদার মহা আনন্দ—দাদাবাবু ও চট্টলার বীর সন্তানদের তিনি সেবা করবেন। গর্বভরে সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ষষ্ঠীদা সবার দীর্ঘজীবন কামনা করলেন।

সুবোধ একটু চুপি চুপি ষষ্ঠীদাকে আশু প্রয়োজন জানাতে চাইল। ষষ্ঠীদা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে খুব চাপা কণ্ঠে বললেন—"আচ্ছা, আর বলতে হবে না। আমার পেছন পেছন তোমরা এস।" এই বলে ষষ্ঠীদা একটু এগিয়ে গিয়ে একটা খালি বড় ঘরের দরজা খুলে দিয়ে সবাইকে সেখানে বসতে বললেন। একে একে বিশজন সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলে ষষ্ঠীদা বাইরে থেকে একটা মস্ত বড় তালা লাগিয়ে দিলেন। ঘরের চারিদিকের জানালা দরজা বন্ধ। বিশজনের পক্ষে ঘরটি 'অন্ধকূপ' বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু উপায় নেই, সেখানে তাদের ২৫শে তারিখ পর্যন্ত থাকতেই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ ঘরে ষষ্ঠীদা দু'-তিন কলসী জল, কিছু চিঁড়ে ও গুড় পৌঁছে দিলেন। ঝুঙ্কু বাড়ির ভেতরে গিয়ে মা-বাবাকে প্রণাম করল। 'হারানো'

ছেলেকে ফিরে পেয়ে মা-বাবা মুহূর্তে সব দুঃখ ভুলে গেলেন। রাতুলবাবু তখনও তাঁর বন্দুক চুরির সংবাদ পুলিসে জানান নি। পুলিসও সুবোধ রায়ের খোঁজে তাঁর বাড়ি তল্লাসী করতে পারে এমন কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে নি। সুবোধ রায় দলের অত্যন্ত গোপন বিভাগের সভ্য ছিল বলেই তার নাম তখনও বাইরে প্রকাশ পায় নি। সুবোধ প্রথম থেকেই নির্মলদার কাছে বৈপ্লবিক জীবনের শিক্ষা পেয়েছে। মাস্টারদা ও নির্মলদা পরামর্শ করে স্থির করলেন সুবোধ বাড়িতেই থাকবে। মিহিরের বাড়ির বন্দুকও মতি কানুনগো নিয়ে এসেছে। মিহিরকে আমরা আত্মগোপন করে থাকার নির্দেশ দিই নি। তবু পুলিস নিখোঁজ বন্দুকের ব্যাপারে মিহিরকে গ্রেফতার করে নি। তাই স্বভাবতই মনে হয় সুবোধকেও তারা বন্দী করবে না। আর প্রথম থেকেই যদি সে আত্মগোপন করে থাকে তবে হয়ত সুবোধের বিরুদ্ধে হুলিয়া বার হবে। মাথার ওপর গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে কখনই পুরোদস্তুর কাজ করা যায় না। তাই মাস্টারদা ও নির্মলদা ঝুঙ্কুকে নিরীহ ছেলের মত বাড়িতেই থাকতে আদেশ দিলেন।

পুলিস-মাস্কেট বিশটি এক-এক ভাগে পাঁচটি করে চারটি বোঁচকা করা হ'ল। মাস্টারদারা এইগুলি চারটি নিরাপদ স্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। যাদের নিজ বাড়িতে বা আত্মীয়-বাড়িতে নিরাপদে থাকার সুবিধে আছে তাদের সেই সেই স্থানে যেতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল। বাড়িতে যারা থাকবে তাদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা সমীচীন নয় মনে করেই তাদের রিভলভারগুলি কেবল সেই গ্রুপের হেপাজতেই রাখা হ'ল, যারা পুলিসের কাছে সুপরিচিত বলে আত্মাগোপন করে ভবিষ্যতে সশস্ত্র আক্রমণের কর্মসূচী পরিচালনা করবে। প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সমাপ্ত হওয়ার পর সবাই খাকী পোশাক পরিবর্তন করলো। বলাই বাহুল্য, ধুতি-শার্টের ব্যবস্থাও ষষ্ঠীদার মারফতেই সম্ভব হ'ল।

এই বিশজন সৈনিকের মধ্যে বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে যারা আশ্রয় নিল তারা বাদে বাকি যে ক'জন রইল, তাদের সঙ্গে মাস্টারদা ও নির্মলদা গেলেন বিনয় সেনের বাড়িতে। বিনয় আমাদের বয়সী এবং সেও আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রামের প্রথম গ্রুপেরই সদস্য। প্রথম-শ্রেণীর কয়েকজন বিশেষ কর্মী প্রথম আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে নি। এর প্রধান কারণ, ১৮ই এপ্রিলের সশস্ত্র বিদ্রোহের পরদিন, অর্থাৎ ১৯শে তারিখ সকালে, ছাত্র-যুবকদের নিয়ে তারা (বিনয়, যোগেশ, গোবিন্দ) ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সৈনিক হিসেবে প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে এইরকম প্ল্যান ছিল। এরা তিনজনেই

আমাদের সমবয়সী। শচীন সেন ও অর্ধেন্দু দত্তও ছিল পরের ধাক্কা সামলাবার জন্য। তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু দত্ত একই সঙ্গে বি-এ পড়ত। আমি এই অর্ধেন্দু দত্তের কথাই আগে লিখেছি। জেল থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গেই আমি প্রথম সংযোগ স্থাপন করি। অর্ধেন্দু দত্ত ছাড়া প্রথম ছ'টি মাস আমি অন্য কাউকেই আমার আস্থাভাজন বলে মনে করি নি। তাকে আমার বিশ্বাস করবার কারণও ছিল। তারই হেপাজতে দলের "অমূল্য ধন" গুপ্তস্থানে সুরক্ষিত ছিল। অর্থাৎ, আমরা যখন ১৯২৪-২৮ সাল পর্যন্ত রাজবন্দী হয়ে জেলে ছিলাম, তখন এই অর্ধেন্দুই আমাদের রিভলভার পিস্তল সব সামলে রাখে। কাজেই তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণই থাকতে পারে না। জালালাবাদ যুদ্ধোত্তর সময়ে অর্ধেন্দু দত্তের অবদান অতুলনীয়। যাদের নাম আমি উল্লেখ করেছি, সেই সব বিপ্লবী সাথীদের নিয়ে মাস্টারদা ও নির্মলদা সারা চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে ব্যূহ রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৩০-৩৪ সাল পর্যন্ত হাজার হাজার মিলিটারী ও পুলিসের বিরুদ্ধে মাস্টারদার নেতৃত্বে যে শক্তিশালী আক্রমণ ও প্রতিরোধ-বাহিনী গড়ে ওঠে তার মূল ভিত্তি ছিল দলের এই প্রচ্ছন্ন শক্তি। যথাসময়ে এই শক্তির সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল বলেই চার বছর ধরে অত্যাচার ও নিষ্পেষণের মধ্যেও আমরা আমাদের বৈপ্লবিক অ্যাকশন অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলাম। এই প্রচ্ছন্ন শক্তির মূলে যারা ছিল তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইতিহাস লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ, অনেকের সঙ্গে পরে আমার আর দেখাই হয় নি। আমি বাইরে ও জেলে থাকাকালীন প্রত্যক্ষভাবে মেলামেশার মাধ্যমে দলের সভ্যদের কাছ থেকে যতটুকু জানবার সুযোগ পেয়েছি তারই ভিতর আমার লেখা সীমাবদ্ধ। যদি অনেক কথা বাদও পড়ে, তবে তা' আমার ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়। একজনের পক্ষে সকলের সম্বন্ধে সব কথা লেখা সম্ভব নয়। এ কাজের ভার যোগ্যতর আর কেউ গ্রহণ করলে সুখী হব।

বিনয় সেনের বাড়ি সুবোধদের একই গ্রামে—নয়াপাড়ায়। নির্মলদা প্রথমে একাই গেলেন বিনয়ের সঙ্গে দেখা করতে—তার বাড়ির অবস্থা চট্টগ্রামবাসীর মনোভাব এবং পুলিস ও মিলিটারীর তৎপরতা কিরূপ তার একটা মোটামুটি রিপোর্ট নিতে। বিনয় জানালো, বিপ্লবীবাহিনী তাদের বাড়ির ও চট্টল-বাসীদের আন্তরিক সমর্থন পেয়েছে; তাদের বাড়িটি আত্মগোপনের আস্তানা হিসেবে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারা যায় এবং পুলিস তার বর্তমান গতিবিধি ও কাজকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তাছাড়া পুলিস তখনও শহরের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত—সুদূর বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার তাদের সময়

নেই এবং অত সৈন্যও নেই যে বিপ্লবীদের চাইতে অধিক শক্তি নিয়ে আন্দাজে সব গ্রামে প্রবেশ করতে পারে। শহর আয়ত্তে আনা যদিও বা সম্ভব কিন্তু প্রত্যেকটি গ্রামে ও গ্রামান্তরে সৈন্য মোতায়েন করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। বাংলা দেশে ইংরেজ সরকারের পক্ষেও তা' সম্ভব হয় নি।

নির্মলদা, মাস্টারদা ও আরও কয়েকজন প্রথম সারির বিপ্লবীর বিনয়ের বাড়িতেই থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। বিনয়ের বাড়িটি বর্তমানে ফিল্ড-হেডকোয়ার্টার বললেই চলে। এই কেন্দ্র থেকেই মাস্টারদা ও নির্মলদা চট্টগ্রামের বিভিন্ন গ্রামে দলের সমর্থক ও সভ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন।

এবার আমরা আবার জালালাবাদ যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যেতে চাই। আমাদের বিপ্লবীসাথীরা সবাই এখনও নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসে নি। মাস্টারদার সঙ্গে দলের প্রায় অর্ধেক অংশ যখন গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয় তখন বিনোদ চৌধুরী গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে পাহাড় থেকে নামার চেষ্টা করছে। গলার ডান পাশ দিয়ে রাইফেল বা লুইস্-গানের '৩০৩ বোরের গুলী প্রবেশ করে গলার বাঁ পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তখনও অনবরত রক্ত ঝরছে। বিনোদ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। যারা তার দুর্বল দেহকে নিজ স্কন্ধে ও বাহুতে support দিচ্ছে তারাও অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বনবিহারী দত্ত বিনোদের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু। সে এবং অপর একজন সাথী, যতই কষ্টসাধ্য হোক্ না কেন, বিনোদকে তারা সঙ্গে নিয়ে যাবেই। বিনোদও বুঝতে পারছিল তারা তাকে ফেলে যাবে না, কিন্তু সে ভাবছিল, তাহলে কি তারা প্রধান-বাহিনীর গতির সঙ্গে মিল রেখে কদম ফেলতে পারবে? এক হতে পারে তাদের তিনজনকেই পেছনে পড়ে থাকতে হবে, আর নয়ত, প্রধান-বাহিনীর সকলেই বিনোদের অক্ষমতার জন্য গতি মন্থর করতে বাধ্য হবে। এর কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। বিনোদের আহত অবস্থার জন্য দু'জন সাথীকে পেছনে পড়ে থেকে যে কোন সময়ে শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে—এইরূপ অর্থহীন sentiment বনবিহারী ও অপর সাথীকে আচ্ছন্ন করুক, এটা বিনোদ কোন-মতেই মানতে পারছিল না।

বিনোদ আর এক পাও চলতে পারছিল না। সে বনবিহারীকে সম্বোধন করে বলল—"দেখ তোমরা অনেক পেছনে পড়ে আছ। আমাকে কোনমতে নিচে নামিয়ে দিয়ে তোমরা দ্রুত প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে যোগদাও।" বিনোদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে ক্রমেই কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিল। শরীরে একেবারে balance নেই—তার পক্ষে আর যেন দাঁড়ানও সম্ভব নয়। এরকম

শোচনীয় অবস্থা দেখে বনবিহারীর মনে হ'ল বিনোদ আর বাঁচবে না। তাই বনবিহারী খুব ব্যথিত কণ্ঠে বলল—"দেখ ভাই, মাস্টারদা সবাইকে বলেছেন যদি কষ্টের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং জীবনের কোন আশাই না থাকে তবে প্রয়োজনবোধে সেইরূপ মুমূর্ষু সাথীকে বুকে গুলী করে তার কষ্টের চির-উপশম করবে। বিনোদ, ভাই, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? যদি বল তবে ভাই তোমার ইচ্ছেতেই তোমার বুকে গুলী করতে আমি প্রস্তুত।" বনবিহারীর উৎকণ্ঠা এবং বন্ধুর প্রতি বৈপ্লবিক কর্তব্য সাধনের প্রতীক্ষায় সে বন্ধুরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বিনোদ কোনমতে উত্তর দিল—"দেখ বনবিহারী, এখনও আমার হাতে রিভলভার ধরা আছে। যদিও প্রচুর শক্তিক্ষয় হয়েছে, তবু রিভলভার টেপার শক্তি আমি হারাইনি। তুমি বিশ্বাস কর বন্ধু, মরতে আমার একটুও ভয় নেই। জীবন্ত আমাকে ইংরেজ দস্যুরা বন্দী করতে পারবে না—এ কথা তুমি নিশ্চিত জেনো। আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত চেষ্টা না করে আত্মহত্যার কথা ভাবা ভুল। এই শিক্ষা আমি স্বয়ং মাষ্টারদার কাছেই পেয়েছি। ১৯২৩ সালে নাগারখানা যুদ্ধের সময় তিনি, অম্বিকাদা ও রাজেন দাস তীব্র বিষ খেয়েছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্ না কেন, শেষ পর্যন্ত তাঁদের মৃত্যু হয় নি এবং বেঁচে থেকে আজও বিপ্লব পরিচালনা করছেন। তাই বলছি, আমার ওপর ভরসা রাখ। আমাকে কোনমতে নিচে নামিয়ে দিয়ে তোমরা ছুটে গিয়ে প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হও। আমার সঙ্গে রিভলভার তো আছেই—ভয় কি? ধরা আমি কোনমতেই দেব না। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে চলে যাও। মাস্টারদাকে আমার কথা বোলো—তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি যা শিখেছি তাই কাজে পরিণত করবো—শেষ পর্যন্ত লড়বো। মরবার আগের মুহূর্তেও মৃত্যু-আশঙ্কায় আত্মহত্যা আমি করবো না। মাস্টারদা যেন আমাকে আশীর্বাদ করেন।"

বিনোদের মানসিক শক্তির সঠিক পরিচয় বনবিহারী এর আগে কখনও পায়নি বা পরস্পরকে এত ভালভাবে চেনবার সুযোগও আগে আসেনি। বনবিহারী বিনোদকে বলল—"তুমি যখন আর হাঁটতে পারবে না, তখন না হয় বসে পড়বে। এখন চল যতদূর পারি তোমাকে নিয়ে যাই।" বিনোদ এবার সত্যিই রেগে গেল, বলল—"তোমাদের বলছি তোমরা আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হও—তোমরা তা' শুনছ না কেন? আমাদের সীমিত শক্তির ক্ষয় যাতে কম হয় তা' কি যুক্তিযুক্ত নয়! তবে sentiment থেকে তোমরা এখনও মুক্ত হতে পারছ না কেন?" এই

বলে বিনোদ সেখানেই বসে পড়লো। তার হাতে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ রিভলভার। সে মুখে আর কিছু বলতে পারলো না। ঘন ঘন হাতের ইসারায় বুঝিয়ে দিল—'বিন্দু মাত্র দেরি না করে দ্রুত প্রধান-বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হও।' বনবিহারীও তার সাথী বিনোদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিদায় নিল, ভেবেছিল বিনোদের সঙ্গে আর তাদের দেখা হবে না। বিনোদও নিশ্চয়ই তাই ধরে নিয়েছিল।

প্রকৃত বিপ্লবীর সুদৃঢ় মনোবলই বিনোদের মধ্যে ছিল। মৃত্যুভয়ে সে ভীত নয়, আবার অকারণে আত্মহত্যারও পক্ষপাতী নয়। শেষ পর্যন্ত বিনোদের অনমনীয় মনোভাব জয়যুক্ত হ'ল। ধরা সে পড়ে নি, আত্মহত্যাও তাকে করতে হয় নি। শুধুমাত্র মনের জোরে ঠিক সময়মত সে স্থান পরিত্যাগে সমর্থ হয়েছে। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে নিরাপদ স্থানে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বিনোদ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। আজও সে সুস্থ দেহে বেঁচে আছে।

অম্বিকাদাকে আমরা জালালাবাদের অদূরে একটি পাহাড়ের পাদদেশে নির্জন ঝোপের আড়ালে ছেড়ে এসেছি। অম্বিকাদা সেখানেই ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙতেই দেখেন বেশ রোদ উঠেছে। তাঁর মনে হ'ল জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের খোঁজে শত্রু-সৈন্যরা এসে পড়েছে। তাদের বাঁশির সঙ্কেত এবং কখনও কখনও সামান্য হাঁকডাক শুনে অম্বিকাদার স্পষ্টই ধারণা হ'ল জালালবাদ পাহাড় শত্রুপক্ষ ঘিরে ফেলেছে। শত্রুবেষ্টনী থেকে অম্বিকাদা খুব বেশি দূরে ছিলেন না। কাজেই আর বেশিক্ষণ সেখানে নিরাপদে থাকারও আশা ছিল না। প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছে। সৈন্যেরা ও অফিসারেরা বিপ্লবীদের মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত থাকাই অধিক বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছে। বন্দুকধারী বিপ্লবীদের সম্মুখীন হওয়া কি ভাল! গতকালের যুদ্ধের তিক্ত স্বাদ এত শীঘ্রতোলা সম্ভব নয়; তাই চলার পথে বিপ্লবীদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে অনুসন্ধান কার্য না চালিয়ে সেনাধ্যক্ষ ও পুলিস অফিসারেরা শহীদদের মৃতদেহের ফটো তুলতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পাহাড়ের ওপরে বিপ্লবীদের পরিত্যক্ত কার্তুজের খোল, জলপাত্র, টুপী, ব্যাজ প্রভৃতিও তাঁরা সংগ্রহ করা কর্তব্য মনে করলেন। ধন্য তাঁদের কর্তব্যজ্ঞান! তা' নইলে সামান্য একটু দূরেই সম্পূর্ণ নিরাপদে অম্বিকাদা কি নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকতে পারতেন?

সারাটা দিন এইভাবেই কাটল। পশ্চিম গগন লাল করে সূর্য অস্ত গেল। অম্বিকাদা সবার চোখ এড়িয়ে ঐ একই ঝোপের আড়ালে বসে রইলেন—একটি

পুলিসও সেদিকে এলো না। অম্বিকাদার আশ্রয়স্থল সেই ঝোপটি বাদ দিয়েই মিলিটারী-বাহিনী চারিদিকে অনুসন্ধান কার্য্য চালালো!

হঠাৎ অম্বিকাদার মনে হল ঝোপের দিকে কে যেন এগিয়ে আসছে। খস্ খস্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। কে আসছে? কার এই শুভাগমন? যে কোন অবস্থার জন্যই অম্বিকাদা প্রস্তুত। রিভলভারের ট্রিগারে আঙুল রেখে অজানা আগন্তুকের প্রতীক্ষায় তিনি উৎকর্ণ হয়ে আছেন। হঠাৎ বর্শা হাতে একজন বলিষ্ঠকায় আগন্তুক একেবারে অম্বিকাদার সামনে এসে হাজির। সে একজন চৌকিদার। অম্বিকাদাকে অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে দেখে সে একেবারে হতবুদ্ধি! কর্তব্য স্থির করবার আগেই অম্বিকাদা তার বুক লক্ষ্য করে রিভলভার ধরে কঠিন কণ্ঠে হুকুম করলেন—"বর্শা ফেল। হাত তুলে দাঁড়াও।" হুকুম তামিল করা ছাড়া চৌকিদারের আর কোন উপায় ছিল না। সে বর্শা ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়ালো।

অম্বিকাদা তারপর খুব ভদ্র ও নম্রভাবে চৌকিদারকে সম্বোধন করে বললেন —"ভাই আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তোমাকে অপমান করা বা গুলী করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে আমরা দেশবাসীকে ভালবাসি—দেশের মুক্তির জন্যই আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছি। তুমি আমার দেশবাসী—তুমি আমার ভাই। তুমি আমার শত্রু নও—আমিও তোমার শত্রু নই। আমাদের উভয়েরই শত্রু ইংরেজ। বল তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ! বল, তুমি আমার ওপর রাগ করনি?" অম্বিকাদার স্বদেশ-প্রেমের উত্তাপে অভিভূত চৌকিদার অম্বিকাদাকে বার বার জানাল যে, তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে সে প্রস্তুত। তাঁকে সে একেবারেই ভুল বোঝে নি এবং তার মনে একটুও ক্ষোভ নেই।

অম্বিকাদার কাছে রুমালে বাঁধা সামান্য ক'টি টাকা ছিল। তিনি চৌকিদারকে ডেকে সসম্ভ্রমে বললেন—"ভাই, আমার কাছে সামান্য ক'টি টাকা আছে—তুমি নাও। দেখ, আমার সাথে আরও একজন বন্ধু ছিল। খুব বেশি আহত হওয়ায় সে আমার সঙ্গে আসতে পারেনি—পাহাড়ের ঢালুতে হয়ত কোথাও পড়ে আছে। যদি সম্ভব হয় তুমি একবার তাঁর খোঁজ করে দেখবে কি? পুলিস বোধ হয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহত অবস্থায় তাকে যদি দেখতে পাও তবে কোনমতে তাকে কি আমার কাছে আনতে পারবে ভাই?" টাকার পোঁটলাটি চৌকিদারের দিকে এগিয়ে দিয়ে অম্বিকাদা তাকে তাঁর আবেদন জানালেন। আহতকণ্ঠে আবেগভরে চৌকিদার অম্বিকাদাকে জানাল—"বাবু

আমি জাতিতে মুসলমান—গরীব চাষী। পেটের দায়ে আজ সরকারের গোলাম। গরীব হতে পারি কিন্তু তা' বলে আমার দেশের ভাইকে এই অসময়ে একটু সাহায্য করব বলে কি টাকা নিতে পারি? তাহলে যে আমার গুণাহ্ হবে—বেহেস্তেও আমার স্থান হবে না। আপনার থেকে টাকা নিয়ে আর অপরাধী হতে চাই না। বলুন, আর কি সাহায্য আমি করতে পারি? এখনই আমি আপনার আহত বন্ধুর খোঁজে যাব।" চৌকিদার টাকা নিল না। অম্বিকাদাও তার কথা শুনে আর টাকার কথা বলতে পারলেন না। গরীব চাষীর মহত্ব ও স্বদেশপ্রেমের গভীরতার কাছে অম্বিকাদার নিজেকেই ছোট মনে হ'ল। চৌকিদারের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর অন্তর পূর্ণ হ'ল! অম্বিকাদা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে চৌকিদারকে সম্বোধন করে বললেন—"ভাই, তোমাকে আমি ভুল বুঝেছি। তোমার অন্তরের স্পর্শ পেয়ে বাংলার একজন বিপ্লবী সৈনিক আজ ধন্য। তোমার কাছে আমার অপরাধের ক্ষমা নেই। নিজগুণে তুমি আমায় ক্ষমা কর।...ভাই, এখানে বহুক্ষণ থেকে বসে আছি। শত্রুপক্ষ খুব কাছাকাছি এসেছে তবু এই স্থানটি তাদের চোখে পড়ে নি—আমাকে দেখতে পায়নি। তুমি আমাকে আরো কিছুটা দূরে নিয়ে চল। তারপর তুমি আমার আহত বন্ধুর খোঁজে যাও!"

চৌকিদার অম্বিকাদাকে হাত ধরে তুললো। চৌকিদারের বলিষ্ঠ কাঁধে ভর দিয়ে অম্বিকাদা ধীরে ধীরে এগোলেন। কিছুক্ষণ আগে এই চৌকিদারের বুক লক্ষ্য করেই রিভলভার বাগিয়ে অম্বিকাদা হুকুম করেছিলেন বর্শা ফেলে দিতে। এখন সেই বর্শা হাতেই চৌকিদার অম্বিকাদার ক্ষীণ দুর্বল দেহ বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে হাঁটছে। তার সবল বাহুর নিষ্পেষণে এখন সে অনায়াসে অম্বিকাদাকে কাবু করতে পারে। তা'ছাড়া ভাগ্যের এমনই পরিহাস—অম্বিকাদা তখনও জানতেন না যে, তাঁর রিভলভারে একটিও কার্তুজ ছিল না, ছ'টি টোটাই আগে তিনি ফায়ার করেছিলেন। চেম্বারে কেবল ছ'টি খালি খোল পড়ে ছিল। নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পৌঁছে অনেক পরে তিনি এই তথ্য জানতে পারেন।

প্রায় চার-পাঁচ শ' গজ দূরে একটি অল্পপরিসর খালের পাড় পর্যন্ত তাঁরা এলেন। খালটি উঁচু টিলা ও সামনের নিচু পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে। এই খালের ধারে একটা নির্জন স্থানে অম্বিকাদা বসলেন। চৌকিদার এবার আহত অর্ধেন্দুকে খুঁজতে গেল। অম্বিকাদা তাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে বললেন।

চৌকিদার চলে গেল অম্বিকাদা নিরাপত্তার প্রাথমিক নিয়ম অনুযায়ী সেই স্থানটি ছেড়ে আর একটু দূরে একটি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। সেখান থেকে তিনি লক্ষ্য রাখছিলেন চৌকিদার একাই ফিরে আসে নাকি তার সঙ্গে পুলিস দলেরও আবির্ভাব হয়। আধ ঘণ্টা হয়ে গেল কিন্তু চৌকিদার তখনও ফিরলো না। আরও পনেরো মিনিট কাটলো—চৌকিদারের দেখা নেই। তার এই বিলম্বের কারণ কি? সে কি অর্ধেন্দুকে নিয়ে আসবার সময় কোন বিপদে পড়েছে? এই সব সাত-পাঁচ ভেবে আর দেরি করা সমীচীন নয় মনে করে অম্বিকাদা বহু কষ্টে খালটি পেরোলেন। তাঁর খুব শীত করছিল। . রিভলভারটা কলাপাতা দিয়ে মুড়ে নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন-প্রায় রাস্তা দিয়ে অর্ধনগ্ন বেশে অম্বিকাদা চলেছেন। এই গ্রামের নাম ফতেয়াবাদ—অম্বিকাদার পূর্ব-পরিচিত অঞ্চল। ফতেয়াবাদ থানায় অম্বিকাদার বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব বাস করেন। তিনি এই গ্রামের ডাক্তার বগলা চক্রবর্তীর বাড়িতে অথবা চেম্বারে যাওয়া মনস্থ করলেন। বগলাবাবুর ছোট ভাই আমাদের বিপ্লবী দলের সদস্য। ডাক্তারবাবু অম্বিকাদাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন তাই বা কে জানে? তবু অম্বিকাদা স্থির করলেন ডাক্তারবাবুর সাহায্য নেবার চেষ্টা করবেন।

অম্বিকাদার কপালের ক্ষতস্থান সেলাই করে ব্যাণ্ডেজ করা প্রয়োজন। তারপর কিছু জামা-কাপড় ও টাকা-পয়সার ব্যবস্থাও না হলেই নয়। এই উদ্দেশ্যে সাহসে ভর করে রাত প্রায় আটটা-ন'টার সময় অম্বিকাদা ডাঃ বগলা চক্রবর্তীর গৃহে প্রবেশ করলেন। অসময়ে হঠাৎ অর্ধনগ্নবেশে অম্বিকাদাকে দেখে ডাক্তারবাবু চমকে গেলেন। যুব-বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ, জালালাবাদ যুদ্ধ, ফেণী সঙ্ঘর্ষ প্রভৃতির সব খবর ডাক্তারবাবু জানেন। অম্বিকাদার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং তাঁর সংবাদের বিনিময়ে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণার কথাও ডাক্তারবাবুর অবিদিত নয়। ডাক্তার অম্বিকাদাকে দেখে বলতে পারছিলেন না—"আপনি আসুন।" তাঁর ইতস্ততঃ ভাব দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছিল অম্বিকাদার উপস্থিতিতে তিনি খুব বিব্রত বোধ করছেন। ডাক্তারের ভয়, যদি পুলিস জানতে পারে যে, তিনি অম্বিকাদাকে সাহায্য করেছেন তবে হয়ত তাকে পুলিসের কাছে প্রচুর নিগ্রহ ও নিপীড়ন ভোগ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে তিনি বললেন—"দেখুন অম্বিকাবাবু, আমি সংসারী মানুষ—ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। আপনাকে সাহায্য করেছি খবর পেলে পুলিস আমাকে ছাড়বে না—সাজা দিয়ে জেল খাটাবে। তাই বলছি আপনি আমাকে বিপদে ফেলবেন না—আপনি দয়া করে আসুন।"

পুলিসের ভয়ে ডাক্তার বাবুর কি করুণ আবেদন! ডাক্তারের প্রতি সমবেদনা অনুভব করা ছাড়া অম্বিকাদার অবশ্য আর কিছুই করবার ছিল না। কিন্তু অম্বিকাদার Medical aid না পেলেই নয়। তাই ডাক্তারকে তিনি বুঝিয়ে বললেন যে, পুলিসের জানবার কোন আশঙ্কাই নেই এবং তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর বাড়ি ছেড়েও চলে যাবেন। এমন সময় ডাক্তারের ছোট ভাই এসে উপস্থিত। অম্বিকাদাকে দেখে সে খুব উৎসাহী হয়ে উঠলো। সে-ও তার দাদাকে অনুরোধ করল অম্বিকাদাকে First-aid দিতে ও কাপড়-জামা প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করতে।

ডাক্তারবাবু ভাইয়ের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে অম্বিকাদার ক্ষতস্থানটি সেলাই করে ভালভাবে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। তখন রাত প্রায় এগারোটা। অম্বিকাদা ডাক্তারবাবুকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। ডাক্তারের ছোট ভাই অম্বিকাদাকে সামান্য কিছু টাকা এবং একজোড়া কাপড় ও ক'টা জামা দিল। সাধারণ গ্রামবাসীর পোশাকে অম্বিকাদা নোয়াপাড়া গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

রাত প্রায় বারোটা হবে। গ্রামের পথ-ঘাট একেবারে নির্জন। অদূরে খরস্রোতা হালদা নদী বয়ে চলেছে। এই নদী পার হয়ে তবেই নোয়াপাড়া যাওয়া যাবে। দেয়ানজী ঘাটে ফেরী নৌকোতে নদী পার হবার ব্যবস্থা আছে। অম্বিকাদা সেইদিকেই এগোলেন। কিন্তু অত রাত্রে ঘাটে আসার আগেই দু'তিনজন পুলিস অম্বিকাদাকে চ্যালেঞ্জ করে বসলো—"এই শালা, কোন্ হায়রে? কাঁহাসে আতা হায়?" অম্বিকাদা উত্তর দিলেন—"আমি এখানে থাকি না। ফতেয়াবাদে আমার এক আত্মীয় বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম; এখন নোয়াপাড়া ফিরে যাচ্ছি।" "যা যা—ভাগ শালা—" এইরূপ মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করে একটি প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে পুলিস অম্বিকাদাকে বিদায় দিল। কি আর করা যায়! গালাগাল ও ধাক্কা নিঃশব্দে হজম করে অম্বিকাদা ঘাটে গেলেন। এত রাতে ঘাটে ফেরী নৌকোর কোন মাঝিই উপস্থিত ছিল না। অগত্যা এক জেলে-নৌকো করে, জেলেকে আট আনা পয়সা দিয়ে, তিনি নদী পার হলেন। সেই সময়ে, ১৯৩০ সালে, আট আনা পয়সা পেয়েই জেলে মহা খুশী।

রাত প্রায় দুটো। ভোর হবার আগেই আশ্রয় একটা পাওয়া চাই-ই। নোয়াপাড়া থানার সহরদা গ্রামে দলের দরদী বন্ধু নিবারণ দে-র বাড়ি। সেখানে যাওয়াই অম্বিকাদার ইচ্ছে। কিন্তু যদি কোন কারণে নিবারণ বাড়িতে না

থাকে তাহলে কি হবে? নিবারণ সত্যিই ছিল না। অম্বিকাদা বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। নিবারণের পাশের বাড়িতে অম্বিকাদার একজন পরিচিত "বন্ধু" থাকতেন। কিন্তু সেই "বন্ধু" তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস করলেন না। এদিকে ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। এখন কি করবেন তিনি?

তাঁর পিসীমা এই গ্রামেরই পাশে, ডেঁয়াপাড়া গ্রামে থাকতেন। পিসীমার বড় ছেলে সরকারী চাকুরে—বড় পোস্টে আছেন। কাজেই সেখানে যেতে অম্বিকাদার ভয়, পিসীমা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কার ভীত হয়ে তাঁর আবেদন হয়ত প্রত্যাখ্যান করবেন। পিসীমাই হচ্ছেন সমস্যা—পিসেমশাইকে মনে হয় রাজী করানো যাবে। এ-সবই হচ্ছে কেবলমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে চিন্তা করা—প্রকৃত অবস্থা কি হবে তা' পরীক্ষাসাপেক্ষ। এদিকে হাতে সময় একেবারেই নেই—ভোর যে হয়ে এলো!

ডেঁয়াপাড়া গ্রামে প্রায় প্রতিটি বাড়ির লোকেই অম্বিকাদাকে চেনে। পিসীমার বাড়ির নানা সমস্যা ও অনিশ্চয়তা সত্বেও অম্বিকাদা সেই বাড়িতেই গেলেন। বাড়িতে প্রবেশ করামাত্র পিসীমার সঙ্গেই প্রথম দেখা—পিসীমাকে এড়িয়ে যাবার কথা অবশ্য ওঠেই না। তবু একেবারে দোরগোড়ায় পিসীমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎটা না হলেই যেন ভাল ছিল। ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা যে, অম্বিকাদাকে দেখামাত্রই পিসীমা ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। অম্বিকাদার আগমন তাঁর কাছে এক বিভীষিকা সৃষ্টি করলো—তাঁর ছেলের যেন তক্ষুণি সর্বনাশ হয়ে গেল। পিসীমা ধপ্ করে মাটিতে বসেই দু'টি পা সামনে ছড়িয়ে সুর করে কাঁদতে লাগলেন—"ও গো কি সর্বনাশ! আমার কি হবে গো! আমার ছেলের ক্ষতি করতে তুই এখানে এলি কেন? ও রে বাবা রে! আমার ঘরবাড়ি সব যাবে, সংসার যাবে—আমার ছেলের চাকরি যাবে রে···!" তাঁর এই আকস্মিক চেঁচামেচিতে পিসেমশাই ছুটে এলেন—বাড়ির অন্যান্য সকলেও ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এলো। পিসীমার এই অপ্রত্যাশিত "ভোরের সঙ্গীত" কোন দুঃসংবাদ বা অমঙ্গলের সূচনা মনে করেই বাড়ির সকলেই বিচলিত। পিসেমশাই এসে অম্বিকাদাকে সামনে দেখে তাঁর স্ত্রীর এই বুকফাটা আর্তনাদের কারণ সহজেই বুঝে ফেললেন। অম্বিকাদা ঠিক এইরূপ একটা অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হবেন ভাবতেই পারেন নি। এখন কি করা যায়? অস্বাভাবিক ও অভূতপূর্ব অবস্থার জন্য ব্যবস্থাও তদনুরূপ হওয়া প্রয়োজন।

এই অবস্থার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবার জন্য অম্বিকাদা মুহূর্তে কঠোর হলেন। পিসেমশাইয়ের সামনেই পিসীমাকে সম্বোধন করে বললেন—"পিসীমা তুমি চেঁচাবে না। ভাল চাও তো একেবারে চুপ কর। আমি আজ রাত পর্যন্ত এখানে গোপনে থাকব। কেউ যেন আমার উপস্থিতি জানতে না পারে। আমি তোমাদের সাহায্য চাই। যদি এর অন্যথা হয় তবে আমি একা মরব না। তোমাদের সবাইকে—তোমার ছেলেকেও জড়িয়ে আমি পুলিসকে বলব যে, তোমরা বহুদিন থেকেই আমাদের বিপ্লবী দলে আছ।" অম্বিকাদার এইরূপ কঠোরভাব ও অগ্নিমূর্তি দেখে পিসীমা কান্না বন্ধ করলেন—জ্ঞান ফিরে পেলেন। চেঁচামেচি ও কান্নাকাটিতে যে কোন ফল হবে না তা' তিনি বুঝলেন। রাত পর্যন্ত অম্বিকাদাকে নিরাপদে গোপন আশ্রয় দিতেই হবে—এ কথাটা পিসেমশাই উপলব্ধি করলেন। বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পিসেমশাই ও পিসীমার মুহূর্তে ভাবান্তর ঘটলো—ভাতিজার জন্য দরদ উথ্‌লে উঠলো। অম্বিকাদা বুঝলেন মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি—ওষুধ ধরেছে।

পিসীমা অম্বিকাদাকে একটা গোপন কামরায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে তাঁর কোন ভয় নেই বলে আশ্বাস দিলেন।

রাত্রি পর্যন্ত সেই ঘরে স্নান, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, ঘুম—সবই হ'ল। কিন্তু বিকেল থেকেই অম্বিকাদার খুব জ্বর। অথচ এখানে কোনমতেই থাকা যাবে না। অগত্যা জ্বর গায়েই রাত ন'টার সময় পিসীমা ও পিসেমশাইকে মুক্তি দিয়ে অম্বিকাদা বিদায় নিলেন! তাঁরা অম্বিকাদাকে দু'হাত তুলে অজস্র আশীর্বাদ করলেন।

অম্বিকাদা এখন কোথায় যাবেন? কে স্থান দেবে? কেউ ভয় পাচ্ছে, কেউ ঝুঁকি নিতে চাইছে না, আবার কেউ হয়ত বাধ্য হয়েই সাময়িকভাবে আশ্রয় দিয়েছে। ডাক্তারবাবু অম্বিকাদাকে বিদায় করেছেন; নিবারণের অনুপস্থিতে সে বাড়িতেও কোন সুবিধে পাওয়া গেল না; পাশের বাড়িতেও স্থান হ'ল না; নিজের পিসীমা-ও আজ বিশেষ পরিস্থিতিতে অম্বিকাদাকে আশ্রয় দিতে পরাঙ্মুখ। এই অবস্থায় কি করবেন, কার কাছে যাবেন তিনি? বাংলা দেশে, চট্টলার মাটিতে আজ কি এমন একজনও নেই অম্বিকাদাকে এই অসময়ে একটু আশ্রয় দেয়? কেউ কি নেই তাঁকে একটু সাহায্য করে? তাঁর ক্ষতস্থান শুকিয়ে ওঠা পর্যন্ত একটু পরিচর্যা করে?

যুব-বিদ্রোহের পর চট্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরে—প্রতিটি মানুষের অন্তরে অব্যক্ত নীরব দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল। বিপ্লবীরা তার সান্নিধ্যে আসবার

সুযোগ পেয়েছে—দেখেছে, হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান—জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তারা অকুণ্ঠিত-চিত্তে বিনা দ্বিধায় সাধ্যমত সাহায্য করেছে।

অম্বিকাদা এই ডেঁয়াপাড়া গ্রামে বহুকাল কাটিয়েছেন। এই গ্রামেই একজন বয়স্ক চাষী আমজাদ আলীর কথা তাঁর মনে এল। এই দুঃসময়ে হঠাৎ আমজাদ আলীর কথাই বা কেন তাঁর মনে আসছে। এত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন থাকতে সকলকে বাদ দিয়ে তাঁর মানসপটে আমজাদ আলীর চেহারা ভেসে উঠল কেন?

অম্বিকাদা মন্ত্রমুগ্ধের মত চাষী আমজাদ আলীর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালেন। ভোর হতে তখনও কিছু বাকি। একটু ইতস্ততঃ করে অম্বিকাদা ডাকলেন—"আমজাদ চাচা! আমজাদ চাচা!" ভেতর থেকে প্রশ্ন শোনা গেল—"কে? কি চান?" অম্বিকাদা বললেন—"আমজাদ চাচা, একটু বাইরে আসুন—কথা আছে!"

ভোর রাতে—পাখী ডাকার আগে আমজাদ চাচাকে কে ডাকল? আমজাদ আলীর হয়ত মনে হয়েছিল চেনা গলা—তবু সে নিশ্চয়ই ভাবতে পারেনি তারই দরজার আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরই অতি পরিচিত বীর সন্তান—অম্বিকা চক্রবর্তী।

আমজাদ আলী প্রায় ঘুম-চোখেই বাইরে এলেন। প্রথমটা তিনি আবছা আঁধারে অম্বিকাদাকে চিনতে পারলেন না। তাই প্রশ্ন করলেন—"কে আপনি? এত ভোরে কি চাই? অম্বিকাদা বললেন—"চাচা, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনাদের অম্বিকা!" "কি? কি বললে? তুমি অম্বিকা?"—আমজাদ অম্বিকাদার কাছে এগিয়ে গেলেন—চিনতে পারলেন। অম্বিকাদাকে সামনে উপস্থিত দেখে আমজাদ আলী অভিভূত হলেন। তরপর আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন—"তুমি অম্বিকা—তুমি এখনও বেঁচে আছ? আমরা ভেবেছিলাম তোমাকে আর দেখতে পাব না। এস, এস, ভেতরে এস। কোন সঙ্কোচ বা কুণ্ঠার প্রয়োজন নেই—এ বাড়ি তোমারই বাড়ি। এ কি! তোমার কপালে পটি বাঁধা কেন? গুলী লেগেছে? পড়ে গেছ? এখন ভাল আছ তো? এস, এস, এখানে তোমার কোন অসুবিধে হবে না। আমরা মুসলমান বলে সরকারের একটু সুনজরে আছি। বর্তমানে আমার বাড়িই তোমার পক্ষে সব চাইতে নিরাপদ। এস, বাড়ির ভেতরে এস।"

অম্বিকাদাকে অভ্যর্থনার করবার জন্য আমজাদ চাচা যেন বহুদিন থেকে

অপেক্ষা করে আছেন। তিনি গ্রামের একজন মুসলমান চাষী। বিপ্লবীদের কোন জাত নেই—হিন্দু, মুসলমান জাতিভেদ তারা মানে না। তা'রা মানুষের স্বাধীনতা চায়—দেশের স্বাধীনতা চায়। আমজাদ চাচা অম্বিকাদাকে বিপ্লবী বলেই জানতেন। চক্রবর্তী-ব্রাহ্মণের আভিজাত্য বজায় রাখা অপেক্ষা অম্বিকাদা আমজাদ আলীর ঘরে আতিথ্য গ্রহণ যে অনেকগুণে শ্রেয় মনে করবেন আমজাদ কৃষক পরিবারের সেই ধারণা ছিল।

৬ই মে পর্যন্ত এই মুসলমান কৃষক পরিবারে অম্বিকাদা নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে ছিলেন। আমজাদ চাচার ছেলে ও স্ত্রী সেবা শুশ্রূষা করে অম্বিকাদাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে তোলেন। যুব বিদ্রোহের দিনটি থেকে এই ১৮ দিন ধরে পুলিস ও মিলিটারীর দৌরাত্ম্য ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। অম্বিকাদার গ্রেফতারের বিনিময়ে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে সকলেই এ খবর শুনেছে. আমজাদ পরিবারেও এ খবর অজ্ঞাত ছিল না। আমজাদ গরীব হতে পারে, কিন্তু স্বদেশ-প্রেমের সুদৃঢ় বর্মে ঢাকা আমজাদ পরিবারকে কোন প্রলোভনই কোন অবস্থায় স্পর্শ করতে পারে নি।

২২শে এপ্রিল সাথীরা পাহাড়ের উপরে মৃতপ্রায় অম্বিকাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচে নেমে এসেছিল—এ ছাড়া বিপ্লবীদের অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। মাস্টারদা ও নির্মলদা তারপর থেকেই অম্বিকাদার কোন খবর না পেয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। মৃত বিপ্লবীদের সরকারী তালিকায়ও অম্বিকাদার নামের কোন উল্লেখ ছিল না। তারপর দু'টি সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। মাস্টারদা চারিদিকে খবর পাঠিয়েও অম্বিকাদার কোন খোঁজ পান নি।

অম্বিকাদা সুস্থ হয়ে আমজাদ চাচার ছেলের সাহায্যে নানা স্থানে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। অবশেষে মাস্টারদার সংযোগসূত্রের মারফত খবর পেয়ে অম্বিকাদা ছোট্ট একটা চিঠি পাঠালেন—

"মাস্টারবাবু, আমি মরি নি। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছি। যোগাযোগের ব্যবস্থা করবেন—সাথী।"

অম্বিকাদার এই ছোট্ট চিঠিখানি পেয়ে সবার আনন্দের সীমা ছিল না—"মৃত বন্ধুকে" ফিরে পেয়েছেন। অম্বিকাবাবু বেঁচে আছেন। কি আনন্দ!

১৯৪৬ সালে মুক্তি পেয়ে আমরা অম্বিকাদার সঙ্গে গিয়ে আমজাদ চাচা ও তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁর ও তাঁর পরিবারের স্বদেশ-প্রেমের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আমজাদ পরিবার দীর্ঘজীবী হোক্।

জালালাবাদ যুদ্ধের পর অম্বিকাদা, বিনোদ চৌধুরী এবং যুব-বাহিনীর প্রায়

অর্ধেক অংশ মাস্টারদা ও নির্মলদার সঙ্গে বিভিন্ন পথে নানা অভিজ্ঞতা ও কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো। প্রধান-বাহিনীর অপর অংশটিও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। লোকনাথ বল, কালী চক্রবর্তী, রজত সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন, স্বদেশ রায়, নারায়ণ সেন, রণধীর দাসগুপ্ত সহায়রাম দাস, বনবিহারী দত্ত, সরোজ গুহ প্রমুখ আরও কয়েকজন যুবক অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে সেই রাত্রে অরণ্যপথে অন্যদিকে এগিয়ে গেল। দুই প্রধান দলের দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে চলল—ক্রমে পরস্পরের সংযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দু'টি দল দুই বিপরীত মুখে এগিয়ে গেল।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানা, গ্রামের অবস্থান ও গ্রামাঞ্চলের পথঘাট সম্বন্ধে কালী চক্রবর্তীরই সবচেয়ে বেশি জানা ছিল। কালী চক্রবর্তী ১৮ই এপ্রিল যুব-বাহিনীর সঙ্গে শত্রুঘাঁটি আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। জালালাবাদে শত্রুর সঙ্গে সে শেষ পর্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে; চাঁদপুরে আই, জি, পুলিস মিঃ ক্রেগের পরিবর্তে ইন্‌স্পেক্টার তারিণী মুখার্জীর হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আমাদের সঙ্গে আন্দামানে জেল ভোগ করেছে। বর্তমানে সে চট্টগ্রামেই (পূর্ব-পাকিস্থানে) আছে।

লোকনাথ তাদের দলে কালীকে পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সেই রাত্রে রণক্লান্ত বিপ্লবী সৈনিকেরা আর বেশিদূর এগোতে পারল না। ভোর হবার আগেই তারা একটি নির্জন পাহাড়ে আশ্রয় নিল। নিজেদের বহু কষ্টে টেনে-হিঁচড়ে সকলে পাহাড়ের ওপরে উঠলো। পাহাড়ে উঠে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। যে যেখানে যে অবস্থায় পারলো পাহাড়ের বুকে নিজেদের দেহ এলিয়ে দিল। সামরিক শৃঙ্খলা বা অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে পাহারার ব্যবস্থা ইত্যাদি করবার মত মনের অবস্থা বা শারীরিক সামর্থ্য তাদের ছিল না। প্রত্যেকে হাতে রিভলভার ও পাশে বন্দুক নিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো।

এখন সকাল আটটা। কারো কারো ঘুম ভেঙেছে। কেউ কেউ এখনও ঘুমে অচেতন। গতকাল কি দুর্যোগ ঘটে গেল! কত সাথীকে চিরকালের মত বিদায় দিতে হ'ল! আজ ২৩শে তারিখ এখানে কেবল তাদের অর্ধেক অংশ। অন্যেরা এখন কোথায়, তাদের কি হচ্ছে, আবার যুদ্ধ হয়েছে কি না—এইসব নানা কথা ঘুম ভাঙার পর সকলের মনে ভিড় করে এলো।

আস্তে আস্তে সবাই প্রায় উঠে বসলো। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালায় সকলেই

অস্থির। ছোটদের ভিতর যারা যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে রণধীর অন্যতম—পনেরো বছর বয়স, সবেমাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। সদা-হাস্যমুখ, তার যেন কোন ক্লান্তি নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণাও যেন নেই! রণধীর চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাবান ধনী কবিরাজ জয়ন্ত দাশগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেঠতুতো দাদা ক্যাপ্টেন পি, কে, চৌধুরী (I.M.S.) ডাক্তার। একই বাড়িতে থাকতেন। তাঁর দোনলা বন্দুক রণধীর বাড়ির সকলের অজ্ঞাতে আমাদের কাছে নিয়ে আসে। বাড়ি-ঘর তার কাছে অতি তুচ্ছ; মা-বাবার স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা, কিছুর আকর্ষণই রণধীরকে সেদিন ঘরে বেঁধে রাখতে পারে নি। জালালাবাদ পাহাড়ে তার হাতের বন্দুক শত্রুর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্নুদ্গীরণ করে গেছে। এই নির্ভীক বালক তাদের দলের সকলের কাছে যেন আদর্শস্থানীয়।

রণধীর সবার চাইতে ছোট হলেও তার দায়িত্ববোধ ও চিন্তাশক্তির পরিচয় পেয়ে লোকনাথ মুগ্ধ; সকলেই যখন ক্ষুধা তৃষায় ব্যাকুল, তখন রণধীর এই কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য কালী চক্রবর্তীকে বলল—"পণ্ডিতদা (কালী চক্রবর্তীকে সবাই পণ্ডিতদা বলেই ডাকত) আমাদের শারীরিক শক্তি অটুট রাখতে হবে, তবেই আমরা যে-কোন অবস্থায় শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে সমর্থ হব। আপনি চেয়ে দেখুন, সবাই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এখনই সবার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে-কোন উপায়েই হোক্ এই সমস্যার সমাধান আমাদের করতেই হবে।"

কালী চক্রবর্তীও রণধীরের সঙ্গে একমত—কালবিলম্ব না করে পেটপূজোর বন্দোবস্ত করা চাই। লোকনাথের কাছে প্রস্তাব করা হ'ল, কাছেপিঠে বাজার বা কোন দোকান খুঁজে বার করে খাদ্যবস্তু যা পাওয়া যায় তাই কিনে আনা হোক্। এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। তবে কথা হ'ল, কে কিভাবে কোথায় যাবে?

লোকনাথ নিজেই কালীকে নিয়ে পাহাড়ের নিচে নেমে এলো। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটি পায়ে চলা সরু গ্রাম্য পথ চলে গেছে। এই পথের ধারে গাছের নিচে তারা যে কোন একজন পথিকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কি এ পথে আসা-যাওয়া করে না? নির্জন পথ বহুদূর পর্যন্ত লোকালয়ের চিহ্নও নেই। তবু তারা নিরুপায় হয়ে কোন একজন পথিকের সন্ধানে অপেক্ষা করতে লাগলো তেমন কোন আগন্তুকের সাহায্য নেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য।

প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট পরে একজন পথিককে তাদের দিকেই আসতে

দেখা গেল। লোকনাথ ও কালী সেই পথিকের দৃষ্টির অগোচরে একটি গাছের আড়ালে সরে দাঁড়ালো; পথিক আপন মনে চলেছে। সে লোকনাথদের সামনে এসে পড়তেই গাছের পেছন থেকে কালী ও লোকনাথ হঠাৎ রিভলভার হাতে তার সামনে পথ রোধ করে দাঁড়ালো। বুক লক্ষ্য করে রিভলভার দু'টি ধরা দেখে স্বভাবতই সে হতবুদ্ধি ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে—এই বুঝি মূর্ছা যায়!

লোকনাথ পথিককে অভয় দিয়ে নম্রভাবে বলল—"ভাই তোমার ভয় নেই। তোমার কোন অনিষ্টই আমরা করব না। বিপদে পড়ে আমরা তোমার সাহায্য চাইছি। তুমি আমাদের সঙ্গে পাহাড়ের ওপরে চল, তোমাকে সব বলছি। ভাই, তোমায় আমাদের অনেক সাহায্য করতে হবে। চল, আমাদের প্রয়োজনের কথা তোমাকে সব বলবো।" আগন্তুক লোকনাথের কথা শুনে আশ্বস্ত হ'ল। কিন্তু সে পাহাড়ের ওপর উঠতে চাইছিল না। তবু সে যখন বুঝল যে তার এই আপত্তি টিকবে না, তখন আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে সে লোকনাথের সঙ্গে পাহাড়ের ওপরে এলো। পাহাড়ের ওপরে আরও প্রায় আঠার-বিশজনকে বন্দুক, রিভলভার হাতে ও খাকী পোশাকে দেখে পথিক সহজেই বুঝল এরা কারা। সকলেই তার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করেছে। এদের সংস্পর্শে এসে পথিক বুঝেছে এরা "স্বদেশী"—ইংরেজ এদের শত্রু, দেশবাসী এদের ভাই।

ক্রমেই পথিকের ভয় কেটে গেল। অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে সে লোকনাথকে জিজ্ঞেস করল—"আপনি তো আমাকে বলছেন না আমায় কি করতে হবে? আমি নেহাতই সাধারণ লোক; আমাকে দিয়ে আপনাদের কি উপকার হবে? বলুন আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি?"

লোকনাথ—"দেখুন, আমরা এই এলাকা সম্বন্ধে কিছুই জানি না। বাজার বা খাবারের দোকান কোথায় পাওয়া যাবে তার নির্দেশ আপনাকে দিতে হবে। তা'ছাড়া আমাদের সবার খাকী পোশাক। এই পোশাকে আমাদের কারও লোকালয়ে যাওয়া উচিত হবে না। তাই ভাই, যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার লুঙ্গি, টুপী ও কামিজটি আমাদের কারও খাকী পোশাকের সঙ্গে বদল করতে হবে। সাধারণ মুসলমানের বেশে যদি আমাদের কেউ বাজারে যায়, তবেই লোকে তাকে সন্দেহ করবে না এবং আমাদের অস্তিত্বের খোঁজও পাবে না। তা'ছাড়া, আপনাকে ভাই রাত পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করছি। আপনিই এই অঞ্চলের পথ-ঘাট দেখিয়ে আমাদের নিরাপদ স্থানে যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন...।"

মুসলমান পথিক বিপ্লবীদের সবার ব্যবহার দেখে বুঝেছিল যে, তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বলে কোন জাতি ভেদ নেই—কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তাদের স্পর্শ করে নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপ্লবীদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। পথিক-বন্ধু সানন্দে লোকনাথের প্রস্তাব মেনে নিয়ে কালী চক্রবর্তীর সঙ্গে তার পোশাক বদল করলো।

কালী মুসলমান বেশে পথিকের নির্দেশ অনুযায়ী নিকটস্থ এক বাজার হতে চিঁড়ে, গুড়, কলা, প্রভৃতি নিয়ে এলে সবাই তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলো। পথিক-বন্ধুও তাদের সঙ্গে একত্রে খাওয়ার আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত হ'ল না!

খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে মিলে স্থির করলো যে, সন্ধ্যের পর, একটু অন্ধকার হলেই, তারা এই পাহাড় পরিত্যাগ করবে। পথিকের কাছে লোকনাথ জেনে নিল, সমুদ্রতীরে কাট্টলি গ্রামের মাইল তিন-চারের মধ্যেই তারা বর্তমানে অবস্থান করছে। এই কাট্টলি গ্রামের ধনী জমিদার ও কণ্ট্রাক্টার প্রাণহরি দাসের কথা হঠাৎ লোকনাথের মনে পড়লো। তাঁরই ছেলে সুরেন দাস চাকরি ছেড়ে ১৯২১-২৩ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। এরপর থেকেই তিনি কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন।

সেই দিনকার কংগ্রেসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন খতম করার জন্য সুরেন দাস সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অহিংস পথ সম্বন্ধে অবশ্যই আমাদের মতের অমিল ছিল। অহিংসার পথ Policy হিসেবে মানার যুক্তি পেয়েছি—কিন্তু গান্ধীজীর আদর্শে স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস ধর্মকে Creed হিসেবে গ্রহণ করা অযৌক্তিক ও অবাস্তব (Utopian) বলেই আমরা মনে করেছি। আমাদের বাস্তব যুক্তি—বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে "অহিংস নীতি" যে খাটে না, তা' ১৯২১-২২, ১৯৩০ ও ১৯৪২ সালেই বাস্তব সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে—জনগণের সংগ্রাম কখনও অহিংস থাকতে পারে না। তাই "হিংসার" বা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ সম্বন্ধে সুরেন দাসের সঙ্গে আমাদের অমিল থাকলেও, তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন বলেই লোকনাথের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত মিল ছিল। সুরেন দাস সঙ্গীতবিদ্ ছিলেন। তাঁর মুখে "বন্দেমাতরম্" গান চট্টলার লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মুগ্ধ করেছে। তিনি সুর ও সঙ্গীতে ডুবে থাকতেন। লোকনাথেরও সঙ্গীতচর্চার দিকে ঝোঁক ছিল। এই বিশেষ গুণের অধিকারী লোকনাথ সুরসাধক সুরেন দাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনিও লোকনাথকে সঙ্গীতে

আগ্রহশীল দেখে খুবই স্নেহ করতেন। সুরেন দাস তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় "আর্য-সঙ্গীত মিউজিক এ্যাকাডেমি" স্থাপন করেন। তিনি চট্টগ্রামবাসীর অতি প্রিয় ও আপনজন ছিলেন। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লোকনাথ ভেবেছিল যে, প্রাণহরি দাসের বাড়িতে তারা নিশ্চয়ই উপেক্ষিত হবে না।

প্রাণহরিবাবুর বাড়ি থেকে জামা-কাপড় ও টাকা-পয়সা সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করার কথাও লোকনাথ ভেবেছিল। তাই সে পথিক-বন্ধুকে অনুরোধ জানালো তাদের প্রাণহরি দাসের বাড়ি নিয়ে যেতে। রাত প্রায় দশটা-এগারোটার সময় পথিক-বন্ধুর নির্দেশিত পথে সদলবলে লোকনাথেরা প্রাণহরি দাসের বাড়িতে উপস্থিত হ'ল। সুরেন দাস তখন বাড়ি ছিলেন না। দীন, জীর্ণ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সামরিক খাকী পোশাকে বিশ-বাইশজন যুবককে বন্দুক হাতে বাড়ির কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করতে দেখে বাড়ির লোকেরা নিদারুণ বিস্মিত ও শঙ্কিত হ'ল। লোকনাথ এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিল। লোকনাথকে অনেকেই চেনে। এ কি! চট্টলার বীর যুবক সৈনিকেরা আজ তাদের গৃহে অপ্রত্যাশিত-ভাবে পদার্পণ করেছে! এ যে তাদের পরম সৌভাগ্যের কথা, গর্বের কথা! বাড়ির সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের অভিনন্দন জানালো; বিজয়ী বিদ্রোহী সৈনিকদের সাদরে বরণ করে ঘরে নিয়ে গেল।

সেই রাত্রে প্রাণহরি দাসের বাড়ির লোকেরা যা পেয়েছে তাই রান্না করে ওই অসময়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিপ্লবীদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করলো। তাদের সবার জন্য জামা-কাপড় এবং নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছবার পথের খরচ বাবদ লোকনাথ যা টাকা চাইল তাও বিনা দ্বিধায় দিল। তাদের অন্তরে স্বদেশপ্রেমের গভীরতা বিপ্লবী তরুণেরা উপলব্ধি করেছে—এই নিঃস্বার্থ আতিথ্যের পরিচয় পেয়ে সকলেই মুগ্ধ ও অভিভূত। ক্ষণিকের এই অমূল্য স্মৃতি বহন করে বিপ্লবীরা সেই বাড়ি থেকে বিদায় নিল। ক্ষণিকের দেখা এই বিপ্লবী অতিথি দলের সঙ্গে কতটুকুই বা পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে! কতটুকুই বা তাদের সান্নিধ্যে এসেছে! তবু বিদায়ের সময় বাড়ির সকলের চোখ জলে ভরে গেল। কেউ ভাবাবেগ সামলাতে পারলো না। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা আশীর্বাদ জানালো—"ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন! দীর্ঘজীবী হও! জয়ী হও!" তাঁদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে লোকনাথেরা আবার সদলবলে সমুদ্র উপকূল ধরে বিভিন্ন গ্রামের পথ অতিক্রম করে এগিয়ে চললো।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একস্থানে একটু বসে পরস্পর আলোচনা করে তারা স্থির করলো—যাদের নিরাপদ স্থানে যাবার সুযোগ আছে তারা দু'তিনজন করে

এক একটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সেই স্থানে চলে যাবে। এই উদ্দেশ্যে সকলে ছোট ছোট বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হ'ল। লোকনাথ প্রত্যেকটি গ্রুপকে প্রয়োজন অনুযায়ী পথ-খরচার জন্য অর্থ দিল। পথিক-বন্ধুর কাছ থেকে যতদূর সম্ভব শহরে পৌঁছবার পথ ও পথের খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে গ্রুপগুলি একে একে বিদায় নিল।

লোকনাথের গ্রুপে রইল—রজত, মনোরঞ্জন, দেবু, স্বদেশ, সুবোধ ও ফণী। পথিক-বন্ধুকে তারা তখনও ছেড়ে দিতে পারে নি। লোকনাথ বহুবার তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে থেকে পথের নির্দেশ দিতে বারে বারে অনুরোধ করেছে। এতে পথিক কখনও অমত করে নি বা একটুও বিরক্তির ভাব দেখায় নি।

এখন সমস্যা লোকনাথ তার ছ'জন সাথীকে সংগে করে কোথায় যাবে? গ্রামাঞ্চলের সদস্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি সাময়িক নিরাপদ আশ্রয় তাদের একান্ত প্রয়োজন। রজত সেনের বাড়ি কোয়েপাড়া গ্রামে। তার মা ও বাবা শহরের বাড়িতে থাকেন। গ্রামের বাড়িটি অন্যান্য আত্মীয়দের তত্ত্বাবধানে আছে। রজত প্রস্তাব করে, সকলে সাময়িক ভাবে তাদের গ্রামের বাড়িতেই আশ্রয় গ্রহণ করুক। সবাই এই প্রস্তাবে এক মত।

পথিক-বন্ধুকে এবারে লোকনাথ অনুরোধ জানালো, সে যেন কোয়েপাড়া যাবার জন্য তাদের একটা নৌকোর ব্যবস্থা করে দেয় এবং কিভাবে বা কোন্ পথে নিরাপদে কোয়েপাড়া যাওয়া যাবে তার একটি বিশদ নির্দেশও যেন দেয়। "বন্দী" পথিক-বন্ধু এবার খুব সঙ্কোচের সঙ্গে লোকনাথকে বলল—"দেখুন, নদী-তীরে খালি নৌকো পড়ে আছে। ঐ একটার মধ্যেই আপনারা আশ্রয় নিন। এত রাত্রে আপনাদের সাতজনকে একসঙ্গে যদি কেউ দেখে, তবে তার মনে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। আর যদি পুলিসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহলে বুঝতেই পারছেন বিপদের সীমা থাকবে না। কাজেই একটা খালি নৌকোতেই লুকিয়ে থাকুন। আমাকে যেতে দিন; আমি ইতিমধ্যে আমার মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। কারণ, মামারা আমার চাইতে অনেক ভালোভাবে নৌকোর ব্যবস্থা করতে ও আপনাদের কোয়েপাড়ার পথের নির্দেশ দিতে পারবেন। মামাকে বললে তিনি আমার অনুরোধ অবহেলা করতে পারবেন না। আমি গেলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসবো।"

পথিকের নির্দেশমত তারা সাতজন একটা পরিত্যক্ত খালি নৌকোর মধ্যে লুকিয়ে রইল! কিন্তু "বন্দী পথিককে" তারা কোন্ ভরসায় ছেড়ে দেবে?

পিস্তল দেখিয়ে পথিককে বন্দী করেছে ; সে জাতিতে মুসলমান—তার পরিধেয় বস্ত্র খাকী পোশাকের পরিবর্তে বেশ পরিবর্তনের জন্য তারা নিয়েছে ; সকাল থেকেই পথিককে চোখে চোখে রাখা হয়েছে। কিন্তু এত সবের পরেও তার মনোভাব বা ব্যবহারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নি এবং লোকনাথেরাও তার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। তবু, সে জাতে মুসলমান এবং এতক্ষণ খুব বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে থাকলেও সে যে তাদের বন্দী—এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করা যায় না। এমন অবস্থায় তার প্রস্তাব—সে গিয়ে মামাকে নিয়ে আসবে এবং মামাই সব ব্যবস্থা করে দেবে—এ কি মেনে নেওয়া সম্ভব ? সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে মুসলমান পথিক-বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করে মামাকে ডেকে আনবার জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না।

আমার মনে হয়, যার কাছ থেকে এত সাহায্য পাওয়া গেছে, যে এত দীর্ঘ সময় বিপদ মাথায় নিয়েও তাদের সঙ্গে আছে—সেই বন্ধুকেও যদি ষড়যন্ত্রমূলক কাজে অবিশ্বাস করা হয়, তাতে কোন অন্যায় হতে পারে না। কিন্তু লোকনাথ এক বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিল। বিপদ ও বিশ্বাসঘাতকতার আশা থাকা সত্ত্বেও লোকনাথ পথিক-বন্ধুকে তার মামার কাছে যাবার অনুমতি দিল—"ভাই, তুমি মুক্ত ; তুমি যাও, কিন্তু যত শীঘ্র পার ফিরে এস। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করবো।"

এ কি ? আমাকে হিন্দু যুবকেরা এতখানি বিশ্বাস করছে ? আমি তো তাদের ধরিয়েও দিতে পারি ? এতখানি তাদের বিশ্বাস আমার ওপর—এত আস্থা ?—পথিক-বন্ধুর অন্তর বিগলিত হ'ল। লোকনাথ এই ঘটনার বিবরণ দেবার সময় আমাকে বলেছিল—'পথিকের দুই চোখে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল।' সে বর্তমানে মুক্ত—একেবারে মুক্ত ; কিন্তু লোকনাথের বন্ধুত্বের সূক্ষ্ম গ্রন্থিতে সে যে এখন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ! মামার খোঁজে ও মামাকে নিয়ে আসতে সে চলে গেল।

লোকনাথ ক্ষণিকের এই বন্ধুকে বিশ্বাস করেই মুক্তি দিয়েছে। এখন সে ইচ্ছে করলেই শত্রুতা করতে পারে। মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই। কখন কি ঘটবে—এই আশঙ্কায় তারা সাতজন সর্বক্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। কে জানে হঠাৎ কি ঘটবে ? সশঙ্কিতচিত্তে অনিশ্চয়তার মধ্যে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় তারা পথিক বন্ধুর প্রতীক্ষার সময় কাটাতে লাগলো। বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করলে যে-কোন সময়ে তাদের পুলিসের অতর্কিত আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে। তবু উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত তাদের দেখতে হবে। দু'টি ঘণ্টা

অতিবাহিত হ'ল, তবু বন্ধু ফিরে এলো না। শত্রুতা না করলেও সাহস তো হারাতে পারে! অবশেষে তাদের নানা চিন্তার সমাধান করে বন্ধু তার মামাকে নিয়ে ফিরে এলো।

অপূর্ব! এইরূপ আদর্শ চরিত্রের ইতিহাস পৃথিবীতে বিরল। স্বদেশ-প্রেম, বন্ধুত্ব ও মানবতার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসকে নিশ্চয় সমৃদ্ধিশালী করেছে। ধন্য ক্ষণিকের বন্ধু! ধন্য তুমি বিপদের সাথী! তোমার দেশভক্তি, তোমার মহত্ব, তোমার নিষ্ঠা ও মানবতার ধর্মকে প্রণাম জানাই।

পথিক-বন্ধু ও তার মামা লোকনাথদের কোয়েপাড়া যাবার সব ব্যবস্থা করে দিল। মামা-ভাগ্নে নৌকো করে তাদের সঙ্গে নদীর ওপার পর্যন্ত গিয়ে লোকনাথদের কাছ হ'তে বিদায় নিল। মুসলমান তারা—ক্ষণিকের বন্ধু। আর কখনও হয়ত পরস্পরের দেখাও হবে না! তবু কেন এত মমতা? কেন তারা বন্ধু-বিচ্ছেদের গভীর বেদনা অনুভব করছে? যুগ যুগ একত্রে বসবাস করেও হয়ত প্রকৃত বন্ধুত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, আবার কখনও ক্ষণিকের সান্নিধ্যেও মনে হয় যেন অনাদি অনন্তকাল ধরে পরস্পর অতি আপন, অতি নিকটতম!

১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাত দুটোর সময় চট্টগ্রামের ডবলমুরিং জেটির দু'মাইল পশ্চিমে এই ড্রামা অনুষ্ঠিত হয়। আজ এই ঘটনার স্মৃতি উন্মোচনের জন্য বেঁচে আছে কেবল সুবোধ চৌধুরী। আর সেই অনামী ক্ষণিকের বন্ধু ও তার মামা যদি বেঁচে থাকে তবে তারাও এই ঘটনার সাক্ষ্য দিতে পারবে। ১৯৬২ সালের ২৬শে এপ্রিল, লোকনাথের জীবিতকালে, আমি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে ধারাবাহিকভাবে "Chittagong Heroes Fight for Freedom" শিরোনামায় যে লেখা পরিবেশন করেছি, তা'তে এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছি।

ভোরের আলো দেখা দেবার আগেই লোকনাথেরা সাতজন রজতের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিল। রজতের মা-বাবা শহরেই থাকতেন—কালেভদ্রে কখনও হয়ত গ্রামের বাড়িতে যেতেন। কাজেই এই খবর তাঁরা কিছুই জানলেন না। আবার আমরাও যে ওদিকে এপ্রিলের ২০-২১শে তারিখে রজতের শহরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম এবং তারই বাবা-মা'র সাহায্যে পুলিসের অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ করে রক্ষা পেয়েছি—এ কথাও রজতের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। রজতদের দেশের বাড়ি তাদের আশ্রয়ের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়। কারণ, পুলিস যখন রজতের খোঁজে তাদের শহরের বাড়িতে অনুসন্ধান করেছে, তখন গ্রামের

বাড়ি বাদ দেবে ভাবাটা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু যাই হোক্ না কেন, উপস্থিত এই গ্রামের বাড়িতেই তারা সাময়িকভাবে আশ্রয় নেবে বলে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। রজতদের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নেবার পর বিভিন্ন সূত্রে চেষ্টা করে দু' দিনের মধ্যেই বিনয়দার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হ'ল।

বিনয়দা তাদের সাতজনকেই নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। বিনয়দার বাড়ির সকলেই আমাদের সমর্থক। কাজেই এখানে আত্মগোপন করে থাকার সুবিধে ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল লোকনাথ। সে চট্টলবাসীর একান্ত পরিচিত। কাজেই তার পক্ষে নিরাপদে আত্মগোপন করা খুব কষ্টসাধ্য। তা'ছাড়া তার গৌরবর্ণ দেহাকৃতি, মুখশ্রী, সব মিলিয়ে তাকে সুভাষচন্দ্রের ছোট ভাই বলেই মনে হ'ত। তেমন অসাধারণ চেহারার লোক সহজেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লোকনাথের উপস্থিতিতে অন্যান্য ছ'জন সাথীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে মনে করে বিনয়দা আমাদের পার্টির একজন বিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল যুবক সৈনিকের (জালালাবাদে এক সঙ্গে যুদ্ধ করে এসেছে) সঙ্গে লোকনাথকে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

ভোর হবার আগেই লোকনাথকে নিয়ে সেই বীর সৈনিক তার নিজের বাড়িতে গেল। আমাদের দলের গোপন অংশের সভ্য বলে যুব-বাহিনীর এই দায়িত্বশীল সদস্যকে গ্রামের সকলের পক্ষে চেনা বা জানা সম্ভব ছিল না।

নিচেরতলায় একটা ঘরে লোকনাথকে বসিয়ে সে ওপরে বাড়ীর অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা করতে ও কথা বলতে গেল। এই যুবক-সাথী কৃতী ছাত্র—বি-এ, চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তো। তার জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অভাব ছিল না। এইরূপ যুবকের দায়িত্ববোধ ও কর্মনিষ্ঠার ওপর নির্ভর না করলে আর কার ওপর লোকনাথের নিরাপত্তার ভার দেওয়া যায়? বিনয়দা অগাধ বিশ্বাস নিয়ে এই যুদ্ধ-ফেরত ও সাহসী যুবক সৈনিককে লোকনাথের নিরাপদ আশ্রয়ের দায়িত্ব নিতে নির্বাচিত করেছিলেন। বলাই বাহুল্য, সেই যুবক সাথী নিজে থেকে এই দায়িত্ব না নিলে তার ওপর জোর করে এই ভার চাপিয়ে দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। গ্রামের রাস্তাঘাট ও দলের বিভিন্ন কর্মীদের ঠিকানা তার জানা ছিল। এই যুবক-সাথীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই লোকনাথ তাদের বাড়িতে এসেছে। সে লোকনাথকে নিচের একটা ঘরে বসিয়ে রেখে গেলেও এখানে তার আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার কোন কথাই ওঠে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল, লোকনাথ একা বসেই আছে, সাথীটির দেখা নেই। নিচের তলায় কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়? কত লোক আসতে

পারে! ভোর হয়ে গেছে—হাতমুখ ধোয়া, প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করা, সবই তো প্রয়োজন। তা'ছাড়া হ'ল কি? সে তো একবার এসে বাড়ির সকলের অবস্থা ও তাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে লোকনাথকে জানাবে? লোকনাথ তার সঙ্গে সব বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। প্রায় দেড় ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পরেও যখন যুবক-সাথীটি এলো না, তখন লোকনাথ অস্থির হয়ে নিচে থেকেই তার নাম ধরে বারে বারে ডাকতে লাগলো। কোন উত্তর নেই। হ'ল কি? লোকনাথ অবাক! সে আরো জোরে চীৎকার করে ডাক দিল।

এমন সময় পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। মনে হল সিঁড়ি দিয়ে কে যেন নামছে। কিন্তু এটাও স্পষ্ট বোঝা গেল—সে নয়, আর কেউ হবে। এই পদধ্বনি বাড়ির অপর কোন লোকের। তাই ঠিক—বিপ্লবী সাথী নিজে এলেন না, এলেন--মামাবাবু।

লোকনাথকে এই মামাবাবু হয়ত বহুবার বিভিন্ন সভায় বা ময়দানে শারিরীক শক্তি ও ক্রিয়া প্রদর্শনীর সময় দেখেছেন। কাজেই লোকনাথকে চেনা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের যুবক-সাথীর মামা হলেও, তিনি নিজের পরিচয় দেবার আগে লোকনাথ তাঁর সঠিক পরিচয় জানতে পারে নি।

আশ্চর্য মানব চরিত্র! মামাবাবু নিজে পরিচয় দিয়ে লোকনাথকে সসম্ভ্রমে বললেন—"দেখুন, আমরা বিপদে যেতে সাহস করি না। আমরা সাধারণ গেরস্ত লোক—নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চাই। আপনি তো বুঝতেই পারছেন, পুলিস আপনাকে গ্রেফতার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আপনি কোন কারণে যদি এখানে ধরা পড়েন তবে আমাদের আর রক্ষা থাকবে না। তাই আপনাকে আমাদের সবিনয় অনুরোধ—আপনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন না।...এখন তবে আপনি আসুন।"

লোকনাথ এইরূপ অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কি আর করে! লোকনাথ তখন মামাবাবুকে অনুরোধ করল অন্তত তার ভাগ্নে যেন একবার তার সঙ্গে দেখা করে! মামাবাবু গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন—"না, তার সঙ্গেও আপনার আর দেখা হবে না। রিভলভারটি নিন।" এই বলে মামাবাবু তাঁর ভাগ্নের রিভলভারটি লোকনাথকে ফিরিয়ে দিলেন।

লোকনাথ বুঝলো বিপ্লবী সাথী তার সঙ্গে আর দেখা করবে না এবং তাকে এই বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু দিনের আলোতে পরিচিত গ্রামে ঘরের

বাইরে আসা লোকনাথের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। উপায়ন্তর নেই দেখে মরিয়া হয়ে লোকনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে কঠোর কণ্ঠে বলল—"দেখুন, আমি জোর করে এখানে থাকব না, নিশ্চয়ই অন্যত্র চলে যাব। কিন্তু রাতের অন্ধকারের সাহায্য আমাকে নিতেই হবে। কাজেই সন্ধ্যার পর পর্যন্ত আপনাদের বাড়িতেই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

মামাবাবু লোকনাথের এই প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারলেন না। রাত আটটা পর্যন্ত লোকনাথ সেই বাড়ির নিচেরতলার সেই ঘরেই ছিল। দুপুরের খাওয়া থেকে সে অবশ্য বঞ্চিত হয় নি। কিন্তু সেই বীর বিপ্লবী সাথীর সঙ্গে লোকনাথের আর দেখা হ'ল না। রাত আটটায় লোকনাথ সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে নির্মলদার মামাবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

বিচিত্র মানুষের মনস্তত্ত্ব! যে কয়েকদিন আগেও একসঙ্গে জালালাবাদ পাহাড়ে লোকনাথের কম্যাণ্ডে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, এই অল্প সময়ের মধ্যে তার কি করে এই আশ্চর্য পরিবর্তন হ'ল? বিপ্লবী দলে যোগ দেবার সময় কত প্রতিজ্ঞা—'আমাদের মা নেই, বাপ নেই, ঘর নেই, বাড়ি নেই, আমরা শুধু জানি জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী!' এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের আঁচল, বাড়ির বন্ধন, মামার স্নেহ-শাসন কি করে তার বিপ্লবী নিষ্ঠাকে ম্লান করে দিল?

এই তথ্য গবেষণা করে ভাবীকালের বিপ্লবীদের বুঝতে হবে। জালালাবাদের যুদ্ধ—চারিদিকে রক্ত আর রক্ত! সাথীরা গুলীবিদ্ধ অবস্থায় অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে! সেই মৃত্যু-বিভীষিকার বাস্তবতাকে হৃদয়ঙ্গম করে যদি Subjective mind তৈরী না হয় তবে, তরুণ বিপ্লবীদেরও এই পরিণতি হতে বাধ্য। বিপ্লবের কথা মুখে আওড়ানো আর রক্তাক্ত বিপ্লবের সম্মুখীন হওয়া—এই দু'য়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে, আমাদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও, এইরূপ চরিত্রের পরিচয় আমরা পেয়েছি। বিপ্লবের ইতিহাস কেবল সাহস ও আত্মত্যাগের পীঠস্থান নয়—ভীরুতা ও কাপুরুষতা সংগঠনকে কতখানি দুর্বল করে, তাও এই ইতিহাসের একটি শিক্ষণীয় ও গবেষণার বিশেষ অধ্যায়।

"বন্ধুর" গৃহ ত্যাগ করে লোকনাথ নির্মলদার মামার বাড়িতে আশ্রয় নিল। বর্তমানে সাময়িকভাবে মাস্টারদা ও অন্যান্যদের সংস্পর্শ থেকে লোকনাথ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

বিনয়দার বাড়িতে রজত, মনা, দেবু, স্বদেশ, ফণী ও সুবোধ একত্রে আছে। কিন্তু এই ছ'জন সাথী নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতে নারাজ। গেরিলা-যুদ্ধ চালাতে

হবে—আক্রমণের নতুন নতুন প্ল্যান নেওয়া চাই। নিরবচ্ছিন্নভাবে আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে। নিষ্ঠুর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর হৃদয়-শোণিতে তর্পণ করা চাই। যুব-বিদ্রোহের দিন ইউরোপীয়ান-ক্লাবের নিধনযজ্ঞ সম্পন্ন হয় নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি। প্রতিশোধ নিতেই হবে—প্রতিহিংসার আগুন জ্বালাতেই হবে। জালালাবাদের শহীদদের আহ্বান এই ছ'জন বিপ্লবী সৈনিক যেন প্রতিদিনই শুনতে পাচ্ছে—ইংরেজের পরিত্রাণ নেই, প্রতিশোধ চাই। মৃত্যুসংকল্পে দৃঢ় ও বদ্ধপরিকর এই সাথীরা সক্রিয় প্ল্যান গ্রহণ করলো।

পাহাড়তলীতে একটি ও কর্ণফুলী নদীতীরে সদরঘাট জেটির কাছে ব্যালেন-টাইন ঘাটে একটি, সাহেবদের এই দু'টি ক্লাব। এই দু'টি ক্লাব রেল ও সরকারী বড়সাহেবদের প্রমোদভবন। ক্লাব আক্রমনের জন্য নিখুঁতভাবে বিস্তারিত প্ল্যান করার প্রয়োজন তারা মনে করে নি। শহরে পুলিস ও মিলিটারীর রাজত্ব চলছে। বসে বসে বহুদিন ধরে শান্ত পরিবেশে গোপনে প্ল্যান করার পরিস্থিতিও বর্তমানে আর নেই। সশস্ত্র আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ সুরু হয়েছে। তাই এখন প্রয়োজন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ক্লাব-গৃহের কাছে এগিয়ে যাওয়া এবং অতর্কিতে সাহেবদের আক্রমণ করে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর হাতে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের প্রতিশোধ নেওয়া।

অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত অবস্থার নিখুঁত সংবাদ পাওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা'ছাড়া সরকারপক্ষ নিত্য নতুন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে—আজ যা আছে, কাল তার পরিবর্তন হচ্ছে। এই বাস্তব অবস্থার সম্যক উপলব্ধি আছে বলেই তারা দু'টি ক্লাবই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বলে ধরে নিল—একটাতে কোন অসুবিধে হলে অন্যটিকে যেন বিধ্বস্ত করতে পারে। বিনয়দার মারফত এই প্ল্যানটি তারা মাস্টারদার কাছে তাঁর অনুমোদনের জন্য পাঠায়। মাস্টারদা তাদের এই প্রতিশোধস্পৃহাকে সমর্থন জানালেন।

যুব-বিদ্রোহের সতেরো দিন পরে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, ওই ছ'জন বিপ্লবী সাথী গ্রাম থেকে শহরে এলো। বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে তারা বুঝলো সরাসরি ক্লাব আক্রমণ করতে যাওয়া সম্ভব নয়। পথে মিলিটারী ও পুলিসের বাধা আছে। কাজেই শহরে কোন নিরাপদ স্থানে একটু অপেক্ষা করে অবস্থাটা সম্যকভাবে বুঝে নেওয়াই তাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হ'ল। এই কারণে, তারা ছ'জন যতদূর সম্ভব গা ঢাকা দিয়ে বাড়ির সম্মুখের প্রবেশ পথ পরিহার

করে রজতের শহরের বাড়িতে প্রবেশ করলো। কিন্তু এত সাবধানতা ও সতর্কতা কোনই কাজে এলো না।

যুব-বিদ্রোহের সতেরো দিন পরে রজতের বাড়ি বা আমাদের অন্যান্য বিশেষ পরিচিত সাথীদের শহরের বাড়ি আর নিরাপদ ছিল না। পুলিস প্রতিটি বাড়ি ও সন্দেহজনক প্রত্যেকটি পাড়ায় স্থানীয় দুষ্ট লোকদের গুপ্তচর হিসেবে নিযুক্ত করেছে। উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করে ও অতিরিক্ত পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে ওই সব দুষ্ট লোকদের বিপ্লবীদের গতিবিধির সংবাদ সরবরাহের ঘৃণ্য কাজে টেনে এনেছিল।

রজতের বাড়ির চারপাশে স্থানীয় ওই সব লোকেরা সর্বক্ষণ গোয়েন্দাগিরিতে বহাল থাকতো। রজতের বাবাও এই গোপন পুলিসী ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পেরেছিলেন এবং ছ'জন বিপ্লবী সাথীও এইরূপ অবস্থা সম্বন্ধে আগে থেকেই কিছু অনুমান করেছিল। এই জন্যই বিপ্লবী সাথীরা ও রজতের বাড়ির সকলেই সাধারণভাবে সাবধান ছিল। রজতেরা পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই রজতের ছোট ছোট ভাই-বোনেরা নিজ বুদ্ধিতে বাড়ির চারদিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলো।

দাদা এসেছে—দাদার সাথীরা এক সঙ্গে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ফিরেছে; ছোট ভাই-বোনেদের কি আনন্দ! কি উৎসাহ!—"দাদা, তুমি এসেছ! তোমার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি নি। তোমরা যাও, ভেতরে যাও। মা-বাবা এখন বাড়িতে আছেন। বাইরের লোক কেউই নেই। কোন ভয় নেই—আমরা এখানে পাহারায় আছি। পুলিস এলে আমরা আগেই জানাবো —তোমরা প্রস্তুত হবার সময় পাবে"—রজত ভাই-বোনের আবেগভরা আন্তরিক সাড়া পেয়ে বুঝেছে যে, তারা কেউই ভয় পায় নি—বিপ্লবের পথে দাদাকে সব রকম সাহায্য করতে তারা সব সময় প্রস্তুত। রজত গলার স্বর একটু নামিয়ে বোনকে জিজ্ঞেস করলো—"হ্যাঁ রে, শোন্—বাবা কি খুব রেগেছেন? বন্দুক নিয়ে গেছি বলে কি চটেছেন? পুলিস কি হামলা করেছে? আমরা ভেতরে যাব? আমাদের দেখে ভয় পাবেন না তো? হঠাৎ চটে গিয়ে বেরিয়ে যেতে বলবেন না তো?" ভাইবোনেরা প্রায় একসঙ্গে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলল—"দাদা, তোমার একটুও বুদ্ধি নেই। কেবল সাহেব মারতে আর যুদ্ধ করতেই পার। বাবা-মা তোমাদের ওপর কখনও রাগ করতে পারেন? যাও যাও, তাড়াতাড়ি বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা কর—তখন বুঝতে পারবে তোমাদের নিয়ে তাঁদের কত গর্ব!"

রজত অপর পাঁচজন সাথীর সঙ্গে বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করলো। মা ছেলেকে অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে নিজের ঘরে দেখে ক্ষণিকের জন্য বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন—একি স্বপ্ন না বাস্তব? রজত ছুটে গিয়ে মাকে প্রণাম করলো। না, এ তো স্বপ্ন নয়? মা রজতকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—মায়ের অন্তরের কত স্নেহ, কত ভালোবাসা, কত আশীর্বাদ! রজত জিজ্ঞাসা করলো —"মা, সত্যি বল, তুমি খুশি হয়েছ? আমরা অন্যায় করেছি—একথা একবারও ভাব নি? বাবা কি···"—মা বাধা দিয়ে বললেন—"কি যে বলিস্ বাবা! দেশবাসী আজ তোদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চট্টলার প্রতিটি দেশপ্রেমিক তোদের নিয়ে গর্বিত। আমরা কি কখনও তোদের ওপর রাগ করতে পারি? তোরা আজ আমাদের কত গর্বের! তোদের এই বিপদের সময় আমরা তোদের সামান্য কাজে লাগলেও মনে করবো স্বাধীনতা-যুদ্ধে কিছুটা অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলাম। গণেশ-অনন্তরা চারজনও আমাদের এখানে ছিল। পুলিসের আকস্মিক আক্রমণ থেকে কোনমতে তারা বেঁচেছে। যা, তোর বাবার কাছে সব শুনবি··· ।"

রজত এই প্রথম জানলো যে, আমরা চারজনও তাদের শহরের এই বাড়িতে ছিলাম। রজতের সঙ্গে বাকি পাঁচজন সাথীও একে একে মাসীমার পায়ের ধূলো নিল। রজতের বাবার কাছেও তারা ছ'জন বীরোচিত সম্মান ও অভ্যর্থনা পেল।

মাসীমা রান্নাঘরে চলে গেলেন তাড়াতাড়ি কিছু রেঁধে তাদের সামনে বসে খাওয়াবেন। অপর দিকে তাদের অজান্তে শত্রুপক্ষের তৎপরতাও সমানে চলেছে। দু'জন দুষ্ট লোক থানায় গিয়ে খবর দিল যে, রজতকে পাঁচ-ছ'জন সাথীর সঙ্গে বাড়িতে প্রবেশ করতে তারা দেখেছে। কোতোয়ালি রজতের বাড়ির খুব কাছে—সিকি মাইলও বোধহয় হবে না। সদর থানায় ডি, এস, পি, আসানুল্লা স্বয়ং উপস্থিত। এই মূল্যবান সংবাদ পাওয়া মাত্রই আসানুল্লা পুলিস সাহেব, ডি, আই, জি, ও কর্নেল ডালাস স্মিথ্‌কে টেলিফোনে খবর দিলেন যেন ফৌজ নিয়ে তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি হাজির হন। আসানুল্লা নিজে থানার একদল কন্‌স্টেবলের সঙ্গে রজতের বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে প্রস্তুত হলেন। কোতোয়ালি-ইনচার্জ আজীম সাহেব দেখলেন যোগ্যতার পুরস্কার খাঁ সাহেব আসানুল্লা একাই লাভ করতে চাইছেন। আজীম সাহেবের পক্ষে এটা সহ্য করা সম্ভব হ'ল না। তিনিও এই ছ'জন বিপ্লবীকে জীবিত অথবা মৃত ধরবার অভিপ্রায়ে আর একদল সশস্ত্র কন্‌স্টেবল সহ ভিন্ন পথে বেড়িয়ে পড়লেন!

কোতোয়ালিতে সংবাদ পাবার পরেই খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যদি তারা রজতের বাড়ি ঘিরে ফেলতে পারতো তবে হয়ত রঞ্জনবাবুর বাড়িই যুদ্ধক্ষেতে পরিণত হ'ত। আসন্ন যুদ্ধ ও মৃত্যু-বিভীষিকাই যে আসাহুল্লা ও আজীম সাহেবের ক্ষিপ্রতার গতি মন্থর করেছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ইতিমধ্যে মাসীমা রান্না সেরে টেবিলে ছ'খানা থালা সাজিয়ে রজতদের ডেকে পাঠালেন। তারা সকলে খেতে বসেছে। কিন্তু খাওয়া আর হ'ল না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিনিদ্র রজনী যাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য, গুপ্ত সর্পের ক্রূর ফণা যাদের দংশনে সদাই উদ্যত, মা-বাবার স্নেহ এবং বাড়ির আদর যত্নে যারা বহুদিন ধরেই বঞ্চিত, তাদের পক্ষে থালা সাজানো বাড়া ভাত স্বাভাবিক নিয়মের একটা ব্যতিক্রম মাত্র!

পাহারায় নিযুক্ত রজতের ভাইবোনেরা হঠাৎ সঙ্কেতধ্বনি করলো—"পুলিস! পুলিস!" ছ'জন বিপ্লবীর হাত সঙ্গে সঙ্গে কটিবন্ধে রিভলভারের ওপর নিবদ্ধ হ'ল। ভাতের থালা পড়ে রইল। তারা উঠে মাকে প্রণাম করলো—মা অজস্র আশীর্বাদ করলেন। রজত বলল—"মা, ভেবো না, ভয় কোর না—আমরা জয়ী হব।" রজতের বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি রজতকে ডেকে বললেন—"শাহজীর নৌকো-ঘাট দিয়ে নদী পার হওয়া সহজ হবে। ওই দিকের পথই সহজ এবং দূরত্বও কম। তোরা ওই পথে যেতেই চেষ্টা কর্; ভগবান তোদের মঙ্গল করবেন!" রজতের পিতার নির্দেশ ও আশীর্বাদ শিরোধার্য করে তারা দ্রুত রওনা হ'ল।

পুলিশ ধাওয়া করে আসছে; দাদা চলে যাচ্ছে, দাদার সাথীরাও অনির্দিষ্টের পথে পা ফেলেছে—রজতের ভাইবোনেরা ব্যাথাতুর নয়নে রজতদের গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। রজতের বাবা অসহায় অবস্থায় অন্তর উজাড় করে চট্টলার সন্তানদের কল্যাণ ও বিজয় প্রার্থনা করলেন। মা বিনোদিনী বিপ্লবী সন্তানদের বিদায়কালে তু'হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন।

রিভলভার হাতে বিপ্লবীরা বাড়ির সকলের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। পুলিসের দল যখন এসে পৌছেছে, তারা তখন নদীর ঘাটে। পুলিস খবর পেয়ে পেছু নিয়েছে, সহজে হার মানবে না—তবে সরাসরি পিস্তলের রেঞ্জের মধ্যে এসে পৈতৃক প্রাণটা হারাতেও তারা রাজী নয়। সৈন্যবাহিনী আসা পর্যন্ত নিজেদের বাঁচিয়ে রেখে দূর থেকেই বিপ্লবীদের অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ। খাঁ সাহেব আসাহুল্লা ও সদর থানা-ইনচার্জ আজীম সাহেব বুদ্ধিমানের মত সেই কৌশলই অবলম্বন করলেন।

আমাদের মামলার জাজ্‌মেণ্ট থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

"A useful map of the entire area has been prepared. It is Ex. III. On the night of 6th. May about 8-30 or 9 p.m. S. I. Abdul Azim and D. S. P. Khan Bahadur Ashanulla were sitting in Kotwali P. S. along with several other police officers when they received certain information about some persons suspected to belong to the raiders and hastened towards Shahji Ghat on the Karnafuli river at the end of Feringhee Bazar.

"Abdul Azim went to Abdul Haq Dubhas's Jetty where he found no suspects but got some more information and saw a 'Sampan' (boat) putting out across the river from the Jetty. He called out but there was no reply. In the meantime Khan Bahadur Ashanulla had found a 'Sampan' at Shahaji Ghat and in it he and S. I. Hem Gupta, S. I. Fazlur Rahaman, S. I. Pande Ali and two youths from Feringhee Bazar, one of whom was their informer, set out across the river in persuit. Abdul Azim had some difficulty in securing a 'Sampan', but a little later he succeeded in finding one and on it he accompanied by Inspector Heramba Ghosh, S. I. Abdur Rahim, S. I. Jogendra Das and S. I. Rohini Bhoumik followed Ashanulla's party across the river."

—জজসাহেব লিখছেন, এই ছ'জনের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছে, সেই রণক্ষেত্রের সম্পূর্ণ এলাকার একটা নক্সা প্রস্তুত হয়েছে। এই নক্সাটি তিন নম্বর একজিবিট। রাত সাড়ে আটটা বা ন'টার সময় কোতোয়ালিতে খাঁ বাহাদুর আসাহুল্লা ও আজীমের সঙ্গে আরো কয়েকজন অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তাঁদের কাছে এক খবর এল, শাহজী ঘাটের দিকে বিদ্রোহীদের একটা দল ছুটে চলেছে। ফিরিঙ্গী বাজারের শেষপ্রান্তে, কর্ণফুলী নদীতীরে এই ঘাটটি অবস্থিত।

কোতোয়ালি-ইন-চার্জ আবদুল আজীম আবদুল হক্ দোভাষীর জেটির দিকে

ছুটে গেলেন। সেখানে বিদ্রোহীদের কাউকে দেখতে পেলেন না; কিন্তু কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করলেন। তিনি অদূরে একটা "সাম্পান" (নৌকো) নদী পাড়ি দিচ্ছে দেখতে পেলেন। দেখে তিনি হাঁক দিলেন কিন্তু কোন উত্তর মিললো না। ইতিমধ্যে খাঁ বাহাদুর আসান্থল্লা সদলবলে—স্যব-ইন্‌স্পেক্টার মহোদয়, হেম গুপ্ত, পাণ্ডে আলি, ফজলুর রহমান ও দু'জন ফিরিঙ্গী-বাজারের যুবক, শাহজী ঘাটে একটা সাম্পানে চাপলেন। শেষোক্ত দু'জন যুবকের মধ্যে একজম গোয়েন্দা। তারা এই নৌকো নিয়ে বিদ্রোহীদের পেছনে ছুটলেন। আবদুল আজীমের নৌকো জোগাড় করতে কষ্ট হয়। অবশেষে তিনিও তাঁর দলে ইন্‌স্পেক্টার হেরম্ব ঘোষ এবং তিনজন দারোগা—আবদুর রহিম, যোগেন্দ্র দাস ও রোহিণী ভৌমিককে নিয়ে আর একটা সাম্পানে চেপে আসান্থল্লা সাহেবের নৌকো অনুসরণ করেন।

সরকারপক্ষ রেখে ঢেকে যা স্বীকার করেছে, তা' থেকে জানা যাচ্ছে যে, রঞ্জনবাবুর বাড়িতে পুলিসদল পৌছবার আগেই বিদ্রোহীরা উধাও হয়েছে এবং এই পুলিসদল দুই পার্টিতে বিভক্ত হয়ে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে নৌকোযোগে তাদের অনুসরণ করেছে। খাঁ সাহেব ও আজীম সাহেব—এই দু'জনেই প্রাণের ভয়ে বিপ্লবীদের গুলীর পাল্লার বাইরে থাকার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তবু জজসাহেব কুখ্যাত খাঁ বাহাদুর আসান্থল্লার স্তুতি করেছেন। ইংরেজ রাজপুরুষেরা এই ভাবেই ভারতীয় অফিসারদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতেন। জাজ্‌মেণ্টে মিঃ ইউনী লিখেছেন—

"When Ashanulla's 'Sampan' had reached the middle of the river, an electric torch-light was flashed upon them from the southern bank and thay rowed towards it. When they were within 50 or 60 cubits distance of the bank, they turned their torch-lights on it and saw some six persons sitting there who immediately got up and began to hasten south-eastern over the fields. Ashanullas companions raised their rifles to fire at them but he forbade them as he was not certain that these were the same persons they were looking for."

—আসান্থল্লার সাম্পান মাঝ-নদীতে এলে কর্ণফুলীর দক্ষিণ তীর থেকে তাঁদের নৌকোর ওপর ইলেকট্রিক টর্চের আলো পড়ে। আসান্থল্লার পার্টি নৌকো

বেয়ে ওই দিকেই গেল। নদীতীরে পৌঁছবার পঞ্চাশ-ষাট হাত বাকি থাকতে টর্চের আলোতে তাঁরা তীরের ওপর ছ'জনকে বসে থাকতে দেখেন। আলো ফেলা মাত্রই সেই ছয়জন তড়িদ্গতিতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। আসানুল্লার সঙ্গীরা মুহূর্তে রাইফেল তুললেন তাদের গুলী করতে, কিন্তু এতক্ষণ তাঁরা যাদের অনুসরণ করে আসছেন এই ছ'জন লোক যে তারাই—এ সম্বন্ধে একেবারে সুনিশ্চিত নয় বলে আসানুল্লা গুলী ছুঁড়তে বাধা দিলেন।

অহো! খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা কি মহানুভব! জজসাহেব মিঃ ইউনী তাঁর গুণগানে পঞ্চমুখ! যে কুখ্যাত ডি, এস, পি, আসানুল্লা অসহযোগ আন্দোলন দমন করার সময় নিরীহ নিরস্ত্র লোকের ওপর বেপরোয়া লাঠি ও গুলী চালিয়েছেন, সেই বৃটিশ খেতাবধারী খাঁ বাহাদুর অস্ত্র সংবরণ করেছেন পাছে অপর কোন নিরীহ লোক আহত হয়! মিথ্যা প্রবঞ্চনা ছাড়া এ আর কিছুই নয়। বিপ্লবীদের গুলীর পাল্লার মধ্যে রাইফেল দাগা যে বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তা' আর কেউ বুঝুক বা না বুঝুক খাঁ বাহাদুর আসানুল্লার সেই বোধ শক্তির অভাব ঘটে নি—তারা যে গান্ধীবাদী নয়; হাতে পিস্তল আছে, এত কাছে রাইফেল ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে ছ'টি অথবা বারোটি পিস্তল গর্জন করে উঠবে—এই অবশ্যম্ভাবী নিদারুণ পরিণতির কথা ভেবেই আসানুল্লার পুলিসী চরিত্রের এই ব্যতিক্রম। মহানুভবতার মুখোসধারী পুলিসদের ভীরুতা, কাপুরুষতা ও অকর্মণ্যতাকে মামলার সময় জেরা করে আমরা লোকচক্ষে প্রকাশ করে দিয়েছিলাম। বৃটিশ পুলিস খাঁ বাহাদুর কত সংযত, কত উদার—পাছে ভুলে নিরীহ মানুষ জখম হয় তাই আর গুলী ছুঁড়লেন না—বিদ্রোহীদের দ্রুত মাঠ অতিক্রম করতে সুযোগ দিলেন! কিন্তু সেই ছ'জনকে নিরীহ লোক বলেই যদি মনে করেছিলেন তবে বীরপুঙ্গবের দল ইঁটের পাঁজার পেছনে গা ঢাকা দিতে গেলেন কেন? আমাদের মামলার জাজ্‌মেণ্টে মিঃ ইউনী লিখছেন—

"The party then landed near brick-field and waited there for ten or fifteen minutes to see if they could find anybody who could show them any way by which they could go round and intercept the fugitives....."

—তাঁরা ইটখোলার মাঠে নেমে পড়ে সেখানে দশ-পনেরো মিনিট অপেক্ষা করেন। কারণ, তাঁদের এমন একজন পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল, যার সাহায্যে ঘোরা পথে গিয়ে পলাতকদের পথ অবরোধ করা সম্ভব হয়।

প্রথম সাফাই—গুলী ছুঁড়তে পারলেন না পাছে তারা আততায়ী না হয়।
দ্বিতীয় সাফাই—ঘোরা পথে গিয়ে পলাতকদের ধরবার জন্য একজন Guide-এর (পথ-প্রদর্শক) সন্ধানে তাঁদের দশ-পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হ'ল।
অর্থাৎ—কাজ কি বাবা বিদ্রোহীদের গুলীর পাল্লার মধ্যে যাওয়ার? দশ-পনেরো মিনিটে বিপ্লবীরা অনেকদূর চলে যাবে!

বৃটিশ পুলিস মরতে চায় না—নিজেরা বেঁচে থেকে বৃটিশ প্রভুর কাছ থেকে সুনাম ও পুরস্কার আদায়ের জন্যই সর্বদা সচেষ্ট! আসানুল্লা—চৌকিদার, দফাদার, গ্রামের মোড়ল, ডিষ্ট্রিক্ট ও ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার এবং প্রেসিডেণ্ট প্রমুখকে জড়ো করেন। এই সব সরকারী সংগঠনের লোকদের সাহায্যে গ্রামবাসীদের এক অংশকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সাহস বা ক্ষমতা এই ছোট পুলিস পার্টির ছিল না। কাজেই তাঁরা ছ'জন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিপ্লবীর সামনে নিরীহ গ্রামবাসীদের শিখণ্ডী খাড়া করে তাদের পিছন থেকে অনুসরণ করবার কৌশল অবলম্বন করলেন।

ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি ও চীৎকারে অল্পসংখ্যক গ্রামবাসীকে একত্র করে নানা প্রলোভন ও বিভিন্ন পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাঁরা দলে টানলেন। অনেকে যেমন পুলিসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'ল আবার বহু লোক তাদের প্ররোচনা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল—এও বাস্তব সত্য। সরকারী স্বীকৃতি থেকে সামান্য একটি নজির দিচ্ছি—

"......they heard shouts to the west of the house and came out to see what the trouble was. As they stood there, six persons came along the path and made entry into the yard of the house but they stood in their way. Where upon all the six levelled at them the pistols which they had in their hands and told the terrified Malekjjama and his father-in-law that they would not kill them if they showed them the way out of the 'bari'. Abdul Latif showed them the path and run off eastward towards the house of Ismat Ali Khalifa." (Judgement, Chittagong Armoury Raid Case No. I,).

—পশ্চিম দিকে চীৎকার শুনে তারা দেখতে এলো ব্যাপারখানা কি? তাদের বাড়ির উঠোনে ছ'জন রিভলভার হাতে প্রবেশ করলো। তারা বিদ্রোহীদের

পথরোধ করে দাঁড়ায়। বিপ্লবীরা ছ'জন রিভলভার বাগিয়ে ধরে এবং সশঙ্কিত মালেকজ্জমা ও তার শ্বশুরকে অভয় দিয়ে তাদের বাড়ির বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দিতে বলে। আব্দুল লতিফ্ পথ দেখিয়ে দিল। বিপ্লবীরা পূর্ব দিকে ইস্মৎ আলি খলিফার বাড়ি অভিমুখে ছুটে পালালো।

সরকারী তথ্য থেকে আমরা আগাগোড়া সত্য বিবৃতি আশা করতে পারি না। আমাদের সাথীরা জাজ্মেণ্ট কপিতে উল্লিখিত ওই পরিবারের কাউকে রিভলভার দেখিয়ে ভয় দেখায় নি। পুলিসী নির্যাতনের ভয়েই তারা এই সাফাই গেয়েছে যে—রিভলভার দেখিয়ে বিদ্রোহীরা তাদের সহযোগিতা আদায় করেছে। বাস্তবে এই পরিবার তাদের আশ্রয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। কিন্তু কিছু সংখ্যক ক্ষিপ্ত উত্তেজিত গ্রামবাসী পুলিসের সঙ্গে ছুটে আসছিল বলেই বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পুলিসের প্রভাবে গ্রামবাসীদের কিছুসংখ্যক যদিও উত্তেজিত হয়েছে, তবু বিপ্লবীরা এইরূপ সমর্থন অনেকের কাছেই পেয়েছে। পেছনে গ্রামবাসীদের যে দল এদের ধাওয়া করে আসছিল, তারা অনবরত ঢিল ও ইট-পাথর ছুঁড়ছিল। পেছনের চেঁচামেচিতে সামনের দিকে যে সব লোক জড়ো হয়েছে, তাদের মধ্যে শত্রু-মিত্র চেনা কঠিন। এদের অনেকেই মালেকজ্জমার মত সহযোগিতা করেছে আবার অনেকে পুলিসদলের সঙ্গেও যোগ দিয়েছে।

সরু পথ ধরে ছ'জনে চলেছে। একজনের পেছনে একজন। প্রত্যেকের হাতে খোলা রিভলভার। এদের ছ'জনের দলের পুরোভাগে মনোরঞ্জন সেন এবং সকলের পেছনে দেবপ্রসাদ গুপ্ত। সামনে গ্রামবাসীর একটা ছোট দল জড়ো হয়েছে। এমনি ধরণের বহু দল তারা অতিক্রম করে এসেছে। অন্যান্য দলগুলির মতই এই দলটিরও প্রায় পাশ ঘেঁষেই বিপ্লবীরা যাচ্ছিল। প্রথম পাঁচ-জন দলটিকে অতিক্রম করে গেল। সর্বশেষে দেবু যখন যাচ্ছে, তখন একজন বিশ্বাসঘাতক হঠাৎ একটা ধারালো দা দিয়ে দেবুর ঘাড় লক্ষ্য করে আঘাত করে। ভাগ্যে দেবু একপলকে অবস্থাটা উপলব্ধি করে শাণিত অস্ত্রের আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য নিমেষে নিজেকে সরিয়ে নেয়! মাথাটি কোনমতে ভূ-লুণ্ঠিত হ'ল না বটে, কিন্তু দায়ের প্রচণ্ড কোপ এসে পড়লো দেবুর কাঁধে। গুরুতর আঘাতে তার ডান হাতখানা একেবারে ঝুলে পড়লো। অঝোরে রক্ত ঝরছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই আঘাত সহ্য করা কারো পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। যুদ্ধের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কত অসম্ভব ও অসাধারণ জিনিসও যে বাস্তবে

পরিণত হয় তা সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে! এইরূপ গুরুতর আঘাতেও দেবু জ্ঞান হারালো না। বন্ধুদের সঙ্গে সমান কদমে ছুটে চললো।

এতবড় বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে ওই অবস্থায়ও দেবু কিন্তু এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে নি। দেবুর পিস্তল আততায়ীর বুক লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠলো। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গুলীবিদ্ধ হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আর যারা ছিল, যে-যেদিকে পারলো ছুটে পালাল। অপর পাঁচজন সাথী এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও অতর্কিত আক্রমণের বিষয় জেনে প্রতিশোধ নিতে ক্ষেপে গেল। কিন্তু কিভাবে প্রতিশোধ নেবে? পুলিস গুলীর পাল্লাব বাইরে, আর গ্রামবাসীরা সকলে এমনভাবে মিশে আছে যে, শত্রু-মিত্র প্রভেদ করা যাচ্ছে না।

আমাদের মামলার রায় থেকে এই ঘটনার সামান্য উল্লেখ করছি—

"....Presently thay heard several shots being fired by the fugitives and on reaching the path leading to the house of Ismat Ali Khalifa they found Ali Hussein lying wounded....thay saw near the house of Ismat Ali Khalifa six persons running eastward along the village path, pursued by a number of villagers who were shouting 'Dharo, Dharo' (catch them, catch them). The six fugitives ran past them and Ali Hussein made after them whereupon one of them turned and shot him and he fell down."

—এখন তারা আততায়ীদের পিস্তলের শব্দ শুনতে পায় এবং ইস্‌মৎ-আলি খলিফার বাড়ির গলিপথে আলি হোসেনকে আহত অবস্থার পড়ে থাকতে দেখে।......তারা ইস্‌মৎআলি খলিফার বাড়ির কাছে ছ'জন বিদ্রোহীকে দেখতে পায়। বিদ্রোহীরা গ্রাম্যপথে পূবদিকে দৌড়ে পালাচ্ছিল। তাদের পেছনে গ্রামবাসীরাও 'ধর, ধর' চীৎকার করে ছুটছে। ছ'জন পলায়মান ব্যক্তি তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আলি হোসেন তাদের অনুসরণ করে। বিদ্রোহীদের একজন ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে গুলী করায় সে পড়ে যায়।

বিশ্বাসঘাতকেরা উচিত মূল্য দিয়েছে—বিপ্লবীদের গুলীতে একজন আহত ও অপরজন নিহত হয়েছে। গ্রামবাসীরা (যারা বিপ্লবীদের পিছু ধাওয়া করেছিল) বুঝতে পেরেছে যে, দেশদ্রোহিতার প্রতিশোধ নিতে বিপ্লবীদের হাত একটুও কাঁপবে না। পুলিসবাহিনী সম্মুখ-সমরের জন্য এখনও প্রস্তুত নয়। তাদের সাহায্যের জন্য শহর থেকে সৈন্য এসে পৌছয় নি। এই অবস্থায় নিরাপদ

দূরত্বে থেকে গ্রামবাসীদের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা ছাড়া বর্তমানে পুলিসের আর কিছুই করণীয় ছিল না। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সহকারী প্রেসিডেণ্টের সাহায্যেই গ্রামবাসীদের প্ররোচিত করা পুলিসের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যেই একজন নিহত ও অপরজন আহত হওয়ায় শত্রু-চরেরা মিথ্যা প্ররোচনা দেওয়ার সুযোগ আরও বেশি পেলো। শাণিত দা দিয়ে অতর্কিতে নৃশংসভাবে আঘাত করার প্রতিফল-স্বরূপই যে সেই দু'জনকে উচিত মূল্য দিতে হয়েছে, তা' গ্রামবাসীরা কেমন করে জানবে? "ডাকাতেরা দু'জনকে হত্যা করেছে! তাদের ধর মার খুন কর"—এইভাবে চীৎকার করে জনতাকে উত্তেজিত করতে লাগলো চৌকিদার, দফাদার আর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও সহ-সভাপতি।

ক্ষিপ্ত জনতাকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের একজন গ্রামবাসীদের সম্বোধন করে জোরে চেঁচিয়ে বলল—"ভাই সব, আমরা স্বদেশী। ইংরেজ আমাদের শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে আমরা জেহাদ ঘোষণা করেছি। স্বাধীনতার জন্য আমরা জান কবুল করেছি। আমরা আপনাদের সাহায্য চাই, সমর্থন পাবার আশা রাখি। পুলিসের প্ররোচনায় আপনারা উত্তেজিত হবেন না। তারা আপনাদের ভুল পথে চালিত করছে—দেশদ্রোহিতায় প্রলুব্ধ করছে। তাদের কথা শুনবেন না, বিশ্বাস করবেন না—আপনারা ফিরে যান······।" বিপ্লবীদের এইরূপ প্রচারে কিছুটা কাজ হ'ল। অনেকে নিরস্ত হয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে মুখ ফেরালো।

পুলিস এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সেই দু'জন কুখ্যাত প্রেসিডেণ্ট ও সহকারী প্রেসিডেণ্ট বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রমাদ গুনলেন—এই বুঝি গ্রামবাসীরা বিদ্রোহীদের আবেদনে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে! তাঁরা মরিয়া হয়ে প্রাণপণে সাধারণ লোকেদের উত্তেজিত করতে লাগলেন; গুলী করে হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য 'ডাকাতদের' ধরতে নানাভাবে ক্ষেপিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পক্ষপাতিত্ব দোষে প্রভাবান্বিত বলে সরকারী তথ্যে সঠিক বিবরণ পাওয়া যদিও সম্ভব নয়, তবু নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে বিপ্লবীরা গ্রামবাসীদের কাছে সাহায্যের আশায় সত্যিই আবেদন করেছিল এবং এই পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল দলের সর্দারেরা গ্রামবাসীদের মনোবল (morale) অটুট রাখার উদ্দেশ্যে তাদের সাহায্যের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের বন্দুক আনার চেষ্টা করেছে। আমাদের মামলার রায় থেকে পাওয়া যায়—

"....They each carried a pistol in hand. He asked them

where thay were going and whence they came. Some of them replied that in the town the 'Shahebs' had been killing Hindus and Musalmans and thay had run away from the town. Thay added—'we are your people—we would go towards the east....' Thay had gone a little away from the tank when thay saw coming running along the path to-wards them, six persons, who as thay approached, the each side of the road with the intension of getting him and his gun to help them...."

—তাদের প্রত্যেকের হাতে পিস্তল ছিল। একজন গ্রামবাসী তাদের জিজ্ঞেস করে, তারা কোথা থেকে আসছে ও কোথায় যাচ্ছে। যুবকদের মধ্যে কেউ একজন উত্তর দিল—শহরে সাহেবরা হিন্দু ও মুসলমানদের হত্যা করছে বলেই তারা শহর থেকে পালিয়ে এসেছে। তারা আরও বলল—'আমরা তোমাদের আপনজন, আমরা পূর্বদিকে যাব······।' তারা (গ্রামবাসীরা) পুকুর ছাড়িয়ে একটু এগোতেই দেখতে পেল, ছ'জন যুবক সরু হাঁটা-পথে ছুটে তাদের দিকেই আসছে। তারা তখন পূর্বদিকের রাস্তা দিয়ে গিয়ে তাকে (ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট) ও তার বন্দুকটি আনবে ভেবেছিল।

এই বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে বিপ্লবী-যুবকেরা তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে সাহায্য লাভের আশায় গ্রামবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছে, আবার অপরদিকে গ্রামবাসীদের মধ্যেও কিছু লোক বিপ্লবীদের আক্রমণ করার জন্য বন্দুক সংগ্রহের চেষ্টা করছে। আর একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি, তা' থেকেও জানা যাবে যে, প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা বন্দুক সংগ্রহ করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল। উদ্ধৃতিটি হচ্ছে—

"....He was standing at Omra Mia's 'Ghata' waiting for Abdul Wadud, who lived in the house, to bring the gun out of him when he saw six persons coming eastward...."

—একজন গ্রামবাসী আব্দুল ওয়াদুদের জন্য ওম্রা মিঞার বাড়ির 'ঘাটায়' (প্রবেশদ্বার) অপেক্ষা করছিল। আব্দুল ওয়াদুদ তখন বাড়ি ছিল। ছ'জনকে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে দেখে সেই লোকটি তার (আব্দুল ওয়াদুদের) বন্দুকটি আনতে গেল।

এই ছ'জন বিদ্রোহী-যুবকের এমনই দুর্ভাগ্য যে, ঠিক সেই সময়েই গ্রামের

দুই স্থানে ঝগড়া মীমাংসার জন্য সালিশ বসেছিল। সালিশী বিচার দেখতে ও শুনতে সেইসব স্থানে অনেকে উপস্থিত ছিল। গ্রামের মাতব্বরেরা 'ডাকাত' ধরবার এই সুযোগ ছাড়লো না। সাধারণ গ্রামবাসীকে বিভ্রান্ত করে 'ডাকাত' ধরবার জন্য উত্তেজিত করতে লাগলো। গ্রামের মোড়ল এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সহকারী প্রেসিডেণ্টের মিলিত চেষ্টায় অবস্থা ক্রমেই বিপ্লবীদের প্রতিকূলে গেল। সরকারী স্বীকারোক্তি থেকে এইসব বৃত্তান্ত আমরা জানতে পারি—

"....That night President Omra Mia and some 40 or 50 villagers had assembled at Nur Hossains's house to settle a dispute....After 9 p.m. they heard the reports of guns.... Omra Mia formed them into two parties and directed one party among whom were Nur Hossain and Adu Mia to go to the south while with the other party he himself went west-wards with the intension of getting his gun.

"In the meantime Rohim Ali, the Vice-President of the Union Board had been setting out from the house to attend the 'Shalis' (austration) when he heard the firing...., so he went to Omra Mia's house to get his gun."

—উপরের সরকারী বিবরণ থেকেই পাচ্ছি, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ওম্‌রা মিঞা ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট রহিম আলি চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক নিয়ে সালিশ-মীমাংসার জন্য বসেছিল। তারা নিজেদের বন্দুক এনে সাধারণ লোকদের 'ডাকাত' ধরবার জন্য প্ররোচিত করেছে।

উত্তেজিত জনতা সারা পথ বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছুঁড়ছিল। গ্রামের সালিশে উপস্থিত জনতাকেও তারা উত্তেজিত করে তুলেছিল এবং প্রেসিডেণ্ট ও সহকারী প্রেসিডেণ্টের প্ররোচনায় বন্দুকও যোগাড় করেছিল। ইতিমধ্যে দেখা গেল, সশস্ত্র পুলিসবাহিনী সমেত একটা ষ্টীমলঞ্চ অদূরে নদী-ঘাটে এসে ভিড়েছে। মারমুখো গ্রামবাসীর সাহস এবং আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বিপ্লবী যুবকেরা অগত্যা ক্ষিপ্ত জনতাকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে বাধ্য হ'ল। সরকারী ভাষ্য থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"On the District Board Road they found a crowd of

excited villagers assembled and Kala Mia lying dead near Anti Mahamud Ghat. On the road also they were overtaken by Azim and Hem Gupta and the other police officers hastened along the District Board Road....On the road also they were overtaken by Azim and his party; and the whole force of Ashanulla and Fazlar Rahaman got into Police launch which then arrived with the Dy. Superintendent of Police and Inspector Macdonald and an armed force on board and proceeded in it up the the river and into the Shikal-baha Khal. Abdul Azim and Hem Gupta and the other police officers hastened along the District Board Road."

উপরের তথ্য থেকে পাচ্ছি, বিপ্লবীদের গুলীতে কালা মিঞাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এবং পুলিসবাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ছ'জন বিদ্রোহী যুবককে দু'দিক থেকে আক্রমণ করতে চলেছে। আজিমের দল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে অগ্রসর হচ্ছে, আর বিপ্লবীদের গতিপথ অবরোধের উদ্দেশ্যে শিকলবহা খাল দিয়ে আসানুল্লার সশস্ত্র বাহিনী ষ্টীমলঞ্চে ধোঁয়া ছেড়ে ছুটে চলেছে।

আন্তিমামুদ নৌকো-ঘাট থেকে পটিয়া থানা পর্যন্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। একটা বড় কাঠের সেতু এই রাস্তাটিকে অতিক্রম করে গেছে। এই সেতুটি 'কালার পোল' নামে খ্যাত। কালার পোলের সন্নিকটে একটা পুলিস-বিট্ আছে। চট্টগ্রামের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য এই বিটে প্রায় বিশ-পঁচিশজন সশস্ত্র কনস্টেবল সর্বক্ষণ পাহারায় নিযুক্ত থাকত। তাদের বেশির ভাগই এই সঙ্ঘর্ষের খবর পেয়ে পেট্রল ডিউটিতে চারিদিকে বেরিয়ে পড়েছে। বিপ্লবী যুবকেরা পুলিস পার্টি, উত্তেজিত জনতার বেড়াজাল এবং কালার পোল বিটের সামনের রাস্তা পরিহার করে শহরের দিকে এগোবার জন্য শেষবারের মত মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলো। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা ছ'জন সিদ্ধান্ত নিল, বাঁচবার যখন কোন আশাই নেই তখন বিপথে পরিচালিত গ্রামবাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করে মিথ্যা শক্তিক্ষয় না করে প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শত্রুর ওপর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে প্রাণপণে শহরের দিকে ফেরবার চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত।

আমাদের মামলার জাজ্‌মেণ্টে দেখতে পাচ্ছি—

"Six men hailed him from the bank and three of them got into his 'sampan' and requested him to row the six of them to the 'char' near 'Freimukh' promising him fifty rupees if he did so. Just then he heard the villagers shouting that decoits had come and persons were being killed and he also heard Munshi Mia calling him not to let the decoits into his 'sampan' and that they had shot his brother Ali Hossain. He noticed that the three persons who had got into his 'sampan' had each a pistol in their hand and so inspite of their entreaties he refused to take them to the char. They got out of the 'sampan' and went towards Anti Mahamud Ghat."

—তারা ছ'জন তীর থেকে সাম্পানের মাঝিকে ডাক দিল এবং তিনজন ইতিমধ্যে নৌকোয় চড়ে বসলো। মাঝিকে তারা অনুরোধ করলো পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার বিনিময়ে তাদের নদীর অপর পারে 'ফেরীমুখের চরে' (অর্থাৎ, চরচাকতাই) নিয়ে যেতে। এই সময় গ্রামবাসীরা চীৎকার করে সমস্বরে বলতে লাগলো, ডাকাতেরা গ্রাম আক্রমণ করে লুঠতরাজ ও খুনখারাপী করেছে। মুন্সি মিঞা মাঝিকে ডেকে বলে যে, তার ভাই আলি হোসেনকে ডাকাতরা গুলী করে মেরেছে, সে যেন ওদের সাম্পানে না তোলে। নৌকোর উপর ওই তিনজন যুবকের হাতেও পিস্তল দেখে মাঝি তাদের অনুনয় সত্ত্বেও নদীর ওপারের চরে তাদের নিয়ে যেতে অস্বীকার করলো। অগত্যা নৌকো থেকে নেমে যুবকেরা আন্তি মামুদ ঘাটের দিকে অগ্রসর হয়।

ক্ষিপ্ত জনতা পিছু নিয়েছে, দেবুর স্কন্ধের গভীর ক্ষত থেকে সমানে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, দু'দিক থেকে সেপাইদের গলা শোনা যাচ্ছে, সর্বোপরি এই সঙ্কট মুহূর্তে নদী পার করতে মাঝিরও অক্ষমতা জ্ঞাপন—এইসব মিলে সে এক নিদারুণ অবস্থা! কিন্তু বিপ্লবী যুবক ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারী ভাড়াটে সৈন্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ। বিপ্লবীদের অন্তরে দরদ বেদনা ও অনুভূতি আছে। বিপদে পড়েও তাদের বিচার-বুদ্ধি লোপ পায় নি। বাস্তব দৃষ্টিতে বিপ্লবী যুবকেরা নৌকোর মাঝির অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরেছে—সে যদি গ্রামবাসীদের আদেশ উপেক্ষা করে তাদের নৌকোয় তোলে তবে তার গ্রামে থাকা মুস্কিল হবে এবং পুলিসের

হাতেও তার নির্যাতনের সীমা থাকবে না। মাঝির ইচ্ছে থাকলেও ভয়েই সে যে তার অক্ষমতা জানাতে বাধ্য হয়েছে, সে কথা বিপ্লবী যুবকেরা সহজেই বুঝেছিল। তাই নিজেদের মাথার ওপর শত বিপদ থাকা সত্ত্বেও মাঝির লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের কথা ভেবে তার ওপর জোর-জবরদস্তি করা অথবা তাকে গুলী করার কথা তারা ভাবতেও পারে নি।

সাম্পান না হয়ে যদি সাধারণ দাঁড়-টানা নৌকো হ'ত, তবে তারা নিজেরাই দাঁড় টেনে নিশ্চয়ই ওপারে যেতে পারতো। চট্টগ্রামে সাম্পান জাতীয় নৌকোর বিশিষ্ট ধরণের এক জোড়া দাঁড় সবাই ব্যবহার করতে পারে না। কাজেই সাম্পান ছেড়ে তারা মাঠে নেমে পড়লো। এই সময় দুই পক্ষে সামান্য গুলী বিনিময় হয়। যুবকেরা মাঠ দিয়ে একজনের পেছনে একজন হেঁটে যাচ্ছিল। গোলমালে ফণীন্দ্র নন্দী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

সরকারী বিবৃতি—

"The persuit however was maintained by Omra Mia (President) and Rahim Ali (Vice-President) and their companions. Getting further information from Rahim Ali, Ali Mia and Abdul Ali as to the direction in which the fugitives had gone, they went along the bank of the tank to the south of the house and there they found the fence broken down. They went through the breach south-eastwards towards a 'Godha' (bounded khal) nearby, and as they approached two men on the other side of the 'Godha' called out that there was something black in the jungle towards the east and after running some distance turned and fired at them. He ran towards the houses of Torab Ali and Munsur Ali which stand beside the Shikalbaha Khal and then he disappeared. Although these houses were surrounded and the neighbourhood searched, no trace of him could be found."

—এই বিবরণে দেখা যাচ্ছে, প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট সদলবলে সমানে বিপ্লবী যুবকদের তাড়া করে চলেছে। এই হ'ল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বৈশিষ্ট্য। ভারতের মত এত বড় দেশ মাত্র কয়েক লক্ষ ইংরেজ দু' শ'

বছরের অধিককাল শাসন করেছে। তাদের শাসন-পদ্ধতির চাবিকাঠির মূল ভিত্তি হচ্ছে ভারতবাসীর সাম্প্রদায়িক দুর্বলতা এবং ভারতবাসীর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা সৃষ্টি করেছে খাঁ সাহেব ও রায় সাহেব, খাঁ বাহাদুর ও রায় বাহাদুর, অনারারী ম্যজিস্ট্রেট, ইউনিয়ন বোর্ড ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ; আর সংগঠিত করেছে বাছাই করা গ্রামবাসীদের নিয়ে চৌকিদার ও দফাদারদের সাম্রাজ্যবাদী রক্ষী দল।

এই দুই কুখ্যাত প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট আলি মিঞা ও আব্দুল আলির কাছ থেকে পলাতকেরা কোন্ দিকে গেছে জানতে পেরে, পুকুরের ধার দিয়ে অগ্রসর হয়ে একস্থানে বাড়ির কম্পাউণ্ডের বেড়া ভাঙা দেখতে পায়। এই ভাঙা বেড়া অতিক্রম করে প্রেসিডেণ্টের দল খালের সামনে এসে পৌছলো। সেই সময় খালের অপর পার থেকে দুই ব্যক্তি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলে, ঝোপের আড়ালে তা'রা কালমত কি একটা দেখতে পাচ্ছে এবং সেটা পূর্বদিকে গুলী ছুঁড়ে পালাচ্ছে। ওই দুই ব্যক্তি আরও জানালো যে, শিকলবহা খালের অদূরে তোরাব আলি ও মন্‌সর আলির বাড়ির দিকে সে ছুটে গেছে এবং তারপর থেকে আর সেই যুবককে দেখা যাচ্ছে না। এই খবর শুনে প্রেসিডেণ্টের পার্টি সেই সব বাড়ি এবং সমগ্র এলকাটি ঘিরে ফেলে ব্যাপক ও নিখুঁত অনুসন্ধান কার্য চালালো। কিন্তু এ যেন ভৌতিক কাণ্ড!—'তাকে' (ফণীন্দ্র নন্দীকে) আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এই হ'ল সরকারী সাক্ষীদের বর্ণনা।

সত্যিই তা'রা শত চেষ্টা করেও সেই রাত্রে ফণীন্দ্র নন্দীকে খুঁজে পায়নি। তীর থেকে বহুদূরে মাঝ-সমুদ্রে যখন কোন দুর্ঘটনাবশতঃ জাহাজ ডুবি হয়, তখনও আশা-নিরাশার মধ্যে কোন কোন যাত্রী হয়ত লাইফবয়ার সাহায্যে ভেসে থাকে। হিংস্র বন্য জন্তু বেষ্টিত দুর্গম অরণ্যের মধ্যে হয়ত কখনও কোথাও নিরাপদ গুহা বা আশ্রম বিরাজ করে। ধূ-ধূ মরুভূমি—চারিদিকে কেবল উত্তপ্ত বালুরাশি, তবু বুক ফাটা তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে মরুদ্যানের সন্ধানও পাওয়া যায়। সেইরূপ 'প্রেসিডেণ্ট' পরিচালিত উত্তেজিত ক্ষিপ্ত জনতার ব্যূহ-বেষ্টনীর মাঝেও কে জানতো ফণীন্দ্র নন্দীকে আশ্রয় দেবার জন্য কোল পেতে রেখেছে এক অজানা-অচেনা স্বদেশপ্রেমিক মুসলমান পরিবার!

রাত তখন প্রায় আড়াইটা হবে। ফণীন্দ্র নন্দী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষিপ্ত জনতার হাত এড়িয়ে এক মুসলমান পাড়ায় প্রবেশ করে। উত্তেজিত জনতা 'প্রেসিডেণ্টের' নেতৃত্বে সমস্ত এলাকাটি ঘিরে ফেলায় আর কোন

উপায়ান্তর না দেখে ফণী নন্দী এক মুসলামান পরিবারের বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়ে।

হৈ-চৈ হল্লা শুনে গৃহস্বামী ও তাঁর স্ত্রী উঠানে বেরিয়ে এসেছেন। ফণীন্দ্র নন্দীর হাতে রিভলভার। সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকেছে। তাকে দেখেই যে কেউ বুঝবে সে পলাতক এবং তাকেই ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য হিংস্র জন্তুর মত প্রেসিডেণ্টের দল তেড়ে আসছে। গৃহস্বামীর কোমল অন্তর ফণী নন্দীর অসহায় অবস্থা দেখে অভিভূত হ'ল। তিনি মুসলমান—পরে জেনেছি তাঁর নাম মনসর আলি। বৃদ্ধ মনসর আলি ও তাঁর স্ত্রী ফণীন্দ্র নন্দীকে এই অসহায় অবস্থায় ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে বাঁচানো ধর্ম বলেই মনে করলেন। ফণীন্দ্র নন্দী তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। বৃদ্ধ অত্যন্ত মমতার সঙ্গে তাকে সম্বোধন করে বলল—"বাউ, উইক্যা ধাইৎ পাইরতাক্ ন—ধরা পড়ি জাইবাক্। আঁর লয় আস্তক্"—(বাবু ওদিকে গেলে আপনি ধরা পড়ে যাবেন। আমার সঙ্গে আসুন)। এই বলে মনসর আলি আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন—ফণীন্দ্র নন্দী মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করলো। ফণীন্দ্র আমাকে নিজ মুখে তার এই অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। সে বলেছে—"আমি মনসরকে এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করতে পারি নি। তাঁর সৌম্য চেহারা, মমতাভরা গলার স্বর এবং আমার বিপদে তাঁর অস্থিরতা দেখে আমি একেবারে সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি তাঁকে যন্ত্রের মত অনুসরণ করলাম।"

মনসর আলি তার নিজ বাড়ির বাইরের একটা ঘরে ফণীকে নিয়ে গেলেন। সেই ঘরে নানা জিনিষপত্র রাখা আছে। ঘরের ভেতর একটা মাচার ওপর কিছু খড়ের গাদা, মাটির কলসী, হাঁড়ি-পাতিল, ইত্যাদি সব বোঝাই করা ছিল। মনসর আলি সেই মাচার নিচে ফণীন্দ্রকে লুকিয়ে থাকতে বললেন। দ্বিরুক্তি না করে ফণীন্দ্র সেখানে আশ্রয় নিল।

কয়েক মিনিট বাদেই ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী হৈ-হৈ করে যথারীতি মনসর আলির বাড়িতে প্রবেশ করলো। তা'রা অন্যান্য বাড়ির মত এই বাড়িও তল্লাসী করবে, যদি কোথাও সেই পলাতক যুবক লুকিয়ে থাকে। জনতা বাড়িতে ঢুকেই প্রশ্ন করে—

—"মনসর ভাই, পোয়া ইবা ধাইয়ারে কন্ মিক্যা গেল?"—(মনসর ভাই, যুবকটি পালিয়ে কোনদিকে গেল)।

মনসর—"আঁই ত এঁডে থিয়াই আছি। ইন্দি ন আইয়ে। ত চলতক্ চাই কনকাইত্ লুকাই আছে নি তোয়াই।"—(আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে

আছি। এদিকে আসে নি। তবু চলুন ঘুরে দেখি, কোথাও লুকিয়ে আছে কি না)।

মন্‌সর আলি এইসব বলে লোকদের নিয়ে বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখালেন। ফণীন্দ্র নন্দী মাচার নিচে নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিঃশব্দে ট্রিগারে আঙুল স্পর্শ করে বসে আছে। লোকেদের কথাবার্তা সব সে শুনতে পাচ্ছিল। এমন কি মন্‌সর গ্রামবাসীদের সঙ্গে সেই ঘরের দরজা পর্যন্ত এসেছেন এবং নিজে না জানার ভান করে উঁকি মেরে ঘরের ভিতর দেখে সঙ্গীদের বলেছেন—"মরার পোয়া, আঁরার চোখত্ ধুইল দিয়ারে ধাইয়ে। আইচ্ছা দেইখ্যম্, ধা'বি কঁড়ে? ধরা ন পড়িবি না?"—(আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে মরার ছেলে পালাল কোথায়? আচ্ছা দেখবো—পালাবি কোথায়? ধরা কি পড়বি না?)।

মন্‌সর আলির সুদক্ষ অভিনয় জনতাকে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তা'রা নিঃসন্দেহ হ'ল মন্‌সর আলির বাড়িতে কারও লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। আর কালবিলম্ব না করে 'ডাকাত' খুঁজে বার করবার জন্য জনতা হৈ-হৈ করে পাশের বাড়িতে প্রবেশ করলো। মন্‌সর আলির মাচার নিচে ফণীন্দ্র নন্দী পিস্তল হাতে বসে রইল, আর ক্ষিপ্ত জনতা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সমস্ত পাড়াটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

যদিও অবিশ্বাস্য মনে হবে, তবু এই বর্ণনার প্রতিটি অক্ষর সত্য। স্বাধীনতা যুদ্ধে মন্‌সর আলির স্থান কোথায়? ইতিহাসবিদের গবেষণার জন্য মন্‌সর আলির স্বদেশপ্রেমের অবদান (যা' আমার জানা সম্ভব হয়েছে) এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখলাম। মন্‌সর আলি কোন্ সম্প্রাদায়ের লোক—এই বিচার আমাদের কাছে কখনও বড় হয় নি। মন্‌সর আলির মানবতাবোধ ও স্বদেশপ্রেমই তাঁকে মহামানবের মর্যাদাসম্পন্ন করেছে—তাঁর আদর্শে বিপ্লবী ভারত গর্বিত।

ফণীন্দ্র নন্দী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মন্‌সর আলির বাইরের ঘরের মাচার নিচে আশ্রয় পেয়ে সাময়িকভাবে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল। সে জানেনা অপর পাঁচজন সঙ্গীর তখন কি অবস্থা বা তারা কোথায়। ফণীন্দ্র যখন দল ছাড়া হয়ে পড়ে, তখন বাকি পাঁচ বন্ধু তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু কোনমতেই ফণীন্দ্রের সঙ্গে তারা আর যোগাযোগ রাখতে পারলো না। অগত্যা পাঁচজনে মনস্থ করলো নদী পেরিয়ে তারা শহরে যাবে এবং আশা করলো এই পথে হয়ত ফণীন্দ্রর সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারে। এই স্থির করে মেঠো পথ পরিত্যাগ করে তারা আবার রাস্তা ধরে এগোতে লাগলো। এই রাস্তা আস্তিমামুদের ঘাট থেকে পটিয়া থানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথের

ওপর কালারপোলটি অতিক্রম করা সম্ভব হলেই খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে শহরে পৌঁছনো যাবে। তবে এই ক্ষেত্রে পুলিস-বিটের সম্মুখে ছোট পথটির সুযোগ নিতে হবে।

নানা বিপদ, ঝুঁকি ও কত অজানা অনিশ্চয়তা যে চলার পথ আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার খবর কে বলতে পারে? গেরিলা-যুদ্ধের সময় বিপ্লবীদের বহু নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেই হয় এবং সেই সব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ ফলাফল আগে থেকে কেউই সঠিক বলতে পারে না—তবু বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সাহসের সঙ্গে এগোবার চেষ্টা করতে হয়। তাই এই পাঁচজন বিপ্লবীও বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও, বর্তমান অবস্থায় আর পেছুতে নারাজ।

সুবোধ চৌধুরী সবার আগে আগে চলেছে। বাকি চারজন পাঁচ-ছয় হাত পেছনে তাকে অনুসরণ করে আসছে; এই অবস্থায় সকলে পুলিস-বিটের প্রায় সামনে এসে পড়লো। একজন সেন্ট্রি বন্দুক কাঁধে বিট পাহারা দিচ্ছে এবং অন্যান্যরা পেট্রল ডিউটিতে সব বাইরে গেছে। গার্ড-রুমে তখন তিন-চারজন সশস্ত্র কনস্টেবল উপস্থিত ছিল। সম্মুখ যুদ্ধের সম্ভাবনায় সোজাসুজি সামনের পথ দিয়ে চলবার ইচ্ছে বিপ্লবীদের ছিল না। তারা ঠিক করেছিল কোন ছলে বা কৌশলে সাধারণ পথিক সেজে সশস্ত্র প্রহরীদের বিভ্রান্ত করে পথ অতিক্রম করবার চেষ্টা করবে এবং আশা করেছিল তারা সফল হবে। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! ইতিমধ্যে বিদ্রোহী পলাতকদের গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্য এবং সম্ভব হলে তাদের গতি অবরোধ করবার জন্য পুলিস বিটে খবর ও নির্দেশ এসে গেছে।

পাঁচজন যুবককে পথের ওপর দেখা মাত্রই সেন্ট্রি হাঁক দিল—"কে তোমরা?" সুবোধ চৌধুরী জবাব দিল—"আমরা পথিক।" আগেই খবর পাওয়াতে প্রহরী সুবোধকে দাঁড়াতে হুকুম করলো। সুবোধ তো দাঁড়াবেই—প্রহরীর সঙ্গে কথা বলবে, তবেই না প্রহরীকে বিভ্রান্ত করে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে! সুবোধ চৌধুরী কথা বলতে বলতে বন্দুক কাঁধে দাঁড়ানো সেপাইয়ের খুব কাছে গেল। সুবোধের দৃষ্টি সেন্ট্রির দিকের স্থির নিবদ্ধ—তার কাঁধের বন্দুক সুবোধ কোনমতেই তাকে হাতে নিতে দেবে না। সাংঘাতিক উত্তেজনাপূর্ণ একটি সঙ্কটময় মুহূর্ত! এমন সময় খালি হাতে একজন কনস্টেবল বিটের ঘর থেকে বেরিয়ে সুবোধের খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। সুবোধের দৃষ্টি তখনও সশস্ত্র প্রহরীর দিকে—খালি হাতে তার কাছে দাঁড়ানো কনস্টেবলটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

সুবোধ চৌধুরী খুব বলিষ্ঠ এবং তার দৈহিক আকৃতিও সাধারণ লোকের

মনে বিভীষিকা সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। তাই বোধহয় সুবোধ মুহূর্তের জন্য নিজের শক্তি সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আত্ম-সচেতন হয়ে পড়েছিল। সেপাইটি সুযোগ বুঝে নিমেষে সুবোধকে জাপ্‌টে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন সেপাই ছুটে এসে সুবোধকে কাবু করতে ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করে দিল। সুবোধ দু'তিনজন কন্‌স্টেবলকে কোন মতে কায়দা করে, রিভলভার সুদ্ধ নিজের হাতটি মুক্ত করেই গুলী ছুঁড়তে চেষ্টা করলো। কিন্তু এমনই বেগতিক যে ট্রিগার টিপতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হ'ল। সমস্ত পরিস্থিতিই যেন সুবোধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে! বিপদের একমাত্র সাথী, সঙ্কট মুহূর্তের একান্ত বন্ধু এই রিভলভারটিও বিশ্বাসঘাতকতা করলো! সুবোধের অসহায় অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিল পুলিসের মিলিত শক্তি—সুবোধ শত্রুর হাতে বন্দী হ'ল।

আমাদের মামলার জাজ্‌মেণ্টে ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেণ্ট লিখছেন—

"In the meantime after 3 a.m. constable Prasanna K. Dey, as he stood sentry on the road outside the beat house, caught sight of five persons coming along the road towards him from the bridge; one of them was a little ahead of the others who were following about 5 or 6 cubits behind him.

"As the first stranger approached, Prasanna cried, 'who are you' and he replied, 'a passerby'—whereupon Prasanna ordered him to halt. Just then constable Prasanna Kumar Barua came out of the house, went forward and caught hold of him. As they struggled constable Lalit Mohan Choudhury also went forward and caught him from behind."

—সরকারী ভাষ্যে বলা হচ্ছে, প্রহরী প্রসন্নকুমার দে ও প্রসন্ন বড়ুয়াই প্রথমে সুবোধ চৌধুরীকে ঘায়েল করেছে। বিপ্লবীদের পাঁচজনকে আসতে দেখে প্রসন্ন দে, সর্বাগ্রে যে ছিল তাকে দাঁড়াতে হুকুম দেয়। সুবোধ সেণ্ট্রির সামনে এসে দাঁড়ালো এবং ইতিমধ্যে প্রসন্ন বড়ুয়া বিটের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুবোধকে জাপ্‌টে ধরলো। কন্‌স্টেবল ললিতমোহন চৌধুরীও পেছন থেকে এসে সুবোধকে বন্দী করতে সাহায্য করেছে।

সরকারী ভাষ্যমত অত সহজে অবশ্য তারা সুবোধকে বন্দী করতে পারে

নি। সুবোধ তাদের কবল থেকে রিভলভার ধরা হাতটা মুক্ত করে। কিন্তু যখন কোনমতেই সে রিভলভারটি ফায়ার করতে পারলো না, তখনই সেপাইরা তাকে কাবু করে।

সরকারী পক্ষ এটা স্বীকার করেছে—

"....they (constables) immediately proceeded to the beat house and there found accused Subodh Choudhury and near him constable Prasanna Barua lying seriously wounded....The revolver taken from him (Subodh) by Lalit Chaudhury was a ·455 Webly Revolver. Ahasanulla tried to open it but it was jammed with mud and he could not do so but Col. Dallas Smith or some other military officir present succeeded in opening it. Inside the chamber were three ·45 Govt. cartridges, two live and one fired...."

—খাঁ বাহাদুর পুলিস বিটে এসে সুবোধকে বন্দী ও কনস্টেবল ললিত-মোহনকে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। সুবোধের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রিভলভারটি আসানুল্লা কোনমতে খুলতে পারেননি—কাদা-মাটিতে সেটি একেবারে ঠাসা ছিল। কর্নেল ডালাস স্মিথ্ বা অন্য কোন সাহেব রিভলভারটি খুলতে সমর্থ হন। রিভলভারের চেম্বারে দুটি তাজা ও একটি ব্যবহৃত কার্তুজ পাওয়া যায়।

সুবোধকে কনস্টেবলেরা যখন মিলিতভাবে আক্রমণ করে এবং একটা প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধ চলতে থাকে, তখন বাকি চারজন সঙ্গী ঘুরে দাঁড়িয়ে ফায়ার করে। পাছে সুবোধ আহত হয়, এই ভয়ে সাথীদের পক্ষে বেপরোয়া গুলী চালানো সম্ভব হয় নি। খুব সতর্কতার সঙ্গে গুলী ছুঁড়লেও লক্ষ্য ভেদ হ'ল—কনস্টেবলের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। গভীর রাতে দু'পক্ষের গুলী বিনিময়ের আওয়াজে গ্রামের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হ'ল এবং পুলিস ও মিলিটারীর মনে ত্রাসের সঞ্চার করলো। সবাই তো সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বেতনভোগী ভাড়াটে লোক—হোক্ না কেন সে পুলিস বা মিলিটারী অফিসার বা সাধারণ সৈনিক—মরতে কেউ-ই চায় না। কোনমতে বেঁচে থেকে সুনাম ও পুরস্কার অর্জন করাই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সেই বীরপুঙ্গবেরা দূর থেকে যখনই গুলী বিনিময়ের শব্দ শুনেছে তখনই আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া দেখে

শিউরে উঠেছে। সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য যে যেখানে পেরেছে কোন-না-কোন ছুতো করে নিরাপদে কাল অতিবাহিত করাই শ্রেয় মনে করেছে। আমার নিজের কথা না বলে সরকারী পক্ষ সেই রাতের যুদ্ধের কথা যেটুকু বলতে বাধ্য হয়েছে, তারই কয়েকটি তথ্য উদ্ধৃত করে পুলিস ও মিলিটারীর ভীত-ত্রস্ত অবস্থার বিবরণ দিচ্ছি—

"....The captive crouched down with Lalit still holding on to him while Prasanna Kumar Barua stood infront of him holding his hands. Just then the four others began to fire and Prasann Barua cried out that he had been shot and fell forward on top of the prisoner. The sentry Prasanna K. Dey immediately opened fired on them and they retreated behind the tea shop on the south side of the road firing as they went. The sentry continued firing on them....Meanwhile the four strangers continued to fire at intervals from behind the tea shop until about 4-30 a. m., after which all was quiet."

—সেন্ট্রি বলছে যে, পেছন থেকে ললিত ও সামনে থেকে প্রসন্ন বড়ুয়া সুবোধকে পাকড়াও করবার চেষ্টা করছিল। এমন সময় চারজন যুবক ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলী চালালো। 'আহত হয়েছি' বলে চীৎকার করে ললিত সুবোধের গায়ের ওপর পড়ে গেল। সেন্ট্রি তক্ষুণি গুলী ছুঁড়লো। ওই যুবকেরাও একটা চায়ের দোকানের আড়াল থেকে পাল্টা গুলী চালালো। সেন্ট্রি ক্রমাগত গুলী ছুঁড়ছে এবং বিদ্রোহীরাও সমানে জবাব দিচ্ছে। ভোর সাড়ে চারটার সময় সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

পুলিস বিটের সুরক্ষিত দেয়ালের আড়াল থেকে সেন্ট্রির ফায়ার করবার যে সুবিধে ছিল, খোলা মাঠ বা চায়ের দোকানের কাঁচা ঘরের দেওয়ালের আড়াল থেকে গুলী ছুঁড়বার সেরূপ কোন সুবিধে বিপ্লবীদের ছিল না। তবু বাঁশের ঘরের আড়ালে অন্ধকারের সুযোগটুকু নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব গোপন করে বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত পাল্টা গুলী চালিয়েছে। পুলিস বিটের সামনে এই সজ্যর্ষের সংবাদ মাস্কেট্রি ও রিভলভারের আওয়াজে চতুর্দিকে ঘোষিত হয়েছে। এই বিট থেকে যারা পেট্রল ডিউটিতে গ্রামের ভেতরে গিয়েছিল রিভলভারের আওয়াজে তারা সহজেই অনুমান করলো যে বিট্ আক্রান্ত হয়েছে। তাই

তারা ভাবলো, বীরত্বে আর কাজ নেই বাবা—যা' হচ্ছে সেখানেই হোক্, আমরা এখানে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে থাকি! পেট্রল ডিউটির কন্স্টেবলদের বিট রক্ষার্থে সেই রাত্রে ফিরে না আসার দরুণ অজুহাতের অভাব হ'ল না—তাদের মোটরে যে তেল নেই! উপরন্তু মাস্কেট্র যে খারাপ, ভাল ফায়ার করা যায় না—কি করে এই অসহায় অবস্থায় বিটে ফিরে যাবে?

মামলার জাজ্‌মেণ্টে মিঃ ইউনী সাহেব লিখেছেন—

"One musket was given to each of these parties....Then ....set out in a taxi....*when the petrol gave out and the taxi driver went back to Kalarpole for more*, they remained sitting in the car. Shortly afterwards hearing fire from the direction of Kalarpole, and *as the musket they had with them was not in good order*, they got out of the car and hide on the bank of a tank near the road and did not venture back to the beat house until after day-break...."

—পেট্রোল যে ফুরিয়ে গেল! ট্যাক্সিচালক গাড়ি রেখেই আর কিছু পেট্রোলের সন্ধানে গেছে। কন্স্টেবলেরা গাড়িতে বসে আছে। হঠাৎ তারা কালারপোল বিটের দিক থেকে গুলীর আওয়াজ শুনতে পেল। এতক্ষণে তারা বুঝতে পারলো (পেট্রল ডিউটিতে আসবার সময় বুঝতে পারে নি) তাদের বন্দুকগুলি অকেজো। অগত্যা কি আর করা যায়। রাস্তার ধারে এক পুকুর পাড়ে বসে প্রাণটি হাতে নিয়ে শিব নাম জপ করতে লাগল। তারপর ভোরবেলা দিনের আলোতে যখন বিপদ কেটে গেছে মনে হ'ল, তখন বোধ হয় তারা আবার উপলব্ধি করল যে, তাদের বন্দুকের জড়তা কেটেছে—অতটা অকেজো নিশ্চয়ই নয়। বীরদর্পে তারা আবার বিটে ফিরে এল।

সামান্য বেতনভোগী সেপাইদের বীরত্বের প্রতি কটাক্ষ বা ব্যঙ্গ করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার নেই; বৃটিশের জন্য দেশবাসীর সঙ্গে যুদ্ধে তারা প্রাণ দেবে কেন? সাহসের অভাবেই হোক্ বা স্বদেশ-প্রীতিবশতই হোক্, রণাঙ্গনে তাদের উপস্থিত না হওয়াই সমীচীন হয়েছে। তবু ভাবীকালের বিপ্লবীদের অবগতির জন্যই তাদের কথা লিখলাম। ভয়হীন দৃঢ়তার সঙ্গে ছোট্ট একটা দলও যদি আক্রমণ চালায় তবে শত্রুশিবির সাময়িকভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং শত্রু শিবিরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অসমান শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রধান হাতিয়ার morale—বিপ্লবী মানসিক দৃঢ়তা। কালারপোল

যুদ্ধের শহীদদের morale শত্রুপক্ষকে ত্রস্ত ও ভীত করে তুলেছে—শত্রুশিবিরকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে গেছে। দিনের আলোতে প্রচুর মিলিটারী আসবার পর তবেই তারা চারজন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

আমরা সামান্য সেপাইয়ের ভীরুতা দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করবো না। বৃটিশপোষা যে খাঁ বাহাদুরের বাহাদুরি সম্বন্ধে ইউনী সাহেব প্রশংসায় পঞ্চমুখ, যে আসানুল্লা বিপ্লবীদের সঠিক পরিচয় বুঝতে না পেরে পুলিস পার্টিকে গুলী ছুঁড়তে নিরস্ত করেছে, সেই বীর বাহাদুর রাত তিনটার সময় কালারপোল থেকে গুলীর শব্দ শুনে কি করলো, তা' জানবার ইচ্ছে স্বভাবতই আমাদের সকলেরই আছে। জাজ্‌মেণ্ট থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

"After unsuccessfully searching for the fugitives on both sides of the Khal at Kulermath pole Ahasanulla, Abdul Azim and the other officers with them had taken shelter in an outhouse by the side of the Khal. After 3 a. m., they heard sound of firing from the direction of Kalarpole and started off towards the beat house."

—খাঁ বাহাদুর আসানুল্লার পার্টি পলাতকদের অনুসন্ধানের পর ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে খালের ধারে একটি পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিল। তখন রাত প্রায় তিনটে হবে। কালারপোল পুলিস-বিটের দিক থেকে গুলীর আওয়াজ শুনে তারা সেদিকে এগিয়ে গেল।

ক্রমেই গুলীর আওয়াজ প্রখর হতে লাগল আর খাঁ বাহাদুরের গতিও গুলীর শব্দের সঙ্গে তাল রেখে মন্থর হ'ল। খাঁ বাহাদুরের পা যেন সামনে চলতে বিদ্রোহ করছে। মৃত্যু যে একেবারে শিয়রে! এতক্ষণ দূরে দূরে গুলীর আওতার বাইরে ডিউটি করেছে—এখন যে একেবারে ফায়ারিং লাইনে যেতে হবে! কাজেই খাঁ সাহেব ভাবলো—সাহসিকতা অপেক্ষা বিচক্ষণতাই শ্রেয়!

সরকারী ভাষ্যে পাচ্ছি—

"As they approached Kalarpole shots were fired in their direction and they took cover first behind the bank of a tank and then in the house of a Mohamedan nearby."

—ওরে বাবা! এ যে আসানুল্লার পার্টির দিকেই গুলী আসছে। উপায়ান্তর নেই দেখে প্রথমে একটা পুকুর পাড়ের পেছনে আড়াল নিল। তারপর সেখানেও যদি বিপ্লবীরা তাদের দেখে ফেলে—এই ভেবে কাছাকাছি

কোন এক মুসলমানের বাড়িতে ঢুকে প্রাণ বাঁচাল। খাঁ বাহাদুরের সাহস ও বিক্রমের প্রশংসা করতে না পারলেও বিচক্ষণতার তারিফ না করে কি পারা যায়?

সুবোধ চৌধুরী ধরা পড়েছে। ফণীন্দ্র নন্দী তখনও মন্‌সর আলির মাচার নিচে বসে আছে। ফণীন্দ্র গুলীর শব্দ শুনতে পাচ্ছিল; কিন্তু যোগাযোগের কোন উপায় ছিল না।

ফণীন্দ্র নন্দী ভাবছে কোথায় যাবে—কি করবে! খুব বেশিক্ষণ অবশ্য তাকে ভাবতে হ'ল না। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিটি স্তরে যুগে যুগে জয়চাঁদ, উমিচাঁদ, মীরজাফর প্রমুখের আবির্ভাব হয়েছে এবং হবেও। শত্রুশিবিরে ফণীন্দ্র নন্দী অজানা-অচেনার কাছে আপনজনের সাহচর্য পেয়েছে কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের গুপ্ত ফণার ছোবল থেকে রক্ষা পেল না।

মন্‌সর আলির আত্মীয় তোরাব আলির বাড়িটি খুব কাছে। ফণীন্দ্রকে খুঁজে না পেয়ে তোরাব তার বাড়ির লোকদের মন্‌সরের বাড়ির ওপর নজর রাখতে বলে কালারপোল পুলিস-বিটের কাছে ধৃত যুবকটিকে দেখতে গেল। সেখান থেকে ফিরে তোরাব দেখল তার বাড়ির সামনে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। এমন সময় মাচার নিচে ফণীন্দ্র নন্দীর গোপন অবস্থান তোরাব আলির দৃষ্টিগোচর হয়। তারপর বিশ্বাসঘাতকতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির হাত থেকে ফণীন্দ্র নন্দীকে বাঁচান গেল না। মন্‌সর আলি স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে 'ভাইয়ের' শত্রুতা দেখলেন। ব্যথিত নয়নে নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে মন্‌সর গোপনে চোখের জল মুছলেন—মন্‌সরের স্ত্রী আল্লার কাছে ফণীন্দ্র নন্দীর শুভ কামনা করে কতই না প্রার্থনা জানালেন! কিন্তু কোন ফল হ'ল না। শত্রুপক্ষ এমন দিনের আলোর সুযোগ পেয়েছে! একেবারে অসমান শক্তির সঙ্গে Running Battle-এ রাতের অন্ধকারে আত্মরক্ষার যেটুকু সুযোগ বিপ্লবীরা পেয়েছিল, দিনের আলোতে সেটুকুও তারা হারালো। সর্বোপরি তোরাবের শত্রুতা তো আছেই। ফণীন্দ্র নন্দী রিভলভার হাতে মাচার নিচে থেকে বেরিয়ে এলো।

আমাদের মামলায় রায়ে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ইংরেজ জজ লিখছেন—

"The President Omra Mia and other villagers and the police came and searched the area but could not find the fugitive. In the early morning after sunrise he (Torab Ali), hearing that somebody had been caught at Kalar-

pole, went there and saw a Hindu youth under arrest at the beat house. On his return home he found a number of villagers assembled beside his house and then he noticed a man lying under the 'mancha' of Mansar Ali's fuel shed. Presently there came a shout from the villagers from the south ; 'he was a runaway'—and going to the north of Mansar Ali's house he saw a hindu youth running off towards the north-west, He atonce gave chase and Mobarak Ali did likewise followed by the other villagers. They caught him a little further on, on a narrow path between two tanks, and took from him the revolver which he had in his hand."

—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ওমরা মিঞা পুলিস ও গ্রামবাসীর সঙ্গে মিলে সমস্তটা এলাকা অনুসন্ধান করেও পলাতককে (ফণীন্দ্র নন্দীকে) খুঁজে পায় নি। তারপর সকালে, সূর্যোদয়ের পর, তোরাব আলি ধৃত যুবককে দেখতে কালারপোল বিটে যায়। সেখান থেকে ফিরে তার বাড়ির অদূরে কিছু জনতার সমাবেশ লক্ষ্য করে। সেই সময় তোরাব আলি মন্‌সরের জ্বালানি রাখার ঘরে মাচার নিচে একজন যুবককে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিক থেকে অন্যান্য লোকেরাও চেঁচিয়ে উঠলো—'ওই তো পলাতক !' তোরাব মন্‌সরের বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়ে দেখতে পায় একজন হিন্দু যুবক উত্তর-পশ্চিম দিকে ছুটে যাচ্ছে। তোরাব পিছু নিল। মোবারক আলি ও আরো অনেকে তোরাবকে অনুসরণ করলো। ফণীন্দ্র নন্দী দু'টি পুকুরের মাঝ দিয়ে একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরে ছুটে যাচ্ছিল। অনুসরণকারীরা এই স্থানে তাকে ধরে ফেলে ও তার রিভলভার ছিনিয়ে নেয়।

ফণীন্দ্র নন্দী ধরা পড়েছে—বন্দী হয়েছে, এ কথা অনস্বীকার্য। তার রিভলভারও যে তারা কেড়ে নিয়েছে তাও মিথ্যা নয়। তবে বাস্তবে যা ঘটেছিল তার যথার্থ বিবরণ এইরূপ—অভুক্ত, ক্লান্ত, ফণীন্দ্র নন্দী বিনিদ্র রজনী শেষে মাচার নিচ থেকে বেরিয়ে যখন আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করতে গেল, তখন সে যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। তবু সর্বশক্তি নিয়ে সে ছুটে চলেছিল। আন্দামান জেলে আমাদের প্রায় চারশ' রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে সবাইকে ছাড়িয়ে ফণীন্দ্র নন্দীর দৈহিক গঠন, শারীরিক শক্তি ;

খেলাধূলায় তার দক্ষতা দেখে আমরা মুগ্ধ হতাম। কি সুন্দর সৌম্য মুখাকৃতি ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ! কিন্তু বলিষ্ঠ ফণীন্দ্র নন্দীর সেই শক্তি কোথায় এখন? ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, অবসন্ন দেহ ফণীন্দ্র নন্দী পা পিছলে পুকুরের মধ্যে পড়ে গেল। হাতের রিভলভার খসে পড়েছে; হাঁটুতে আঘাত লেগেছে, ডান হাতের কনুই কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। এইরূপ এক অসহায় প্রতিকূল অবস্থায় ফণীন্দ্র নন্দী বন্দী হয়েছিল। কিন্তু এ সত্য কথা ইংরেজ সরকারের জাজ্‌মেণ্ট কপিতে লেখা নেই।

ভোর হয়েছে, সূর্য উঠেছে। দু'জন বিদ্রোহী যুবক ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে। বাকি চারজন নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কালারপোল পুলিস-বিটের সশস্ত্র কন্‌স্টেবলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। ভীত-সন্ত্রস্ত পুলিসের দল নানা অজুহাতে নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রাখতে ব্যস্ত। ডেপুটি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ও ইন্‌স্পেক্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সঙ্গে পুলিস-লঞ্চে একদল সৈন্য রাত তিনটের সময় এসে পৌঁছনো সত্বেও শত্রুপক্ষ বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্মুখ-সমর পরিহার করে চলেছে। যাদের শক্তির অফুরন্ত উৎস—অজস্র সৈন্য, তারা ভীত বা ত্রস্ত হবে কেন? জালালাবাদে অদূর ভবিষ্যতের আশায় তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে এসেছে। প্রয়োজন হলে আজও সম্মুখ-সমর পরিহার করবে—সর্বশক্তি প্রয়োগ করে জয় সুনিশ্চিত জেনেই আক্রমণ করার সুযোগ নেবে। এই তো রণকৌশল।

তাই হ'ল; সর্বশেষে পুলিস ও সমরপ্রধানেরা বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হলেন। কিভাবে তাঁরা সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন সরকারী তথ্য থেকে তা' আমি উদ্ধৃত করছি—

(1) "While Ahasanulla was writing up the list, the police and some of the Eastern Frontier Rifles, went out in seperate parties in search of the other fugitives."

(2) "Between 7 and 8 a. m. on getting certain information he along with S. I. Abdur Rahim, Col. Dallas Smith and some men of the E. F. Rifles ran towards Kilmirja, about three quarters of a mile from Kalarpole on the west side of the Khal."

(3) "In the meantime on receipt of information another party consisting of the D. I. G. Mr. Farmer, Inspector Macdonald, Abdul Azim. S. I. Hem Gupta, eight men

of the Eastern Frontier Rifles and four Constables had gone south from the beat house to Uttardewan, a village about two miles from Kalarpole."

—আসানুল্লা সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে কালারপোল পুলিস-বিটের ধৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে পাওয়া জিনিসের লিস্ট করছিলেন এবং কিছু সৈন্য ও কন্‌স্টেবলদের বাকি পলাতকদের খোঁজে পাঠালেন।

সকাল প্রায় ৭টা-৮টার সময় একটা খবর পেয়ে আসানুল্লা, আবদুর রহিম, কর্নেল ডালাস স্মিথ্ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলের একদল সৈন্য নিয়ে কিলমিরজার দিকে ধাওয়া করেন। এই স্থানটি খালের পশ্চিমে কালার-পোল বিট থেকে প্রায় পৌনে এক মাইল দূরে অবস্থিত।

ইতিমধ্যে এই সংবাদ পেয়ে অপর একটি সামরিক দল স্বয়ং ডি, আই, জি,—মিঃ ফারমারের নেতৃত্বে কালারপোল থেকে দক্ষিণে দুই মাইল দূরে উত্তরদেওয়ান গ্রামের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। ডি, আই, জি-র সঙ্গে গেল ইন্‌স্পেক্টর ম্যাক্‌ডোনাল্ড, আবদুল আজীম, হেম দারোগা ও ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলের মাত্র (!) আটজন সৈন্য এবং চারজন কন্‌স্টেবল।

জালালাবাদ যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবার জন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মাত্র ছাপ্পান্নজন সৈন্য পাঠিয়েছিল বলে শত্রুপক্ষ সাফাই গেয়েছিল। চারজন বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ শোভন নয়—বৃটিশ প্রেস্টিজের প্রশ্ন! তাই পুলিসপ্রধান মিঃ ফারমার মাত্র সামান্য সৈন্যবল নিয়ে বীর বিক্রমে নাইটদের মতই যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন! ইংরেজ জজ মিঃ ইউনী যদি প্রচুর সৈন্য সমাবেশের সত্য তথ্যও লিপিবদ্ধ করতেন তাতেও আমরা কিছু মনে করতাম না। বেতনভোগী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরাধীন ভারতের বুকের ওপর শত শত বছর শাসন ও শোষণ চালিয়েছে। তাই আজ শাসক-প্রধানেরা নাইটের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলেও এটা তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন বিচক্ষণতার ত্রুটি বলে মনে করতাম না।

কালারপোলের সন্নিকটে জুল্‌দা গ্রামে মরণযুদ্ধ সমাসন্ন! শত্রুপক্ষের প্রচুর সৈন্য সমাবেশের বিরুদ্ধে মৃত্যু প্রতীক্ষায় চারজন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিপ্লবী—প্রাণ দেবে, তবু আত্মসমর্পণ নয়।

দিক্‌চক্রবালে কালো মেঘের ঘনঘটা! আর দেরি নেই—এখনই চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব সুরু হবে।

মিলিটারী ও সশস্ত্র কন্‌স্টেবলে আশপাশের গ্রাম ছেয়ে গেছে—বিদ্রোহী

চারজন যুবকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশের খবর বিপ্লবীরা আগেই পেয়েছে—প্রচুর অস্ত্র—রাইফেল, মেসিনগান ও মাথায় হেল্‌মেটে সুসজ্জিত বিপুল সৈন্যদল বীরদর্পে রাজপথ কাঁপিয়ে চলেছে। কিন্তু বিদ্রোহীদের সংবাদ পাওয়া না গেলে এত সৈন্য সমাবেশ এত আয়োজন কি কাজে লাগবে—তাদের সব চেষ্টাই যে ব্যর্থ হবে!

ভোর হয়ে আসছে। চারজন বিপ্লবী যুবককে সূর্য ওঠার আগেই কোন না কোন নিরাপদ আশ্রয় একটা খুঁজে নিতেই হবে। ব্যাপক শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে চাই অন্ধকারের সুযোগ, চাই শারীরিক শক্তি। দিনের শেষে সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসা পর্যন্ত কোথায় তারা অপেক্ষা করবে, কে তাদের স্থান দেবে এবং সামান্য কিছু আহার্যের ব্যবস্থা করবে? কালারপোলের কয়েক মাইলের ভেতর শিকলবহা খালের মাইলখানেক দক্ষিণের জুল্‌দা গ্রাম তাদের অপরিচিত; কাজেই গ্রামের রাস্তাঘাট বা লোকজন সম্বন্ধে কিছুই তারা জানে না। গ্রামটি হিন্দুপ্রধান না মুসলমানপ্রধান অঞ্চল তাও তাদের অজ্ঞাত। দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা এক শ্রেণীর, আর দেশদ্রোহী ইংরেজের পোষা গোলামেরা অন্য জাতের। তাই বিপ্লবী যুবকদের কাছে জাতিভেদের কোন প্রশ্নই আসে না। রাত ভোর হ'ল। দিকে দিকে গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে হাঁচি কাসি ও কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এই তো সুযোগ! গভীর রাত্রে বা শেষ রাত্রে আশ্রয়ের জন্য কোন বাড়িতে ঢুকে কাউকে ডেকে তোলার মারাত্মক ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন ছিল বলেই বিপ্লবীরা গ্রামের লোকেদের কারো না কারো কাছে সাহায্য পাওয়ার আশায় এই বিশেষ সময়টুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিল। উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় অধীর আমাদের যুব-বিদ্রোহীরা সদ্য-জেগে-ওঠা কয়েকটা বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। একটা বাড়ির সামনের কম্পাউণ্ডে এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে দেখতে পেয়েই কোন পরিচয় বা হাঁকডাকের অপেক্ষা না রেখে তারা চারজন একেবারে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। ছিন্ন মলিন বেশ, রুক্ষ চেহারার চারজন যুবককে এই অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে কার না মনে প্রশ্ন জাগবে—কেই বা আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে পারে?

বৃদ্ধ আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"কে তোমরা? কি চাও?" বৃদ্ধের ত্রস্ত সুর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি কতখানি ভীত ও বিহ্বল হয়েছেন। তিনি আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলেন; কিন্তু তাঁকে আর কষ্ট করতে হ'ল না। যুবকেরা তাঁর সব ঔৎসুক্যের নিরসন করে নিজেদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য বৃদ্ধের কাছে ব্যক্ত করলো। যুবকেরা বলল—"চাচা, আমরা বড় বিপন্ন।

আমাদের আক্রমণ করতে পেছনে ছুটে আসছে পুলিস ও মিলিটারী। আমরা স্বাধীনতার সৈনিক—ইংরেজ আমাদের শত্রু, দেশবাসী আমাদের ভাই। আমরা এখন আপনার আশ্রয় চাই। সন্ধ্যে পর্যন্ত নিরাপদে আপনার এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিন··· !"

ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের কথা সবার মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ আজ চট্টলবাসীর গর্বের বিষয়। ইংরেজ-পোষা দেশদ্রোহী ব্যতীত অন্য সকলেই বিপ্লবী-যুবকদের অন্তর থেকে ভালবেসেছে। বীর যুবকদের স্বার্থত্যাগ, বীরত্ব ও তাদের দেশভক্তির কাহিনী বাংলার, বিশেষ করে চট্টলার, নর-নারীকে মুগ্ধ করেছে, আকৃষ্ট করেছে—দেশ-প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা নির্বাক বিস্ময়ে যুবকদের বক্তব্য শুনলেন। এক মুহূর্তে তাঁরা বুঝে নিলেন কি ভয়ানক সমস্যা—কি কঠোর দায়িত্ব! যুবকদের বাঁচাতেই হবে—দেশের বিপ্লবী সন্তানদের রক্ষা করতেই হবে। পুলিশ ও মিলিটারী তাড়া করেছে—এক্ষুণিই হয়ত এসে পড়বে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ভাবছেন, কিভাবে সমস্যার বাস্তব সমাধান সম্ভব। তাঁদের নিজ বাড়িতে বহু লোক। পাড়ার লোকের আনাগোনা তো লেগেই আছে। সবার চোখের আড়ালে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেবার মত নিরাপদ স্থান কোথায়? বৃথা কালক্ষেপ না করে তাঁরা বিদ্রোহীদের বললেন—

—"দেখ বাবা, তোমাদের আমার বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু এখানে অন্যের সম্পূর্ণ দৃষ্টির আড়ালে একান্তে তোমরা থাকতে পারবে না। আমার বাড়িতে বহু লোক। তা'রা তোমাদের দেখে ফেলবে এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদের অস্তিত্ব শত্রুপক্ষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। এরকম ঝুঁকি নেওয়া যায় না। তোমরা ওই পুকুর পাড়ে শণক্ষেতে গিয়ে আত্মগোপন কর। সেখানে হয়ত তোমরা অনেক বেশি নিরাপদে থাকতে পারবে···।" বৃদ্ধের যুক্তিপূর্ণ সৎ পরামর্শ উপেক্ষা করা যায় না। যুবকেরা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শণক্ষেতের দিকে পা বাড়াল। যাবার সময় রজত বললে—"চাচা, আমরা অভুক্ত—পুরো একদিন আমাদে কিছু খাওয়া হয় নি। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে—ক্ষিদের জ্বালায় পেট চোঁ চোঁ করছে···"বৃদ্ধ তাদের বাধা দিল—"তোমরা কথা না বলে যত শীঘ্র পার সেখানে গিয়ে লুকিয়ে পড়। আমি তোমাদের জন্য জল ও খাবার যা' পারি নিয়ে যাচ্ছি!" তারা চলে যাবার সময় কি ভেবেছিল, আর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আল্লার কাছে কি প্রার্থনা জানিয়েছিল তা' কেবল অন্তরের গভীর

উপলব্ধি দিয়েই ভাবা সম্ভব। এই বৃদ্ধের সহৃদয়তার বিশদ পরিচয় পাবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি লিখছি। কিন্তু আমার দুর্বল হস্তের লেখনী সঠিকভাবে বাস্তব ঘটনা পরিবেশনে সক্ষম হবে না বলেই আমার ভাবনা।

দু'টি বছর আমাদের মামলা চলেছিল। রজতের বাবা উকিল—গ্রামের জমিদার ; তবু তিনি রজতের বাবা—তাই সরকারের চোখে অপরাধী। কাজেই তাঁকেও আমাদের সঙ্গে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জজসাহেবের রায়ের জন্য দু'টি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। মামলা চলাকালীন প্রতিদিন আদালতে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত। তিনি ও মাসীমা জুল্‌দা গ্রামে, তাঁদের বীর সন্তানদের ধর্মক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্রে, অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ডালি সাজিয়ে পূজো দিতে গিয়েছিলেন। জুল্‌দা গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান গ্রামবাসী তাদের অন্তর উজাড় করে রজতের মা-বাবাকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানিয়েছে। এই মুসলমান বৃদ্ধ দম্পতি রজতের মা-বাবাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেছেন—আদরযত্ন করে খাইয়েছেন। এই সহৃদয় বৃদ্ধ মুসলমান দম্পতি রঞ্জনবাবুকে (রজতের বাবা) আগাগোড়া এই কাহিনীর বর্ণনা দেন। মেসোমশাই আমাদের কাছে, আদালতের কাঠগড়ায়, এই ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। মেসোমশাই যখন রজতদের কথা বলছিলেন, তখন আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বৃদ্ধের সাহস, বেদনা, দুঃখ এবং যুবক-বন্ধুদের শেষমুহূর্তের বীরত্বের ইতিহাস শুনেছি। আজও আমার মনে সেই মধুর চিত্র ও বীরত্বের কাহিনী স্পষ্টভাবে দেখা দেয়। রঞ্জনবাবুরা এখন বালীগঞ্জে থাকেন। মেসোমশাই ও মাসীমা এখনও আমার এই বর্ণনার সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছেন। কিন্তু জানি না সেই বৃদ্ধ দম্পতি এখন কোথায় বা কেমন আছেন! দুঃখের বিষয় আজ আমি সেই বৃদ্ধের নামটি ভুলে গেছি।

পুকুর পাড়ে মানুষের চাইতেও উঁচু উঁচু শণক্ষেতে গিয়ে বিপ্লবী যুবকেরা আত্মগোপন করলো। তাদের নিদ্রাহীন ক্লান্ত অভুক্ত দেহ বিশ্রাম চাইছে। দেবুর গুরুতর আঘাত ও তা থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণের (যার বর্ণনা আমরা সুবোধ ও ফণীন্দ্র নন্দীর কাছে জেনেছি) ফলে দেবু যে কতখানি দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে তা' সহজেই অনুমান করা যায়। বৃদ্ধ তাদের শুকনো মুখ দেখেই বুঝেছিলো যাই হোক্ কিছু একটু খাওয়া তাদের একান্ত দরকার। কিন্তু সূর্য ওঠার আগে ভোরের আবছা অন্ধকারে তাদের জন্য খাবারের কি ব্যবস্থা করা যায়? বৃদ্ধা ছুটে গেলেন রান্নাঘরে। রান্নাঘরে পান্তা ভাত ও শুট্‌কীর তরকারী যেটুকু ছিল কলাপাতায় মুড়ে, তিনি এনে দিলেন বৃদ্ধকে। পান্তা ভাতের

পোঁটলা ও জলপাত্র নিয়ে বৃদ্ধ যুবকদের চুপি চুপি দিয়ে এলো। সেই খাদ্য যে তারা অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত আহার করেছে তা' বলাই বাহুল্য। তাদের ভোজনের প্রত্যক্ষদর্শী কাকেরা কলবর করে শণবন মুখরিত করেছে—অভুক্ত বিপ্লবীদের তৃপ্তিতে বনের পাখীও কত খুশি কত প্রীত! কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র ডাক্তারকে ভারতীকে বলতে শুনেছি—'এদেশের সাপেরও ধর্মজ্ঞান আছে—তারা তো আর বিদেশ থেকে আমদানী হয় নি!' এদেশের সাপও বিপ্লবীদের ভালবাসে—আর কাক-পক্ষী তাদের সুখে সুখী হবে না!

ইংরেজ-পোষা ভারতীয় গোলামেরা বিদেশ থেকে আমদানী না হলেও নিজেদের বিবেককে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। তারা ডি, আই, জি, মিঃ ফারমার সাহেবের অঙ্গুলিনির্দেশে মিলিটারী ফৌজের পুরোভাগে দেশদ্রোহিতার কাল নিশান হাতে চলেছে।

আমাদের মামলার রায় থেকে উদ্ধৃত করছি—

"There (village Uttar Dewan) they met the Union Board President Abdus Sabur and obtained further information, and crossing to the west side of the Sikhal-baha Khal went south about a mile and a quarter accompanied by abdus Sabur and some villagers to Fakirmirhat where they got more information and from which a villager (Ahmad Mia) let them to Julda, about a quarter of a mile further, and pointed out a bank of a tank on which there was thatching grass and bamboos growing and there they saw four youths lying close together between two bamboo clump."

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কুখ্যাত প্রেসিডেণ্ট আব্দুস সাবুর পুলিসকে সংবাদ সরবরাহ করলো। একজন বিশ্বাসঘাতক—আহমদ মিঞা, পুকুর পাড়ের সেই শণবনের কাছে পুলিস ও মিলিটারী ফৌজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ও অঙ্গুলীনির্দেশে সেই শণবনের মধ্যে চারজন বিপ্লবী যুবকের অবস্থানটিও দেখিয়ে দিল।

মিলিটারী ও পুলিস দুর্ভেদ্য শণ বনের আড়ালের পেছনে দূরপাল্লার রাইফেল ও মেশিনগান নিয়ে পজিশন নিল। দূরপাল্লার অস্ত্র থাকলেই যে সব সময় দূরে পজিশন নিতে হবে তার কোন অর্থ নেই। শক্ত দুর্ভেদ্য আড়াল থাকা চাই,

যেন বিপক্ষের গুলী আড়াল ভেদ করে কাউকে হত বা আহত করতে না পারে। যুবকদের শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে রাখতে শণক্ষেত হয়ত কিছুটা সাহায্য করতে পারে কিন্তু রাইফেল বা মেশিনগানের গুলী ব্যর্থ করতে কতটুকু কাজে আসবে ?

সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৈন্য উপযুক্ত আড়ালের পেছনে আর বিপ্লবীরা শণক্ষেতের মাঝে শত্রুর বন্দুকের মুখে প্রাণ দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। গ্রামবাসী এই আসন্ন যুদ্ধের পরিণতি ভেবে মনে মনে প্রমাদ গুণলো ! সহৃদয় বৃদ্ধ চাচা নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে যুবকদের মঙ্গলের জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। বৃদ্ধা রমণী অধীর উৎকণ্ঠায় চরম মুহূর্তের বিভীষিকা কল্পনা করে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলেন না। বৃদ্ধ তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করে রঞ্জনবাবুকে বলেছিলেন—"বাবু, চোখের সামনে সব ঘটে যাচ্ছিল। তিন দিক থেকে সৈন্য এসে তাদের ঘিরে ফেলল। যুবকদের পালাবার কোন পথই রইল না ! আমরা দু'জন পাগলের মত ছটফট্ করেছি—কেবল বলতে ইচ্ছা করছিল—'তোমরা অকারণে প্রাণ দিও না। এই অসমান যুদ্ধে তোমাদের কি লাভ ? তোমরা আত্মসমর্পণ কর। অকাল কুসুমের মত ঝরে যেও না। তোমাদের আমরা মরতে দেব না।' শুধু চিন্তা করাই সার—আমাদের আর কিছু করবার ছিল না বাবু। ছেলেরা মরবার জন্য প্রস্তুত। কিছুই করা গেল না। আমরা কেবল দু'হাত তুলে আল্লার কাছে তাদের মঙ্গল কামনা করলাম।" রঞ্জনবাবু বৃদ্ধের কথা আমাদের জানাবার সময় চোখের জল সামলাতে পারলেন না। বৃদ্ধ যখন ছেলেদের এই মরণ-পণ যুদ্ধের বিবরণ দিচ্ছিলেন, তাঁর দু' চোখেও ছিল তখন জলের ধারা।

দেবু, রজত, মনা ও স্বদেশ—চার মাস্কেটিয়ার্স ! মিলিটারী যে তাদের ঘিরে ফেলেছে—এই তথ্য তাদেরও আর অজানা নাই। হুইসেলের শব্দ, তাদের কথাবার্তা ও গ্রামবাসীদের সমাবেশ নিদারুণ অবস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিপ্লবীরা প্রত্যেকে রিভলভার খুলে দেখে নিল চেম্বারে টোটা ভর্তি আছে কি না। তারপর প্রশ্ন—কে আগে ফায়ার সুরু করবে ? মিলিটারী যদি দূর থেকে পাহারা দিয়ে চুপ করে বসে থাকে, তবে না হয় তারাও সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কিন্তু অবস্থার মোড় ঘুরে গেল। যুবকেরা অনুমান করল মিলিটারীরা বুকে হেঁটে দু'দিক থেকে এগিয়ে আসছে। গাছপালা ঝোপ-জঙ্গল নড়ছে—খস্ খস্ খস্ খস্ শব্দ তাদের কানে আসছে। আমাদের মামলার সময় সাক্ষ্য দিতে এসে সেই সব সেপাইদের মধ্যে (যারা সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল) কেউ কেউ

আমাদের বলেছে, তাদের বুকে গড়িয়ে আসবার আওয়াজ পেয়ে বিপ্লবীরা তাদের দিকে আন্দাজে আগে ফায়ার করে।

পাঁচ দশ মিনিট পর্যন্ত দুই পক্ষেই অজস্র গুলীবর্ষণ চললো। স্বল্পকালস্থায়ী প্রচণ্ড তীব্র মরণ যুদ্ধ শেষ হ'ল। মিনিট দশেক পরেই জুল্‌দা রণপ্রাঙ্গণ একেবারে স্তব্ধ শান্ত—গ্রামবাসীদের কোলাহল থেমে গেছে, সেপাইরাও আর কর্মচঞ্চল নয়। বিপ্লবীদের পিস্তলের আগুন আর দেখা যাচ্ছে না এবং সৈন্যদের মেশিনগান ও রাইফেলেরও এতক্ষণে বিশ্রাম মিলেছে।

কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহী যুবকদের অবস্থা জানতে ব্যস্ত হলেন। ডি, আই, জি-র নির্দেশমত হেম দারোগা কয়েকজন সেপাই সঙ্গে নিয়ে খুব সন্তর্পণে ঝোপের কাছাকাছি গেলেন, যেখান থেকে চোঙা মুখে চীৎকার করে বললে তাঁদের কথা বিপ্লবীরা শুনতে পাবে। হেম দারোগা উচ্চৈস্বরে ডি, আই, জি ফারমার সাহেবের আদেশ ঘোষণা করলেন—

"There is order for you to surrender. Lay down your arms. It is useless for you to fight. To continue fight means death for you."

—তোমাদের হুকুম জানানো হচ্ছে, তোমরা আত্মসমর্পণ কর। অস্ত্র পরিত্যাগ কর। তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করার কোন অর্থ হয় না। যুদ্ধ অব্যাহত রাখার অর্থ তোমাদের সুনিশ্চিত মৃত্যু।

সকলেই উত্তর শুনতে উদ্‌গ্রীব—কান খাড়া করে আছে। ডি, আই, জি, ভাবলেন এক্ষুণি অস্ত্র পরিত্যাগ করে একে একে চারজনই মাথার ওপর হাত তুলে শণক্ষেত থেকে বেরিয়ে আসবে। হেম দারোগাও নিশ্চিত ছিলেন যে, আত্মসমর্পণ ছাড়া বিপ্লবীদের গত্যন্তর নেই।

ডি, আই, জি, মিঃ ফারমারের আশা নির্মূল করে হেম দারোগার রঙিন স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে মনোরঞ্জনের বজ্রকঠোর দৃপ্ত স্বর শোনা গেল—

"Monoranjan does not know how to surrender ! I want to be Jatin Mukherjee of Balasore !"

—মনোরঞ্জন আত্মসমর্পণ করতে জানে না। আমি বালেশ্বর যুদ্ধে যতীন মুখার্জীর মত শহীদের ভূমিকা গ্রহণ করবো।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হেম দারোগা আদালতগৃহে সমবেত শ্রোতাদের এই বিবরণ শুনিয়ে বিস্মিত করেছেন এবং আত্মসমর্পনের বদলে মনোরঞ্জনের এই দৃপ্ত ঘোষণা শুনে আমাদের বুক গর্বে ভরে উঠেছে। মনোরঞ্জনের দৃঢ়

ঘোষণায় ডি, আই, জি, হতভম্ব হয়ে গেলেন। মাত্র "চারজন মাস্কেটিয়ার্স" শত শত উদ্যত রাইফেল উপেক্ষা করলো! এ কি—তাদের প্রাণের ভয় নেই? তাদের কি জীবনে কোন সুখের বাসনা নেই। কর্তৃপক্ষ ভাবতে লাগলেন—কি করা যায় এদের নিয়ে? সেখানে উপস্থিত পুলিস ও মিলিটারী-প্রধানেরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিলেন না। বিদ্রোহীরাই কর্তৃপক্ষকে দুর্ভাবনা থেকে রেহাই দিল। শণক্ষেত থেকে তাদের আলোচনা ভেসে আসছিল। একজনকে বলতে শোনা গেল—"আমরা প্রাণ থাকতে ধরা দেব না।" অপর একজনের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—"না, না,—নিশ্চয়ই না, আমরা মরব তবু ধরা দেব না।" তারপর আরও কঠিন, আরও দৃঢ়, আরও দৃপ্ত কণ্ঠের বাণী ধ্বনিত হ'ল—"মনা, আমি দেবুকে গুলী করছি। সে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে, হাত নাড়তে পারছে না! আমি তাকে গুলী করছি—তুই আমাকে গুলী করবি—বুঝলি?"

এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'বার পিস্তল গর্জন করে উঠলো। তারপর?—সাক্ষ্যতে হেম দারোগা বলেছেন—তিনি রজতের গলার স্বর চেনেন এবং রজতই দেবুকে গুলী করেছে। হেম দারোগা সাক্ষ্য দেবার সময় আরো বলেছেন আহত অবস্থায় রজত তাকে গুলী করবার জন্য মনোরঞ্জনকে উত্তেজিত করেছে—

"মনা, গুলী কর্--গুলী কর্—শীগগির গুলী কর্। আমরা জীবন্ত ধরা দেব না। আমি যে হাত নাড়তে পারছি না—গুলী লেগেছে। কি ভাবছিস্? হাত কাঁপছে? আমি বল্ছি গুলী কর্ আমাকে মনা?"

বন্ধুর প্রতি বন্ধুর এ কি নিদারুণ আজ্ঞা! বন্ধু চিরতরে বিদায় নেবে—আর সেই বিদায়ের রথ নিজ হাতে সাজাতে হবে বন্ধুকেই? মনোরঞ্জন রজতকে গুলী করে—বন্ধুর বিপ্লবী মর্যাদা রাখতে মনোরঞ্জন দ্বিধা করেনি—সে রজতের আজ্ঞা পালন করলো।

পিস্তলের দু'টি আওয়াজ হল—গুড়ুম্ গুড়ুম্। তারপর দু'এক সেকেণ্ড পরে শেষবারের মত আবার রিভলভারের একটা আওয়াজ হয়ে জুল্দার সেই শণবন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মনোরঞ্জন দু'বার বন্ধু রজতকে গুলী করল, তারপর শেষ গুলীটি সে করে নিজের বুকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর অত সৈন্য, মেশিনগান, রাইফেল, সমস্ত উপেক্ষা করে—চারজন বিদ্রোহী বীর ভাবীকালের তরুণ বিপ্লবীদের প্রাণে সাম্রাজ্যবাদী শত্রু-চক্রান্ত ধ্বংসের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে চিরবিদায় নিল।

আমাদের মামলার রায় থেকে লিখছি—

"........As soon as Ahmed Mia said where they are, the youths opened fire to which the D. I. G. party replied. The engagement lasted three or four minutes after which the firing from bamboo clumps ceased. Then the D. I. G. and other went forward and found three youths lying dead and the fourth mortally wounded. Abdul Azim and Hem Gupta found that two of the dead were Rajat Sen and Monoranjan Sen and the other wounded youth was Deba Prasad Gupta. They knew all three of them before. They did not know the fourth youth. Ex. LVII-(3) has been indentified by Jagadish Roy as being a photograph of his younger brother Swadesh Roy....DebaPrasad Gupta expired within an hour."

—আহমদ মিঞা, ঝোপের আড়ালে বিপ্লবীদের অবস্থান পুলিসকে দেখিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবীরা গুলী চালায়। তারপর তিন-চার মিনিট ধরে উভয়পক্ষে গুলী বিনিময় হয়। যুদ্ধ শেষে ডি, আই, জি-র পার্টি সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনজনের মৃতদেহ (রজত, মনা ও স্বদেশ) দেখতে পায়। দেবু তখনও বেঁচে ছিল।

হেম দারোগা আদালতকক্ষের সবাইকে স্তম্ভিত করে দেবপ্রসাদ গুপ্তের শেষ ক'টি মুহূর্তের বিবরণ দিলেন। এই বিবরণ নিদারুণ সত্য, তবু অবিশ্বাস্য মনে হয়। যুদ্ধের আগের রাত্রে বিশ্বাসঘাতকের দায়ের আঘাতে দেবু গুরুতর আহত হয়েছিল, সমস্ত রাত ধরে ক্ষতস্থান হতে অবিরত রক্ত ঝরেছে; অবসন্ন দেহে শণঝোপের আড়াল নিয়ে তবু সে অসম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। অবশেষে যখন অপর হাতটিও শত্রুর গুলীতে সম্পূর্ণ অচল হ'ল, তখন দেবুর কষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে নিজের আহত অবস্থায়ও রজত তাকে গুলী করে। কি আশ্চর্য? দেবু তখনও বেঁচে আছে? তখনও কি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সঙ্কল্প তার? সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে কি তীব্র ঘৃণা, কি ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা জীবনের শেষ মুহূর্তেও দেবু পোষণকরে রেখেছিল, তার বর্ণনা হেম গুপ্তের (দারোগা) মুখে শুনে আদালত-গৃহে উপস্থিত দেশপ্রেমিকেরা শ্রদ্ধায় মাথা নত

করেছেন আর সাম্রাজ্যবাদীর পোষা গোলামদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে।

মামলার জাজ্‌মেণ্ট থেকে উদ্ধৃত করছি—

"....Deba Prasad Gupta was mortally wounded. I knew him from before. I could well recognise him. When I saw him I found him gasping for breath. Mr. Farmer (D. I. G.) followed me. I spoke to Deba Prasad, 'Bara Saheb ekhane achhen, tanke ki kichhu balben?' Thereupon in a semidelirious condition, but in a distinct clear voice Debaprasad went on to say—'Bara Saheb? Ke bara saheb? Lowman? Lowman? My arms are shattered, otherwise I would have shot him down.' Then with a deep sigh he sank...."

—দেবুর জীবনের একেবারে চরম মুহূর্ত। মিঃ ফারমার (ডি, আই, জি,) এবং হেম দারোগা দেবুকে দেখলেন—দেবুর নিঃশ্বাসের খুব কষ্ট হচ্ছে। সেই অবস্থায় হেম দারোগা দেবুকে জিজ্ঞাসা করেন—'বড় সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁকে কি কিছু বলবেন?' দেবু তখন প্রায় প্রলাপের ঘোরে, কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলো—'কে বড় সাহেব? লোম্যান? আমার দু'টি হাতই অচল নইলে আমি তাকে এক্ষুণি গুলী করতাম।' এই কথা বলেই দেবু মারা যায়।

সত্যি অবাক হতে হয়! সাধারণের জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচরে! জালালাবাদ যুদ্ধে রক্ত দেখে গাছের ছালের সামান্য স্পর্শেও কারো মনে হয়েছে রাইফেলের গুলী বিদ্ধ হয়ে সে মারা যাচ্ছে; আবার বিচ্ছিন্ন দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে একমাত্র অমরেন্দ্র ছাড়া আর কারো পাত্তা পাওয়া গেল না। আবার দেখা গেল, যুদ্ধের স্বাদ পাওয়ার পর কেউ কেউ অস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলো। বিপ্লবীদের মধ্যেও সাহস ও বিক্রমের তারতম্য আছে। অলস মনে বিলাসের স্বপ্নে বিপ্লব ভাবা যায়, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মৃত্যু যখন প্রতিনিয়ত বিভীষিকা সৃষ্টি করে, তখন স্বপ্ন-বিলাসীর বিপ্লবের আত্মপ্রবঞ্চনা তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে। সেই যুগে ইংরেজের বিরুদ্ধে মরণ-যুদ্ধে নেমে রাতদিন আমাদের নিজেদের মনের সঙ্গে যুঝ্‌তে হয়েছে। শরীরচর্চা করে যেমন মাংসপেশী শক্ত করতে হয়, তেমনি মনের জোর ও

সাহস এবং স্বার্থত্যাগের শক্তি অর্জন করতে হলেও প্রতিদিন রীতিমত মানসিক exercise যদি না করা যায় তবে মনের psychic 'muscles' বা 'waves' কখনও সবল সুস্থ ও দৃঢ় হতে পারে না। সেই যুগে আমরা বিপ্লবের তত্ত্বকথা কতটুকুই বা জানতাম! পরাধীন ভারতকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে—মরণ-পণ যুদ্ধ করতে হবে, এইমাত্রই জানা ছিল। যুব-বিদ্রোহের সৈনিকেরা কিভাবে রাতদিন মৃত্যু-প্রোগ্রামের বাস্তব রূপ অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছে—কতখানি গভীরতা নিয়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে, তা' আমরা আমাদের তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করে বুঝেছিলাম।

কালারপোল যুদ্ধের শহীদেরা আমার আদর্শ—তাদের সাহস বিক্রম ও আত্মত্যাগ আমার অন্তরকে বারে বারে আলোড়িত করে, তিরস্কার করে—এবং অতীতকে স্মরণ করিয়ে আমার নিষ্ক্রিয়তার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

কালারপোলের অতুলনীয় যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য জানানো প্রয়োজনবোধে সরকারী তথ্য থেকে একটু বর্ণনা দিচ্ছি—

"The Deputy Magistrate held an inquest on the four corpses and in the inquest reports described the injuries, on Rajat Sen two gunshot injuries, on Monoranjan Sen six gunshot injuries and on Swadesh Roy five gunshot injuries. He could not say exactly by how many bullets the wounds on each has been caused as his examination was completely extended, nor he could say whether they had been caused by rifle or revolver bullets...."

ডাক্তারের বড় রিপোর্টটি এখানে দিয়ে গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি করলাম না। এখানে যা' পাচ্ছি তাই যথেষ্ট। প্রত্যেকের শরীরে পাঁচ ছয়টি গুলীর চিহ্ন। ডাক্তারের রিপোর্টে আছে—খুব কাছ থেকে রিভলভার গায়ে ঠেকিয়ে গুলী করেছে বলেই ক্ষতস্থানের মুখের চারপাশ আগুনের শিখায় পুড়ে গেছে।

ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের বিপ্লবীদের বীরত্বপূর্ণ অসমসাহসিক সংগ্রামের অনেক কাহিনী জানি, কিন্তু কালারপোলের ঘটনার মত কোন ঘটনা আমার জানা নেই। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ অসম্ভব জেনে পরস্পর গুলী বিনিময় করে নিজেরা প্রাণ দিল, তবু আত্মসমর্পণ করল না।

সেই দরদী দেশপ্রেমিক বৃদ্ধ মুসলমান রঞ্জনবাবুকে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তির বর্ণনাও দিয়েছেন। সেই বৃদ্ধ দম্পতি বিপ্লবী যুবকদের ভালোবেসেছিলেন। তিনি বলেছেন—"বাবু, একেবারে কচি তারা—অকালে ঝরে গেল! আমার স্ত্রীকে তারা 'মা' বলে ডেকেছিল, আমাকে পিতার মত শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। তারা ক্ষুধার জ্বালায় খেতে চেয়েছিল—আমরা তাদের পান্তা ভাত ছাড়া কিছুই খাওয়াতে পারিনি। বলে এসেছিলাম রাত্রে মাংস ভাত খাওয়াব—আল্লা আমাদের সেই সুযোগ দিলেন না। প্রাণ ঢেলে আল্লাকে কত ডেকেছি, তবু তারা বাঁচলো না—তাদের কোনমতে বাঁচানো গেল না। বাবু, তোমাদের সন্তানদের তোমাদের কোলে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না! বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ গোলামেরা তাদের মহামূল্যবান্ জীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিল। আজও তাদের মুখগুলি আমার চোখের সামনে ভাসছে। ভাবতেও বাবু কষ্ট হচ্ছে—কেন তারা মরলো—কেন আমাদের মধ্যে বেঁচে রইল না?"

দরদী বন্ধু! তুমি আজ কোথায় জানি না! তোমার নাম আমার জানা নেই। তবু তুমি আমাদের একজন 'অনামী' বন্ধু। শোন বন্ধু শোন—তোমার প্রার্থনা আল্লা অবহেলা করতে পারেন নি। তুমি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলে—চেয়েছিলে তারা বেঁচে থাকুক। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে! তারা মরে নি—বিপ্লবী ভারতে তারা কখনও মরবে না—মরতে পারে না! কালারপোলের জুল্‌দা রণপ্রাঙ্গণ সুস্পষ্টভাবে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের যে ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত দিয়ে গেছে, ইতিহাসে তা' অমর হয়ে থাকবে—সেই আলো অন্ধকারে পথ দেখাবে!

জুল্‌দার রণ-প্রাঙ্গণ স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগে—

"We belive that it is an inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom and *enjoy the fruits of their toil* and *have necessities of growth.* We belive also that if any Government deprives a people of these rights and opresses them, *the people have a further right to alter it or to abolish it.*"

—Independence Pledge.
Indian National Congress,
January, 1942.

প্রবল শত্রুকে উপেক্ষা করে, তার বিপুল সৈন্যবাহিনী এবং সমরনায়কদের সাহস ও বিক্রমকে বিদ্রূপ করে, বৃটিশ মেশিনগান ও রাইফেলের অগ্নিবৃষ্টিকে তুচ্ছ করে কালারপোল যুদ্ধের শহীদেরা বিপ্লবী বাংলা ও ভারতকে বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে গেল ; ঘোষণা করলো—"মৃত্যু, তবু আত্মসমর্পণ নয়।" শহীদদের উত্তপ্ত শোণিতের আহ্বান—"আত্মসমর্পণ নয়, যুদ্ধ—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ"—ভারতের আকাশে-বাতাসে এই ঘোষণার প্রতিধ্বনি।

বৃটিশ কমিশনপ্রাপ্ত তেইশ বছরের আইরিশ যুবক, এডিশন্যাল স্থপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, মিঃ লুইস্ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে জালালাবাদ যুদ্ধে মেশিনগান চালিয়েছেন—কালারপোল রণক্ষেত্রেও লুইস্ সাহেব কম কৃতিত্ব দেখান নি। তবু আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-যুদ্ধের শহীদদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের অমরগাথা মিঃ লুইসকে হয়ত ক্ষণিকের জন্য উত্তেজিত করেছিল—সেই জন্যই হয়ত আদালতে টিফিনের সময় আমার কাঠগড়ার সামনে এসে মিঃ লুইস্ ভাবাবেগে বললেন—

"My imagination fail to understand what sort of dare-devil these four youths were! To them life was just a plaything! I wonder how they played havoc with their own lives! Had they been born in a free country their real worth would have been recognised!"

—এ যেন আমার কল্পনারও অতীত—কি অসম সাহসী এই চারজন যুবক! মৃত্যু যেন তাদের খেলার সামগ্রী! ভেবে অবাক হতে হয় নিজেদের জীবন নিয়ে তারা কি করে এ-রকম ছিনিমিনি খেলেছিল! কোন স্বাধীন দেশে যদি তাদের জন্ম হ'ত, তবেই দেশবাসী তাদের আত্মত্যাগের মর্যাদা বুঝতো।

কালারপোলের আপোষহীন মরণযুদ্ধের এই আদর্শ এবং তার বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মহিমা আইরিশ পুলিসসাহেবকেও ক্ষণিকের জন্য সম্মোহিত করেছিল। জালালাবাদ ও কালারপোল যুদ্ধের অমোঘ বিষাণ বিক্ষুব্ধ ভারতের গগনে গগনে যখন মহারোল তুলেছে—"আপোষ নয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সশস্ত্র সংগ্রাম! মৃত্যু, তবু আত্মসমর্পণ নয়!"—তখন তরুণ বিপ্লবীর জিজ্ঞাসা : 'অনন্ত সিং তুমি কেন Surrender করলে?'

অগ্নিযুগের যে অধ্যায়টি আমি লিখছি, সেই অধ্যায়ের বিপ্লবী সংগ্রামের কষ্টিপাথরে আমার 'আত্মসমর্পণ' কেন, তার মূল্যায়ন হবে। এই ইতিহাস আমার সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনা নিয়েই পাঠকবর্গের কাছে পরিবেশন

করছি। কালারপোল যুদ্ধের "No surrender"-এর পরেই আমার 'আত্মসমর্পণ' বিবেচিত হলে বিপ্লবী ভারত উপযুক্ত রায় দিতে বেশি সক্ষম হবে জেনেই কালারপোল যুদ্ধ বর্ণনার পরেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করলাম।

যে মন ভবিষ্যতের এক রঙীন স্বপ্ন অন্তরে লালিত করেছিল সেই মন কেবলমাত্র বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেই আমার দায়িত্ব শেষ হ'ল—এই কথা অস্বীকার করছে। সেই জন্য বিপ্লবী ইতিহাসের বীরত্বপূর্ণ দিকটির বাস্তবরূপ তুলে ধরবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, বৈপ্লবিক ত্রুটি-বিচ্যুতির বিশেষ বিশেষ ঘটনা এবং ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অক্ষমতা ও দুর্বলতাকে কশাঘাত করতে আমি বিন্দুমাত্র ইতস্তত করি নি। যে নৈতিক নিষ্ঠার অধিকারী নিজে হলে পরে অন্যের সম্বন্ধে অনুরূপ আলোচনা করা যায়, তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম বলেই আমি সেইরূপ লিখতে একটুও দ্বিধাবোধ করি নি। নিজের দুর্বলতা ঢেকে রেখে অন্যের বৈপ্লবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করার অধিকার আমার কোথায়?

'কেন আমি ধরা দিলাম'—এই নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা, গবেষণা, মন্তব্য, বিশ্লেষণ ও উদ্ভট কল্পনা বহুকাল ধরে চলেছে এবং আজও, প্রসঙ্গ যদি ওঠে, তবে এই নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা হয়।

অনেকের ধারণা, আমাদের সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে—আমার বাবাকে জেল-হাজতে রেখেছে ও তাঁর নামে রাজদ্রোহিতার মামলা হবে—ইত্যাদি কারণে আমি বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেছি। আবার মুখে মুখে এ গল্পও ছড়িয়েছে—আমি ধরা দিয়েছি যারা স্বীকারোক্তি করেছে তাদের খুন করার জন্যে। এ ছাড়া অনেকে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে ভেবেছেন—আমার ধরা দেওয়ার একমাত্র কারণ, সরকার যাতে আমাদের মামলায় কোন রাজসাক্ষী খাড়া করতে না পারে এবং যেন কেউ স্বীকারোক্তিও না করে। মুক্তি পাবার পর অম্বিকাদা বহু ঘরোয়া বৈঠকে ও সভায় নিতান্ত অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন; তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে—'অনন্ত সিং ধরা দিল কেন?' তিনি আমাদের মধ্যে অনেককেই বলেছেন—'অনন্তের ধরা দেওয়ার ব্যাপারে মুখ দেখানো যায় না; সবাইকে বলতে হয়—আমরাই তাকে প্ল্যান করে জেলে পাঠিয়েছিলাম যাতে সরকারপক্ষ কাউকে প্রলোভন দেখিয়ে রাজসাক্ষী নিয়োগ করতে না পারে'...ইত্যাদি। ধলঘাট-যুদ্ধে নির্মলদার গুলীতে ক্যাপ্টেন কেমারন নিহত হন। নির্মলদা ও অপূর্ব সেনও সেই যুদ্ধে প্রাণ দেয়। মাস্টারদা ও প্রীতিলতা মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করে পালাতে সমর্থ হন। সেই

বাড়ি তল্লাসী করে পুলিস মাস্টারদার স্বহস্তে লিখিত ছুটি খাতা পায়। পরে যারা দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে এসেছে, তাদের মধ্যে শান্তি চক্রবর্তী, কালী দে প্রমুখ দলের সাথীরা আমাদের বলেছে, মাস্টারদা তাঁর লেখা পাণ্ডুলিপিতে "স্বেচ্ছায়" আমার ধরা দেওয়ার ব্যাপার বিশদভাবে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা অসাধ্য সাধনের কর্মস্থচী কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই আমাকে ধরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সংক্ষিপ্ত কর্মস্থচীটি এইরূপ—সরকার যেন আমাদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী নিযুক্ত করতে অসমর্থ হয়; জেল-প্রাচীরের অভ্যন্তরে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ মজুদ করতে হবে; বাইরে ও জেলের মধ্যে ব্যাপকভাবে ডিনামাইট্ ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে; জেল-প্রাচীর বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়ে আমাদের মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে এবং যুগপৎ ল্যাণ্ডমাইন ও ডিনামাইট্ ফাটিয়ে শত্রুপক্ষকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করতে হবে।

মাস্টারদা কেন বা কি ভেবে এই বৈপ্লবিক কর্মস্থচীটিই "আমার ধরা দেওয়ার" মূল কারণ বলে লিখেছিলেন, তা আমি বলতে পারবো না। সরকারের হেপাজতে সরকারী দপ্তরে মাস্টারদার সেই পাণ্ডুলিপি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। মাস্টারদার বিরুদ্ধে মামলা চলাকালে আদালতে exhibit হিসেবে এই ছু'টি খাতাও উপস্থিত করা হয়; যথা"…বাড়ি তল্লাসী করিয়া রিভলভার কার্তুজ, চিঠি, প্রীতিলতার ফটো ও তিনটি হাতঘড়ি, ছুটি Bomb-strikers, রামকৃষ্ণের ফটো ও তিনটি খাতা—একটিতে India and Revolutioneries নামক চট্টগ্রাম জেলে লিখিত একটি প্রবন্ধ এবং খবরের কাগজ পাওয়া যায়……।"

India and Revolutioneries নামক প্রবন্ধটি গণেশের লেখা। জেল-হাজতে বসে গণেশ লিখেছিল। আমরা চোরাপথে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির অগোচরে সেই খাতাটি মাস্টারদার কাছে পাঠিয়ে দিই। বাকি খাতা ছু'টি মাস্টারদার নিজের হাতে লেখা। সেই ছু'টির মধ্যে কোন একটিতে আমার ধরা দেওয়ার ব্যাপার মাস্টারদা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

মাস্টারদা কি লিখেছিলেন বা না লিখেছিলেন তা' যদি বাদও দিই তবু বাস্তব ঘটনাবলী থেকে মাস্টারদার কর্মস্থচীর সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আমার প্রত্যক্ষ চেষ্টাতেই কেউ রাজসাক্ষী হয় নি এবং স্বীকারোক্তিও সত্যিই প্রত্যাহার করেছে। কর্মস্থচী অনুযায়ী জেলে ও বাইরে ব্যাপক ল্যাণ্ডমাইনের তাণ্ডব স্থষ্টির প্রস্তুতি জেলের ভিতরে থেকেই যে আমরা সমাপ্ত

করতে সক্ষম হয়েছিলাম তাও অভ্রান্ত সত্য। অবশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে এই ব্যাপক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়াতে অর্ধেন্দু গুহ ও অন্যান্য সাথীদের সক্রিয় অপরিহার্য অবদান ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

এইসব অনস্বীকার্য বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মাস্টারদার স্বহস্তে লেখা আমার ধরা দেওয়ার বৈপ্লবিক কারণগুলি আজ যদি আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ নিই, তবে হয়ত দেশবাসীকে প্রতারণা করা সম্ভব, কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনার জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। নিজ বিবেককে মিথ্যায় ঢেকে রাখার এইরূপ তুর্বল প্রয়াসকে আমি ঘৃণা করি।

মাস্টারদা বা অম্বিকাদা বা আমার বিপ্লবী বন্ধুবান্ধবেরা আমার ধরা দেওয়ার ব্যাপারটিকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যে যা ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু আমি কখনও আমার ধরা দেওয়ার বাস্তব কারণটি ছাড়া অন্য কিছু বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করি নি। ১৯৬২ সালে দৈনিক পত্রিকা হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে, আমার ধারাবাহিক লেখার মাধ্যমে 'ধরা দেওয়ার' বাস্তব কারণ স্বীকার করতে আমি দ্বিধাবোধ করি নি।

প্রখ্যাত লেখক নীহাররঞ্জন গুপ্ত তাঁর "বিদ্রোহী ভারত" গ্রন্থে আমার এই ধরা দেওয়ার বিষয় লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে সিনেমা সংক্রান্ত ব্যাপারে ১৯৬১ সালে আমার প্রথম যোগাযোগ হয় এবং আজও আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমরা পরস্পর এক মধুর সম্পর্কে আবদ্ধ। তাঁর "বিদ্রোহী ভারত" সম্বন্ধে আমার মতামত এখানে নিষ্প্রয়োজন। সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, পাঠকবর্গের কাছে বইটি খুবই প্রিয়; তা' না হলে পর পর চারখণ্ডে কখনই বইটি প্রকাশিত হ'ত না। পাঠকবর্গের কাছে "বিদ্রোহী ভারত" কেন এত প্রিয় বা কেন এত আগ্রহের বস্তু, তা' তাঁরাই বলবেন। কিন্তু আমার কাছে "বিদ্রোহী ভারত" একটিমাত্র কারণে অতি প্রিয়, বিশেষ শিক্ষণীয় ও অতি সমাদৃত—"বিদ্রোহী ভারতে" তিনি লিখছেন—

"বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালেন—দেশের তদানীন্তন বিখ্যাত আইনজীবীর দল, শরৎচন্দ্র বসু, সন্তোষ বসু, বীরেন্দ্র শাসমল, অখিলচন্দ্র দত্ত ও কামিনীকুমার দত্ত প্রমুখেরা।"

"বিপ্লবের পথ চিরদিনই কন্টকাকীর্ণ, শত দুঃখ, লাঞ্ছনা, পীড়ন, রক্তক্ষয় ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার গতি।"

"তাই তো বিপ্লবীর ধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম!"

"মান অভিমান প্রেম ভালোবাসা তার জন্য তো নয়!"

"বেদনা, হতাশা ও অশ্রুমোচন তো তার ধর্ম নয়!"

"বাহাদুরী বা নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখাই তার পক্ষে বিপ্লবীর ধর্ম হতে চ্যুত হওয়া।"

"সেখানেই তার মৃত্যু!"

"সেই তার শেষ!"

"তাই মনে হয় ১৯৩০—২৮শে জুন ইন্স্পেক্টর জেনারেল লোম্যানকে পূর্বাহ্নে পত্র দিয়ে অনন্ত সিংহের আত্মসমর্পণ—আর যাই হোক্ বিপ্লবী নিষ্ঠার ও ধর্মের অপমৃত্যু ভিন্ন বোধ হয় আর কিছুই নয়!"

"কথার ফুলঝুরি গেঁথে নিজেকেই সমর্থন করা যায় কিন্তু বিপ্লবীর ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।"

"বিপ্লবীর ধর্মের কষ্টিপাথরে তাই ল্যোমানকে লিখিত অনন্ত সিংহের পত্রখানা তার সত্যকারের মূল্যটুকুই হয়ত যাচাই করে দিয়েছে।"

"তাই বলছিলাম ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানের যে রক্তক্ষরা স্মৃতি বিদ্রোহী ভারতের ইতিবৃত্তের পাতায় যে অনন্তলাল সিংহের পরিচয় নিয়ে ভারতের অগণিত জনগণকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল তা' স্মৃতির মণিকোঠাতেই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক।"

"১৯৩০-এর ২৮শে জুন তাকে আর স্মরণ করতে চাই না।"

আমার অন্তরে আমার সম্বন্ধে নীহাররঞ্জন গুপ্তের এই রূঢ় সত্য ও মূল বক্তব্যের প্রতিবাদ কখনও ধ্বনিত হয় নি। ১৮ই এপ্রিলের অনন্ত সিংহকে যাদের বিপ্লবী অন্তর শ্রদ্ধা করে, আমি সেই অন্তরের প্রতি শ্রদ্ধাবান। ২৮শে জুন 'অনন্ত সিংহের অপমৃত্যু' যাদের অন্তরে তাকে চির-বিস্মৃতির অতলে বিসর্জন দিয়েছে, তাদের বৈপ্লবিক অন্তরকেও আমি শ্রদ্ধা জানাই।

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী অন্তরের কথা ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—২৮শে জুন আমার বৈপ্লবিক জীবনের অপমৃত্যু—কথার কোন ফুলঝুরি দিয়ে তাকে বাঁচানো যায় না। আমিও বিপ্লবী—অপমৃত্যুকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই না; সুস্পষ্ট ভাষায় আমার স্বীকারোক্তি—আমি ধরা দিয়েছি নেহাতই আমার ব্যক্তিগত কারণে, ভাবপ্রবণতাবশে ফাঁসিতে মরবার জন্য; কোন বৈপ্লবিক কারণে বা বৈপ্লবিক কর্মসূচী কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে নয়।

আমি বিশ্বাস করি পাঠকবর্গ, আগ্রহান্বিত রাজনৈতিক মহল ও প্রাক্তন বিপ্লবীরা এই প্রশ্নটির উত্তরের প্রতীক্ষায় ছিলেন—"আমি কোন বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ধরা দিয়েছিলাম, নাকি সেটি আমার ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ

দুর্বলতা ?" সুস্পষ্ট উত্তর আমি দিয়েছি—'এ আমার দুর্বলতা, কোন বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য নয়, এ আমার নেহাতই ব্যক্তিগত কারণ।'

অগ্নিযুগের কথা বলতে গিয়ে আমি অনেকের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছি বটে, কিন্তু তাদের কারও ব্যক্তিগত জীবনের সীমা অতিক্রম করি নি। এই গ্রন্থে তাই আমার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী বর্ণনার কোন সুযোগ বা স্বাধীনতা নেই। আমার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী লিখতে বা তা' সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে আমার একটুও সঙ্কোচ নেই; কিন্তু অন্তত দু' শ' পৃষ্ঠায় সেই কাহিনী লিখতে না পারলে আমার যে কিছুই বলা হবে না। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের আলোচনা যদি বাদ পড়ে, ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-বেদনা, অশ্রুজল ও ভাব-প্রবণতার কাহিনী নিবেদন করবার পূর্ণ সুযোগ যদি না পাই, তবে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কি বৈশিষ্ট্য ফাঁসির রজ্জুতে আত্মবলি দিতে আমাকে পাগল করে তুলেছিল, তা' ব্যক্ত করা সম্ভব হবে না। মানব-চরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়। আমার ব্যক্তিগত জীবনী—কারই বা কোন্ কাজে লাগবে ? আমার নিজ মনের আনন্দ লাভের আশায় কোনদিন হয়ত তা' লিখবো। সেই জীবনের কোন মূল্য বিপ্লবীদের কাছে নেই। তাদের কাছে সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় হ'ল—১৮ই এপ্রিলের অনন্ত সিংহও অন্য একদিন ব্যক্তিগত কারণে আত্মসমর্পণ করে! কোন বিপ্লবীকেই কি চিরকাল বিশ্বাস করা যায় বা তার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ন্যস্ত হওয়া কি উচিত ?

আমার ধরা দেওয়ার কারণ স্বীকার করেছি—দুর্বলতা গোপন করি নি। এখন আবার পূর্বেকার ঘটনার বর্ণনার্থে চন্দননগরের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি।

চন্দননগরের বাড়িতে কালারপোল যুদ্ধের খবর আমরা পেয়েছি। কিন্তু আমাদের কাছে এই খবর এসে পৌছেছে অনেক পরে। কারণ, স্বাভাবিক খবরাখবর আদান-প্রদানের ব্যবস্থা তখন ভয়ানকভাবে ব্যহত হয়েছিল। চন্দন-নগরের বাড়িতে তখনও আমরা কার্যকরী কর্মসূচী স্থির করতে পারি নি। আমাদের প্রধান কর্মসূচী বা প্ল্যান ছিল—Mr. Roxburg, Chief Presidency Magistrate-কে kidnap (জোর করে বেঁধে নিয়ে আসা) করা। এই প্ল্যান কাজে পরিণত করতে হলে সাহসী এবং অস্ত্রচালনা ও আক্রমণপদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল একদল সবল সুস্থ যুবকের প্রয়োজন। আমাদের আস্থাভাজন পাঁচ-ছ'জন যুবক সাথীকে ওই প্ল্যান কার্যকরী করার জন্য কলকাতায় পাঠাতে মাস্টারদার কাছে প্রস্তাব পাঠাবার বন্দোবস্ত করি। ইতিমধ্যে সেই বাড়ির অন্তঃপুরের বদ্ধ দেওয়ালের ভেতরে গা ঢাকা দিয়ে বসে

থাকা ছাড়া আমাদের আর কোন কাজ ছিল না। ষড়যন্ত্রমূলক কাজের ধারাই হ'ল—ইচ্ছে করলেই প্রস্তুতি ছাড়া কোন আক্রমণাত্মক কাজ বাস্তবে পরিণত করা যায় না। প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। কাজেই ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সামনে রেখে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার যৌক্তিকতা বুঝেছিলাম। তবু ভূপেনদার সাহায্যে সেই বাড়িতে আমরা নানা প্রকার যন্ত্রপাতি আনালাম। সেই বাড়ির একটা ঘর ছোটখাটো একটা ওয়ার্কশপ হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক হ'ল। রিভলভারের কার্তুজ ও বোমার স্ট্রাইকার প্রভৃতি তৈরি করার উপযোগী করে এই ছোট কারখানাটি সাজানো হয়। গণেশ আমাদের এই কারখানায় কার্তুজও তৈরি করেছে। গণেশ ধরা পড়বার সময় পুলিস তার পকেটে আমাদের এই কারখানায় তৈরি কার্তুজ পেয়েছে। আমাদের মামলার জাজ্‌মেণ্টে পাওয়া যায়—

"Ganesh Ghosh and Ananda Gupta were forthwith searched and in the pocket of Ganesh Ghosh were found nine ·450 Govt. Revolvercartridges (Ex. DCLXXVII) and five home-made cartridges of the same type (Ex. DC-LXXVIII)."

ভূপেনদা মাঝে মাঝে কয়েকজন যুবকসাথীকে অস্ত্র শিক্ষা নিতে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমরা তাদের আক্রমণাত্মক সামরিক শিক্ষা দিয়েছি ; কিন্তু এই যুবকসাথীদের কেউ জানতে পারে নি যে, আমরাই চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সৈনিক। সেই বাড়িতে এই শিক্ষার্থীদের সঙ্গ পেয়ে আমরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করেছি। আমাদের পরিচয় কেবল যে এদেরই দেওয়া হয় নি তা নয়, যাঁদের পরিচর্যায় আমরা সেই বাড়িতে ছিলাম তাঁদেরও জানানো হয়নি আমরা কে এবং আমরাও তখন পর্যন্ত জানিনি যে তাঁরাই বা কে ?

কালারপোল যুদ্ধ হয়েছে ১৯৩০ সালের ৬ই মে ; ২৮শে জুনের আর বেশি দিন বাকি নেই। আমার আত্মসমর্পণের এক বাস্তব নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হওয়ার দিন ঘনিয়েছে। বিপ্লবী বাংলার পর্দার অন্তরালে আমার আত্মসমর্পণের করুণ নাটকটি রচিত হচ্ছিল। কি ট্রাজেডি! একজন 'বিপ্লবীর' অপমৃত্যু !

কেন এমন হ'ল ? এককালে যাদের বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা হয়েছে—যারা ঘরবাড়ি ছেড়েছে, আত্মীয়-পরিজন পরিত্যাগ করেছে, মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে মা-বাবা, ভাই-বোনের স্নেহ-ভালোবাসা মায়া-মমতা কাটিয়েছে, তাদের কেন স্নেহ-

ভালোবাসা অভিভূত করবে? কেন তারা ভাবপ্রবণতার প্রবল জোয়ারে ভেসে যাবে—অতলে তলিয়ে যাবে? তাদের জীবন-প্রভাতে প্রেম-ভালোবাসা ও ভাবপ্রবণতার অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা কি কখনও স্তব্ধ ছিল? বাল্যকাল থেকেই সকলের মধ্যে ভাবপ্রবণতার অভিব্যক্তি ও হৃদয়াবেগের প্রকাশ কি একই ধারায় প্রবাহিত হয়?

ছেলেবেলা থেকেই সবাই জানে—তার দয়া নেই, মায়া নেই, কারো জন্যই অন্তরে বিন্দুমাত্র করুণা নেই, কারো প্রতি কোন আকর্ষণ নেই, কবিতা সে পছন্দ করে না, সঙ্গীত তার হৃদয়ে মূর্ছনা তোলে না, শিল্পকলা এবং প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ সম্বন্ধে সে উদাসীন—ভয়ানক ও ভীষণ নিষ্ঠুর সে। এই রসকষহীন, দুর্দান্ত ও দুর্বিনীত বালকের জীবন-প্রত্যূষ থেকে অন্তরের গভীরে মায়া-মমতা স্নেহ-ভালোবাসার ফল্গুধারা কি নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে যেতে পারে? এ যে দুই পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্ব—এই দ্বিমুখী স্রোতের সামঞ্জস্য কোথায়?

রোমা রোলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ্‌কে তবু বোঝা যায়। ক্রিস্তফ্‌ ছিলেন শিল্পী—রসস্রষ্টা কলাকার। তিনি জগতের সৌন্দর্য নিজের অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতেন। দয়া-মায়া স্নেহ-ভালোবাসা তাঁর জীবনকে অপরূপ সজ্জায় বিকশিত করেছে—তা' হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার জীবনে সেই সামঞ্জস্য কোথায়? যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে আলিপুর জেলে এসেছি। তখনই আমি বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক রোমা রোলাঁর নাম প্রথম শুনি। তাঁর প্রসিদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি জাঁ ক্রিস্তফ্‌ সেই প্রথম আমার পড়ার সুযোগ হয়। সুযোগ পেলেই যে আমি বই পড়তাম তা নয়; বই পড়াটা আমার পক্ষে যেন একেবারে তেতো ওষুধ গেলা। তবু কি জানি কেন, জাঁ ক্রিস্তফ্‌ বইটি আমি আলিপুর জেলে শ্রীজ্যোতিষ ভৌমিকের কাছ থেকে নিয়ে নিজের সেলে বসে পড়লাম। পড়ে কি বুঝেছিলাম জানি না। তবে যখন বন্ধু Otto-কে ক্রিস্তফ্‌-এর বাল্য জীবনে ('Morning') আবিষ্কার করলাম, তখন একা ঘরে আমি অবাক হয়ে বসে রইলাম। এ কি! আমার কথা সব রোমা রোলাঁ জানলেন কি করে? ক্রিস্তফ্‌ অটোকে এত ভালোবাসতেন! চোদ্দ বছরের বালক ক্রিস্তফ্‌! আমিও তো চোদ্দ বছরের ছিলাম। এত সাদৃশ্য কোথা থেকে এল?—

"Will you be my friend?

Otto murmured:

'Yes'............

"When he returned home he found a letter waiting for

him. He had no need to ask himself whence it came. He ran and shut himself up in his room to read it. It was written on pale blue paper in a laboured, long, uncertain hand with very correct flourishes: '........ your very devoted servant and friend Otto Dienar.'

'P. S. On Sunday please do not call for me at home. It would be better, if you will, for us to meet at the SCHLOSS GARTEN'.

Christopher read the letter with tears in his eyes. He kissed it; he laughed aloud; he jumped about on his bed. Then he ran to the table and took pen in hand to reply atonce. He could not wait a moment. But he was not used to writing. He could not express what was swelling in his heart; he dug into the paper with his pen, and blackened his fingers with ink; he stamped impatiently. At last, by dint of putting out his tongue and making five or six drafts, he succeeded in writing in malformed letters, which flew out in all directions, and with terrific mistake in spelling:

'My soul,

........Yours always,

Christopher.'

Christopher was devoured with impatience for the rest of the week. He would go out of his way and make long turns to pass by Otto's house. Not that he counted on seeing him, but the sight of the house was enough to make him grow pale and red with emotion. On the Thursday he could bear it no longer, and sent a second letter even more high-flown than the first. Otto answered it sentimentally.

Sunday came at length, and Otto was punctually at

the meeting place. But Christopher had been there for an hour, waitig impatiently for the walk. He began to imagine dreadfully that Otto would not come. He trembled lest Otto should be ill, for he did not suppose for a moment that Otto might break his word. He whispered over and over again, 'Dear God, let him come—let him come !'

"Christopher ran to him, and with his throat dry wished him 'Good-day !' Otto replied, 'Good-day !' And then found that they had nothing more to say to each other, except that the weather was fine, and that it was five or six minutes past ten, or it might be ten past because the castle clock was always slow."

আমিও তো সেদিন চোদ্দ বছরের বালক ! ক্রিস্তফ্-এর মতন আমারও একজন অটো (Otto) ছিল। আমাদের বন্ধুত্বের পর পূজোর ছুটিতে এই প্রথম সে বাড়ি যাচ্ছে ; দিন বিশেকের মধ্যেই আবার ফিরে আসবে। তবু কিছুতেই মন মানছিল না। স্টেশনে তাকে বিদায় দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে এলাম। আজকের লেখা পড়ে সবার হয়ত মনে হবে—সবটাই বাড়াবাড়ি, সবই অবাস্তব ও উদ্ভট কল্পনামাত্র ! কিন্তু সত্যি-মিথ্যা বা অবাস্তব কিনা তার উত্তর একমাত্র ক্রিস্তফ্ই দিতে পারে। পরের দিন একখানা পোস্ট কার্ড পেলাম—নাক্সাম জংসন থেকে লেখা। কার্ডখানা পেয়ে কি খুশি ! ক্রিস্তফ্-এর মতই পোস্টকার্ডখানা নিয়ে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলাম। পোস্টকার্ডের ওপরে কতকগুলো যেন মণি-মুক্তো ছড়ানো, অন্তরের সে কি উচ্ছ্বাস ! কি সে ভাবাবেগ ! ঝর ঝর করে চোখের জল পড়ছিল। কেন এ অহেতুক অশ্রু—যদি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকে তবে কি করে তা' বোঝানো যাবে ? আবার তাহলে ক্রিস্তফ্কেই অনুরোধ জানাতে হবে সে যেন বলে দেয়—চোদ্দ বছরের বালকের চোখে এই অহেতুক অশ্রু কেন ?

আমিও তার চিঠির উত্তর দিয়েছি। কতবার চিঠির খসড়া করেছি, কতবার কেটেছি ছিঁড়েছি, তবু উদ্বেলিত অন্তরের যথাযথ ভাষা খুঁজে পাই নি ! অক্ষরগুলি বাঁকা-টেরা আর সহস্র বানান ভুল। সেই বানান ভুল আজও আছে—বাঙালী হয়েও বাংলা লিখতে ইচ্ছে করেনা শুধুমাত্র বানান ভুলের

আতঙ্কে। কিন্তু সেই দিন নির্ভুল বানানের দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। চিঠি লিখেছি কালি দিয়ে নয়—প্রতিটি লাইন লিখেছি ভাব দিয়ে, আবেগ দিয়ে। আর চিঠি লিখতে গিয়ে কেবল চোখের জলে ভেসেছি।

তারপর বলি—বন্ধুর সাময়িক অনুপস্থিতিও আমাকে পীড়িত করেছে; আমি মানসিক অসুস্থ বোধ করেছি। সে বাড়ি নেই জেনেও চার মাইল পথ অতিক্রম করে প্রতিদিন বিকেলে তার বাড়ির কাছে গেছি। দূর থেকে কেবলমাত্র বাড়িটা দেখেও কত আনন্দ পেয়েছি! দিন আগত—সে নিশ্চয়ই ফিরবে। কোন সন্দেহ নেই—সে ফিরবেই। তবু ক্রিস্তফ্-এর মত ভোর থেকে কতবার ভেবেছি—যদি সে না ফেরে! আমিও সেদিন ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা জানিয়েছি—'হে ভগবান! সে যেন আসে—নিশ্চয়ই আসে!'

বর্তমান যুগের তরুণ-তরুণীরা এই লেখা পড়ে হয়ত মনে মনে হাসবেন, বলবেন—একেবারে "ন্যাকা"! প্রত্যেকের নিজস্ব মত পোষণের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আমার কর্তব্য "আত্মসমর্পণের" ঘটনাটির বর্ণনা দিতে মাত্র যেটুকু বলা প্রয়োজন, সেটুকুই প্রকাশ করা—নইলে কি এমন ব্যক্তিগত কারণ, যার জন্য বিপ্লবের ঐশ্বর্যকে বিসর্জন দিয়ে সুনিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ধরা দিলাম?

জীবনের প্রারম্ভেই আমার মনে ভাবপ্রবণতার বান ডেকেছিল। সেই বান উচ্ছল উদ্দাম গতিতে ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা ও ঘনিষ্ঠ সব সাথীরাই আমার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আমার ভাবপ্রবণতার বাড়াবাড়ির জন্য মাস্টারদার কাছে আমি বহুবার তিরস্কৃত হয়েছি। তবু জীবন-প্রভাতে যার সূচনা তার আর মৃত্যু হ'ল না। ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি ক্রমেই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হ'ল। ১৯২০-২১ সালে দু'বার পুঞ্জীভূত অভিমান বুকে নিয়ে, শত অভিযোগ অন্তরে পোষণ করে আত্মহত্যার জন্য পা বাড়াই। কিন্তু মরতে পারি নি। সব সময় মনে হয়েছে, মরে যাওয়ার পর আমি তো আর জানতে পারবো না, কেন আমি মরলাম, সে তা বুঝলো কি না!—সে কি জানতে পারবে আমার ভালোবাসার পরিধি কত গভীর?—তাই দু'বারই মরা হ'ল না।

২৮শে জুন, ১৯৩০ সাল। জীবন-প্রভাতে যার সূচনা নতুন পরিবেশে—নতুন-রূপে—সে আমায় অনুসরণ করে এসেছে! কল্পনায় তাকে সাজিয়েছি, রূপ দিয়েছি, উজ্জ্বল করে তুলেছি—এ যেন আমারই কাজ, আমারই একার দায়িত্ব; আমি ছাড়া তার ভাল যেন আর কেউ বুঝতে পারবে না। রাতদিন আপন মনের রঙে তার ছবি এঁকেছি। নরম মাটি দিয়ে নিজের হাতে মনের মত করে

একটি মূর্তি গড়ে তুলবো, যার তুলনা কেবল তারই মধ্যে পাওয়া যাবে। ভাবে ভরা অন্ধ স্বার্থে মূর্তি গড়েছি, ভেঙেছি, নিখুঁত করে তৈরি করবার জন্য মিথ্যে কত কি ভেবেছি। পুত্রস্নেহান্ধ পিতামাতা সন্তানকে তাঁদের মনের মত গড়ে তোলার জন্য সন্তানের যে ছবি মনের কল্পনায় দেখেন তার ব্যতিক্রম চোখে পড়লে মনে কত অশান্তি কত ব্যথা তাঁদের চঞ্চল করে তোলে; স্নেহান্ধ ও স্বার্থান্ধ মন বুঝতে চায়না বা বুঝতে পারেনা, কল্পনায় যে ছবির প্রকাশ তার মধ্যে সন্তানের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ সব সময় থাকে কিনা! পিতা-মাতার চিন্তা ও কল্পনার গণ্ডীতেই কি নেপোলিয়ান, কার্ল-মার্কস্, লেলিন প্রমুখ যুগের শ্রেষ্ঠ মানবের জন্ম হয়েছিল? অন্ধ বিচারবুদ্ধি নিয়ে স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে মূর্তি গড়েছিলাম। ভেবেছিলাম—আমার চাইতে বড় কারিগর আর কেউ নেই। তাই দৈনন্দিন ব্যাপারে অতি সামান্য ও তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে সুপ্ত অহঙ্কার বারে বারে আহত হতে লাগলো। মনে হ'ল আমার প্রতি তার উদাসীনতা, তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা সীমাহীন! স্বার্থপরের মত মনগড়া একটা আদর্শে যে মূর্তি গড়ে তোলার জন্য আমার সাধনা—তার ব্যতিক্রম আমাকে চঞ্চল করে তুললো, ব্যথিত করলো; দারুণ আঘাতে—মানসিক স্থৈর্য বিপর্যস্ত করে দিল! সে আঘাতের কত ব্যথা—কি মর্মান্তিক যন্ত্রণা! স্বাভাবিক জিনিসকেও মনের অস্বাভাবিকতার জন্য সঠিকভাবে বুঝতে পারলাম না, কেবলই মনে হতে লাগলো আমার ভালোবাসা লাঞ্ছিত, অবমানিত, ধূলায় লুণ্ঠিত!

ভাবপ্রবণ মনের পুঞ্জীভূত অভিমান আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো। আমি আর পারলাম না। মনস্থির করলাম—আমাকে মরতেই হবে। আত্মহত্যাই করবো—তবে 'এমন আত্মহত্যা,' যাতে মরতে সময় লাগে। তারই চোখের সামনে মরবো এবং মরবার আগে নিজে বুঝে যাবো—সে বুঝেছে কিনা যে, আমিই তাকে জগতে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছি!

বিকেলবেলা চা-খাওয়ার পর আমি গণেশ, মাখন ও আনন্দকে ডাকলাম। আগে থেকেই আমি খুব গম্ভীর ছিলাম। সারাদিন গেছে—কারো সাথে একটা কথাও বলি নি। এখন হঠাৎ তাদের ডেকে কথা বলবার জন্য ঘরে গিয়ে বসায় তারা খুব ঔৎসুক্য বোধ করছিল। তিনজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার কথা শোনার প্রতীক্ষা করছে। আমি খুব শান্ত ধীর কণ্ঠে বললাম—

"প্রতিমুহূর্তে আমি মনে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করছি। আমার অন্তরের ব্যথা বোঝার মত ক্ষমতা তোমাদের কারো নেই। সে আমার একান্তই

ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার ব্যথা আমারই থাকবে। এখন তোমাদের আমি আমার সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি—আমি আগামীকাল স্বেচ্ছায় ধরা দেব—আমি ফাঁসি যাব।

আমার sentiment তারা সবাই জানতো। তবে সেই sentiment যে আজ এভাবে প্রকাশ পাবে তা' তারা ভাবে নি। গণেশ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। আনন্দ ও মাখন হতবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। গণেশ একটু হেসে ধীরে ধীরে ব্যঙ্গের সুরে বলল—

গণেশ—"তুমি ধরা দেবে কেন?

আমি—ফাঁসি যাব বলে—মরতে চাই বলে।

গণেশ—তুমি যখন মরতেই বদ্ধপরিকর তখন মেরে মরছ না কেন? রিভলভার হাতে ইংরেজ রাজপুরুষ কাউকে হত্যা করে প্রয়োজন হলে নিজের গুলীতে আত্মহত্যা কর।

আমি—আমার মনের নিদারুণ অবস্থার সঙ্গে তোমার সঠিক পরিচয় নেই বলেই তুমি এই প্রস্তাব করছ। বর্তমান মানসিক অবস্থায় আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তা'ছাড়া আমার ইচ্ছে ফাঁসিতে মরা।

গণেশ—আচ্ছা, বুঝলাম, বেশ!"

গণেশ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাখন ও আনন্দ, দুজনেই কেঁদে উঠলো। তাদের আকুল আবেদন—এই সিদ্ধান্ত আমাকে বাতিল করতেই হবে। আমি আগেই জানতাম যে, এইভাবে ঢাক ঢোল বাজিয়ে, সিদ্ধান্ত জানিয়ে বন্ধুদের ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কেউ যে আমাকে ফাঁসির যাত্রী হতে দেবে না, তা' কে না জানে! তবে কি তারা আমাকে যেতে দেবে না জানি বলেই সবার কাছে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলাম? না—আমি ভেবেছিলাম আমার সিদ্ধান্ত থেকে কেউ আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। তাই তাদের বলেই যাচ্ছিলাম এবং চাইছিলাম যদি তারা নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ স্থানে যেতে চায় তবে সময় থাকতে সেই সুযোগ যেন নেয়। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত আমাকে পাল্টাতে হ'ল। মাখন ও আনন্দকে আমার কথা দিতে হ'ল—এবারের মত আমার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলাম। আমার আর ধরা দেওয়া হ'ল না।

আপাততঃ ধরা দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছি বলে আনন্দ ও মাখনকে কথা দিয়েছি। কিন্তু যে ঝড় রুদ্রমূর্তিতে ক্ষণে ক্ষণে প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতে আমার অন্তর বিধ্বস্ত করে তুলছে—একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে

দিচ্ছে—তার প্রাবাল্য আমার ধৈর্যের সীমা ভেঙে আমাকে অস্থির করে তুললো।

দু'দিন যেতে না যেতেই আমি আমার সিদ্ধান্তে আবার কঠোর ও অবিচলিত হয়ে উঠলাম—ধরা দিয়ে আমাকে ফাঁসিতে মরতেই হবে—মরবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দেখে যেতে হবে আমার মৃত্যু তার মনে কতখানি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

কাউকে না জানিয়েই চলে যাব এবং যাওয়ার আগে বন্ধুদের কাছে একটি চিঠি লিখে রেখে যাব বলে স্থির করলাম। চিঠিটা হ'ল—

"My dear brothers,

You had plenty of opportunity to know me thoroughly. I understand, I am too much sensitive. I can't help it.

I think I have got enough respect and love from you, my young brothers.

I have no complain against anybody, as you know thoroughly well. My vanity is wounded. I think I am ignored and deprived of my due share! I have no claim. Simply I want to bid you farewell for ever!

I could have committed suicide or could have faught a frontal battle to die. But I have a secret desire in me. I want to see and know the reaction of my fast and close friend, during my death. This is why I preferred the process not of a quick death but rather a prolonged one in horror and at the same time to have time and scope to read what position I actually occupied in your heart so long!

I am definite that prior intimation would simply create a condition embarassing for you as well as for me. Therefore please excuse me that I could not inform you before-hand I am leaving and leaving you for ever!

I have no idea of the next world. With a heavy heart I am going to loose present one. Good bye!

Yours ever,
Ananta Singh."

এই চিঠির সারমর্ম এইরূপ :—"আমি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ তা তোমরা সবাই জান। কি করবো—এতে আমার কোন হাত নেই। আমি তোমাদের কাছে কতই শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেয়েছি—কারো বিরুদ্ধেই আমার কোন অভিযোগ নেই। তবু প্রতি মুহূর্তে আমার আহত মনের অভিমান আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আমি আমার ন্যায্য স্বীকৃতি হ'তে বঞ্চিত। আমার কোন দাবি নেই। আজ তোমাদের কাছ থেকে চিরকালের মত বিদায় নিচ্ছি।

আমি হয়ত আত্মহত্যা বা সম্মুখ যুদ্ধে-প্রাণ দিতে পারতাম—কিন্তু আমার মনের গোপন বাসনা—ফাঁসিতে মরা ও ফাঁসির প্রতীক্ষায় থাকাকালে প্রিয়তম বন্ধুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটি বোঝা।

তোমাদের বলে-কয়ে আমার বিদায় নেওয়া সম্ভব নয়—তোমরা বাধা দেবে। আমাকে ক্ষমা কর—তোমাদের না জানিয়েই চিরকালের মত বিদায় নিচ্ছি।

ওপারের জগৎ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই! হৃদয়ে গভীর ব্যথা নিয়ে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছি। বিদায়!

তোমাদের—

অনন্ত সিংহ।"

ইতিমধ্যে মাথায় এলো সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণকে আগে জানাবো—ব্যক্তিগত কারণে আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিচ্ছি, পুলিস আমাকে গ্রেফতার করতে পারে নি। এই ভেবে 'অমৃতবাজার', 'স্টেট্সম্যান', 'বসুমতী' ও 'জ্যোতি' প্রভৃতি চারটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকের নামে চারটি চিঠি একই বিষয়বস্তু নিয়ে ইংরেজীতে লিখলাম। আরো একটি চিঠি I. G. Police Mr. Lowman-কে সম্বোধন করে লিখলাম।

আমাদের মামলার জাজ্মেণ্ট থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"The envelope addressed to Mr. Lowman contained a letter beginning 'Dear Mr. Lowman' and signed 'Ananta Lal Singh', and the other six envelopes addressed to the editors of 'Amrita Bazar', 'Statesman', 'Basumati' and daily 'Jyoti' contained each a letter to the editor and also a copy of the letter to Mr. Lowman which the editors were asked to publish as early as possible.

The letter addressed to the Editor 'Amrita Bazar' may

be quoted as typical. The others addressed to the three other newspapers were to the same effect and all are dated the 25th June. It ran as follows :—

'Dear Sir.

I am Ananta Lal Singh and in my name the District Magistrate of Chittagong has declared ruppees five thousand (Rs. 5000/-) as a reward for my arrest.

I have posted one letter to Mr. Lowman, I. G., and the copy of the letter is annexed herewith, I shall do everything accordingly as written in the letter. Please publish the letter addressed to Mr. Lowman within the 28th June, 1930 and oblige.

Thanking you in anticipation.

I am,
Yours sincerely,
Ananta Lal Singh."

—পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল মিঃ লোম্যানকে একখানা চিঠি এবং স্টেটস্‌ম্যান, অমৃত বাজার, বসুমতী ও দৈনিক জ্যোতি (চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত) প্রভৃতি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়দের পত্র লিখি। সব কয়টি চিঠিতে তারিখ ছিল ২৫শে জুন ১৯৩০ সন। মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের কাছে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদকের চিঠিটি জাজ্‌মেণ্ট ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট হুবহু তুলে দিয়েছেন। সেই চিঠির সারমর্ম— 'প্রিয় মহাশয়, আপনারা হয়ত জানেন, অনন্ত সিংহের গ্রেফতারের জন্য পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আমি পুলিসকর্তা মিঃ লোম্যানকে একটি চিঠি পাঠিয়েছি। তার নকল এইসঙ্গে দিলাম। মিঃ লোম্যানকে চিঠিতে যা লিখেছি—কাজেও আমি তাই-ই করবো। জুনের ২৮ তারিখের মধ্যে ঐ চিঠিখানি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করে আমাকে বাধিত করবেন। ইতি—

আপনাদের—
অনন্তলাল সিংহ'।"

প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের নিকট মিঃ লোম্যানকে লিখিত চিঠির নকল পাঠাই ও অনুরোধ করি যেন ২৮শে জুনের আগে তাঁরা তা পত্রিকাগুলিতে প্রকাশ করেন।

মিঃ লোম্যানকে লেখা চিঠিও পুলিস আমার বিরুদ্ধে প্রমাণের জন্য আদালতে উপস্থিত করে। নিচে সেই চিঠির নকল দেওয়া গেল—

Dear Mr. Lowman,

"I shall meet you on the 28th June 1930. It is sure that you will never miss the opportunity to arrest me then and there. Never think it please, that I am going to surrender. When does a person surrender? When he becomes quite helpless and finds no other means to protect him, then and then only he yields.

Am I helpless now? No, certainly not. I have arms to protect me, ample money to spend in time of need, many a helper to help me and good many shelters, outside Bengal as well as outside India to abscond. Now I am absconding with my friends and we are quite safe. But still I am allowing my arrest and why? Do you think I am repentant for any of my actions? No, never, not a bit sorry. Then is it a mandate on me by any authority? No, it is my personal matter and absolutely private.

I am revolutionary,
Ananta Lal Singh,"

প্রিয় মিঃ লোম্যান,

আমি ২৮শে জুন, ১৯৩০ সাল, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি নিশ্চিতভাবে জানি আমাকে গ্রেফতার করিবার সেই সুযোগ আপনি হারাইবেন না। দয়া করিয়া ভুলেও মনে স্থান দিবেন না যে, আমি আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছি। একজন নতি স্বীকার করে কখন? যখন আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অপারগ হয় ও নিজেকে বাঁচাইবার আর কোন পথই থাকে না, একমাত্র তখনই মানুষ পরাজয় মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

আমি কি এখন সত্যই অক্ষম ও অপারগ? না, কখনই না। আত্ম-রক্ষার্থে আমার অস্ত্র আছে, প্রয়োজনে খরচ করিবার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আছে, বহু দরদী বন্ধু সাহায্য করিতে প্রস্তুত এবং বাংলাদেশে, এমন কি বাংলা ও ভারতের বাহিরেও, আমার গোপন নিরাপদ আস্তানার অভাব নাই। বর্তমানে আমি বন্ধুদের সহিত খুব নিরাপদেই আছি। এমত অবস্থায়ও আপনাকে আমি আমার গ্রেফতারের সুযোগ দিতেছি—কেন? আপনি কি মনে করেন আমি আমার অতীত কার্যকলাপের জন্য বিন্দুমাত্রও অনুতপ্ত? না, নিশ্চয়ই না—বিন্দুমাত্রও অনুতপ্ত নহি। তবে কি আমার প্রতি ইহা কোন উচ্চ বিপ্লবী পরিষদের নির্দেশ? না, তাহাও নহে। এ আমার একান্তই ব্যক্তিগত কারণ—নিতান্তই নিজস্ব।

ইতি—

বিপ্লবী অনন্তলাল সিংহ।

চিঠি লেখা শেষ হ'ল। আমার ধরা দেবার আর মাত্র তিনদিন বাকি। 'মাত্র তিনদিন' বটে, কিন্তু সে যে অনেক ঘণ্টা! প্রতিটি সেকেণ্ড আমার কাছে এক এক যুগ মনে হচ্ছে—মন ভেঙে গেছে, গোটা পৃথিবীটাই আমার কাছে বিস্বাদ—কিছুই ভালো লাগছে না, কারো সঙ্গে কথা নেই, আপন বিকারগ্রস্ত মনে কত কথা ভেবেছি, কতবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি, গোপনে ভাবাবেশে চোখের জল মুছেছি—আমি চলে যাব! চির বিদায় নেব! কত দূরে—নির্জনে একান্তে, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, ছোট্ট একটি কক্ষে বসে দেখবো চোখের সামনে ধীরে ধীরে পৃথিবীর রং বদলাচ্ছে—আর আমি শত অভিমান, দুঃখ ও ব্যথা-বেদনা নিয়ে নির্বাক দর্শকের মত অপেক্ষা করে থাকবো ফাঁসিমঞ্চে শেষ কথাটি বলে যাবার জন্যে—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্! আমি অক্ষম!

এই তিন দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে পুলিসের ঘাঁটি লর্ড সিন্‌হা রোডে আমাকে দেখার পর পুলিস-কর্তৃপক্ষ কি করবে? তাদের সকল প্ল্যান ও চাতুর্য বানচাল করে বৃটিশ-প্রেষ্টিজ ধূলায় মিশিয়ে দিলাম! আমার ওপর যত ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা ও যত নিষ্ঠুর উৎপীড়নের অদম্য ইচ্ছা পুলিসের থাকা সম্ভব, তা' আমি মানসচক্ষে দেখছিলাম। হিংস্র পশুর মত পুলিসের উচ্চপদস্থ অফিসারেরা তাদের ব্যক্তিগত পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না বা লোম্যান অথবা চার্লস টেগার্ট আমার বুকে বুটের লাথি বসিয়ে দেবে না, তা' ভাবতেই পারি নি। পুলিস কতখানি শারীরিক

পীড়ন করতে পারে তার কোন সীমা নেই। এই বিভীষিকাময় চিত্র ক্ষণিকের জন্য মনে উঁকি মেরেছে। "ক্ষণিকের জন্যই", কারণ কোন বিভীষিকা বা মৃত্যুভয় আমাকে কখনই ভীত করতে পারে নি। পুলিসের ভয়াবহ উৎপীড়নের চিন্তা আমাকে ক্ষণিকের জন্যও বিচলিত করে নি। এই সময়, যখন আমি সব কিছু ছেড়ে প্রিয়জনের কাছ থেকে চির-বিদায় নিতে চলেছি, তখন কি কোন বিভীষিকাই আমার মনে স্থান পেতে পারে?

২৮শে জুন, ১৯৩০ সাল। সকালে ঘুম থেকে উঠেছি। আজ মনে নেই রাতে ঘুমিয়েছিলাম কিনা। বারে বারে মা'র কথা মনে পড়ছিল। মাঝে মাঝে মা'র ম্লান মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সন্তানের জন্য মা'র চোখের জল ও তাঁর অন্তরের ব্যথার করুণ রূপ আমাকে ভয়ানকভাবে বিচলিত করছিল। বেচারী মা কি দোষ করেছেন! মাকে শাস্তি দেবার আমার কি অধিকার? মনে ভয় হ'ল—মা'র কথা বেশি ভাবলে চলবে না। ভুলতে হবে—আমার সব ভুলতে হবে। এ পৃথিবী আমার জন্য নয়—আমাকে আজ সুদূরের পানেই নৌকো ভাসাতে হবে।

সকালে এক ফাঁকে দিদিকে (সুহাসিনী গাঙ্গুলী) বললাম যে, আমি একটু আগে খাব, আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। তিনি যে সুহাসিনীদি তা' কিন্তু তখনও আমরা জানি না। সকাল দশটার সময় আমি খাব বলেছিলাম। তিনি প্রশ্ন করেন নি কেন আমি কলকাতায় যাব বা অন্য কেউ যাবে কিনা। আমার যাওয়া উচিত নয় বলে নিষেধও করেন নি।

বিপ্লবী দলের নিয়ম অনুযায়ী ঐরূপ কোন প্রশ্ন করার অধিকার তাঁর ছিল না এবং আমি যে কাউকে না জানিয়ে চলে যাচ্ছি তা' তিনি ভাবতেও পারেন নি। কারণ, আমাদের চারজনের কথা জানবার কোন সম্ভাবনাই তাঁর ছিল না।

আমি সবার দৃষ্টি এড়িয়ে স্নান করলাম। তারপর দশটার সময় টুক্ করে রান্নাঘরের পাশে খাওয়ার ঘরে ঢুকে পড়লাম। দিদি আমাকে খাবারের থালা এগিয়ে দিলেন। সব সময়ে তিনিই আমাদের যত্ন করে খাওয়াতেন এবং আমাদের সুবিধে-অসুবিধের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। সকাল দশটার সময় খাব বলে তিনি ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু তিনি কি বুঝতে পারছিলেন খাওয়ার দিকে আমার একটুও লক্ষ্য নেই—তিনি কি দেখতে পেয়েছেন আমার চোখ মাঝে মাঝে ঝাপ্সা হচ্ছে এবং আমি অত্যন্ত অন্যমনস্ক?

খেতে খুব কম সময় লেগেছে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছিল যদি গণেশ, মাখন বা আনন্দ, হঠাৎ কেউ এসে পড়ে! তারা দেখলেই আমার উদ্দেশ্য

বুঝে ফেলবে। কিন্তু তারা কেউই এলো না। জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়েই আমি খেতে বসেছিলাম। উপর থেকে নেমে আসার সময় আমার বালিশের নিচে তাদের তিনজনকে সম্বোধন করে লেখা চিঠিটা রেখে এসেছি।

এই বাড়ির প্রবেশ পথটি মস্তবড় কাঠের দরজা দিয়ে সুরক্ষিত। সেই দরজা সব সময় ভেতর থেকে বন্ধ রাখার ব্যবস্থা আছে। কেউ বেরোবার সময় বলে যেত এবং ভেতর থেকে খিল দেওয়া হ'ত। আমি খাওয়া শেষ করে আর একটুও দেরি করলাম না। যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াই উচিত মনে হ'ল। যাবার সময় দিদিকে বলে গেলাম যেন দরজা বন্ধ করে দেন।

পিঁজরায় বদ্ধ পাখীর মত এতদিন পরে ঘরের বাইরে এসে মুক্ত বাতাসও যেন কেমন কেমন লাগছিল। তা' ছাড়া খুব আশঙ্কা হচ্ছিল পাছে কোন পুলিস বা অবাঞ্ছিত লোক আমাকে এই এলাকায় বা চন্দননগর স্টেশনে দেখে ফেলে। আর ভয়ানক চিন্তা হচ্ছিল, পুলিসঘাঁটি লর্ড সিন্‌হা রোডে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই পাছে পুলিস আমাকে ধরে ফেলে! তাহলে যে সব কৃতিত্বই তাদের! সেই কৃতিত্ব থেকে তাদের বঞ্চিত করতেই হবে।

মনের এই উৎকণ্ঠা আমাকে অস্থির করে তুললো! কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তেই হু-হু করে কান্নার ঝড়ে আমার অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠলো— অবাধ্য ঝাপ্‌সা চোখ দু'টি ক্ষণে ক্ষণেই মুছতে হচ্ছিল!

স্টেশনে এসে কলকাতার টিকিট কাটলাম। ট্রেনে উঠে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বাইরের দিকে মুখ করে জানালার কাছে বসলাম। বাঁশী বাজিয়ে ট্রেন ছাড়লো। চোখের সামনেই সব আছে—তবু কিছু যেন দেখতে পাচ্ছিলাম না। মন দূরে—অনেক দূরে চলে গেছে। যন্ত্রচালিত পুতুলের মত আমি চলেছি— ধরা দেব।

লোক্যাল ট্রেনটি চন্দননগর থেকে প্রায় এক ঘণ্টা পরে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌছলো। পথে বহুবার ট্রেন থেমেছে, কত যাত্রী উঠেছে নেমেছে— সেইদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। পাছে জানাশোনা কোন পুলিস বা পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় পেছনের দিকে মুখ ফেরাচ্ছি না। হাওড়া পৌছে টুক্ করে নেমে পড়লাম। কোন পুলিস অনুসরণ করছে কিনা তা বোঝা যাক্ বা নাই যাক্—আমার গন্তব্যস্থানে পৌছবার আগেই আমাকে ধরে ফেলে কৃতিত্ব অর্জনের কোন সুযোগ যেন তারা না পায় সেই জন্যই আমি সচেষ্ট।

আমার গন্তব্যস্থল—১৩ নং লর্ড সিন্‌হা রোড—ইংরেজ সরকারের বিখ্যাত বা কুখ্যাত ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিস। হাওড়া থেকে সোজা পুলিসের হেডকোয়ার্টারে যে যাব না, তা আগেই স্থির করেছিলাম। আমার চিঠিতে লেখা আছে আমি বন্ধুদের সঙ্গে বহাল তবিয়তে ও নিরাপদে আছি। পুলিস যদি কোন সুযোগে ট্যাক্সি চালককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে আমি হাওড়া স্টেশন থেকে আসছি, তাহলে তাদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন হবে না যে, আমার বন্ধুরা বর্ধমান, চন্দননগর প্রভৃতি কোন স্থানে লুকিয়ে আছে। বিশেষ করে চন্দননগরে আছে বলেই তাদের পক্ষে অনুমান করা স্বাভাবিক; কারণ, চন্দননগর ফরাসী সরকারের অধীনে সুরক্ষিত স্থান।

দলের মধ্যে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা না হলে পরে এইরূপ সূত্র ধরে অনুসন্ধান করেই যে পুলিস সব ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে, তা নয়। তবে আমরা যদি বোকামি করে কতকগুলি বিশেষ সূত্র তাদের দিই—সেগুলি ধরে অনুসরণ করলে অনেক ক্ষেত্রে তারা কৃতকার্য হতেও পারে। আমার সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝেছিলাম, ট্যাক্সিচালকের থেকে বা আমার রেলের টিকিট দেখে, অথবা চন্দননগর থেকে আমার ট্রেনে ওঠা, এই সবগুলি সূত্রের বা কোন একটির সাহায্যে যদি তারা নিশ্চিত হয় যে, আমি চন্দননগর থেকে আসছি তবে তারা চন্দননগরেই অনুসন্ধানকার্য চালাবে। চন্দননগরে আমার বন্ধুরা আছে এইরূপ ধারণা করে নেওয়ার পর আমার জামাকাপড়ে যদি ধোপার চিহ্ন পায়, তবে পুলিসের পক্ষে অনুসন্ধানকার্য আরও সহজ হবে। যদি চন্দননগরে প্রত্যেক ধোপার কাছে খোঁজ নেওয়া যায় সেই বিশেষ চিহ্ন কার দেওয়া ও কোন্ বাড়ি থেকে সে এই কাপড় এনেছে, তাহলে সহজেই তারা আমার বন্ধুদের খোঁজ পেয়ে যাবে। বৃটিশ সরকারের উচ্ছেদসাধনের জন্য ষড়যন্ত্রমূলক কাজে যে দল মরণ-পণ করে লিপ্ত, তাদের কাছে এই সব অতি প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা—'কি করে পুলিসের তৎপরতা ও অনুসন্ধান পদ্ধতিকে বানচাল করা যায়'। এই জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই ধুতি, সার্ট ও গেঞ্জি থেকে ধোপার চিহ্ন দেওয়া স্থানগুলি ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলেছিলাম। তারপরও আমি চন্দননগর থেকে আসছি জেনে পুলিস যদি আমার পরিধানের ধুতি ও সার্ট নিয়ে চন্দননগরে ধোপাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনুসন্ধান করে এবং ধোপাদের নিজস্ব চিহ্ন সেই জামাকাপড়ে না থাকলেও তারা সাধারণতঃ কোথায় চিহ্ন দিয়ে থাকে ও ঐরূপ ধুতি-সার্ট কোন বাড়ি থেকে এনেছে সেইরূপ তথ্য সংগ্রহ করে, তবে আমার বন্ধুদের

বাড়ি আবিষ্কার করে ফেলা মোটেই শক্ত হবে না। কাজেই আমার সামান্য অসাবধানতার জন্য আমার বন্ধুদের চরম বিপদ ঘটতে পারে। বন্ধুদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এই ব্যাপারে আমি কোনমতেই উদাসীন থাকতে পারিনি।

ঠিক করেছিলাম দু'তিনটি ট্যাক্সি বদল করবো এবং আমার পরিহিত ধুতি, সার্ট, গেঞ্জি প্রভৃতির পরিবর্তে সমস্ত নতুন পরিধানে সজ্জিত হয়েই পুলিসের সঙ্গে দেখা করবো।

হাওড়া থেকে ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমে কলেজস্ট্রীট মার্কেটে গেলাম। সেখানে ধুতি ও গেঞ্জি কিনে আর একটি ট্যাক্সি করে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গেলাম। সেখান থেকে খুব দামী একটি আমেরিকান কাফ বেন্ ও বেন্-কলার দেওয়া চেক্-কাপড়ের সার্ট এবং একজোড়া ইলাষ্টিক আর্ম-ব্যাণ্ড কিনলাম। দোকানীকে বললাম—আমি একটি interview দিতে যাচ্ছি—যদি অনুমতি পাই তবে আমার পরিধানটি বদলাতে পারি। সানন্দে তাঁরা আমাকে সেই সুবিধে দিলেন। আমার ব্যবহৃত কাপড়জামা বাণ্ডিল করে কাগজে মুড়ে নিয়ে আর একটি ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। পথে ড্রাইভারের দৃষ্টির অগোচরে কাপড়ের পোঁটলাটি নির্জন রাস্তায় ফেলে দিলাম। ড্রাইভার কিছু বুঝতেই পারলো না। এই ট্যাক্সিটিও ছেড়ে দিলাম। চতুর্থ ট্যাক্সি নিয়ে আমি প্রায় একটা-দেড়টার সময় ১৩ নং লর্ড সিন্‌হা রোডে ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসের সিংহদ্বারে উপস্থিত হলাম।

পুলিসের এই ঘাঁটিটি বিপ্লবী বাংলার একটি বিশেষ শত্রুশিবির। তাই বিপ্লবীরা—সময় মত উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য—এই অফিসের প্রধান প্রধান অফিসারদের ওপর সব সময়ে লক্ষ্য রাখত। সেইজন্য পুলিসের এই অফিসটি নানাভাবে সুরক্ষিত। সাদা পোশাকে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীরা এই অফিসের নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বদা মোতায়েন।

অফিসটির চতুর্দিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সিংহদ্বারটি সুদৃঢ় কাঠের দু'টি বড় বড় পাল্লা দিয়ে তৈরি। এই পাল্লা দুটি খুলে দিয়ে মোটর গাড়ি যাতায়াত করে। দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ থাকে—চেনা গাড়ি ছাড়া দরজা খোলা হয় না। দরজার পাশে—ভিতরে প্রহরীদের ঘর। রাইফেল ও রিভলভার নিয়ে অতন্দ্র প্রহরী সর্বদা পাহারায় নিযুক্ত। ভিতর থেকে বাইরে দেখার জন্য মোটা কাঠের পাল্লায় তিন চার ইঞ্চি ব্যাসের দু'টি ছিদ্র আছে। আর একটি বড় পাল্লা কেটে কেবল মানুষ যাতায়াতের জন্য একটি ছোট দরজা

করা আছে। এই ছোট দরজাটিও ভিতর থেকে বন্ধ। চেনা লোক না হলে প্রহরী দরজা খোলে না।

সিংহদ্বারের সামনে এসে আমি ট্যাক্সি বিদায় দিলাম। আগে থেকে আমার নাম লিখে দু'টি কার্ড সঙ্গে নিয়েছিলাম—একটি আই, জি, মিঃ লোম্যান সাহেব ও আর একটি রায় নলিনী মজুমদার বাহাদুরের উদ্দেশ্যে। ট্যাক্সি বিদায় দিয়ে সিংহদ্বারে করাঘাত করাতে ছিদ্রপথে প্রহরী উঁকি দিল—তার হাতে কার্ড দু'খানা দিয়ে বললাম—"লোম্যান সাহাব আউর রায়বাহাদুর নলিনী মজুমদারকা পাশ ভেজ দিজিয়ে"। সেন্ট্রি একটু থতমত খেয়ে গেল। যে দু'জনের কাছে কার্ড পাঠাচ্ছি তা দেখে সেন্ট্রির কিছু বলা বা জিজ্ঞাসা করার থাকলেও সে সাহস করলো না। ছিদ্রপথে কার্ড দু'টি নিল—আমার মনে হ'ল কাউকে দিয়ে কার্ড দু'টি পাঠিয়ে দিচ্ছে। উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা ও আসন্ন অভ্যর্থনার রূপটি কি হবে—সেই চিন্তা নিয়ে সিংহদরজার পাশে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমি কার্ড পাঠাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাদা পোশাকে একজন পুলিস আমার কাছে এসে খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলো—"আপনার কি প্রয়োজন? আপনি কোত্থেকে আসছেন? কাকে চাইছেন?" আমি এমন ভাব দেখালাম যেন তাকে বা তার কথায় কোন ভ্রূক্ষেপই করছি না। অবজ্ঞার সঙ্গে উত্তর দিলাম—"কার্ড পাঠিয়েছি।" কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আর একজন ওয়াচার এই পুলিসটির সঙ্গে যোগ দিল। সেও আমাকে খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিল—কিন্তু কোন প্রশ্ন করলো না; কারণ, আগেই জেনে নিয়েছে—কার্ড পাঠিয়েছি এবং কোন প্রশ্নের উত্তর দিই নি। এমন সময় দেখি সিংহদ্বারটি খুলছে—ভাবলাম এটা বুঝি আমার "বিশেষ অভ্যর্থনার" জন্য "সম্মান দেখানো"! কেমন কেমন ঠেকলো—তারা আমাকে সম্মান দেখাবে—এও কি সম্ভব! বোধ হয় আমাকে গ্রেফতার করবার জন্য পুলিসের দল ছুটে আসছে! পর মুহূর্তে ভুল ভাঙলো—ইন্‌স্পেক্টার ভুজঙ্গ সরকার, যিনি আমাকে আগে দেখেছেন ও চিনতেন, আরো দু'জনের সঙ্গে একটি মোটরগাড়ি করে আমার গা ঘেঁষে চলে গেলেন। যাকে ধরার জন্য সরকারের এত চেষ্টা—হুলিয়া বার করেছে, মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে, পুলিস গেজেটে ফটো ছেপেছে, সে যে নিজেই তাদের সঙ্গে তাদের আস্তানায় দেখা করতে আসবে, তা কি করে বেচারা ভুজঙ্গ মশাই বুঝবেন! ভুজঙ্গবাবুর গাড়ি চলে গেল—সিংহদ্বার আবার বন্ধ হ'ল।

এতক্ষণ পর্যন্ত দু'জন ওয়াচার ছিল। গাড়ি চলে যাবার পর আর একজন সেপাই এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। তিনজন আমাকে প্রায় ঘিরে দাঁড়িয়েছে। দশ-পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যে আরও একজন দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ সেপাই সাদা পোশাকে খুব ব্যস্ততা ও তৎপরতার সঙ্গে ওই তিনজনের সঙ্গে মিলিত হ'ল! এরা বাইরে পাহারা দেয়। আমার কার্ড পাওয়ার পর আমাকে ঘিরে রাখার জন্যই যে এই ওয়াচারদের পাঠানা হয়েছে তা কিন্তু মনে হ'ল না। কারণ, তা'রা বাইরের পাহারাতেই নিযুক্ত ছিল এবং আমার কার্ড মাত্র মিনিট পাঁচেক আগে দেওয়া হয়েছে। এই চতুর্থ বলিষ্ঠ ব্যক্তি সুতীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে তার কর্তব্য অনুযায়ী আমাকে প্রশ্ন করলো, "আপনি কোত্থেকে আসছেন? কি চান?" আমি তাচ্ছিল্য সহকারে উত্তর দিলাম—"তা'তে আপনার প্রয়োজন? অনধিকারচর্চা আমি পছন্দ করি না—কার্ড পাঠিয়েছি।" আমার দৃঢ়কণ্ঠের এই জবাব শুনে সেপাইরা সকলেই বিব্রত বোধ করলো—কেউ ঢোক গিললো, কেউ সার্টের বোতামটা একটু ঠিক করে নিল আবার কেউ এদিক-ওদিক তাকিয়ে এক পা সরে দাঁড়াল। সাদা পোশাক পরা দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ কন্‌স্টেবলটি নিরুপায় বোধে বিরক্তির ভঙ্গীতে আমার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার slip পাঠাবার প্রায় মিনিট দশেক পরে এই প্রথম ছোট দরজাটা খুললো। ভেতর থেকে একজন বাবু ধরনের লোক বেরিয়ে এলেন এবং একজন বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী কন্‌স্টেবলও তাঁর ঠিক পেছন পেছন এলো—মনে হ'ল বাবুটির দেহরক্ষী। বাবুটির হাতে আমার কার্ড দু'খানা দেখতে পেলাম। তিনি ছোট দরজা দিয়ে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, এই slip কে পাঠিয়েছেন? ......তবে আসুন...এই যে...।" বাইরে এসে এই ধরনের কি সব বলছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর গলা কাঁপছিল। মোট কথা বুঝলাম, তিনি আমাকে ভেতরে যেতে বললেন। মজার কথা হচ্ছে, বাইরে এসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ক'টি কথা বলেই দেহরক্ষীকে নিয়ে তিনি যেন একেবারে লাফ দিয়ে সিংহদ্বারের ভেতরে প্রবেশ করলেন। সমস্ত ব্যাপারটা দেখে যে কেউ বুঝবে, বাবুটি খুব ভয়ে ভয়ে এসেছেন—দেখামাত্রই "অনন্ত সিং যদি তাঁর বুকে গুলী করে বসে?"

এই ভদ্রলোককে আমি আগে কখনও দেখি নি। তাঁর নাম বোধ হয় "কুমার বাবু"—ইন্‌টেলিজেন্স ইন্‌স্পেক্টার। সেই দিনই নাকি তিনি রেঙ্গুন থেকে বদলী হয়ে এসেছেন। অমোর কার্ড দু'খানা যখন নলিনীবাবুর কাছে পৌছয় তখন কুমারবাবু তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। লালবাজারে বহু অফিসার

আমাকে নানা রকমের কথা বলেছেন—সে সব কথা পরে লিখছি। তাঁদের মধ্যে একজন অফিসারের মুখে শুনেছি—"নলিনীবাবু আপনার slip পেয়ে বিচলিত হলেন। আর্দালিকে ডেকে বিপদ-সঙ্কেত বাজাতে বললেন। একে ওকে হাঁকাহাঁকি করলেন। সাহেবকে অর্থাৎ ডি, আই, জি, কোলসন্‌কে ফোনে ডেকে আপনার কার্ডের কথা বললেন। নলিনীবাবু পদমর্যাদায় অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও তাঁর অফিসে এইরূপ সাংঘাতিক ঘটনা—কাজেই তিনি ডি, আই, জি,কে খবর পাঠালেন। তখনও আমি বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা কি হ'ল। তারপর তিনি কুমারবাবুকে দু'টি slip এগিয়ে দিয়ে বললেন—'যাও, অনন্ত সিংহকে ধরে নিয়ে এস। কি, ভয় পেলে? ভয়, ভয় কি? আমিই তাকে ধরে আনতে পারি!—গেটে দাঁড়িয়ে আছে—যাও।' কুমারবাবু যতটুকু শঙ্কিত হয়েছিলেন তার চেয়ে নলিনীবাবু অনেক বেশি আতঙ্কগ্রস্ত। নলিনীবাবুর উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা ও আতঙ্ক দেখে কুমারবাবু বেশ ঘাবড়ে গেছেন মনে হ'ল। নলিনীবাবু বললেন—'একটু বস। ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমিই তো যেতে পারি। বল তবে, আমিই যাচ্ছি!'

কুমারবাবু—'না স্যার, আপনি যাবেন কেন? আমিই যাচ্ছি।'

নলিনীবাবু—'যাও যাও, শীগ্‌গির যাও—সাবধানে যেও। পাঁচ-ছ'জনকে সঙ্গে নাও।'

কুমারবাবু উঠে পড়লেন। ঘরের দরজা পর্যন্ত গেছেন, অমনি আবার নলিনীবাবু ডাকলেন—'কুমার!' কুমারবাবু ফিরে দাঁড়াতে আবার বললেন—'সাবধানে যেও। কে জানে—fire open করতে পারে!' কুমারবাবু রায়বাহাদুরের এইরূপ সস্নেহ সাবধান বাণী শুনে কৃতজ্ঞতার স্বরে বললেন—'ভয় কি স্যার—খুব সাবধানে যাব'।"

তাই বোধ হয় কুমারবাবু সাবধানতা অবলম্বন করে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েই একলাফে সিংহদ্বারের ভেতর ঢুকে পড়লেন। আমার মানসিক অবস্থার জন্যই সেইদিন কুমারবাবুর ওরকম মেষশাবকের মত আচরণ দেখে হেসে ফেলি নি—কিন্তু কৌতুক অনুভব করেছি। আমি কুমারবাবুকে অনুসরণ করে ছোট দরজাটা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দু' পাশ থেকে দু'জন "পালোয়ান কনস্টেবল" আমার দু' হাত যুযুৎসুর প্যাঁচ দিয়ে ধরে ফেললো। বিপ্লবী বন্ধুরা সকলেই জানেন এই সব বাছাই করা কনস্টেবল ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চের অধীনে থাকতো। সশস্ত্র বিপ্লবীদের অতর্কিতে বন্দী করার জন্য এদের special training দেওয়া হ'ত। আমাদের সে যুগের বিশেষ বন্ধু

ভবেশ রায় (আমাদের সমবয়সী, ডাক্তার—এখনও বেঁচে আছেন) স্মাগ্‌লারের কাছ থেকে অস্ত্র কেনবার জন্য গণেশ ও দেবেন দের সঙ্গে যায়। এক বিশ্বাস-ঘাতকের মারফত পুলিস এ খবর জানতে পারে ও এদের ধরবার জন্য জাল পেতে রাখে। পুলিসী ব্যবস্থা অনুযায়ী এইরূপ পালোয়ান সেপাই সাদা পোশাকে এসে হঠাৎ ভবেশকে ধরে ফেলে। দেবেন ও গণেশ পালাতে সমর্থ হয়, কারণ, তা'রা পেছনে ছিল—ভবেশ সবার আগে ছিল। পুলিস ভবেশের সঙ্গে একটা রিভলভার পায়। বিচারে সাজা হ'ল, ভবেশ হাসিমুখে কারাবরণ করলো। ভবেশ আমাদের একজন প্রকৃত বিশ্বাসী বন্ধু।

Commando training নিয়ে, এইরূপ সেপাই স্যার টেগার্ট ও লোম্যানের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে তাদের সঙ্গে গেছে ও অনেক বিপ্লবী বন্ধুদের অকস্মাৎ ধরে ফেলেছে—এই নজির আছে। ১৯২৪ সালে, বাঁধাঘাট-শালকিয়া থেকে আই, বি, অফিসে আমাকে গ্রেফতার করে আনার পর, এইরূপ চারজন পালোয়ান সেপাই মোটরে করে আমাকে পোর্ট-পুলিসের কার্যালয়ে নিয়ে যেত ও আবার ফিরিয়ে আনতো। তাদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমার সম্যক উপলব্ধি ছিল। এই সেপাইরা তাই চট্ করে পাশ থেকে জাপানী কায়দায় যখন আমার হাত দু'টি Lock করে ধরে ফেললো, তখন আশ্চর্য হলাম না বা তাদের কবল-মুক্ত হতেও চেষ্টা' করলাম না—এর জন্য আমি প্রস্তুতই ছিলাম। দু'জন আমাকে ধরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে অপর দু'জন চট্ করে এসে খুব ভাল করে আমার শরীর অনুসন্ধান করে দেখলো। আমাকে একেবারে নিরস্ত্র দেখে তারা যে খুব আশ্চর্য হয়েছে, তা' মনে হ'ল না; তবু একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো—একটা ফাঁড়া তো কাটলো!

চারজন সেপাই এবং পেছনে সঙ্গীন আঁটা রাইফেল হাতে ও ইউনিফর্ম পরা আরো তিনজন সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে কুমারবাবু আমাকে বন্দী করে সদর্পে চললেন। আগে আরো দু'বার এস্, বি, ও আই, বি, অফিসে আমাকে বন্দী করে এনেছিল—তবু আমি এই অফিস দু'টির প্রকৃত অবস্থান ভালো করে বুঝতে পারছিলাম না। কুমারবাবু কোথায় কোন্ দিক দিয়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন তা' সঠিক অনুমান করতে পারছিলাম না। একটা বাড়ির সদর দরজা দিয়ে না গিয়ে পেছনের কোন একটা ছোট সিঁড়ি দিয়ে আমাকে নিয়ে ওপরে উঠছিলেন। মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্টভাবে দু'একটা কথা বলছিলেন—এগুলি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা, না কি তাঁর স্বগতোক্তি তা' ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল কুমারবাবু তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় তখনও ফিরে আসেন

নি। আমার ধারণা আরও সুস্পষ্ট হ'ল যখন ওই ছোট নির্জন সিঁড়ি দিয়ে বন্দী অবস্থায় ওঠার সময় কুমারবাবু আবার অস্বাভাবিক ভাবে আমার কোমর তল্লাসী করে দেখলেন এবং হঠাৎ অসংলগ্ন ভাবে বললেন—"হাঁ, না, হাঁ···দেখুন যদি এভাবে বেঁচে যেতে পারেন···।"

মুহূর্তে সেপাইদের ও কুমারবাবুকে স্তম্ভিত করে দাঁড়িয়ে গেলাম। সজোরে সিঁড়ির ওপর পদাঘাত করে খুব গম্ভীর ও কঠোর স্বরে বললাম—"কি বললেন? আবার বলুন। আমাকে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে বলছেন···?" উপস্থিত সেপাইয়ের দল ও কুমারবাবু আমার ধীর শান্ত নিরীহ মূর্তির হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে বুঝতে পারলেন হিসেবে কোথায় যেন ভুল করেছেন। কুমারবাবু আমার দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে ও কণ্ঠস্বর শুনে বিশেষ অপ্রস্তুত হলেন; তা'ছাড়া তাঁর আশঙ্কা হ'ল, এই বুঝি কর্তার কাছে যাওয়ার আগেই কোন একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়! বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন—'আমার ভুল হয়েছে। আমকে ক্ষমা করুন। ···না ···হাঁ—দেখুন—কি বলতে কি বলে ফেললাম। ···হ্যাঁ, চলুন রায়বাহাদুর আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন···।"

রায়বাহাদুরের ঘরখানা বোধ হয় দোতলার ওপর। আমি আগেও সেখানে গিয়েছি—বেশ বড় ঘর। রায়বাহাদুর তাঁর আসনে সমাসীন। মস্ত টেবিল—টেবিলের সামনাসামনি অপর দিকে খানতিনেক চেয়ার। টেবিলটি এমনভাবে সাজানো যে, হঠাৎ যদি কেউ আক্রমণের চেষ্টা করে তবু দূরত্বের জন্য তা' করা খুব সহজ হবে না। দু'জন পালোয়ান সেপাই আমার দুই হাত ধরা অবস্থায় আমাকে টেবিলের অপর পারে রায়বাহাদুরের সামনে দাঁড় করালো। কুমারবাবু নলিনীবাবুর ডান দিকে দাঁড়ালেন। অন্যান্য সেপাইরা দরজার পথ আগলে দাঁড়িয়ে রইল। রায়বাহাদুরের ঘরের ভেতর এবং সব দরজাগুলিতে ছোটবড় অফিসার ও পুলিস কর্মচারীরা আমাকে দেখার জন্যে ভিড় করেছে। রায়বাহাদুর নলিনীবাবু তাঁর বৃহৎ বপুটি নিয়ে সমস্ত চেয়ারটা জুড়ে বসে আছেন—রং কালো, মস্ত বড় বড় হাত, বড় মাথা, চোখ দুটো লাল টক্ টক্ করছে।

অত্যন্ত কঠোর ভঙ্গীতে মুখ তুলে একবার তাকালেন। তারপরেই দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—

"How do you dare to come to Elysium Row?"

—(ইলিসিয়াম রো'তে আসবার সাহস তোমার হ'ল কি করে?)। তখনও সেই রাস্তা লর্ড সিন্‌হা রোড নামে পরিচিত হয় নি।

রায়বাহাদুর আমাকে তাদের অফিসে স্বেচ্ছায় আসতে দেখে কুমারবাবুর মতই হয়ত ভেবেছিলেন আমি প্রাণভিক্ষা চাইব। আবার হয়ত মনে করেছিলেন ধমকে আমাকে ভয় দেখাবেন বা কাবু করতে পারবেন। তাই একটু বাজিয়ে দেখার জন্য ঐরূপ কঠোর ভাব দেখালেন। তাঁর সেই অসংযত কণ্ঠের উচ্চস্বরকে দাবিয়ে নলিনীবাবুর ঘরখানা কাঁপিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখের ওপর জবাব দিলাম—

"Whom should I be afraid of ?"

—(ভয় করবো আবার কাকে ?)।

নলিনীবাবু আমার এইরূপ বিদ্রোহী মনোভাব ও এই উত্তর হয়ত আশা করেন নি। সেখানে প্রায় দু'শ' আই. বি-র লোক উপস্থিত। তারাও আগে বোধ হয় কখনও নলিনীবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে এইভাবে তাঁর মুখের ওপর জবাব দিতে বা তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে দেখে নি। নলিনীবাবু সেকেণ্ড দুই-তিন আমার মুখের দিকে একভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর মাংসপেশীগুলি একটু শিথিল করে বললেন—

"Take your seat."

আমার হাত ছেড়ে দেওয়া হ'ল। আমি চেয়ারে বসলাম। পালোয়ান সেপাই দু'জন চেয়ারের পেছনে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নলিনীবাবু এতক্ষণে ঘর ভর্তি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"বেশ, তোমরা এখন এসো।" সবাই চলে গেল। তিনদিকের তিনটি দরজার বাইরে রাইফেল ও রিভলভার নিয়ে প্রহরী মোতায়েন রইল।

আমাদের মধ্যে, অর্থাৎ নলিনীবাবু ও আমার মধ্যে, তখনও পর্যন্ত কোন কথা নেই। রায়বাহাদুর সব সময়েই যেন কাজ করছেন—খুব ব্যস্ত ভাব। আমি খুব গম্ভীর হয়ে বসেছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে D. I. G., W. B., C. I. D. Bengal Mr. Colson রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে ঢুকলেন।

Mr. Colson খুব উত্তেজিত হয়ে আমাকে উদ্দেশ করে বললেন—

"Well, what made you do this sort of senseless act of violence, arson and loot, raids ? Is the British Government a repressive one ? Haven't you enjoyed prosperity under the British rule in India ? Haven't we done any good to India ? How can you justify your criminal acts ?"

এ তো বেশ মজার কথা! সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের একজন প্রতিভূ

আমাকে বলছে, এই সব অর্থহীন লুঠতরাজ, সশস্ত্র আক্রমণ প্রভৃতি আমরা কেন করলাম? নির্লজ্জের মত কোলসন্ সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করছেন—'বৃটিশ সরকার কি সত্যই খুব অত্যাচারী? বৃটিশ সরকার আমাদের জন্য কত করেছে —তারা কি আমাদের জন্য ভালো কিছুই করে নি?' কোলসনের বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা—'তবে কি করে আইনভঙ্গের অপরাধকে আমরা সমর্থন করতে পারি?'

কোলসন্ সাহেবের এক তরফা বক্তৃতা আর সহ্য হচ্ছিল না। তাঁকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বললাম—

"Mr. Colson, it seems to me you have completely forgotton our relation as rulers and the ruled. We are wearing different glasses. Therefore, what is regarded as crime by you is appreciated as patriotism by us."

—সাহেব তুমি তো অনেক বললে। এখন একটু অপেক্ষা কর—আমার কথা শোন—মিঃ কোলসন্, তুমি আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ভুলে যাচ্ছ কেন? তোমরা শাসক, আর আমরা শাসিত। তাই তোমরা যাকে বল আইনভঙ্গের অপরাধ, আমরা তাকেই স্বদেশ-প্রেম বলে অভিহিত করে থাকি।

সাহেব খুব চটে গেলেন। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার আপাদমস্তক বার বার দেখতে লাগলেন। রাগে ফেটে পড়ছিলেন—পারলেই যেন লাথি বসিয়ে দেন। সাহেবের রাগ ও চোখ ঘোরানোকে আমি তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করছি দেখে কোলসন্ আর সেখানে বসে থাকতে পারলেন না, উঠে বাইরে চলে গেলেন।

নলিনীবাবুর ঘর প্রায় খালি ছিল, কিন্তু অনেকে বাইরে থেকে আমাকে দেখছিল। একজন অফিসার নলিনীবাবুকে কানে কানে কি যেন বললেন। নলিনীবাবু কিন্তু শুনতে পাওয়া যায় এমনিভাবেই উত্তর দিলেন—

"All right—let him come. If he wants to meet him, let him come here. He is in my office."

নলিনীবাবুর উত্তর শুনে মনে হ'ল উচ্চপদস্থ কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান জেনে নলিনীবাবু তাঁকে আনতে বললেন। সংবাদবাহক প্রস্থান করলো। মিনিট দুই এর মধ্যেই একজন ইংরেজ যুবক অফিসার খুব স্মার্টলি আমার পাশে এসে বসলেন। পরে জেনেছিলাম তিনি একজন S.S.(I)—অর্থাৎ, Special Superintendent No. 1; আর নলিনীবাবু ছিলেন S.S. (3)।

যুবক অফিসারটি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলেন—

"I see, you are Ananta Singh ? You are considered a very strong man ! There are interesting and striking reports about you ! You are supposed to be the hero of the drama ! You see had I been in your position I think I would have played exactly the same role. Well tell us the story—How did you plan and launch the attack. This will be very interesting ? What do you think Rai-Bahadur ? Isn't it so ?

The Rai Bhadur said :—'Of course, it is the most daring action on the part of the revolutionaries in India ! This must be very interesting and we will like to hear it."

S.S.(I) সাহেব আমার পাশে বসে, "ও আপনিই অনন্ত সিং" বলে তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করলেন। মনে হ'ল—কি কি বলবেন আগেই মনে মনে রিহার্সেল দিয়ে এসেছেন। আমাকে খুব প্রশংসা করে বললেন—তাঁদের রিপোর্ট থেকে জানতে পেরেছেন যে, আমি খুব বলশালী এবং যুব-বিদ্রোহ নাটকের আমিই প্রধান নায়ক। তিনি যদি আমার অবস্থায় থাকতেন তবে তিনিও আমার পার্টটিই অভিনয় করতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে উপসংহারে তাঁর অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন—আমি যেন তাঁদের আমার প্ল্যানটি ও আক্রমণের হৃদয়গ্রাহী গল্পটি শোনাই। তারপর নলিনীবাবুকে দলে না টানলে ভাল দেখাচ্ছে না বলে রায়বাহাদুরকে বললেন—'কি মনে করেন। এঁর কাছ থেকে এঁদের গল্প শুনতে ভালো লাগবে না ?'

রায়বাহাদুরও বোধহয় আমার সঙ্গে গল্প জুড়বার ফন্দি খুঁজছিলেন—তাই সাহেবের প্রস্তাব শুনেই তিনি চট্টলার যুব-বিদ্রোহ সারা ভারতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশংসাবাণী আমাকে শুনিয়ে গল্প শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আই, বি'র দু'জন স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের এত প্রশংসা ও গল্প শোনার "পবিত্র" ইচ্ছেটিকে বিচার না করে পারলাম না—তোমরা বেড়াও ডালে ডালে আর আমি ঘুরি পাতায় পাতায় !

আমি ইংরেজীতেই তাঁদের উত্তর দিলাম—

"I quite appreciate your eagerness. But sorry, I am

not a story teller. I regret I cannot satisfy your appetite."

সাহেব অফিসারকে আমি এই বলে নিরস্ত করতে চাইলাম যে, আমি গোপাল ভাঁড় নই এবং তাঁদের সাধ মেটাতে আমি অক্ষম। কিন্তু ইংরেজ-সন্তান সদ্য বিলেত থেকে এসেছেন—তাঁর কত সাধ আরো কত বড় হবেন! আমার অনিচ্ছা জেনেও তিনি নিরস্ত হলেন না! নতুন ভঙ্গীতে কথাটা পাড়লেন—

"Mr. Singh, it appears that you are simply rigid only because you cherish a misconception about the Intelligence Branch persons. I am not asking in my official capacity to relate the story This is simply my curiosity. I shall be happy if I hear from you of the thrills of the action."

সাহেব বললেন—'আমি তোমার কাছ থেকে অফিসের পদমর্যাদার অধিকারে কোন কথা শুনতে চাইছি না। আমার ব্যক্তিগত ঔৎসুক্য মেটাতেই তোমাদের ঐসব লোমহর্ষক ঘটনাবলীর বর্ণনা শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছি।' সাহেবকে প্রশংসা করতে হয়—রাগ নেই, অসম্মানও গায়ে মাখেন না—স্বাধীন দেশের লোক তো, কাজেই বীরত্বকে সম্মান করেন। ঔৎসুক্যের সীমা নেই—ব্যক্তিগত ঔৎসুক্য মেটাবার জন্যই গল্প শোনা!

ভারতের বীর-পূজারী সদ্য আগত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সন্তানের গল্প শোনার আকুল আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য উপদেশ দিলাম—

"I see I can help you with one suggestion. It is better for you to go through the newspaper reports and to get the authentic version—why don't you contact the District heads, officers and men of Chittagong ? Moreover, to get direct and first hand knowledge of the action it is better for you to visit the District Town."

সাহেব! আমাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী জানার জন্য তোমার যখন এতই প্রবল বাসনা—তখন এক কাজ কর না কেন? তুমি সোজা চট্টগ্রামে চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে জেলা-শাসক ও স্থানীয় অফিসারদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ কর।

আমার এই উপদেশের অর্থ বুঝতে সাহেবের কোন কষ্ট হবার কথা নয়—তিনি বোকা নন; কিন্তু তবু সাহেব ধৈর্য হারালেন না বা একটুও উষ্মা প্রকাশ করলেন না। ধীর ও শান্তভাবে তিনি আবার বললেন—

"I was concerned at the moment to know and to hear from you."

আমি—"Quite so. But how can I help you? I am sorry that I am to disappoint you."

সাহেব তখনও জানালেন যে, আমার কাছ থেকেই তিনি শুনতে চাইছেন। আমিও উত্তরে বললাম—'তাহলে কি আর করা যায়—তোমাকে নিরাশ করা ছাড়া আমার উপায় নেই।'

এতক্ষণে সাহেব রণে ভঙ্গ দিলেন—বুঝলেন এই রাস্তায় আর এগোনো যাবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোন রাস্তা দিয়েই কি গন্তব্যস্থলে পৌছনো যাবে?—মনে হয় সেই সম্বন্ধেও সাহেবের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল—কারণ, শেষপর্যন্ত মনের আসল বাসনাটাই তিনি ব্যক্ত করে ফেললেন! The cat is out of the bag! (থলে থেকে বেড়ালছানা বেরিয়ে পড়লো—আর লুকিয়ে রাখা গেল না)।

সাহেব—"All right. Let us have the topic. Would you mind to tell us why have you come to surrender?"

আমি—"That is the material point. You wanted me and I am here. My physical presence was your concern. That is fulfilled. You must limit your desire to this much and no further."

সাহেব সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন—'আমি ধরা দিচ্ছি কেন?' জবাবে আমি বললাম—'তোমাদের কাজ আমাকে ধরা নিয়ে—আমি সশরীরে উপস্থিত—এতেই তোমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে—এর বেশি নয়!'

বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকে আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন—মনে হ'ল তাঁরা বেশ আমোদ উপভোগ করছেন। নলিনীবাবু ইতিমধ্যে টেলিফোন করছিলেন। তাঁকে বলতে শুনলাম—

"Sir, Mazumder speaking. Ananta Singh is here. He is sitting in my office. He has written letters to me and to you. Most probably he wants to make a statement. ....Oh yes. Yes sir. No, no, he is all right........Yess ir....".

নলিনীবাবু টেলিফোন রেখে দিয়ে আমাকে বললেন—"মিঃ লোম্যানকে খবর দিলাম—তিনি এক্ষুণি আসছেন।" আমি একটু মজা করার জন্য রায়-বাহাদুরকে বললাম—"সব credit-ই আপনার হ'ল; মিঃ লোম্যান তো আমাকে গ্রেফতার করার সুযোগ পেলেন না!" তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম—"আচ্ছা বলুন তো, আমি স্বয়ং এসে পড়েছি বলে আপনারা কি পুরস্কারের অংশটি পাবেন না?" নলিনীবাবু লজ্জা বা রাগে একটু লাল হলেন—সেই রক্তিমাটা চোখে ঠাওর করা মুস্কিল—তবে মুখের ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল আমার কথাটা তাঁর ভাল লাগে নি।

মিনিট দশ পরেই মনে হ'ল আই, জি, পুলিস সাহেব আসছেন। প্রহরীরা ইউনিফর্ম ঠিক-ঠাক করে নিল—বড় সাহেবকে সেলাম ঠোকার জন্য পজিশান নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। অন্যান্য অফিসারদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। নলিনীবাবু টেবিলের ফাইল ও কাগজপত্র ইত্যাদি সাজিয়ে রেখে বড় সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হলেন। সেন্ট্রির বুটের আওয়াজ ও রাইফেলের ওপর চাপড় শোনা গেল—মিঃ লোম্যান ঘরে প্রবেশ করলেন।

ঘরের মধ্যে আমি ও রায়বাহাদুর। লোম্যানসাহেব নলিনীবাবুর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেই একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে এসে বসলেন। তাঁর সঙ্গে আগে আমার পরিচয় ছিল না। লোম্যানসাহেব বিশেষ ভণিতা না করে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"I believe you are Ananta Singh!"

আমি চেয়ারে বসেই করমর্দনের উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে হাতটি বাড়িয়ে দিলাম। মিঃ লোম্যান করমর্দনের জন্য হয়ত প্রস্তুত ছিলেন না—তা'ছাড়া বিদ্বেষবশতঃ আমার প্রসারিত হস্ত যে তিনি উপেক্ষা করবেন না, তারও স্থিরতা কোথায়? কিন্তু কি জানি এমন একটি মেজাজে ছিলাম যে, অত সব না ভেবেই সাহেবের দিকে হাতটি বাড়িয়ে দিলাম। ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল একটুও ইতস্তত করলেন না—আমার হাতটি বেশ ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে দিলেন। করমর্দনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলাম—"Oh yes, you are right. I am Singh."

মিঃ লোম্যান তাঁর চেয়ারটি একটু টেনে নিয়ে আমার আরো কাছে এগিয়ে বসলেন। তারপর একটু সামনের দিকে ঝুঁকে নাটকীয় ভঙ্গীতে এক নিঃশ্বাসে বললেন—

"Ananta, you have killed so many men—your own countrymen. They are all innocent and peaceful persons! The poor sentry! He has left behind a few orphans! It

was not a very difficult task! I could have snatched away his gun without firing a single shot! No—no Ananta, you have'nt done right! You will have to repent for those killed. You wo'nt get any peace of mind unless you atone...."

ভাবাবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সাহেবের কত অনুযোগ—কেন আমি নিরীহ লোকদের হত্যা করলাম—কেন প্রহরীর হাত থেকে বন্দুকটি কেড়ে না নিয়ে, তাকে গুলী করলাম—আমি কখনও শান্তি পাবো না—আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাহেব অনর্গল তাঁর বাণী শুনিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত আমার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করলো—মনে হ'ল, সাহেবকে একটু জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন—তাই কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম—

"Mr. Lowman excuse me please. You are labouring under a mistaken idea. I am quite clear in my conscience. I committed no sin, and Ananta Singh has therefore no need for any atonement. Rather I would consider it as something done by me out of a patriotic urge. So long as the British are ruling over India with hired Indian troops and policemen our revolution will go on. So, though it was unfortunate the inevitable has happened and there had been loss of lives during the attack and the clash. The sole responsibility for the greatest sin lives not with the patriots but with the British rulers."

—ক্ষমা করবেন সাহেব—আপনার বড় ভুল হচ্ছে—আমার বিবেকের কাছে আমি নিষ্পাপ ও নির্দোষ—কাজেই অনন্ত সিংহের প্রায়শ্চিত্তের কথাই ওঠে না। আমি মনে করি—দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে আমি আমার বৈপ্লবিক কর্তব্য পালনই করেছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যতদিন ভাড়াটে ভারতীয় সৈন্য নিয়ে শাসনযন্ত্র চালু রাখতে চাইবে, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিপ্লবাত্মক আক্রমণও অপ্রতিহত গতিতেই চলবে। সেই কারণে, যদিও দুঃখের বিষয়, সংঘর্ষের সময় যা অনিবার্য তাই ঘটেছে—কিন্তু সেই দায়িত্ব একমাত্র বৃটিশ শাসকদেরই, স্বাধীনতাকামী স্বদেশপ্রেমিকের নয়।

আশ্চর্য! মিঃ লোম্যান নিঃশব্দে ও বিনা প্রতিবাদে আমার ঐ বক্তৃতা শুনলেন। তাঁর মুখের একটি রেখাও পরিবর্তিত হ'ল না। আমার সঙ্গে মিঃ লোম্যানের এই বিশেষ সাক্ষাতের কথা হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় আগে বিস্তারিত লিখেছি। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে ছুটকো ছুট্‌কো কথাও হয়েছে। আমার এইরূপ বক্তৃতার মুখে মিঃ লোম্যানের ওরকম শান্তভাব পোষণের বিশেষ কারণটি তখনও কিন্তু আমার মনেই আসে নি। আজ লিখতে বসে হঠাৎ আমার মনে সেই সাক্ষাতের চিত্রটি ভেসে উঠলো। আমার ঐরকম বিদ্রোহাত্মক উক্তির সামনে মিঃ লোম্যানের ঐ প্রকার শান্ত ও নির্বিকারভাবের অন্তরালে তাঁর যে বিশেষ চাতুর্য ছিল, সে দিকটা একবারও আমার চোখে পড়ে নি! তাই আজ লজ্জা পাচ্ছি, কেন তাঁর সেই চাতুর্য আমি তখন ধরতে পারি নি!

সাধারণতঃ কোন ইংরেজ অফিসার আমার ঐরূপ ঔদ্ধত্য সহ্য করতো না—বলে বসতো: "Stop you bastard, son of a bitch."—এই হ'ল তাদের স্বাভাবিক রীতি—আমরা ভুক্তভোগী। মিঃ লোম্যানও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না—এই বিশেষ ক্ষেত্রেই তিনি এই ব্যতিক্রম করেছেন। তিনি আমার সেন্টিমেণ্টে আঘাত দিয়ে চুপ করে শুনছিলেন ও আমার মনস্তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করছিলেন—কেন আমি ধরা দিলাম।

কি চমৎকার অভিনয় করে চলেছে সকলে! কোলসন্ সাহেব ভারতে বৃটিশ অবদানের সুখ্যাতির উল্লেখ করে বিপ্লবীদের কার্যকলাপকে অপরাধজনক বলে তীব্র নিন্দা করলেন; আবার নবাগত যুবক S.S.(I) নাটকীয়ভাবে বলে গেলেন যুব-বিদ্রোহে তাঁর যদি অংশগ্রহণের সুযোগ হ'ত—তবে তিনি আমার ভুমিকাটাই অভিনয় করতেন, ইত্যাদি—আর, মিঃ লোম্যান আমার জন্য কত ব্যথিত—আমি কতজনকে হত্যা করেছি—আমার কত পাপ! আমাকে অনুতপ্ত হতে হবে—প্রায়শ্চিত করতে হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি! তাঁদের প্রত্যেকের অভিনয় বিভিন্ন ধরনের—কিন্তু মূল উদ্দেশ্য একই। তাঁদের জানা প্রয়োজন—কি অভিপ্রায়ে আমি ধরা দিলাম। তাই কেউই ধৈর্য হারালেন না—বরং আমার ঔদ্ধত্য সহ্য করে গেলেন।

আমার কথায় মিঃ লোম্যান মুহূর্তে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন—তিনি আমার স্বাস্থ্য ও সুখ-দুঃখের ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পড়লেন—"Ananta, you look pale and much woried. Are you physically quite fit?"—অনন্ত তোমাকে বড় ফ্যাকাশে ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, শারীরিক সুস্থ আছ ত?

আমি—"I am not. For a pretty long time I have suffered from malignant type of Malaria. I am taking quinine tablets daily."—তাঁকে জানলাম—সত্যই আমি অসুস্থ, বহুদিন থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগছি—এখনও রোজই কুইনাইন খেতে হয়।

লোম্যান—"Do you have a high temperature now?" এখন কি তোমার বেশি জ্বর আছে?—এই বলেই আমার বাঁ হাতটি ধরে নাড়ী দেখতে লাগলেন।

এ বড় ভয়াবহ ব্যাপার! এতবড় একজন অফিসার! কতখানি সহৃদয় হলে আমার সঙ্গে অতখানি হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতে পারেন! শত শত বৎসরের দাসমনোভাবাপন্ন অভাজন একবার সাহেবের "কৃপার" স্বাদ যদি পায় তবে ইংরেজের অসীম দয়ার প্রভাব থেকে উদ্ধার পাওয়া তার পক্ষে সুকঠিন হয়ে পড়ে। পুলিসের খপ্পরে পড়ার পর কতদিক থেকে এবং কতভাবে যে তারা বিপ্লবীদের প্রভাবান্বিত করতে চেষ্টা করে তা বিশদভাবে আমাদের জানা ছিল। তাই মিঃ লোম্যান তাঁর মত অভিনয় করে চলেছেন আর আমিও বুঝে বুঝে পা ফেলেছি। তাঁকে বললাম—"No, not now, but I apprehend a rise in my temperature any moment." —না, এখন জ্বর বোধ হয় নেই—তবে যে কোন সময়েই আসতে পারে।

মিঃ লোম্যান তাঁর আন্তরিকতার ব্যাতিক্রম ঘটতে দিলেন না। অত কাঁচা লোক হলে কি তিনি পুলিস-প্রধানের পদে নিযুক্ত থাকেন? তিনি আমার ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য খুব "চিন্তিত" হলেন এবং একজন অফিসারকে তক্ষুণি নির্দেশ দিলেন যেন আমাকে কুইনাইন পিল এনে দেওয়া হয়। পুলিস অফিসারকে কুইনাইনের ব্যবস্থা করার কথা বলে আমার দিকে ঘুরে বসার সময় ছোট্ট একটি কুকুরকে ঘরে ঢুকতে দেখে মিঃ লোম্যান স্বগতোক্তি করলেন—"Oh the dog is here! The commissioner is coming."—এই যে কুকুরটি! আগেই কমিশনারের আগমনবার্তা দিয়ে গেল! পুলিস-কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টের সঙ্গে প্রায় সময়েই ছোট্ট একটি কুকুর থাকতো। তাই ঐ চেনা কুকুরটিকে দেখে মিঃ লোম্যান কমিশনারের আগমন প্রতীক্ষায় রইলেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই স্যার চার্লস টেগার্ট নলিনীবাবুর অফিসকক্ষে প্রবেশ করলেন। চোখে তাঁর রিম-লেস-ইউ-ক্লিপড চশমা! সামান্য একটু খুঁড়িয়ে হাঁটার ভঙ্গীতে ঘরে প্রবেশ করে ঈষৎ হাসি মুখে একটুখানি মাথা নেড়ে মিঃ লোম্যান ও রায়বাহাদুরের সঙ্গে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন সেরে নিলেন। তিনি ঘরে

বসলেন না এবং কারো সঙ্গে কোন কথাও বললেন না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক দেখতে দেখতে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে আমার সম্মুখ দিয়ে রায়বাহাদুরের চেয়ারের পেছন দিক দিয়ে ঘরটি অতিক্রম করে ডান দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তিনি যে ভাবে বা যে ভঙ্গীতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আমিও ঠিক সেই ভাবেই ও সেই দৃষ্টিতেই তাঁর আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখছিলাম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এই নির্বাক নাটিকাটি সমাপ্ত হ'ল। টেগার্ট সাহেব স্টেজ থেকে বিদায় নেওয়ার পর লোম্যান সাহেব তাঁর আরব্ধ কার্যে আবার মনোনবেশ করলেন। বাজিকর যেমন ঝোলা থেকে আশ্চর্য বস্তু সব বের করে দর্শকবৃন্দকে অবাক করে দেয়—ঠিক তেমনি মিঃ লোম্যানও হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন—"Ananta, do you like to meet your sister ?" —অনন্ত, তুমি তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করতে চাও? কথা নেই বার্তা নেই—হঠাৎ দিদির সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাবে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। ভেবে ঠিক করতে পারলাম না—সাহেব কি বলছেন! পরিষ্কার করে বোঝার জন্য প্রশ্ন করলাম—

"What do you mean by it ? Actually I don't follow you."

আমার প্রশ্নের উত্তরে মিঃ লোম্যান এইটুকু মাত্র বললেন—আমার দিদি তাঁর অতিথি। ঠিক বুঝতে পারলাম না—দিদি কি কলকাতায় এসেছে? কেন এলো? তাদের guest—এর অর্থ কি? দিদিকে কি তারা গ্রেফতার করেছে? এইরূপ নানান চিন্তায় আমার মন মুহূর্তে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। মিঃ লোম্যানকে দিদি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলাম না বা কোন ঔৎসুক্যও দেখালাম না। তিনিও আর কিছু বললেন না।

প্রায় পাঁচটার সময় মিঃ লোম্যান আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যাওয়ার সময় আবার দেখা করবেন বলে গেলেন। নলিনীবাবুকে কয়েকবারই বলে দিলেন—আমার থাকার সুব্যবস্থার যেন কোন ত্রুটি না হয়।

আরো প্রায় দু'তিন ঘণ্টা পর্যন্ত রায়বাহাদুরের অফিসঘর পুরোদমে কর্মচঞ্চল রইল। বড়সাহেবেরা আসা-যাওয়া করছেন, ছোট অফিসারেরা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে দেখতে আসছেন—যাতে পালাতে না পারি—প্রত্যেকটি দরজার বাইরে রাইফেল হাতে প্রহরী মোতায়েন—মাঝে মাঝে তাদের ডিউটির পরিবর্তন হচ্ছে।

বড়সাহেবেরা ও নলিনীবাবু ইতিমধ্যে সুনিশ্চিত বুঝে নিয়েছেন যে, আমি

তাঁদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে আসিনি—তবে, কেন ধরা দিলাম সেই রহস্যভেদ না করা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না।

প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে—কিন্তু সেই রহস্য উদ্ধার হয়নি। পুলিস মহল দীর্ঘ সময়ের জন্য প্ল্যান নিলেন—কি উদ্দেশ্যে আমি স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব বরণ করলাম—এটা যতক্ষণ পর্যন্ত না সঠিক জানা যাবে—তাঁরা ধৈর্যের সঙ্গে আমার পেছনে লেগে থাকবেন।

মিঃ লোম্যান চলে যাওরার পর নলিনীবাবু ও দু'একজন অফিসার যাঁরা ছিলেন, তাঁরা গল্প করছিলেন—"রথ দেখা আর হ'ল না! এখন ক'টা বাজল? কই কুইনাইন নিয়ে তো ফিরল না? কেমন আছেন? জর আসবে বলে মনে হচ্ছে কি? যখনই যা প্রয়োজন মনে করেন আমাদের বলবেন," ইত্যাদি। রায়বাহাদুর একবার আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"আমাদের রথ দেখাটা একেবারে মাটি করলেন! তা অবশ্য বেশ করেছেন—যাত্রার সুরুটা ভালই হ'ল।"

প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময়—ঘরে একটা মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেলাম এবং একটু চাঞ্চল্যও যেন অনুভব করলাম। কয়েকজন শসস্ত্র পুলিস ও সার্জেণ্ট ঘরে ঢুকলো। তারাই আমার ভার নিল। এবার তাদের সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। আমার হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বাঁধা হ'ল। আমি এখন একটু একা থাকার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। কাজেই আমাকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিতে আমার আপত্তির কারণ ছিলনা—আরো আগে যেতে পারলেই ভাল হ'ত। যাবার সময় নলিনীবাবু বোধহয় বলেছিলেন—"তবে আপনি আসুন—পরে দেখা হবে।" আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম মনে নেই।

আমি বন্দী হলেও এখনও আইনসঙ্গতভাবে আমাকে গ্রেফতার করা হয় নি। শসস্ত্র পুলিস বেষ্টিত হয়ে একটি পুলিস ভ্যানে উঠলাম। আরো দু'টি পুলিসের গাড়ি আমার ভ্যানের আগে ও পেছনে নিরাপত্তার ব্যবস্থানুযায়ী চললো। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল আমাকে লালবাজার লক্-আপে পাঠাচ্ছে। কিন্তু গাড়ি তিনটি পার্ক স্ট্রীট থানার সামনে থামলো। থানা-ইন-চার্জ এবং কাগজপত্র নিয়ে আর একজন পুলিস কর্মচারী আমার ভ্যানে উঠলেন ও আমাকে আইনমাফিক গ্রেফতার করলেন। বাংলার ইন্‌টেলিজেন্স পুলিস আমাকে "ধরেছে" মাত্র—গ্রেফতার করতে পারে নি। পার্ক ষ্ট্রীট পুলিস আমার গ্রেফতার কার্য সমাপ্ত করে আমাকে লালবাজার লক্-আপে পাঠালো।

লালবাজারে পৌছে মনে হ'ল, তারা আগেই আমার আসার খবর পেয়ে

গেছে। খুব কড়া পাহারার বন্দোবস্ত দেখলাম। পুলিসদের মধ্যেও কেউ যেন দেখতে না পায়, সেইভাবে পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সে সময় কাউকেই সেদিকে আসতে দেওয়া হচ্ছিল না। ১৯২৩ সালে, গোপীনাথের ফাঁসির কিছুদিন পরে, আমি বাঁধাঘাট-সালকে জেটিতে ধরা পড়ে লক্‌-আপে আসি। তাই লালবাজার লক্‌-আপ আমার কাছে নতুন নয়। তবে সেইদিন ও আজকের ব্যবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। লালবাজার লক্‌-আপের নিয়ম অনুযায়ী ইউরোপীয়ান সেলেও যদি কাউকে রাখে, তবু মাত্র একটা জাঙিয়া ও একটা কুর্তা এবং দুটো কম্বল ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে রাখতে দেয় না। সেলে আর কিছুই থাকে না—এমন কি জলপাত্র এবং জলও বাইরে পাহারারত সেপাইদের তত্ত্বাবধানে থাকে; প্রয়োজন হলে প্রহরী সাহায্য করে। এই হ'ল সেলের নিয়ম।

আজ কিন্তু এই সব কড়া ব্যবস্থার সম্পূর্ণ শৈথিল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। লক্‌-আপে নেবার সময় শরীর তল্লাসী করার নিয়ম আছে। কিন্তু আজ আমার শরীর অনুসন্ধান করলো না—এমন কি কাপড়-জামা পরিবর্তনেও বাধ্য করলো না—কম্বল দু'টি সম্বল করেও আমাকে সেলে ঢুকতে হ'ল না।

আমাকে ওপরে ইউরোপীয়ান সেলে নিয়ে গেল। ঘরগুলি খুব বড়—তবু সেল, কারণ, একেবারে নির্জন ও খালি। কিন্তু আজ সেলের সেই বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলাম না—মনে হল বড় লোকের বাড়ির গেস্ট-হাউস যেন! দিব্যি একটা খাট আছে—তিন-চারটে চেয়ার, একটা আর্মড-ইজিচেয়ার ঘরের শোভা বর্ধন করছে। এই ঘরে আমার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় একজন আই, বি, অফিসার আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন।

লালবাজারের এই ঘরে আমি তিনটি রাত ও দু'টি দিন অতিবাহিত করেছি। আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য সাত-আটজন অফিসার ক্রমান্বয়ে ডিউটি দিয়েছেন—তাঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করেছেন; কখনও বা বোকা সেজে নিরীহভাবে জানতে চেয়েছেন—কেন ধরা দিলাম? আবার অনেকে এই প্রশ্নের সঠিক জবাবের জন্য মিনতিও জানিয়েছেন। এই সব কথাবার্তার মাধ্যমে খুব চাতুর্যের সঙ্গে জেনে নিতে চেয়েছেন, আমি কলকাতা অথবা অন্য কোন্ জেলা থেকে আসছি, বন্ধুরা কেমন আছে—নিরাপত্তার জন্য শহর অপেক্ষা গ্রামে থাকাই শ্রেয়, ইত্যাদি বহু কথা। আমি কখনও উত্তর এড়িয়ে গেছি, কখনও বা তাদের বিদ্রূপ করেছি, আবার কখনও হয়ত আমার উত্তেজনাও প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের রাগ বা মান-অপমানের বালাই নেই—সব মুখ

বুজে সহ্য করেছেন। তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে—উদ্দেশ্য সাধন করতেই হবে—আমার মুখ থেকে বন্ধুদের ঠিকানা এবং আমার ধরা দেবার কারণ জানতেই হবে।

সারারাত ক্রমাগত তাঁরা একের পর একে আসা-যাওয়া করলেন। আমি ইজিচেয়ারটিতে অর্ধশায়িত অবস্থায় চুপ করে পড়ে রইলাম। ঘুম এলে তাঁরা বলছিলেন—"ও, ঘুম পেয়েছে? আচ্ছা ঘুমোন। আমরা বসে আছি।" আন্দামানে গিয়ে আরো সব বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পর জানলাম, আই, বি, পুলিস কথা বার করবার জন্য তাদের সর্বশেষ কৌশল বার করে—ঘুমোতে না দিয়ে কেবল কথা বলানো, যাতে বিরক্ত ও নিস্তেজ হয়ে পড়ার দরুণ হয়ত বা কিছু কথা মুখ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। আমি কিন্তু প্রথমে তাঁদের কৌশলটা বুঝি নি—ভেবেছি যুব-বিদ্রোহের রোমাঞ্চকর গল্প শোনবারই বিশেষ ইচ্ছে হয়েছে তাঁদের।

সেই রাত কাটলো। পরদিন সকালে দু'জন সাহেব অফিসার আমাকে দেখতে এসে খুব দাপটের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। তাঁরা কি বলেছিলেন বা আমি কি বলেছিলাম তা' এখন আর মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে যে, আমি তাঁদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে পারি নি।

সকাল আটটার সময় নলিনীবাবু এলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিঃ লোম্যানেরও দেখা পাওয়া গেল। তিনি আমার শারীরিক কুশলাদি—কুইনাইন খেয়েছি কি না, কেমন আছি, ইত্যাদি জানতে চাইলেন। মিনিট দশেক ছিলেন; তারপর বিদায় নেওয়ার সময় বললেন—"অনন্ত, তোমার দিদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।"

লোম্যান সাহেবের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম দিদি বারান্দার শেষ মাথায় সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। সত্যিই দিদি! ইন্দুমতী সিং! রহস্য বলে মনে হ'ল। সেই ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায় বাড়ির সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিলাম, দিদির সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবি নি। আজ দু'মাস দশদিন পরে লালবাজারের এই পুলিস দুর্গের একটি প্রকোষ্ঠে দিদির সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকার! দিদির সঙ্গে এই সাক্ষাৎ খুবই অপ্রত্যাশিত—কিন্তু এই সাক্ষাৎ আমাকে আগ্রহান্বিত করলো; ব্যাপার কি—দিদি কেন এলেন? দিদিকে সাক্ষাতের অনুমতিই বা দেওয়া হ'ল কেন? এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে আমি দিদির আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। দিদি দু'জন পুলিস প্রহরায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে লম্বা বারান্দা পার হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

ফাঁসিতে মরবার কৌতুকাভিনয়ে মাত্র গতকালই আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছি —দিদিও গতকালই বা কলকাতায় এলেন কেন? আবার এলেনই যদি, তবে এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে পুলিস শিবিরে কেন? দিদির সঙ্গে এই সাক্ষাৎ আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত করলো! এও কি সম্ভব? দিদি—যাঁর সঙ্গে আর কোনদিনই দেখা হবে না বলে জানতাম, তাঁর সঙ্গেই এখন কথা বলবো! এ কি আনন্দের উচ্ছ্বাস নাকি অন্ধকারের বন্যা; সৃষ্টির সঙ্গীত না প্রলয়ের হুঙ্কার; জীবনের অমৃতধারা নাকি মৃত্যুর করাল ছায়া—আবেগে ভাবপ্রবণ মন ক্ষণিকের জন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠলো! তেজোদৃপ্ত পদক্ষেপে ইন্দুমতী সিং আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর জন্য একটা আসন আমার সামনেই রাখা ছিল। দিদি আসন গ্রহণের পূর্বেই ঘর ভরা পুলিসের সামনে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলতে লাগলেন—

"তুই ধরা দিলি? অনন্ত সিংহ যুদ্ধে প্রাণ না দিয়ে স্বেচ্ছায় বন্দী হ'ল? আশ্চর্য? ইংরেজ মেরে মরলি না কেন? চৌরঙ্গীর রাস্তায় অনন্ত সিংহের মৃতদেহ না দেখে তাকে এখানে জীবন্ত দেখব বলে আশা করি নি!"

ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে দিদি আমাকে এইভাবে তিরস্কার করেছিলেন। তাঁর অন্তরের তীব্র জ্বালা অনুভব করে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না! পুলিসের সামনে এইভাবে ইংরেজ-বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করা এবং ইংরেজ হত্যার সমর্থনে আমাকে অতগুলি কথা বলার মধ্যে দিদির হৃদয়ের গভীর বৈপ্লবিক প্রেরণা উপলব্ধি করে আমার অন্তর গর্বে ভরে উঠলো। শান্ত দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলাম।

আমাকে একেবারে শান্ত ও চুপচাপ দেখে একটু পরেই দিদির হয়ত মনে হয়েছিল, সব না জেনে তিরস্কার করা ঠিক হচ্ছে না। কারণ, প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই দিদির ক্ষুব্ধ মনের যে অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, কিছুক্ষণ পরেই তা' শান্ত, সংযত ও সহানুভূতিপূর্ণ হয়ে পড়লো।

একটু থেমে দিদি প্রশ্ন করলেন—"তুই ধরা দিলি কেন? ধরা দেবার কোন অনিবার্য কারণ আছে কি?" কিছু না ভেবেচিন্তে প্রশ্ন দু'টি করেই দিদি বুঝলেন তাঁর ভুল হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর যে আমি দেবো না বা দিতে পারি না, তা' উপলব্ধি করেই তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন।

এবারে আমরা পরস্পর ব্যক্তিগত ভালোমন্দ ও সুখ-দুঃখের কথাই আলোচনা করলাম। আমি ম্যালেরিয়ায় ভুগছি জানালাম। দিদির কাছেই শুনলাম—বাবা-মা, দাদা-বৌদি ও দিদি যুব-বিদ্রোহের রাত্রে চট্টগ্রাম ছেড়ে

বরিশাল গিয়েছিলেন ; কিন্তু বাবা ও দাদাকে তিন-চারদিনের মধ্যেই গ্রেফতার করে বরিশাল থেকে এনে চট্টগ্রাম জেল-হাজতে রাখা হয়। মাত্র তিন-চারদিন আগে বাবাকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে। দাদা (নন্দলাল সিং) এখনও হাজতেই আছেন। দিদি আরও জানালেন—গতকাল তিনি শেয়ালদহ স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস তাঁর জিনিসপত্র সব তল্লাসী করে এবং অনেক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তাঁর কলকাতার বাসার ঠিকানাও জেনে নেয়। তারপর সকালে মিঃ লোম্যানের নির্দেশেই দু'জন পুলিশ অফিসার দিদিকে লালবাজারে নিয়ে এসেছে। এখানে পৌছবার আগেই খবরের কাগজে আমার ধরা দেবার বিষয় দিদি জেনেছেন।

আমার সেলে দিদি প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট ছিলেন। যাবার আগে আমাকে বলে গেলেন বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে মামলা পরিচালনার বিষয় আলোচনা করে আমাদের সকলের মামলার সুব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্যেই তিনি কলকাতায় এসেছেন। চলে যাবার উদ্দেশ্যে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"আমার সাধ্যমত চেষ্টা করবো যেন মামলা চালাতে কোন ত্রুটি না হয়। তবু—তবু কি তোদের বাঁচানো যাবে ?" জীবনের অনিশ্চয়তা ভেবেই হয়ত একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে দিদি বললেন—"অনন্ত, এবার তবে আসি !" আমিও বললাম—"এসো। বাবা-মাকে আমার প্রণাম দিও।" দিদি চলে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য ঘরটি একেবারে নিস্তব্ধ।

দিদি যে সেইদিনই কলকাতায় এসে পৌছবেন তা' পুলিসের জানা ছিল। চট্টগ্রাম থেকে আসতে চব্বিশঘণ্টা সময় লাগতো। দিদি চট্টগ্রাম থেকে রওনা হতেই কলকাতার পুলিস খবর পেয়েছ এবং স্বভাবতই ভেবেছে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যেই দিদির এই আগমন। কাজেই দিদিকে অনুসরণ করে আমাদের কাউকে যদি ধরতে পারে সেই সুযোগ নেবে স্থির করেছে ; কিন্তু তাদের সব হিসেব-নিকেশ তছ্‌নছ্‌ করে সেইদিন দুপুরেই আমি স্বয়ং ধরা দেওয়াতে পুলিস একেবারে হতভম্ব !

দিদি যেদিন এলেন আমিও সেইদিনই কেন ধরা দিলাম—এই ধাঁধার সমাধানে পুলিসমহল ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যেই যে মিঃ লোম্যান আমার সঙ্গে দিদির সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই—যদি আমাদের পরস্পরের কথাবার্তার মাধ্যমে 'আমার ধরা দেওয়ার উদ্দেশ্য' ও 'দিদির কলকাতা আগমনের কারণ' সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পান !

এই সাক্ষাৎকারপর্ব শেষ হলে যে পুলিস অফিসার তখন ডিউটিতে ছিলেন—অর্থাৎ, সারাক্ষণ আমাকে কথা বলাবার জন্য যিনি ব্যস্ত ছিলেন, তিনি বললেন—"বড়সাহেব আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে। আপনি ইচ্ছে করলেই এখন সবকিছু করতে পারেন।" বড়সাহেব অর্থে তিনি ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল মিঃ লোম্যানের কথা বোঝাচ্ছিলেন। আমি তাঁর এই প্রস্তাবের অর্থ অবশ্যই বুঝেছিলাম; তবু অফিসার মহাশয়কে একটু খেলাবার জন্য প্রশ্ন করলাম—"বড়সাহেব সব করতে পারেন?" অফিসার উৎসাহভরে বললেন—"নিশ্চয়ই। ওঁরা না পারেন এমন কিছুই নেই।"

আমি—"আপনাদের বড় সাহেব ভারতের স্বাধীনতা দিতে পারেন?" অফিসারের উত্তরের অপেক্ষা না রেখে আমি নিজেই উত্তর দিলাম—"না, স্বাধীনতা কেউ দেয় না বা দিতে পারে না—স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়।" অফিসারটি ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু কিছুতেই দমলেন না। তারপরও নানাভাবে কথার ফাঁকে ফাঁকে বলে গেলেন—"বড় সাহেব আপনার হাতে—ইচ্ছে করলেই আপনি সব সুযোগ সুবিধে নিতে পারেন।"

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি পুলিস-হাজতে আটক রাখার নিয়ম নেই। সেই কারণে প্রায় দশটার সময় একদল সশস্ত্র কনস্টেবল আমাকে চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের বাড়িতে নিয়ে গেল—আদালত ভবনে যাওয়া সমীচীন মনে করলো না। মিঃ রক্সবার্গ তাঁর গাড়ি-বারান্দায় আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন—আদেশনামা সই করে দিলেন। আবার আমাকে লালবাজারে ফিরিয়ে আনা হ'ল। নির্দেশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ আমাকে কতদিন কোথায় রাখা হবে সে সম্বন্ধে, আমার কোনই ধারণা ছিল না।

লালবাজারে এসে দেখি আই, বি, অফিসার ডিউটিতে ঠিক হাজির আছেন। আমার পরম আত্মীয় ও হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে তিনিই আমাকে স্বাগত জানালেন। খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধেই ছিল না। সময় মত বারে বারে প্রচুর খাওয়া। যে অফিসার যখনই ডিউটি দিতেন তিনিই পরমাত্মীয়ের মত আমার সঙ্গে লাঞ্চ বা ডিনার খেয়েছেন—বিন্দুমাত্র আপত্তি কেউ করেন নি।

এইসব অফিসারেরা অসাধারণ ধৈর্যের সঙ্গে এত দীর্ঘ সময় ধরে কত কথা যে বলেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। পুলিসী কৌশলের এই নতুন পদ্ধতিটি বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার যে, কোনরূপ বিশ্রাম না দিয়ে

খুব ভদ্রভাবে পুলিস অফিসারেরা একের পর এক কথা বলাবার ডিউটি দিয়ে যান। তাঁদের উদ্দেশ্য—কথা বলে ও বলিয়ে বিপ্লবীদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি ক্ষুণ্ণ করা এবং কোন দুর্বল মুহূর্তে তাদের কাউকে দেশদ্রোহিতার জন্য জয় করে নেওয়া। এই মূল উদ্দেশ্যে ধীর স্থির ও অবিচল থেকে অফিসারেরা যেরূপ চাতুর্যপূর্ণ কথা এবং বিনয়ী ও নম্রভাব বজায় রেখেছিলেন, মাঝে মাঝে যে গভীর সমবেদনা ও স্বদেশপ্রেমের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন এবং তীব্র সমালোচনা ও কঠোর তিরস্কারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেও যেভাবে তাঁরা ডিউটি দিয়েছেন, আমাকে তার প্রশংসা করতেই হবে। তাঁরা একটার পর একটা বিচিত্র suggestion দিয়ে দেখেছেন যদি কোনটা কিছুমাত্রও আলোকপাত করতে পারে। দিদিকে হঠাৎ উপস্থিত করে তাঁরা কিছুটা বুঝবার চেষ্টা করেছেন। তারপর বড়সাহেব আমার প্রতি অনুরক্ত এবং ইচ্ছে করলেই সুযোগ নিতে পারি—ইত্যাদি বলেও আমাকে বাজিয়ে দেখেছেন। এক কথায়—প্রত্যেক অফিসারই তাঁর নিজস্ব বিশেষ ধরনের ঘুড়ি উড়িয়ে বাতাসের গতি ও দিক নির্ণয় করতে চেষ্টা করছেন।

একজন অফিসার আমকে বললেন—"দেখুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার ধরা দেবার পেছনে একটা সুচিন্তিত প্ল্যান আছে। খবরটি শোনা মাত্রই আমার মনে হ'ল—(১) আই, বি, অফিস আক্রান্ত হবে, আর না হয় (২) আপনিই মিঃ লোম্যান, স্যার চার্লস্ টেগার্ট প্রমুখকে হত্যা করার কোন অভিনব কৌশল নিয়ে এসেছেন। আবার ভাবলাম (৩) আপনার ধরা দেওয়া কি ফোর্ট উইলিয়াম ও কলকাতা শহর আক্রমণের ব্যাপক প্ল্যানের পূর্বাভাস? যত সময় যাচ্ছে তা'তে মনে হয় এই জাতীয় বৈপ্লবিক প্ল্যান না থাকলেও আপনার আরও কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা আছে। কোন ব্যক্তিগত কারণে আপনি ধরা দিচ্ছেন—এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি অবশ্য আশা করি না যে, সেইরূপ পরিকল্পনার কথা ঘুণাক্ষরেও আপনি আগে থেকে কাউকে জানতে দেবেন। আমার এইসব ধারণা যদি ভবিষ্যতে ঠিক হয় তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশি হব।"

ভদ্রলোক আমার চোখ মুখের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অতি সুকৌশলে কথাগুলি বলছিলেন—যদি আমার মুখাবয়বের কোন বিশেষ পরিবর্তন তাঁর গবেষণাকে সাহায্য করে। জানি না তিনি তাঁর চাতুর্যে কতখানি সফল হয়েছিলেন বা কি রিপোর্ট দিয়ে ওপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। আজ যতটুকু মনে পড়ে তাঁর ওই সমস্ত উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত বিভিন্ন suggestion

শুনে আমি মুচকি হেসেছিলাম আর মন্তব্য করেছিলাম—"আপনার সুদূর-প্রসারী চিন্তা-ক্ষমতা আপনার উন্নতিসোপান নির্মাণকার্য ত্বরান্বিত করবে সন্দেহ নেই।"

আর একজন অফিসারের কথা মনে আছে। তিনি বলেছিলেন—"ইংরেজ আদালতে ইংরেজের আইনে আপনার বিচার হবে। আপনার ফাঁসি অবধারিত—এ কথা আপনি জানেন। সব জেনে শুনে ধরা দিলেন কেন? আমার মনে হয় দলের অন্যান্যদের সঙ্গে আপনার ঘোরতর মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আপনি হয়ত দ্রুত আক্রমণাত্মক কর্মসূচী গ্রহণের পক্ষপাতী, আর অন্যেরা সম্ভবতঃ তা'তে রাজী নন। তাই বোধহয় ধরা দিলেন। আপনি জেলে ফাঁসির অপেক্ষায় থাকবেন আপনার অন্যান্য যুব-সাথীরা তা সহ্য করবে না—তারা জেল ভেঙে আপনাকে উদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। আমার মনে হয় জেল আক্রমণের প্ল্যানটিই আপনার মাথায় আছে—নইলে ধরা দিয়ে জেলে যাবার পথটি আপনি নিতেন না।······আপনি অবশ্য কোন কথা স্বীকার করবেন না, কিন্তু আপনাকে বিশ্লেষণ করে দেখলে এইরূপ সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়······।"

এইসব উদ্দেশ্যমূলক কথাবার্তা বলবার সময় পুলিস অফিসারেরা আমার উত্তর শোনার চাইতে আমার মুখাকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করাই বেশি প্রয়োজন মনে করতেন। আমিও তাঁদের পূর্ণ সুযোগ দিতাম—কখনও মুখ ঢেকে বসতাম না। তাঁরাই বলতে পারবেন কতখানি সফল হয়েছিলেন—এই বিষয়ে আমার মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন; তবে সেই মহাশয়ের অতখানি বিশ্লেষণ শোনার পর তাঁকে বলেছিলাম—"আপনার বিশ্লেষণী শক্তির প্রশংসা করতে হয়। আমার নিজস্ব কর্মসূচী থাকুক বা নাই থাকুক, আপনার মূল্যবান suggestion-গুলি বিপ্লবীদের কর্মপন্থা স্থির করতে যে যথেষ্ট সাহায্য করবে, তা' কিন্তু সুনিশ্চিত-ভাবেই বলা যায়।"

অপর একজন অফিসার খুব বিনীত অনুরোধ জনালেন আমার হাতখানা তাঁকে একটু দেখতে দিতে—তিনি আমার হাত গুণবেন। পুলিস অফিসারের এই প্রস্তাবে আমার বেশ একটু কৌতূহল হ'ল। খুব অল্প বয়স থেকেই মন্ত্র-তন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, হাতগোণা, কুষ্ঠি দেখা ইত্যাদির উপর আমার আস্থা ছিল না। বাবাকেও দেখছি—তিনিও এইসব কখনই বিশ্বাস করতেন না। তাই ছেলেবেলা থেকেই তাঁর প্রভাব আমার চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আমায় বদ্ধ ধারণা এই ধরনের গণনা বিদ্যা বা শাস্ত্র বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকৃতি লাভ করে নি। তা'ছাড়া গুণেই যদি সব বলে দেওয়া যায় তবে ব্যবসাদারেরা তাদের ব্যবসা আগেভাগেই সামলে নিত;

বড়লোকেরা ভবিষ্যতের বিপদাপদ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পেয়ে আগে থেকেই নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করতে পারতো ; আর সরকারের আই, বি, বিভাগ তু'লে দিয়ে গণৎকারের অফিস সাজিয়ে বসলেই হ'ত—কারো কাছ থেকে আর সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজন থাকতো না। তা' ছাড়া এতজন পুলিস অফিসার এত সময় নষ্ট না করে আমাকে ধরে-বেঁধে বা অজ্ঞান করে আমার হাতের রেখা দেখলেই তো সব জেনে ফেলতে পারতো! কাজেই মহাশয়ের হাত দেখার বায়না কেন?—কৌতুহল বোধ করলাম। আমি সানন্দে হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম—"নিশ্চয়ই দেখবেন বৈ কি? নিন দেখুন!"

খুব নিবিষ্টমনে অফিসারটি আমার হাত দেখতে লাগলেন। তারপর আবার বিনীত প্রার্থনা জানালেন—"দেখুন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন এবং আপনার হাতে যা লেখা আছে তা খুব অপ্রিয় হলেও আমাকে খুলে বলতে যদি অভয় দেন, তবে আমার ইচ্ছে আপনাকে তা বলি।"

ভদ্রলোক কি বলতে চাইছেন তা শোনার কৌতুহল আমি সংবরণ করতে পারলাম না—সঙ্গে সঙ্গে বললাম—"বিলক্ষণ, আপনি নিশ্চয়ই সব খুলে বলবেন বৈ কি! হাতের রেখায় যদি অপ্রীতিকর কিছু থাকে তবে আপনি কি করতে পারেন? নির্ভয়ে সব বলুন—আমি কিছুই মনে করবো না।"

এই পুলিস অফিসারের নামটি বোধ হয় উপেন—পদবী ভুলে গেছি। আমার অনুমতি পেয়ে তিনি ঠিকঠাক হয়ে বসলেন। কেশে গলাটা পরিষ্কার করে আমার হস্তরেখার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন—"দেখুন, আপনাকে আমরা যেভাবে জানি ও আপনাকে দেখে সাধারণতঃ যা মনে হয়, হাতের রেখায় কিন্তু তার কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। আপনার Heart Line থেকে পাচ্ছি, আপনার 'ভালোবাসা' বা 'বন্ধুত্ব' inconsistent, incoherent, irrelevent, deceptive and treacherous!" ওই ক'টি কথা তিনি ইংরেজীতেই বলেছিলেন, যার অর্থ—আমার "ভালোবাসা" বা "বন্ধুত্ব" অসংলগ্ন, সামঞ্জস্যহীন, সঙ্গতিহীন, প্রবঞ্চনামূলক ও অসততাপূর্ণ। এই কথাগুলি বলে তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন কিছু শুনবেন বলে। আমি বলাম—"দেখুন, আপনার এত 'কিন্তু' ভাব কেন? হাতের রেখায় যা আছে তাতো আর খণ্ডাবার নয়—ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলে মেনে নিতেই হবে।"

উপেনবাবু যেন খুব সুবিধে করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করলেন—"দেখুন ভাই, আপনি যদি কিছু মনে না করেন বলি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার ধরা দেবার পেছনে মেয়ে সংক্রান্ত কোন ব্যাপার

আছে। বলুন ঠিক বলেছি কিনা?" উপেনবাবুকে হতাশ করার উৎসাহ বোধ করলাম না। বললাম—"হাতে গুণে যা পেয়েছেন তার স্বীকৃতি পান আর নাই পান, তা বলে তো গণনাশাস্ত্র ভুল হতে পারে না।...উপেনবাবু, কিছু যদি মনে না করেন তবে বলি—আপনি পুলিসে চাকরী না করে গণৎকারী ব্যবসা করছেন না কেন...?" উপেনবাবু কিন্তু আমার মন্তব্য শুনে বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হলেন না। তিনি তখনও নিবিষ্টমনে আমার হাতখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন—"আপনি আমার কথার মূল্য দেন আর নাই দেন, একটি ভবিষ্যদ্বাণী আমি করছি—আপনার হাতের রেখায় আমি দীর্ঘায়ু দেখতে পাচ্ছি। ফাঁসিতে আপনার মৃত্যু কখনই হতে পারে না—আমার এই কথাটি মনে রাখবেন। আপনার ফাঁসি না হলে অন্তত সেইদিন মনে করবেন—'উপেন বলেছিল ফাঁসি হবে না'।"

এইরূপ নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে লালবাজার পর্ব শেষ হয়ে এলো। রাত্রে আমি ইজি-চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়লেও অফিসারেরা পাশে বসে থাকতেন এবং ঘরের বাইরে বন্দুকধারী সেপাইরা পাহারায় মোতায়েন থাকতো। মাঝে মাঝে ঘুমে দু' চোখ জড়িয়ে এসেছে, তবু পাশের অফিসারেরা জাগিয়ে রাখবার জন্য কথা পেড়েছেন,—"হ্যাঁ তারপর কি হ'ল?"—"ষ্টীমার থেকে তারা wireless-এ ফোর্ট উইলিয়ামে সংবাদ পাঠায়।"—"ও, সাহেবেরা বুঝি সব ষ্টীমারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল?"—"সিপাহী বিদ্রোহের পর এত বড় ঘটনা আর হয়নি।"

এই সবের মধ্যে রাত্রে কোন এক সময়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙতেই দেখি রোদ উঠেছে—ভোর ছ'টা হবে। আমার পাশে কেউ নেই। ঘরের লোহার দরজা বন্ধ—সেপাই দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে। এই নতুন ব্যবস্থা কেন? তারা বোধ হয় শেষপর্যন্ত 'রণে' পরাস্ত হয়ে কোন নতুন কৌশলে আমাকে আক্রমণ করবে!

অল্প সময় অতিবাহিত হতেই হঠাৎ অনেকগুলি বুটের আওয়াজ শোনা গেল। সামনের লম্বা বারান্দা দিয়ে আমার সেলের দিকে একদল সেপাই মার্চ করে আসছে মনে হ'ল। এক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখলাম দু'জন ইংরেজ অফিসার মিলিটারী পোশাকে দশ-বারোজন সশস্ত্র সৈন্য সমেত আসছেন। সেলের দরজা খুলে তাঁরা আমাকে তাঁদের সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। কোথায় যেতে হবে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, তবে ভাবে বুঝলাম আমাকে চট্টগ্রাম পাঠানো হচ্ছে।

পুলিসের গাড়ি। মাঝের গাড়িতে আমি, আর দুটো গাড়ি আগে-পিছে আমার গাড়িটাকে পাহারা দিয়ে চলেছে। শেয়ালদহ স্টেশনে ইঞ্জিনের পাশে প্ল্যাটফর্মে ছোট একটি দরজার কাছে আমাকে নিয়ে পুলিসবেষ্টিত গাড়ি তিনটি থামলো। আগে থেকে এই স্থানটুকু পুলিস দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল—কোন লোককে সেদিকে আসতে দিচ্ছিল না। ইঞ্জিনের ঠিক পেছনে একটি প্রথম শ্রেণীর বগি জোড়া ছিল। আমাকে এই কম্পার্টমেণ্টে তোলা হ'ল। জনা পাঁচ-ছয় সেপাই ও দু'জন ইংরেজ অফিসার আমার কম্পার্টমেণ্টে উঠল বাকি সেপাইরা আগে-পিছে অপর দুটি কামরা দখল করে বসলো। এক মিনিটের মধ্যেই এই Chittagong Mail-টি ছেড়ে দিল।

দুপুরে গোয়ালন্দ স্টেশনে পৌছে দেখলাম সেখানকার ডি, এস, পি, প্রায় চব্বিশ-পঁচিশজন বন্দুকধারী কনস্টেবল নিয়ে স্টেশনে উপস্থিত। তাঁর নির্দেশ মত বিশেষ নির্ধারিত পথে আমাকে গোয়ালন্দ-চাঁদপুর স্টীমারের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় নেওয়া হ'ল। স্টীমারের এইদিকের জায়গা সেপাই দিয়ে ঘিরে আলাদা করে রেখেছিল। ডি, এস, পি, মহাশয় এই ব্যবস্থাটুকু করে আমার সঙ্গের ইংরেজ অফিসারের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

স্টীমারে স্নান-খাওয়ার কোন ত্রুটি হ'ল না। সন্ধ্যের সময় চাঁদপুরে এসে পৌছলাম। এডিশনাল পুলিস-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বি, জে, স্টার, ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্-এর বত্রিশজন সৈন্য ও তাদের কমাণ্ডারের সঙ্গে এসেছেন কলকাতার পুলিস পার্টির সঙ্গে যোগ দিতে। চাঁদপুর থেকে মিঃ স্টারকে সৈন্য ও পুলিস দলের সর্বময় কর্তা হিসেবে ভার দেওয়া হয়েছে মনে হ'ল।

স্টীমার থেকে সব যাত্রীরা নেমে গেল, তবু আমাকে নামানোর কোন লক্ষণ নেই। আরো কিছুক্ষণ পরে, মিঃ স্টারের নির্দেশ মত, যেদিকে চট্টগ্রাম যাত্রীবাহী ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে না গিয়ে ডেকের উপরে বিপরীত মুখে আমাকে নিয়ে চললো। এই স্টীমারের গা ঘেঁষে একটা লঞ্চ বাঁধা ছিল। সদলবলে আমি এই লঞ্চে উঠলাম। আমাদের নিয়ে পদ্মার ওপর যখন লঞ্চটি চলতে সুরু করলো তখন আমার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত—এ কি! লঞ্চে মন্থর-গতিতে ঘুরে ঘুরে নদীপথে চট্টগ্রাম যেতে হবে? চাঁদপুর থেকে ট্রেনে চট্টগ্রাম যাবার ব্যবস্থাই সকলের জানা—এই নদীপথে যাচ্ছি কোথায়? খুবই চিন্তিত হলাম কিন্তু কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। লঞ্চের ভেতর বসে আছি—কাজেই বাইরেটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট পরে মনে হ'ল লঞ্চের গতি মন্থর হয়ে এসেছে—কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে থেমে গেল।

একটু পরেই বুঝতে পারলাম মাঝ দরিয়ায় একটা ফ্ল্যাট নোঙর করা আছে, সেটাতেই লঞ্চটা এসে ভিড়েছে।

মস্ত একটা ছাউনী দিয়ে ঢাকা ভাসমান ফ্ল্যাট। এই ফ্ল্যাটটি আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা ছিল। আমাকে সারারাত এখানেই থাকতে হ'ল। বিছানাপত্র কিছু ছিল না—খুব মশা। কাঠের মেঝেতে এমনিই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেপাইরা পালা করে ডিউটি দিয়েছে; কিন্তু স্টার সাহেব এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমোন নি—সারারাত ঘুরে ঘুরে তদারক করছেন। যখনই ঘুম ভেঙেছে দেখেছি মিঃ স্টার বড় একটা টর্চ ফেলে ফেলে নদীর চারিদিক দেখেছেন ও সেপাইদের তদারক করছেন।

সকাল প্রায় সাতটার সময় আবার লঞ্চটা এলো—দেখে মনে হ'ল পুলিসের লঞ্চ। সেই লঞ্চে করে আমরা রেল-লাইনের ধারে নদীর তীরে উপস্থিত হলাম। সেখানে একটা ছোট সাঁকো ছিল। সেই সাঁকোর সাহায্যে তীরে নামলাম। দেখলাম অল্প দূরেই একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিনের ঠিক পেছনে একটি সেলুন ও দুই দিকে দু'টি কম্পার্টমেণ্ট। প্রায় আটটার সময় এই স্পেশাল ট্রেনটি আমাদের নিয়ে রওনা হ'ল। যতদূর মনে পড়ে দুপুর প্রায় দুটোর সময় আমরা পাহাড়তলী জংশনে পৌছলাম। এইটি চট্টগ্রাম মেইন স্টেশনের ঠিক আগের স্টেশন। পাহাড়তলী স্টেশনে আমাকে নামানো হ'ল। মিঃ জনসন, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস, কর্নেল ডালাস্ স্মিথ্, ডি, আই, জি, মিঃ ফারমার ও সঙ্গে আরো প্রায় আট-দশজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। মিঃ জনসন দু'টি ট্রাক বোঝাই সেপাই সঙ্গে এনেছিলেন। তিনি তাঁর গাড়িতে পথ দেখিয়ে আগে আগে অনেক ঘোরা পথে আমাকে নিয়ে সদলবলে চট্টগ্রাম জেলে উপস্থিত হলেন। জেলে হাজির ছিলেন জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট শ্রীজ্ঞান চ্যাটার্জী ও জেলাশাসক মিঃ উইলকিন্‌সন। জ্ঞানবাবু চট্টগ্রাম সরকারী সদর হাসপাতালের প্রধান সিভিল সার্জেন। তিনি আমাদের গৃহ-চিকিৎসক—আবার জেলেরও সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। তাই তাঁর সঙ্গে আমার ও আমাদের বাড়ির ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল। মিঃ উইলকিন্‌সন এবার সামনে এলেন। আমার সঙ্গে কোন কথা বললেন না—আমাকে জেল-হাজতে রাখার আদেশ দিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলার উৎসাহ দেখালাম না। জেলা-শাসক চলে গেলেন। কলকাতা থেকে ভারপ্রাপ্ত হয়ে যে ইংরেজ অফিসারটি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন তিনি, মিঃ লোম্যান ও খবরের কাগজের সম্পাদকদের কাছে আমার লেখা চিঠিগুলি জেল অফিসে জমা দিলেন। জ্ঞানবাবু চিঠিগুলি আমার সামনে

এনে জিজ্ঞাসা করলেন—"এগুলি কার হাতের লেখা?" আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম—"আমার।" তারপর তিনি বললেন—"তুই নাকি মিঃ স্থটারের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্—না খেয়ে আছিস্? আমার জেলে তোর না খেয়ে থাকা চলবে না। তুই এখন convict.—তোর চার মাসের সাজা হাইকোর্ট বহাল রেখেছে। কাজেই তুই আমার direct তত্ত্বাবধানে থাকবি। আজই জেলবন্দীদের classification ব্যবস্থার সার্কুলার পেয়েছি, ম্যাজিস্ট্রেট তোকে Div. II শ্রেণীভুক্ত করবার আদেশ দিয়েছেন। তোর সেলে সব ব্যবস্থা আছে। স্নান করে নে—খাবি কিন্তু…।"

জেল-স্থপার চ্যাটার্জী জেল-কর্মচারী সমভিব্যাবহারে আমাকে জেল-প্রাচীরের অভ্যন্তরে সেলের দিকে নিয়ে চললেন। পনেরো-বিশ কদম যেতে-না-যেতেই হঠাৎ জেলখানা প্রকম্পিত করে বিপ্লবী ধ্বনি উঠলো—"বন্দেমাতরম্", "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্", "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্", ইত্যাদি। আমাদের সাথীদের আগেই জেল-হাজতে রেখেছে। তারা ইতিমধ্যে আমার জেল-আগমনবার্তা সংগ্রহ করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল—কখন আমাকে সেলে নিয়ে যাওয়া হবে। জেলে এইসব সামান্য খবর দণ্ডিত আসামী ও সেপাইদের মারফত অতি সহজেই পাওয়া যায়। আমাদের প্রায় ত্রিশজন সাথী তখন জেল-হাজতে ছিল। জেলে ঐরূপ স্লোগান দেওয়া আইন-শৃঙ্খলা বহির্ভূত। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ জেল-কর্তৃপক্ষ খুব কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। জেল-স্থপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সচরাচর গর্জন করতে থাকেন—"This is amounting to a jail mutiny! Stop it immediately...." ডাঃ চ্যাটার্জী কিন্তু কঠোর নীতি গ্রহণ করতে পারছিলেন না। নিজের কর্তব্য নির্ধারণে তাঁকে বেশ চিন্তিত বলেই মনে হ'ল। তিনি খুব দ্রুত আমাকে সেলে বন্ধ করে জেল-কর্মচারী ও সেপাইদের নিয়ে হাজত-ঘরের কম্পাউণ্ডে ঢুকলেন এবং আমাদের সাথীদের কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন—কেন তারা জেল নিয়ম ভেঙেছে? কেন তারা ঐরূপ স্লোগান দিল? মামলার সময় সরকারপক্ষ এই স্লোগান দেওয়াটাকে আমাদের পরস্পরের সহযোগিতা প্রমাণের কাজে লাগালো। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট মামলার রায়ে লিখেছেন—

"On the 3rd July the accused was brought to Chittagong and he was being taken inside the Chittagong Jail, there arose shouts of 'Bandemataram' from the ward in which the other accused in this case were confined. The

Superintendent of Jail went over and inquired why they had shouted and three of them viz., accused Subodh Roy, Subodh Biswas, and Sukhendu Dastidar admitted having done so, because, said they, 'Our Chittagong leader has come'."

—আমাকে জেলের অভ্যন্তরে নিয়ে যাবার সময় এই মামলার অন্যান্য জেল-বন্দীরা 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি দিল। জেল-সুপার তাদের প্রশ্ন করেন—কেন তারা ঐরূপ শ্লোগান দিয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তরে সুবোধ রায়, সুবোধ বিশ্বাস ও সুখেন্দু দস্তিদার বলে—'আমাদের নেতা এসেছেন তাই শ্লোগান দিয়েছি।'

জেল-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট "ভাল লোক।" আমাদের প্রায় সকলের বাড়ির সঙ্গেই তাঁর জানাশোনা। বাঙালী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ খুব সন্দেহের চোখে দেখত। ডাঃ চ্যাটার্জী খুব বাঁচিয়ে চলতে চাইতেন। ভদ্রলোক কি আর করেন—"জেল-বিদ্রোহে" কেন তিনি সঙ্কেতঘণ্টা বাজিয়ে বিদ্রোহী বন্দীদের লাঠিপেটা করে দমন করেন নি, "সেই অপরাধ" থেকে নিজেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আমাদের বিরুদ্ধে Criminal Association প্রমাণের জন্য ঐরূপ সাক্ষী দিয়ে বৃটিশ প্রভুকে সন্তুষ্ট করলেন।

আমার সেলে দেখলাম চমৎকার ব্যবস্থা! সেলে বসে আগে আরও জেল ভোগ করেছি। তখন সেলের পাকা মেঝেতে কম্বল পেতে শুতে হ'ত। আগেকার ব্যবস্থা ছিল—ছোট্ট একটা ঘরে মেঝেতে পাতা বিছানা; পায়ের দিকে প্রায় বিছানা ঘেঁষে ছোট ছোট দুটো ঝুড়ি বাথরুমের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য রাখা থাকতো; দুর্গন্ধ থেকে রক্ষার জন্য এই ঝুড়িতে কোন ঢাকার ব্যবস্থা ছিল না, অপর একটা ঝুড়িতে কেবলমাত্র বালি থাকতো চাপা দেবার জন্য; সেলে আলো বা জলের কোন বালাই ছিল না, প্রয়োজনে সেপাইকে ডাকলে গরাদের বাইরে থেকে সে জল সরবরাহ করতো। জেল-কয়েদীদের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন সুখ-সুবিধা সম্বলিত নতুন জেল-নিয়মাবলী সবেমাত্র প্রবর্তিত হয়েছে। আমার সাথীরা হাজতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত ছিল। আমি চার মাসের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী বলেই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ক্রিমিনাল কেসে দণ্ডিত কোন ব্যক্তি জেল-আইন অনুসারে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। হাজতবাসীদের জন্য মাত্র দু' রকম ব্যবস্থা—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী। আমার ও অন্যান্য সাথীদের সুখ-সুবিধার মধ্যে কোন তারতম্য ছিল না। তারা সবাই আলাদা কম্পাউণ্ডে একটা বড় হাজতঘরে একসঙ্গে থাকত। আমার সেলে

দেখলাম একটা ছোট খাটে তোষক, বালিশ, বিছানার চাদর ও মশারি দিয়ে একটা বিছানা, ব্যবহারের জন্য একটা কমোড, জল খাওয়ার জন্য একটি জলভর্তি কুঁজো, গ্লাস প্রভৃতি রাখা আছে। সেলে আসার পর আমার স্নানের ব্যবস্থা হ'ল। সেলের সামনেই প্রায় সেলের মত স্থান জুড়ে দেওয়াল ঘেরা এন্টি-সেল। জেলের একজন কয়েদী সেখানে স্নানের জল দিয়ে গেল। পাহারায় নিযুক্ত জেল-ওয়ার্ডার আমার সেলের দরজা খুলে এন্টি-সেলের কাঠের দরজা বন্ধ করে সামনে হাজির রইল। স্নান হয়ে গেলে আবার তক্ষুণি আমাকে সেলে বন্ধ করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার এলো। দ্বিতীয় শ্রেণীর খাওয়া—থালা ও দু'টি বাটিতে আহার্য বস্তু দিয়ে এলো। সেলের দরজা খুলে খাবার ভেতরে দিয়েই সেপাই আবার দরজায় তালা দিল। কড়া হুকুম ছিল, সব সময় সেলের দরজা বন্ধ থাকবে এবং আমাকে স্নানের সময়টুকু ছাড়া এন্টি-সেলেও বেরোতে দেওয়া হবে না। রাত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীরাও পড়বার জন্য আলো ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হ'ল—আমাকে রাত্রে কোন আলো দেওয়া হ'ল না।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে ঘনালো। সূর্যাস্তের মধ্যেই কয়েদীদের রাত্রের খাওয়া সেরে ফেলার নিয়ম। জেলের সব বন্দীর খাওয়া শেষ হলেই ঘণ্টা বাজিয়ে এই ভোজনপর্ব সমাপ্তির ঘোষণা করা হয়। আবার পর পর দুটি ঘণ্টাধ্বনিতে সব কয়েদীদের গণনা শেষের সংবাদও ঘোষিত হয়।। আমার বিশেষ বাসনা ছিল নির্জন সেলে একা থাকা।

২৮শে জুন থেকে ৩রা জুলাই বিকেল পর্যন্ত বহু পুলিস এবং জেল-কর্মচারীর আনাগোনা ও উৎপাত আমাকে অত্যন্ত ক্লান্ত করে তুলেছিল। রাতটা আমার বেশ কাটলো। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখনও সাধারণ কয়েদীদের "নাস্তা" খাওয়া শেষ হয় নি। জেলে হঠাৎ একটা বড় ঘণ্টা বাজলো—অর্থাৎ, কোন বড় অফিসার জেল পরিদর্শনে এসেছেন। জেলের বড় জমাদার "সরকার সেলাম" ও তারপর "অজ্ঞবর" (As before) হুকুম দিচ্ছে। হুকুম মতই সাধারণ কয়েদীরা দাঁড়িয়ে আগন্তুক অফিসারকে অভিবাদন জানাচ্ছে। জমাদারের হাঁক শুনে মনে হ'ল আমার সেলের দিকে আগন্তুক অফিসারের গতি। তাই বটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি একজন সাধারণ কয়েদী আমার সেলের সামনে একটা চেয়ার রেখে গেল। তাকে অনুসরণ করে জেলার, এস-ডি-ও মিঃ এস, এন, রায় ঢুকলেন। তাঁদের পেছনে—এ কি! দেখলাম আমার মা আসছেন! আমার মাকে সঙ্গে নিয়ে

আসছেন ডাঃ চ্যাটার্জী। মায়ের শুষ্ক ও মলিন মুখ—চোখ দুটি ছলছল। তিনি সমস্ত দুঃখ ও আঘাত ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন—স্বামী কারারুদ্ধ ছিলেন, বর্তমানে আমাদের মামলার আসামী; জ্যেষ্ঠপুত্র এই জেল-হাজতেই আছে; আর আমি কনিষ্ঠ ফাঁসির প্রতীক্ষায়।

ধীর পদে মা এন্টি-সেলের ভেতর এলেন। আমার ও মায়ের সামনে থেকে সকলে পাশে সরে গেল। মা আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলছিলেন—"তুই এ কি করলি? তুই কি জানিস না তোর কি হবে? তুই ধরা দিলি কেন?—কেন তুই ধরা দিলি?" মা আর বলতে পারলেন না—তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল, তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। মাকে আমি কি সান্ত্বনা দেব? সান্ত্বনা দেবার যে কিছুই নেই! নির্বাক সমবেদনা জানানো ছাড়া আমার আর কিছুই করবার ছিল না। মা'র কষ্ট দেখে, তাঁর অন্তরের বেদনা বুঝে নিজেকে অপরাধী মনে করছিলাম। নিজের খেয়ালে নিজে শাস্তিভোগ করবো, তাই বলে মাকে ব্যথা দেবার অধিকার আমার কোথায়? আমরা দু'জনেই নিস্তব্ধ। কথা যেন কারই বলার ছিল না। মা কথা হারিয়ে বারে বারে কেবল চোখ মুছছিলেন। মিনিট পনেরো পরে মা উঠে দাঁড়ালে মাকে সেলের সামনে ডাকলাম। গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বার করে মা'র পায়ের ধুলো নিলাম। মাকে বললাম—"বাবাকে আমার প্রণাম দিও।" অন্তরের অজস্র আশীর্বাদ জানিয়ে মা বিদায় নিলেন। ডাঃ চ্যাটার্জী মা'র সঙ্গে গেলেন। মা চলে গেলে অন্যান্য কর্মচারীরাও আমার সেল থেকে প্রস্থান করলো। মিনিট দশ-বারো পরে ডাঃ চ্যাটার্জী আবার আমার কাছে ছুটে এলেন। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত আগমনে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। ব্যাপার কি? কি এমন প্রয়োজনে তাঁকে আবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছুটে আসতে হ'ল? ডাঃ চ্যাটার্জীই রহস্য উদ্ঘাটন করলেন। একেবারে গায়ের কাছে এসে চাপাকণ্ঠে "আপনজন সেজে" বললেন—"শুনলি তো, তুই কেন ধরা দিলি জানতে তোর মা কতখানি ব্যাকুল হয়েছেন? তোর মাকে কিন্তু আমার জানাতেই হবে তুই ধরা দিলি কেন? তিনি যাবার সময় বার বার বলে গেলেন, তোর কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাঁকে বলতেই হবে তোর ধরা দেবার কারণ।"

ডাঃ চ্যাটার্জী ডাক্তার—রুগী নিয়েই তাঁর গবেষণা; আর জেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হিসেবে কয়েদীদের ভাল-মন্দের দায়িত্বও তাঁর। দুটো পুরো দিন ও তিন-তিনটে রাত ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সেরা অফিসারেরা চেষ্টা করেছেন একটিমাত্র কথা জানতে—কেন ধরা দিলাম? লালবাজারে মিঃ

লোম্যানের "অশেষ দয়ায়" দিদির সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ দিতেও তাঁরা কার্পণ্য করেন নি সেই একই কারণে—কেন আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছি তা জানা। সোজা রাস্তায় পুলিস ধুরন্ধরেরা সুবিধে করতে না পেরে পরোক্ষভাবে ডাঃ চ্যাটার্জীর শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু তিনি প্রধান সরকারী ডাক্তার, আর আমি ডাক্তার ও পুলিস নই বটে, তবে পুলিসের সঙ্গে বহুকাল ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছি। কাজেই আমার মা'র ইচ্ছার ব্যাখ্যা করে ডাঃ চ্যাটার্জীর প্রস্তাব শোনামাত্র আমি এমন অর্থপূর্ণ হাসি হাসলাম যে, মনে হ'ল ডাক্তারবাবু লজ্জিত হয়েছেন। এর পরে ডাঃ চ্যাটার্জী আমাকে আর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করেন নি—কেন আমি ধরা দিয়েছি।

২৪শে জুলাই ১৯৩০ সালে, আমাকে চট্টগ্রাম জেলে আনবার তিন সপ্তাহ পরে, "Armoury Raid Case No. 1" নাম দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট জাজ কোর্টে ট্রাইব্যুনাল বসলো আমাদের বিচার করতে। এই তিন সপ্তাহ কর্তৃপক্ষ আমার ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখেন এবং নিম্নপদস্থ কোন কর্মচারী যাতে আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে না পারে সেদিকেও অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। এস-ডি-ও শ্রী এস, এন, রায়, জেল-সুপার, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও জেলার ছাড়া অপর কারুর আমার সঙ্গে কথা বলা নিষেধ ছিল। আই, বি-র একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইন্স্পেক্টার বিশেষ ডিউটিতে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল বাড়ি থেকে আমাদের খাবার ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র যা আসতো, সেগুলি তন্ন-তন্ন করে দেখে তবে আমাদের হাতে দেওয়া। কেবল তিনিই বিভিন্ন সেলে ও ওয়ার্ডে সবার কাছে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারতেন।

বহুদিন থেকে আমরা যেমন গল্পে শুনে আসছি, একটা গোটা কাঁঠালে পুরে জেলের অভ্যন্তরে কানাইলালকে রিভলভার পাঠানো হয়েছিল রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করবার জন্য, কর্তৃপক্ষও সেইরূপ রোমাঞ্চকর রহস্যের বিবরণ এতদিন ধরে বিশ্বাস করে আসছেন। কর্তৃপক্ষ প্রায় সুনিশ্চিত যে, আমার ধরা দেবার পেছনে আর যে-কোন উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, তিনজন যারা স্বীকারোক্তি দিয়েছে তাদের রক্ষা নেই—আমি কোন-না-কোন উপায়ে তাদের হত্যা করবই। এই কথা ভেবেই যে কর্তৃপক্ষ ওই তিনজনের জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার বহু প্রমাণ পেয়েছি। কেবল যে কর্তৃপক্ষই ধারণা করেছিলেন আমি তিনজন "বিশ্বাসঘাতককে" যে-কোন উপায়ে খতম করবো তা নয়, ওরা তিনজনও বুঝেছিল আমার ধরা দেবার একমাত্র কারণ—তাদের হত্যা করা। পরে সহজ পরিবেশে তাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ

হলে, তাদের প্রত্যেকের মুখেই বিশদ বিবরণ শুনেছি যে, আমার ধরা দিয়ে চট্টগ্রাম জেলে আসাতে তারা কি পরিমাণ আতঙ্কগ্রস্ত, ভীত ও বিচলিত হয়েছিল।

ওই তিনজনের মনোভাব ও কর্তৃপক্ষের তৎপরতার সঠিক সংবাদ আমি তখনও জানি না। সঠিক সংবাদ না জানলেও "দেশদ্রোহীদের" মনস্তত্ত্ব ও কর্তৃপক্ষের গতিবিধি দেখে বুঝেছিলাম তারা অতি ভয়ে ও দুর্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে। এই মনস্তত্ত্ব বোঝাটাই পরের কর্মপদ্ধতিগুলি ঠিক পথে পরিচালিত করতে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছে।

রাজসাক্ষী হওয়া বা নিজ স্বার্থে স্বীকারোক্তি করে দলের ক্ষতি করা সর্বক্ষেত্রেই যে মারাত্মক অপরাধ তা মানতেই হবে। এই দুর্বলতার স্বপক্ষে কোনভাবে কোন যুক্তির অবতারণা করার চেষ্টাও অপরাধ বলেই আমার মনে হয়। "বয়স কম, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের পরিমিত সময় ও সুযোগের অভাব বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছে"—এইরূপ যুক্তি আত্মপ্রতারণারই নামান্তর। ছেলেবেলায় বালকসুলভ চপলতায় স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরাও শিক্ষকদের বিব্রত করতে নানা রকম ষড়যন্ত্র করে থাকে। বালকেরাও তাদের মধ্যে দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করে না। জেলের সাধারণ কয়েদীরাও বিশ্বাসঘাতক রাজসাক্ষীকে ঘৃণার চোখে দেখে এবং সময় ও সুযোগ পেলে তার প্রাণ নিতেও দ্বিধা করে না। মানবতার অতি প্রাথমিক উপাদান—'সমষ্টিগত ক্ষয়-ক্ষতি নিজ স্বার্থসিদ্ধির অনেক উর্ধ্বে'—সকলের মধ্যেই এটা নিহিত থাকে, কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে বিকাশ লাভ করে না। এইরূপ জঘন্য স্বার্থপরতার গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা একটি বালকেরও থাকে, কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না—এর জন্য "অভিজ্ঞতা" "জ্ঞান-বুদ্ধি", প্রভৃতিরও প্রয়োজন করে না। তাই স্বীকারোক্তির অপরাধ আমার কাছে অমার্জনীয় অপরাধ—এখানে কোন যুক্তি-তর্কের স্থান নেই। আমাদের মামলার সময় যখন উপরোক্ত তিনজনেই তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে কঠোর দণ্ড গ্রহণের জন্য আমাদের সাথী হ'ল, তখনও অভিভাবকেরা আমার কাছে একজনের বিরুদ্ধে তাঁদের তীব্র মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। আমি তাঁদের যথারীতি এই বলেই বোঝাতে চেষ্টা করি যে, 'অল্প বয়সের দরুণ জ্ঞান, অভিজ্ঞতার অভাবেই তারা ক্ষণিক দুর্বলতার শিকার হয়েছিল। এখন ভুল বুঝে নিজেকে শুধরে নিয়েছে।' অভিভাবকরা বিরক্ত হয়ে আমার মুখের ওপর উষ্মা প্রকাশ করে চট্টগ্রামের ভাষায় বলেছিলেন—"ক্যেয়া ওবা? হিতে পোয়া, আর এউন্ পোয়া ন?

ঝুঙ্কু, রণধীর, গোপাল তারার বয়স তার তুন্ বেশি না? ছোড ছোড পোয়া এউন্ তো কনফেশন্ ন করে। আজ্‌য়া যদি তার কনফেশন্ ন থাইকৃত ত' কঅট্টা পোয়াছা বাঁচি যাইতো! উইবার লাই তোঁয়ার আর ওকালতি করন পইরত্য ন।"—(কেন বাবা? সেই-ই বালক আর এরা বালক নয়? ঝুঙ্কু, রণধীর, গোপাল তাদের বয়স কি তার চাইতে বেশি? এই সব ছোট ছেলেরা তো confession (স্বীকারোক্তি) করে নি! আজ যদি তার স্বীকারোক্তি না থাকতো তবে কতকগুলো ছেলে বেঁচে যেত! ওর জন্যে তোমার আর ওকালতি করতে হবে না)।

চট্টগ্রামের ছেলেদের অভিভাবকেরা ওই স্বীকারোক্তিকেই তাদের সন্তানদের দণ্ডাদেশের কারণ বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাঁদের মনোভাব উপলব্ধি করে বুঝেছিলাম যে, স্বীকারোক্তির অপরাধ লাঘবের কোনই পথ নেই। আশ্চর্য মনে হয়েছে, যখন আন্দামান সেলুলার জেলে কোন কোন বিশেষ নেতা স্বীকারোক্তির গুরুতর পাপকে খণ্ডনের জন্য যুক্তির অবতারণা করতেন এবং একজনের উক্তি আমার এখনও মনে আছে—"Imperialst কা খপ্পর মে পড়ে থে, ইসলিয়ে বাচ্চা উমর মে confession কর দিয়া……।" ভবিষ্যতের তরুণ বিপ্লবী মনকে এইরূপ দুর্বলতার সন্ধান দেবার পেছনে বিপ্লবের পরিপন্থী আপোষমূলক মনোভাব না থাকলে কেউ একথা বলতে পারে না। যেসব বিশেষ নেতাদের কথা লিখলাম এঁদের সাক্ষী গণেশ। তখনই আমরা এই বিপ্লবী বীরপুঙ্গবদের নিয়ে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা করেছি এবং পরেও, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে, সেই সব কীর্তিমান আন্দামান-ফেরত বিপ্লবীদের বিষয়ে বহু গবেষণা করেছি।

রাজসাক্ষী হওয়ার অপরাধে 'অপরাধী'র অবস্থা পরিবর্তনে তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাতে আমার কখনও prejudice বা unbalanced মনোভাব ছিল না।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। আমরা অল্প বয়সের ছেলেদের নিয়ে দল করেছিলাম। চিন্তা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম, প্রবীণ ব্যক্তি অপেক্ষা "বালকদের" মৃত্যুভয় ও স্বার্থপরতা অনেক কম। বাস্তবেও তা প্রমাণিত হয়েছে! আমরা চেয়েছিলাম, অন্তত যুব-বিদ্রোহের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত একজনও পুলিস গোয়েন্দা যেন আমাদের সংগঠনের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে; এবং সেই জন্যই প্রবীণ ব্যক্তিদের (যাদের স্বার্থের দুর্বলতা ও মৃত্যুভয় থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি) সযত্নে পরিহার করেছি। আমরা

যুব-বিদ্রোহের অভ্যুত্থান পর্যন্ত সফল হয়েছি—পুলিস আমাদের বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি। ভারতবর্ষে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের মামলার চাইতে বড় মামলা আর হয় নি। অপরিণত বয়সের বহু ছেলে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পুলিস অত জনের মধ্যে মাত্র তিনজনের স্বীকারোক্তি আদায় করেছিল। কাউকে রাজসাক্ষী হিসেবে খাড়া করতে সরকারপক্ষ চায় নি—কারণ, আশঙ্কা করেছে জেরায় তারা টিকতে পারবে না। মামলায় Evidence হিসেবে স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। স্বীকারোক্তি দিয়ে যদি কেউ আসামী হিসেবে থাকে, তবে তাকে জেরা করা যায় না। কিন্তু রাজসাক্ষী হলে, প্রথমে তাকে "Queen's Mercy" (সম্রাজ্ঞীর দয়া) অনুসারে মুক্তি দেওয়া হয় এবং সে আদালতের কাঠগড়ায় আসে দলের অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে।

আমাদের দলের সেই তিনজনের কাউকেই রাজসাক্ষী হিসেবে খাড়া করবে না জানতে পারলাম। এখন তাদের confession যদি কোন রকমে প্রত্যাহার করানো যায় তাহলেই সরকারের প্রাথমিক পরাজয় ঘটে। যুব-বিদ্রোহ সংঘটিত হবার পর ঐ তিনটি স্বীকারোক্তি বাস্তবে আমাদের সামান্যই ক্ষতি করেছে—অবশ্য কিছু সংখ্যক গ্রেপ্তারের সন্ধান ওই স্বীকারোক্তির মারফতই পুলিস পেয়েছে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগলো—এই তিনজনকে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারে কি উদ্বুদ্ধ করা যায় না? আমাদের এই বিরাট মামলায় সরকারপক্ষ যদি একজনেরও স্বীকারোক্তি ব্যবহার করতে না পারে তবে চট্টগ্রামের গৌরব—ভারতের বিপ্লবীদের এতে মর্যাদা বাড়বে। যে-কোন উপায়েই হোক্ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করানো চাই-ই।

স্বীকারোক্তি যারা দিয়েছে তাদের তিনজনকে জেলে তিনটি পৃথক স্থানে রাখা হয়েছে। আমি কিছুদিন বাদে একজন সেপাই মারফত খবর পেলাম, এদের একজন আছে আমার সেল থেকে দু'টি সেল বাদে। অপর দু'জন আছে জেলের দুই প্রান্তে। আমার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল, যে কোন উপায়ে একবার তাদের সামনে যাওয়া। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, যদি তারা আমাকে দেখে এবং আমার কথা শোনা যায় মত তাদের সান্নিধ্যে আমি কোনমতে একবার যেতে সমর্থ হই, তবে, পুলিসের প্রভাব কাটিয়ে তারা নিশ্চয়ই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করবে।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে বড় হাজত কম্পাউণ্ডে আমাদের সাথীদের কাছে গোপনে

খবর পাঠালাম, তারা যেন ওই তিনজনকে আর গালিগালাজ না করে এবং খুব সহিষ্ণুতার সঙ্গে তাদের প্রতি সমবেদনা ও ক্ষমার ভাব প্রকাশে কুণ্ঠিত না হয়। অন্যান্য সাথীরা আমার যুক্তি মেনে নিয়ে এই ব্যাপারে খুব সংযত হ'ল।

বাকি রইল আমার নিজের কাজ। কর্তৃপক্ষকে আমার কোনমতে বোঝাতেই হবে—সবার অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি, সব অপরাধই আমার; খেলা সাঙ্গ হ'ল, এখন যদি তারা সবাই শ্রীঅরবিন্দের মত ধ্যান-ধারণা নিয়ে বাকি জীবন কাটায় তবে পরপারে গিয়ে আমি শান্তি পাব। আমার সঙ্গে এস-ডি-ও শ্রী এস, এন, রায় প্রায়ই দেখা করতেন; বন্ধ সেলে বসে বহুক্ষণ ধরে কথা বলতেন। আমি সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মালাম যে, আমার আর জীবনের প্রতি কোন আসক্তি নেই—আমার আত্মা ভগবানলাভে ব্যাকুল; আমি চলে যাব সংসার ছেড়ে—সব অপরাধ—সবার অপরাধ মাথায় নিয়ে সকলকে মুক্তি দিয়ে আমি চিরবিদায় নেব। কেবল এস-ডি-ও'কে বলেই ক্ষান্ত হইনি; খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সেপাই, জমাদার সাহেব, ডেপুটি জেলার, জেলার, সুপার সবাইকে একটু একটু করে আমার এইরূপ মনোভাবের পরিচয় দিলাম—সকলেই যেন সব দিক থেকে 'এই একই কথা শুনতে পায় 'আমি একেবারে changed man' (অন্য জগতের লোক)। আমার চালচলন কথাবার্তা সব কিছু বদলে ফেললাম। সেপাই, জমাদার, কয়েদী, মেট ও পাহারাওয়ালার কাছ থেকে জেলার সাহেব আমার সম্বন্ধে জানতে চাইতেন এবং সুপারকে রিপোর্ট করতেন। সুপার আবার জেলা-শাসক, এস-ডি-ও এবং পুলিস সাহেবকে অনুরূপ সংবাদ দিতেন—'আমার ভয়ানক পরিবর্তন হয়েছে—কারো ওপর আমার বিন্দুমাত্র রাগ নেই—কাউকে আমি হত্যা করতে পারি না।' আমার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের এই ধারণার বিষয় সঠিক জানতে পেরেছিলাম এস-ডি-ও, সুপার ও জেলারের কাছে। তাঁরা বহুবার আমাকে বলেছেন—"প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম আপনি এসেছেন এই তিনজনকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। আপনার কি আশ্চর্য পরিবর্তন! আজ মনে হয় তারা যদি আপনার সঙ্গে এক ঘরেও থাকে তাহলেও আপনি তাদের কোন ক্ষতিই আর করতে পারবেন না।" এস-ডি-ও একদিন বললেন—"আপনার শিষ্য আমাকে বলছিল আদালতকক্ষে সে আপনাকে মিলিটারী কায়দায় স্যালুট দেবে……।"

মনে হচ্ছিল ওষুধ বোধ হয় কাজে লেগেছে। ইতিমধ্যে আমার সেল থেকে তিনটি সেলের ব্যবধানে যাকে রাখা হয়েছে, সে'কে জানবার চেষ্টা করলাম কিন্তু

জানা সম্ভব হ'ল না। একটা নাম অবশ্য জানতে পারলাম, কিন্তু সেই নামের কাঁরো সঙ্গে অন্তত আমার, বাইরে পরিচয় ছিল না। নামে চিনি না এমন অনেক ছেলে অন্যান্য গ্রুপ থেকে এসেছে। তাই যদিও তাকে নামে চিনিনি, তবু আমি আমার পরিচয় দিয়ে, সে যাতে শুনতে পায় সেরূপ উচ্চকণ্ঠে, তাকে তার দুর্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানালাম। খুব সাবধানে আমার "বাণী" প্রচার করতাম। যেসব সেপাইরা বুঝতে পারবে না তাদের সামনে এবং জেলার প্রভৃতি যখন round-এ আসবেনা সেইরূপ সুযোগ নিয়ে আপন মনে অথচ সজোরে আমার বক্তব্য বলে যেতাম। কিন্তু কোন একজন সেপাইয়ের রিপোর্টে সন্দেহ করে কর্তৃপক্ষ সেই সাথীকে অন্য সেলে সরিয়ে নিল।

আর একজনকে—যার স্বীকারোক্তির ওপর সরকারপক্ষ বিশেষ নির্ভরশীল—তাকে প্রথম দিন আদালতে নিয়ে যাবার পূর্বেই কোনপ্রকারে প্রভাবান্বিত করা যায় কিনা ভাবছিলাম। এই উদ্দেশ্যে আমি একটা খুব বিপজ্জনক কাজে হাত দিলাম। এতে আমার নিজের আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না; কিন্তু A. S. I. অফিসারটির কথা ভাবছিলাম। ইনি আমাদের প্রত্যেকের কাছে বাড়ির খাবার ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন। A.S.I.-এই অফিসারটিকে আমি আমাদের প্রতি আসক্ত করে তুললাম। তাঁর স্বদেশিকতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তাঁকে বললাম যে, তিনি পুলিসে চাকরি করলেও নিজেকে বাঁচিয়ে আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারেন। ধীরে ধীরে তাঁকে আমার অনুগত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাঁর কাছে প্রস্তাব করলাম—"দেখুন, আমার একটা চিঠি 'ওর' কাছে নিয়ে যান। তাকে পড়তে দেবেন। তার পড়া হয়ে গেলে আবার ফিরিয়ে আনবেন, তার কাছে রাখবেন না। এই কাজটা যদি করতে পারেন তবে হয়ত সে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে পারে।" যুবক A. S. I. অকুতোভয়ে এই কাজের দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল পাছে 'সে' ওই A. S. I. বন্ধুর কথা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ করে দেয়। যাহোক্, ভাবলে চলবে না—ঝুঁকি নিতেই হবে।

একটা চিঠি লিখলাম। খুব স্নেহভরা চিঠি। তাতে আবেগ ও প্রেরণার কোন ঘাটতি ছিল না—স্বদেশপ্রেমের গভীর মর্মবাণী হৃদয়স্পর্শী করে লেখা। সেই চিঠিতে তার অন্তর বিচলিত করার উদ্দেশ্যে বন্ধুদের কথা, শহীদদের কথা উল্লেখ করলাম এবং সর্বশেষে লিখলাম—সে যেন দেশের জন্য, বন্ধুদের জন্য ও সর্বোপপরি তারই মঙ্গলের জন্য স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে।

আমার A. S. I. বন্ধু চিঠিখানা নিয়ে "তাকে" পড়তে দিলেন। তার পড়া হলে চিঠিটা আমাকে আবার ফিরিয়ে দিলেন। আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"চিঠিটা 'সে' খুব ভালভাবে পড়েছে তো? তার ভাব দেখে আপনার কি মনে হ'ল—মানসিক প্রতিক্রিয়া কিছু বুঝতে পারলেন?" বন্ধু A. S. I. বললেন—"আমার মনে হ'ল প্রতিক্রিয়া খুব ভালই হয়েছে। চিঠি পড়বার পর সে এই ক'টি কথা আপনাকে বলতে বলেছে—'অনন্তদাকে বলবেন, আমার ভুলের জন্য আমি অনুতপ্ত। আমি প্রাণ দিয়েও ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত। তিনি যা বলবেন আমি তাই করব'।" এই সংবাদ শুনে আমার অন্তর ভরে উঠেছিল এবং এই A. S. I. বন্ধুর প্রতি আমার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও অজস্র প্রশংসা নীরবে নিবেদন করেছিলাম। আজ তিনি কোথায় জানি না, কিন্তু আমার জীবনের প্রকৃত সাথী হিসেবে চিরকালই তিনি আমার শ্রদ্ধাভাজন হয়ে থাকবেন।

চট্টগ্রামের যুবক বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার জন্য কঠোর হস্তে দমননীতি চালাতে হবে—কঠিন দণ্ডে বিপ্লবীদের দণ্ডিত করতে হবে। নির্বাসন ও ফাঁসির ভীষণ ভয়াল ছায়ায় চট্টলার আকাশ ঢেকে দিতে হবে। যুব-বিদ্রোহকে স্তব্ধ করতে বৃটিশ সরকারকে এমন একটা নির্মম নিদর্শন সৃষ্টি করতে হবে যা ভাবী-কালের বিপ্লবীদেরও মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সমর্থ হয়।

স্পেশাল গেজেটে সরকারের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হ'ল—'স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে আর্মারি রেডের আসামীদের বিচার হবে।' দু'জন কমিশনার ও একজন প্রেসিডেণ্ট নিয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হ'ল। এই দু'জন কমিশনারের একজন হলেন হিন্দু—রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর ও অপরজন মুসলমান—খাঁবাহাদুর মৌলভী এ; এইচ, এম, আব্দুল হাই। ট্রাইব্যুনালের সভাপতিরূপে বিচারকের আসনে এঁদের সঙ্গে বসবেন ইংরেজ জেলা সেসন জজ মিঃ জে, ইউনী!

বাঃ! অপূর্ব! চমৎকার! বৃটিশ জাস্টিস!—পক্ষপাতিত্বের আর কোন সম্ভবনাই নেই! ইংরেজ প্রেসিডেণ্ট মাঝখানে—তাঁর একপাশে থাকছেন একজন খাঁবাহাদুর মুসলমান এবং অপর পার্শ্বে একজন রায়বাহাদুর হিন্দু—এঁরা তিনজনে পরামর্শ করে সুবিচার করবেন, নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন—এতে আশঙ্কার স্থান কোথায়—বানরের পিঠে ভাগেরও বা সম্ভাবনা কোথায়? বৃটিশের পক্ষপাতিত্বহীন নীতির সমালোচনা চলে না। ভারতবাসীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়েও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাদের নিরপেক্ষ নীতিতে অনড়

অটল ছিলেন—হিন্দু ও মুসলমান, এই উভয় সম্প্রদায়কেই তাদের ন্যায্য অংশ ভাগ করে দিয়ে গেলেন—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান !!

আমাদের বিরুদ্ধে বিচারের প্রহসন সুরু হবে—ন্যায় বিচারে দণ্ড দিতে হবে। জুরীদের নিয়ে বিচার চলবে না ! ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে প্রাথমিক বিচারেরও প্রয়োজন নেই ! একেবারে সরাসরি ট্রাইব্যুনালে বিচার—কে সাক্ষী দিতে আসবে, কি বিষয়ে সে সাক্ষী দেবে, তা' 'আসামীরা' আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আগে থেকে জানবার কোন সুযোগই পাবে না। সাধারণ ক্ষেত্রে জুরীদের নিয়ে সেসন বিচারে এই সুবিধেটুকু পাওয়া যায়। ট্রাইব্যুনালে সরকার পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসামী নিজে অথবা আসামী পক্ষের উকিল বা ব্যারিস্টারকে ওই সব সাক্ষীদের জেরা করতে হয়—এই হ'ল ট্রাইব্যুনাল বিচারের বিশেষ পদ্ধতি। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী সরকার কোন অন্যায় করতে পারেন না—ট্রাইব্যুনালে "ন্যায়" বিচার করে তবেই না প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দণ্ডের আজ্ঞা দেবেন!

মনে হতে পারে ট্রাইব্যুনালের বিচারপদ্ধতিকে এত সমালোচনা করার কি আছে ?—'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন'। প্রশ্ন আসতে পারে—এ কি তোমাদের জানা ছিল না—অত্যাচার, নিপীড়ন, বিচারের প্রহসন, সবই তোমাদের ধ্বংস করবার জন্য প্রয়োগ করতে সরকার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করবে না ? তবে কেন তোমাদের ট্রাইব্যুনাল বিচারের প্রতি এত কটাক্ষ ?

কটাক্ষ করছি না—ট্রাইব্যুনাল বিচার প্রহসন উদ্ঘাটন করার মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। সাম্রাজ্যবাদী শাসন তাদের ছলা-কলা, কৌশল, মিথ্যা ন্যায়ের ভান ও 'প্রকৃত নিরপেক্ষ নীতির' (!) চাতুর্যে ভারতবাসীকে বিভ্রান্ত করেছে। বৃটিশের নীতি ও কৌশলের সুদীর্ঘ ধারাবাহিক ইতিহাসকে বাদ দিয়ে, বিচ্ছিন্নভাবে কেবল আমাদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের বিচারের আলোচনা করে এখনও অনেকে বিভ্রান্ত হন—কই কারো তো প্রাণদণ্ড হ'ল না ! কাজেই সকলের কাছে ট্রাইব্যুনালের বিচারকে প্রহসন বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশেষ ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের বিচারকে "প্রহসন" আখ্যা দিতে যদি কারো কুণ্ঠা হয়, তবু এটা যে একটা "রহস্যময়" বিচার অনুষ্ঠান, তাতে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে ? আমাদের কারো ফাঁসি হ'ল না—এই রহস্যের উদ্ঘাটন যথাস্থানে করা হবে এবং তখনই জানা যাবে এই বিচার একটি প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়।

বিচার আরম্ভের সঠিক তারিখ তখনও জানি না। তবে বোঝা গেল

কর্তৃপক্ষ বিচার স্থরু করবার তোড়জোড় করছেন। এদিকে আমার প্রাথমিক কাজ প্রায় শেষ করেছি। ধোঁকা দিয়ে কর্তৃপক্ষকে স্থনিশ্চিত করেছি যে, আমার মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন এসেছে এবং আমি স্বীকারোক্তিকারীদের অন্তর থেকে ক্ষমা করেছি। কর্তৃপক্ষকে যেমন বিভ্রান্ত করেছি তেমনি আবার, যে সাথী স্বীকারোক্তি করে আমার সেলের কাছে ছিল, তাকে নিজ কণ্ঠের "বাণী" শুনেয়েছি—সে যেন তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। আর সব চেয়ে মারাত্মক স্বীকারোক্তিকারীকে চিঠি পাঠিয়ে তার মৌখিক উত্তরও পেয়েছি—সে অনুতপ্ত, জীবন দিয়েও ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত। তৃতীয় স্বীকারোক্তিকারীকে জেলের একেবারে অন্যপ্রান্তে রাখা হয়েছে। তবে তার সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত গোপনে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করছি। আগে থেকেই জেলের অভিজ্ঞতা আমার ছিল—চট্টগ্রাম জেলে যে কোন ওয়ার্ডের বন্ধুদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা আমার কাছে কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু তৃতীয় স্বীকারোক্তিকারীর মানসিক প্রতিক্রিয়া ও তার পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল বা অনুকূল অবস্থার প্রাথমিক অনুসন্ধান, জেল কর্মচারী, সেপাই ও দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের দেওয়া বিভিন্ন রিপোর্টের ভিত্তিতে, তখনও শেষ করা সম্ভব হয় নি বলেই আমি তার কাছে চিঠিপত্র বা মৌখিক সংবাদ পাঠাতে ভরসা করি নি—পাছে তা' অসময়োচিত হয়। তাই বলে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলাম না—প্রতিদিনই কোন না কোন উপায় উদ্‌ভাবনে ব্যস্ত ছিলাম।

একদিন দুপুরে, প্রায় দুটো হবে, আমার সেলে হঠাৎ এস, ডি, ও, স্থপার, জেলার এবং আরো কয়েকজন সেপাই ও কর্মচারী এসে উপস্থিত। এই অসময়ে আগমনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এস, ডি, ও, মহাশয় বললেন—"দেখুন, টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড হবে, আপনি আপনার পরনের জামা-কাপড় সব বদলে নিন। জেলারবাবু আপনার দাদার কাছ থেকে জামা-কাপড় এনেছেন।" সত্যিই দেখলাম জেলারবাবু জামা-কাপড় সমেত এস, ডি, ও, মহাশয়ের পাশে হাজির। আমি একচোট খুব হাসলাম—আমাকে সনাক্ত করবে, তার জন্য আবার এই সব বাজে দেখনাই কেন? আমি জামা-কাপড় পরিবর্তন করলাম না। তারপর স্থপার, এস, ডি, ও, এবং জেলারবাবু আমাকে বিশেষ অনুরোধ করলেন আমি যেন কিছুক্ষণের জন্য অন্য একটি সেলে যাই—সেখানে তাঁরা সেলের দরজা বন্ধ করে আমাকে রাখবেন, সনাক্তকারী যাতে নির্ভয়ে বলতে পারে আমাকে সে চেনে কিনা।

'টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড' আর আদালতের বিচারকের সামনে

কাঠগড়ায় আইডেন্টিফিকেশন এক জিনিষ নয় বা গুরুত্বের দিক থেকেও সমান নয়। আদালতের তথাকথিত সনাক্তকরণ ব্যাপার একটি সাধারণ নিয়ম মাত্র। কিন্তু জেলের অভ্যন্তরে টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের গুরুত্ব অনেক বেশি। সন্দেহভাজন আসামীকে সাক্ষীরা সত্যিই চেনে কিনা অথবা ঘটনাস্থলে বা ষড়যন্ত্রের মূলে অংশ নিতে দেখেছে কিনা, তা সঠিকভাবে যাচাই করার জন্য কোন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা এস-ডি-ও উপস্থিত থেকে সনাক্তকরণ প্যারেড পরিচালনা করেন। সেইহেতু কর্তৃপক্ষ আসামীকে প্রয়োজনমত বেশভূষা পরিবর্তনের সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধে দেন। তারপর বাইরের একদল প্রায় অনুরূপ পোশাক পরিহিত সাধারণ লোকের সঙ্গে একত্রে মিলিয়ে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেন।

রেলের টাকা ডাকাতি, নাগারখানা যুদ্ধ ও সুলুকবাহার ষড়যন্ত্র মামলায় টেস্ট আইডেন্টিফিকেশনের অভিজ্ঞতা আমার ছিল। আমাকে তখন সবার সঙ্গে এক সারিতে জেলের ভেতর কোন এক স্থানে দাঁড় করিয়ে একের পর এক করে সাক্ষী এনেছে—কেউ বা সনাক্ত করেছে, কেউ করেনি। কিন্তু আমাকে একটি সেলে বন্ধ থাকতে হবে এবং বাকি পাঁচটি সেলে অন্য লোককে আমার মতই বন্ধ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ দাঁড় করিয়ে দেবে—জেলের ইতিহাসে এটা এই প্রথম। আমি ভাবতে লাগলাম এত নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেন? এমন কেউ কি আমাকে সনাক্ত করতে আসবে, যাকে দেখামাত্রই আমি আঁচড়ে-কামড়ে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবো? ইতিমধ্যেই একজন স্বীকারোক্তিকারী বোরখা পরে আমাদের সাথীদের সনাক্ত করেছে—এর বিস্তারিত বিবরণ আমি আগেই জেনেছি। তাই মনে হচ্ছিল, সরকার পক্ষ "মামলা চালাবার শাস্ত্র" অনুযায়ী নিয়ম পালনের উদ্দেশ্যেই স্বীকারোক্তিকারীদের দিয়ে ত্রুটিহীন জেল সনাক্তকরণ প্যারেডের অনুষ্ঠান করছে।

আমি অন্য একটি সেলে গেলেও কি সনাক্তকারীকে আগে থেকে সেলের নম্বরটি বলে দেওয়া যায় না? তাহলে তো স্বীকারোক্তিকারী বাদেও যে কোন সনাক্তকারীরই আমাকে চিহ্নিত করতে কোনই অসুবিধে হবে না। তবে এস-ডি-ও এবং সুপার এতখানি কঠোর ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ততা দেখালেন কেন? আমাকে সন্তুষ্ট করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—দেখাতে চাইছিলেন পুলিসকে কোনরূপ সুবিধে না দিয়ে তাঁরা ত্রুটিহীন আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের ব্যবস্থাই করেছেন।

হায় রে! তাঁরা যদি আগে একটুও আন্দাজ করতে পারতেন যে, সরকার-

পক্ষের কোন সাক্ষীই আমাকে সনাক্ত করবে না, তবে কি এস-ডি-ও মহাশয় এই ব্যাপারে এতখানি নিষ্ঠাবান হতেন? আমাকে সনাক্ত করতে কোন স্বীকারোক্তিকারীকেই আনা হ'ল না। ফেণী রেল-স্টেশনের যে সব সেপাই, ইন্‌স্পেক্টার, সাব-ইন্‌স্পেক্টার আমাকে ও আমার তিনজন সাথীকে অতক্ষণ ধরে দেখেছে এবং অত কথাবার্তা বলেছে, তাদের সকলকে একের পর এক আমার ও অপর পাঁচটি সেলের দরজায় উপস্থিত করা হ'ল আমাকে সনাক্ত করতে। কিন্তু তারা একজনও আমাকে সনাক্ত করলো না—পরিষ্কার বললো চিনতে পারছে না।

আশ্চর্য! আমার সেলের সামনে এন্টি-সেলে ঢোকা মাত্র আমি হাসিমুখে তাদের "অভ্যর্থনা" করলাম। এই তো সেদিনের কথা—ইন্‌স্পেক্টার বাসত মিঞা, সাব-ইন্‌স্পেক্টার যতীনবাবু, আহত সেপাই তোরাব আলি, মণীন্দ্র—সবাইকেই তো আমি ভালভাবেই চিনলাম এবং আমার মুখের হাসিও তাদের কাছে গোপন করলাম না। তারাও প্রত্যেকেই যে আমাকে চিনেছে তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। তবু যখন কেউ আমাকে সনাক্ত করলো না, তখন স্পষ্টই দেখলাম এস-ডি-ও মহাশয় খুবই আশ্চর্য হলেন, পুলিস হতাশ হ'ল এবং জেলার ও সুপারের কাছেও ঘটনাটি একান্তই অবিশ্বাস্য মনে হওয়ায় তাঁরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন—এ কি সম্মোহন প্রভাব—একজনও কেন চিনতে পারলো না?

চট্টগ্রামের প্রধান প্রেক্ষাগৃহ 'বিশ্বম্ভর হলের' স্টেজে দর্শকবৃন্দের সম্মুখ থেকে অনন্ত সিংহের অন্তর্ধান, শৃঙ্খলিত হয়ে বস্তাবন্দী অবস্থায় ভৌতিক বাক্স থেকে তার নিষ্কৃতি পাওয়ার কাহিনী যুব-বিদ্রোহের পর আরও প্রচার লাভ করে বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। কাজেই, সম্মোহন শক্তি ছাড়া ইন্‌স্পেক্টর, সাব-ইন্‌স্পেক্টার ও আহত সেপাইদের মধ্যে একজনেরও অনন্ত সিংহকে না চেনা কি করে সম্ভব?

পরদিন সকালে দেশপ্রেমিক অপর্ণা ঠাকুরের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কণ্ঠস্বরে 'পাঞ্চজন্য পত্রিকার' শিরোনামা চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় প্রতিধ্বনিত হ'ল—"জেলে অনন্ত সিংহের টেস্ট আইডেণ্টিফিকেশন প্যারেড—একজনও অনন্ত সিংহকে সনাক্ত করে নাই!"

চট্টলবাসী আমাদের ভালোবাসত। এই খবরে তারা খুশি হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তার অবধি নেই। আর সাধারণ লোক হয়ত 'আমার সম্মোহিনী শক্তির' অদ্ভুত সাফল্যে গর্ব বোধ করেছে। মূর্খ বৃটিশ কর্মচারীরা বুঝতেও

পারে নি যে, এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত সম্মোহন শক্তির বিন্দুমাত্রও স্থান ছিল না বা থাকতেও পারে না। চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহের পর যে বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা ভারতবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত করেছিল, সেই সম্মোহিনী শক্তিই আমাকে সনাক্ত না করবার জন্য ফেণী ঘটনার সাক্ষীদের অন্তরে সদ্বুদ্ধি জাগ্রত করেছিল। তা'ছাড়া ফেণী সংঘর্ষে বিপ্লবীদের গুলী মুসলমান ইন্‌স্পেক্টারকে স্পর্শ করে নি, তাদেরই সাথী হারানের মামাকে আহত করেছে; আর তোরাব ও মণীন্দ্রকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলী করাই হয় নি। এই বাস্তব ঘটনা সবাইকে আমাদের অনুকূলে প্রভাবান্বিত করেছে, যার ফলে ফেণীর সাক্ষী একজনও আমার বিরুদ্ধে যায় নি।

মামলার দিন ধার্য হ'ল—২৪শে জুলাই, ১৯৩০ সাল। মামলা কোথায় চলবে—আদালত-ভবনে নাকি জেল খানারই অভ্যন্তরে? শেষপর্যন্ত স্থির হ'ল আদালতে জজসাহেবের বিচার কক্ষেই এই মামলার শুনানী হবে।

চট্টগ্রামের জেলা-আদালত শহরের কেন্দ্রস্থলে 'পরী পাহাড়ের' মাথার মুকুট হয়ে শোভা বর্ধন করছে। জেলখানা থেকে আদালত প্রায় পোয়া মাইল রাস্তা। শহরের বুকের ওপর দিয়ে রোজ আমাদের প্রায় ত্রিশজনকে নিয়ে আসা-যাওয়া করা পুলিসের পক্ষে এক মহা সমস্যা। তবু কর্তৃপক্ষ আদালত-ভবনেই মামলা আরম্ভের ব্যবস্থা করলেন।

২৪শে জুলাই সকালে উঠেই জেলারবাবুর নোটিশ পেলাম—আমাদের সকাল ১০-৩০ মিনিটের মধ্যে কোর্টে হাজির হতে হবে। তাই সকাল সকাল স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে দশটায় আমাদের প্রস্তুত থাকবার নির্দেশ দিলেন।

সেই ১৮ই এপ্রিল—প্রায় তিন মাস গত হয়েছে, আজ এতদিন পরে সাথীদের সঙ্গে আবার দেখা হবে কোর্টে! এই তিন মাসের ব্যবধানে কত কি ঘটে গেছে—জালালাবাদের সাথীদের বারোজন শহীদ হয়েছে, অমরেন্দ্র নন্দী ফিরিঙ্গীবাজার রণভূমিতে প্রাণ দিয়েছে, কালারপোল যুদ্ধক্ষেত্রের মরণজয়ী সংগ্রামে আমাদের চারজন আদর্শ বিপ্লবীসাথী মৃত্যুবরণ করেছে, গণেশরা কলকাতায় এবং মাস্টারদা ও অন্যান্য সাথীরা চট্টগ্রামে আত্মগোপন করে আছেন, অনেক সাথী ধরা পড়েছে—এদের মধ্যে তিনজন স্বীকারোক্তি দিয়েছে আর আমি অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে আজ বিচারের সম্মুখীন হতে চলেছি।

সরকারের সঙ্গে মামলায় আমাদের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তারা যেন একজন স্বীকারোক্তিকারীকেও রাজসাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেবার জন্য না পায় এবং

প্রত্যেকেই যেন তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়। সরকারের মিলিটারী ও পুলিস মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। তারা তিনজন ভাবী রাজসাক্ষীর নিরাপত্তার জন্য বিশেষ চিন্তিত। যাওয়া-আসার পথে তারা যাতে আক্রান্ত না হয় এবং আদালতকক্ষে বা জেলের অভ্যন্তরে বিপ্লবীদের প্রতিশোধপরায়ণ রোষবহ্নি থেকে রক্ষা পায়, তার জন্য পুলিসের সুব্যবস্থার কোন ত্রুটি ছিল না। তা'ছাড়া আমাদের—ত্রিশজন যুব-বিদ্রোহের "আসামীকে" নিয়ে প্রতিদিন আদালত-ভবনে যাওয়া-আসা করা এবং বিচার চলাকালীন প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত সেখানে সজাগ ও সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করার সমস্যা কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ও বিব্রত করে তুলেছিল। তবু "বৃটিশ সিংহকে" ভারতবাসীর কাছে প্রমাণ করতেই হবে তার সিংহাসন এখনও অটল ও সুদৃঢ় আছে—চট্টলার মুষ্টিমেয় যুবককে তারা ভয় পায় না—পরোয়া করে না!

দশটার আগেই আমরা প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি। মিলিটারী ও পুলিসের গাড়ি জেল-গেটে এসে গেছে। তাদের সঙ্গে আমাদের জন্য দু'টি বন্ধ ভ্যানও উপস্থিত। কিন্তু এই দু'টি ভ্যানে বোঝাই করে সকলকে এক সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হ'ত না—পাছে মাস্টারদার ঝটিকাবাহিনী আমাদের মুক্ত করার জন্য অকস্মাৎ আক্রমণ করে। তিন ক্ষেপে আমাদের আদালত-ভবনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল—একটি ভ্যানে আমরা থাকতাম, ড্রাইভারের পাশে থাকতো রাইফেল ও রিভলভারধারী পাহারাদার এবং ভ্যানের দরজা বন্ধ করে পেছনের ফুটবোর্ডে অনুরূপ সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন থাকতো। এইরূপ সজ্জিত ভ্যানের আগে ও পেছনে হাইপোর্ট-আরম্ পজিশনে উদ্যত রাইফেল হাতে আকস্মিক আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্যে মিলিটারী প্রস্তুত থাকতো।

সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত জেল থেকে আদালত-ভবনের পোয়া মাইল রাস্তায় সকল প্রকার প্রাইভেট যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ থাকতো। রাস্তার দুই পাশে দশ পা অন্তর খোলা সঙ্গীনযুক্ত রাইফেল হাতে বৃটিশ মিলিটারী সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত—তারা লোকজনদের কাছে আসতে বাধা দিত। চট্টগ্রাম-বাসী তাদের প্রিয় সন্তানদের তবু দেখবে, আন্তরিক ভালোবাসা জানাবে—তাদের উদ্দেশ্যে অজস্র আশিস্ বর্ষণ করবে। মিলিটারী বেষ্টনীর তফাতে তাই প্রতিদিন হাজারে হাজারে লোক আনা-নেওয়ার সময় আমাদের দেখবার জন্যে আকুল প্রতীক্ষায় উপস্থিত থাকতো। আমাদের একটিবার দেখবে বলে দূর দূর গ্রাম থেকেও প্রতিদিনই বহু লোকসমাগম হ'ত। তাদের বুকভরা দরদ,

অকাতর ভালোবাসা ও অজস্র আশীর্বাদ আমাদের মামলা চলাকালীন দু'টি বছর আমরা দু' হাতে কুড়িয়েছি! জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন, স্নেহ, ভালোবাসা ও দরদ আমাদের অমূল্য সম্পদ—এই মহামূল্য সম্পদই ছিল আমাদের অফুরন্ত শক্তির একমাত্র বাস্তব উৎস।

আদালত-ভবনের এক প্রান্তে দ্বিতলের একটি কক্ষে জেলা-জজের এজলাস। এই এলাকাটি যেন একটা দুর্গে পরিণত হয়েছে!—প্রায় একশ'জন সেপাই রাত্রি-দিনের অতন্দ্র প্রহরী! জজসাহেবের বিচারকক্ষের একপাশে একটি বড় ঘরে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণের উদ্দেশ্যে কয়েক হাজার exhibits রক্ষিত ছিল। এই সবের ভেতর টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বৃহৎ দু'টি স্যুইচ্ বোর্ডের ধ্বংসাবশেষ এবং পুলিস-লাইন ও A. F. I. হেডকোয়ার্টারে ফেলে-যাওয়া পোড়া, ভাঙা, অকেজো রাইফেল, রিভলভার, লুইস্‌গান, কার্তুজ, কার্তুজের খোল প্রভৃতি ছিল। এমন কি অনেক ভালো রাইফেল পিস্তলও সেই মালখানায় মামলার প্রয়োজনে সরকার পক্ষ মজুত রেখেছিলেন। তাই এই অংশের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সর্বক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ পুলিসের হেপাজতে ন্যস্ত ছিল। আমাদের বিচারের দিনগুলিতে আদালত-ভবন লোকে লোকারণ্য হ'ত। আদালত-ভবন থেকে সাধারণ লোককে বিতাড়িত করা অসুবিধে। তাই পল্টন ও এক কম্পানি সশস্ত্র কন্‌স্টেবল দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে রাখতো যাতে আমরা ভ্যান থেকে নামবার সময় জনসাধারণ আমাদের ভ্যানের কাছে আসতে না পারে। তবু লোকেরা অনেক সময় বাধা মানতো না—বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে তারা বারে বারে তাদের অন্তরের সমবেদনা ও ভালোবাসা জানাতে আমাদের খুব কাছে এসে পড়তো। কখনও কখনও তাদের অনেককে আমরা চিনেছি—এমন কি আমাদের সাথীরাও কেউ কেউ, যারা বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছে কিন্তু যাদের পরিচয় স্বীকারোক্তিতেও পুলিসের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি, তারাও মাঝে মাঝে আমাদের দেখতে এসেছে।

২৪শে জুলাই—প্রথম দিন খুব কড়া ব্যবস্থা। জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রাবল্যও সেদিন অত্যধিক। জজসাহেবের বিচারকক্ষটি প্রায় একটা ছোটখাটো থিয়েটার হলের মত। উঁচু প্ল্যাটফর্মে এজলাস—তিনটি চেয়ার। দুই পাশে দুই কমিশনার, মাঝে ট্রাইব্যুনালের ইংরেজ সভাপতি। এই উঁচু এজলাসের এক ধাপ নিচে একটা বড় টেবিলের দুই প্রান্তে দুই কেরানী বা পেশকার কাগজপত্র সামনে নিয়ে মনোযোগ সহকারে প্রেসিডেণ্টের নির্দেশ পালনের অপেক্ষায় আছে। এই এজলাসের ডান দিকে কাঠের রেলিং ঘেরা আর একটি

প্ল্যাটফর্ম—এখানে প্রায় নয়জন জুরীর বসবার মত ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আজ জুরীদের আসনে বসেছেন প্রেস রিপোর্টারেরা। ভারতের বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও এসেছেন। এই প্ল্যাটফর্মে যে-সব সাংবাদিকদের স্থানসঙ্কুলান হয় নি, তাঁদের বসবার ব্যবস্থা হয়েছে রেলিং-এর বাইরে। এজলাসের নিচের ধাপে পেশকারদের যে প্ল্যাটফর্ম, তারই বাঁ-দিকে সাক্ষীদের কাঠগড়া আর ডান-দিকে একটা ছোট স্থান রেলিং দিয়ে ঘেরা আছে। এখানে তিনজন স্বীকারোক্তিকারী তিনটি চেয়ারে সমাসীন। জজ ও পেশকারদের প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে প্রায় আঠারো ইঞ্চি উঁচু চৌকি পেতে স্টেজ সাজানো আছে। সামনের প্রথম ও দ্বিতীয় সারিতে লম্বা টেবিল ও সেই সঙ্গে চেয়ার পাতা আছে, বাদী এবং বিবাদী পক্ষের উকিল ব্যারিস্টারদের বসবার জন্যে। এর পেছনে আবার লম্বা সারি দিয়ে কেবল চেয়ার রাখা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই আজ প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন উকিল-ব্যারিস্টারের বসবার জায়গা ভরে গেছে। চট্টগ্রাম কোর্টের উকিল ও ব্যারিস্টারেরা প্রায় সকলেই আমাদের সমর্থক। এঁদের বেশির ভাগই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওকালতনামা সই করে অভিযুক্ত বিভিন্ন সাথীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য জুনিয়র হিসেবে এসেছেন। সরকারপক্ষে আছেন মাত্র দু'জন—পাবলিক্ প্রসিকিউটার মিঃ আব্দুল সত্তার ও তাঁর জুনিয়র হিসেবে সুখেন্দুবিকাশ। আর আমাদের সমর্থনে বিশেষ ব্যারিস্টার ছিলেন—মিঃ এস, সি, মুখার্জী, মিঃ এন, আর, দাসগুপ্ত, মিঃ জে, কে, ঘোষাল প্রমুখ এবং আইনবিদ অ্যাড্‌ভোকেট কামিনী দত্ত, অখিল দত্ত, রজনী বিশ্বাস মহাশয়েরা। তখনও শরৎ বোস, শ্রীশ বোস, প্রমুখ ব্যারিস্টারেরা আসেন নি। উকিলদের বসবার জায়গার ঠিক পেছনেই ছিল আসামীদের একটা বড় কাঠগড়া। আমাদের জন্য তিরিশজনের বসবার উপযুক্ত স্কুল-বেঞ্চের মত লম্বা লম্বা ক'টি বেঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। আনন্দের বাবা যোগেশ গুপ্ত, আমার বাবা গোলাব সিং ও রজতের বাবা শ্রীরঞ্জনলাল সেন আমাদের সঙ্গে অভিযুক্ত ছিলেন বলে তাঁদেরও আজ স্থান হয়েছিল আমাদের এই একই কাঠগড়ায়।

আসামীর কাঠগড়া থেকে হাত দুই-তিন ব্যবধানে দর্শক গ্যালারী ঘরের শেষ দেওয়াল পর্যন্ত ধাপে ধাপে উঠে গেছে। জেলা-শাসক পুলিসী অনুসন্ধানের পর আমাদের অভিভাবকদের স্পেশাল প্রবেশপত্র দিয়েছেন। প্রবেশপত্র নিয়ে দর্শকবৃন্দ ইতিমধ্যেই গ্যালারীর প্রতিটি আসন দখল করেছে। প্রায় দুশ' আড়াইশ' বা তারও কিছু বেশি দর্শকসমাগম হয়েছে। তার ওপর সশস্ত্র পুলিস, সার্জেণ্ট ও ইন্‌স্পেক্টারদের উপস্থিতিতে কোর্ট-রুমটি একেবারে গম গম করছে।

জেল-গেটে আমার সাথীদের প্রত্যেককেই হাতকড়া পরানো হয়েছে। তারপর তিন ক্ষেপে তাদের কোর্টে আনা হয়েছে। কোর্টে ভ্যান থেকে নামার সময় তাদের দেখে সমবেত জনমণ্ডলী আনন্দে ও পুলকে ফেটে পড়েছে। জনসাধারণ আমাদের যুবকসাথীদের কাউকেই চিনতো না—চেনা সম্ভবও ছিল ন। তিন ক্ষেপেই আমার সাথীরা এসেছে, আমাকে কিন্তু তখনও নিয়ে যায় নি। উপস্থিত জনসাধারণ আমাকে দেখতে না পেয়ে তিনবারই নিরাশ হয়েছে। চতুর্থ দফায় আমাকে একা যথারীতি পুলিস বেষ্টিত ভ্যানে আদালত-ভবনে নিয়ে এলো। আমার প্রতি চট্টলবাসীর দরদ ও আন্তরিকতার অভিব্যক্তি দেখে আমি অভিভূত হলাম—বার বার হাত তুলে তাঁদের আমি নমস্কার জানালাম—অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্য হলাম।

হাত দু'টি হাতকড়াতে বাঁধা। সার্জেণ্ট, ইন্‌স্পেক্টার ও সেপাইরা আমাকে চারদিকে ঘিরে আদালত-গৃহের দোতলায় ওঠালো। তখনও জানি না—আদালতকক্ষে কি দেখবো। আমাদের সমর্থনের জন্য উকিল-ব্যারিস্টার কারা এসেছেন? ভিজিটার কাউকে কি প্রবেশ করতে দেবে? সর্বোপরি আমি কি স্বীকারোক্তিকারীদের সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারবো—যেখান থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলা যাবে?

পুলিস বেষ্টিত হয়ে বিচারকক্ষে প্রবেশ করলাম। খুব শান্ত গুরুগম্ভীর পরিবেশ। এত লোক, তবু যেন সব নিস্তব্ধ। আমার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল বিচারকক্ষে একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো। পুলিস মুহূর্তে আমার হাতকড়া খুলে দিল। আমি অভিযুক্ত হলেও এখনও বিচারাধীন—তাই বৃটিশ আইনে আমার বিচার হবে মুক্ত পুরুষ হিসেবে। আসামীর কাঠগড়ার দরজা খুলে দেওয়া হ'ল—আর আমি মুক্ত পুরুষের মত "সুবিচারের আশায়" ট্রাইব্যুনালের সামনে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ শুনতে পেলাম জুতোর গোড়ালি ঠুকে মিলিটারী কায়দায় স্যালুট দেওয়ার মত সুস্পষ্ট আওয়াজ। আমার প্রায় হাত বারো সামনে স্বীকারোক্তি-কারীদের একজন আমাকে স্যালুট দিল। হাসিমুখে অত্যন্ত স্নেহভরে আমিও তাকে হাত তুলে প্রত্যভিবাদন জানালাম।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডের আদেশের প্রতীক্ষায় ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে "আসামীর কাঠগড়ায়" স্ফীতবক্ষ, উন্নত ললাট, দৃঢ়চিত্ত বন্ধুরা সমাসীন—(১) হেরম্ব বল (২) সুবোধ বল (৩) আশুতোষ ভট্টাচার্য (৪) সুকুমার ভৌমিক (৫) সুবোধ বিশ্বাস (৬) অশ্বিনীকুমার চৌধুরী (৭) সৌরিন্দ্রকুমার দত্তচৌধুরী

(হারান) (৮) শ্রীপতি চৌধুরী (৯) সুবোধকুমার চৌধুরী (১০) রণধীর দাশগুপ্ত (১১) সহায়রাম দাস (১২) ধীরেন্দ্রলাল দস্তিদার (১৩) সুখেন্দুবিকাশ দস্তিদার (১৪) ননীগোপাল দেব (১৫) মলিনবিকাশ ঘোষ (১৬) নিতাইপদ ঘোষ (১৭) মধুসূদন গুহ (১৮) সুবোধচন্দ্র মিত্র (১৯) শান্তিভূষণ নাগ (২০) ফণীন্দ্রলাল নন্দী (২১) সুবোধ চন্দ্র রায় (২২) বিজয়কুমার সেন (২৩) নন্দলাল সিং (২৪) অনিলকুমার রক্ষিত (২৫) অর্ধেন্দুশেখর গুহ—আমাকে তারা তাদের মধ্যে বরণ করে নিল। এখন আমরা ছাব্বিশজন। আরও তিনজন আমাদের সঙ্গে অভিযুক্ত হয়ে এই কাঠগড়ায় আছেন—রজতের, দেবুর ও আমার বাবা।

প্রথমেই আমাদের ব্যারিস্টার মিঃ জে, কে, ঘোষাল ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্টের কাছে অনুরোধ জানালেন, আমাদের বাবাদের যেন ডকের বাইরে উকিলদের সঙ্গে বসবার অনুমতি দেন। মিঃ জে, ইউনী সেই অনুরোধ উপেক্ষা করেন নি।

মামলা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালতকক্ষে সমবেত সবাইকে চমৎকৃত করে স্বীকারোক্তিকারীরা একে একে প্রেসিডেন্টকে তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত জানালো। তারা প্রত্যেকে যদিও স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলো, তবু একজনের বেলায় সেই প্রত্যাহার তখনও অর্থহীন। কারণ, সে বলল—"আমি পুলিসের কাছে যা যা স্বীকার করেছি, তা সবই তারা আমার কাছ থেকে জোর করে আদায় করেছে—এবং তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।" তখনও এই স্বীকারোক্তিকারী আদালতে বলেনি যে, S. D. O.-র কাছে সে যা বলেছে তাও মিথ্যা এবং তাও সে প্রত্যাহার করছে। প্রেসিডেন্ট তাদের statement তক্ষুণি লিপিবদ্ধ করলেন।

মামলা সুরু হ'ল। সরকারীপক্ষের উকিল মিঃ আব্দুল সত্তার "case open" করলেন। অর্থাৎ ট্রাইব্যুনাল ও আসামীপক্ষের উকিলদের মামলার বিষয়বস্তু বোঝাতে লাগলেন। আব্দুল সত্তার সাহেব এই নিয়ে সাতদিন বক্তৃতা করলেন। আমাদের বিপ্লবী দলের শৈশব থেকে সেই দিন পর্যন্ত যে সব হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে এবং ভারতীয় গণতন্ত্রীবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা যে সমস্ত বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তিনি তার একটা বাস্তব চিত্র দেবার চেষ্টা করলেন। অতীতের কবর খুঁড়ে তিনি পরইকোড়া ডাকাতি, রেল-ডাকাতি, নাগারখানা যুদ্ধ, সুলুকবাহার ষড়যন্ত্র, প্রফুল্ল রায় হত্যা প্রভৃতির বিবরণ দিয়ে বোঝাতে চাইলেন আমরা হঠাৎ যুব-বিদ্রোহ ঘটাই নি—ধারাবাহিকভাবে স্তরে স্তরে যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্ব চলেছিল। প্রায় ১৯২০ সাল থেকেই আমাদের

বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছিল এবং দশ বছর পরে—১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, তা চরম রূপ পরিগ্রহ করেছে। সর্ব-ভারতের প্রেস-রিপোর্টারেরা এবং উপস্থিত উকিল-ব্যারিস্টার ও দর্শকবৃন্দ পাবলিক্ প্রসিকিউটার সাহেবের এই "সারগর্ভ" বক্তৃতার মর্ম উপলব্ধি করে বুঝেছিলেন, সরকারপক্ষ আমাদের কঠোর দণ্ড দিতে ট্রাইব্যুনালের আদালতে সর্বতোভাবে, অর্থাৎ নথিপত্র মিথ্যা সাক্ষী ও স্বীকারোক্তি প্রভৃতির সাহায্যে, মামলা খাড়া করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

আমাদের অভিভাবকেরা, বিশেষ করে আশুতোষের বাবা বিপিন ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্রর বাবা, সুবোধ বিশ্বাসের বাবা ও কাকা, রণধীরের বাবা ও জ্যাঠতুতো দাদা, আমার দিদি ইন্দুমতী সিং এবং আরো অনেকে সরকারপক্ষের ব্যাপক মামলার আয়োজনকে যতদূর সম্ভব ব্যর্থ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। উনত্রিশজনের বিরুদ্ধে মামলা। নিজ নিজ বাড়ি থেকে মামলা চালান প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাদের অভিভাবকেরা কলকাতা ও বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে নামকরা উকিল-বারিস্টারদের আমাদের পক্ষ সমর্থনে নিয়োগের চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা কলকাতায় উপস্থিত থেকে বৈপ্লবিক দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সাধ্যমত উপযুক্ত উকিল-ব্যারিস্টার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং মামলা চালাবার জন্য অর্থের ব্যবস্থাও করলেন। কিন্তু বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিনের পর দিন মামলার জন্য বাইরে থাকাও সকলের পক্ষে স্বভাবতই সম্ভব ছিল না। এই গুরুদায়িত্ব ইন্দুমতী সিং নিজ স্কন্ধে তুলে নিলেন। তিনি তো কেবল আমারই দিদি নন, তিনি যে সবার দিদি—ভাইয়েরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় ইংরেজের আদালতে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে—এই অবস্থায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা দিদির পক্ষে সম্ভব নয়! মাস্টারদা দিদিকে ১৮ই এপ্রিল এই মর্মে চিঠি দিয়েছিলেন—ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক বর্তিকা যেন নির্বাপিত না হয়, সেই প্রজ্বলিত মশাল হাতে দিদিকেই এগিয়ে যেতে হবে। লালবাজার "পুলিস দুর্গে" দিদি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে এসেছিলেন, মামলায় আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য যতদূর সম্ভব শক্তিশালী ডিফেন্সের ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয়ই করবেন।

মামলার সুরুতেই দিদির প্রাথমিক চেষ্টায় মিঃ এস, সি, মুখার্জী ও মিঃ এন, আর, দাশগুপ্ত আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য কলকাতা থেকে এসে অন্যান্য উকিল-ব্যারিস্টারদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমি প্রথমেই ব্যক্তিগতভাবে নিজের

পক্ষ সমর্থন করবো বলে আদালতকে জানিয়েছিলাম। পাবলিক্ প্রসিকিউটার মামলার সূচনা করে বক্তৃতা দেবার পরেই একের পর এক তাদের জবানবন্দী নিয়ে পর মুহূর্তেই সাক্ষী হাজির করতে লাগলো। যথারীতি জেরা চললো। আমাদের পক্ষে উকিল-ব্যারিস্টারেরাই জেরা করতেন। মাঝে মাঝে অবশ্য আমি এর ব্যতিক্রম ঘটাতাম—নিজে আত্মপক্ষ সমর্থন করছিলাম বলেই কোন কোন বিশিষ্ট সাক্ষীকে আমি জেরা করেছি।

সার্জেণ্ট মেজর ফেরেল A. F. I. হেডকোয়ার্টারে আমাদের গুলীতে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁর বেয়ারাই একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষী দিল—অবিকল ক্যাপ্টেন টেট্ সাহেবের মত দেখতে—গৌরবর্ণ, খাকী মিলিটারী পোশাক পরিহিত বলিষ্ঠ দেহ এক ব্যক্তি সার্জেণ্ট মেজরকে হত্যা করেছে। সরকার লোকনাথ বলের বিরুদ্ধে এই প্রতক্ষ্যদর্শী সাক্ষীকে এনেছে। তখনও কিন্তু লোকনাথ ধরা পড়ে নি। কাজেই তার উপস্থিতিতে এই সাক্ষী আসে নি। তবু যদি সুযোগ পায় ভবিষ্যতে হয়ত এই সাক্ষীই লোকনাথের বিরুদ্ধে বলবে। তাই আমাদের পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টারেরা জেরা করে এই সাক্ষীর জবানবন্দী মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। এই সাক্ষী আদালতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল—প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নানা বর্ণনা দিয়েছে, জেরায় কিছু অতিরঞ্জিত করেছে; আবার মিথ্যা ঢাকতে আরো মিথ্যা বলে কোণ ঠাসা হয়ে সবার মধ্যে চাপা হাসির খোরাক জুগিয়েছে। আদালতের proceedings (কার্যক্রম) সম্বন্ধে আমি সাধারণতঃ উদাসীন থাকতাম। এই সাক্ষীর বেলায় কিন্তু আমি একটু মনোনিবেশ করেছিলাম। আমাদের পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টারেরা এই পক্ষের জেরা শেষ করলে আমার কাঠগড়া থেকে নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রেসিডেণ্টকে সম্বোধন করে উচ্চৈঃস্বরে আমি বললাম—

"Your honour I will ask only one question to the witness."

—মাননীয় প্রেসিডেণ্ট, সাক্ষীকে আমি মাত্র একটি মাত্র প্রশ্ন করবো।

উপস্থিত প্রেস-রিপোর্টারেরা, উকিল-ব্যারিস্টার ও ট্রাইব্যুনালের বিচারতিরা এবং দর্শকবৃন্দ উদ্‌গ্রীব ঔৎসুক্যে আমার সেই "একটি প্রশ্ন" শোনার অপেক্ষায় কান খাড়া করে রইলেন। কাঠগড়ার ভেতর থেকেই আমার জেরা করার ব্যবস্থা ছিল। আমাকে একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার দেওয়া হয়েছিল। আমি চেয়ারে উঠে এক পা টেবিলের ওপর দিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর বেশ ভারী ও জোর গলায় সাক্ষীকে প্রশ্ন করলাম—"দেখ, তুমি বলেছ তোমার

সাহেবকে যে হত্যা করেছে সে ক্যাপ্টেন টেটের মত ফর্সা, লম্বা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি—আর তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ তার কালো বড় একজোড়া গোঁফও ছিল ?"

এমনভাবে প্রশ্ন করলাম যে, ক্যাপ্টেন সাহেবের মত ফর্সা, লম্বা, বলিষ্ঠ ব্যক্তির কি আর কালো বড় একজোড়া গোঁফ না থেকে পারে ? বেয়ারা যা দেখেছে তাই তো বলবে—উত্তর দিল—"হ্যাঁ।" আমি আমার একটি প্রশ্নের একটিই উত্তর পেলাম। তক্ষুণি প্রেসিডেণ্টকে সম্বোধন করে বললাম—

"Yes sir, I have got the answer to my question. The witness has seen a big and black pair of mostaches of the same person whom he described as the murderer of Sgt. Maj. Farell."

—আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি—সার্জেণ্ট মেজর ফেরেলের হত্যাকারীর মুখে বড় কালো এক জোড়া গোঁফ দেখেছে সাক্ষী। পরদিন সকালে পাঞ্চজন্য হাতে অপর্ণা ঠাকুরের হুঙ্কারে চট্টগ্রামের রাজপথ মুখরিত হ'ল—"অনন্ত সিংহের জেরা—সার্জেণ্ট মেজর ফেরেলের হত্যাকারীর মুখে একজোড়া কালো বড় গোঁফ !"

মামলা চলাকালীন প্রতিদিনই কিছু না কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলত। কখনও কৌতুকোদ্দীপক সাক্ষীর জেরা, কখনও ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে ঝগড়া, আবার কখনও বা পুলিস প্রহরীদের বিভ্রান্ত করা আদালতে আমাদের দৈনন্দিন কাজ ছিল। একজনের স্বীকারোক্তি তখনও পুরোপুরি প্রত্যাহৃত হয় নি। কি করা যায় ?

পুলিস পাহারার কিছু দূরে অন্য ডকে স্বীকারোক্তিকারী তিনজনকে রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে দু'জন সন্দেহাতীত ভাবে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করবার পরেও আদালতে বড় কাঠগড়ায় তাদের স্থানান্তরিত করা হয় নি। সেই দু'জন প্রেসিডেণ্টকে বার বার অনুরোধ জানিয়েছে তাদের ওই কাঠগড়া থেকে স্থানান্তরিত করতে ; কিন্তু প্রেসিডেণ্ট প্রতিবারেই তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। সরকারপক্ষের বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল, যদি মাত্র একজন স্বীকারোক্তিকারী কাঠগড়ায় একা থাকে, তবে হয়ত তাকে আদালতে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের বিদ্রূপের শিকার হতে হবে এবং তখন মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে সেও শেষপর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয় তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেবে। এই মনোভাব থেকে কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন

যাতে তাঁরা পরাজিত না হন—অন্তত শেষ স্বীকারোক্তিটি যেন কোন মতেই প্রত্যাহৃত না হয়।

যে দু'জন স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছে কর্তৃপক্ষ, তাদের স্থানান্তরিত করছেন না এবং তাদের পুলিস প্রহরা শিথিল করবারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাই আমি বাধ্য হয়ে কলকাতার বিখ্যাত আইনজ্ঞ শিশির মুখার্জীর শরণাপন্ন হলাম—পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে তিনি টিফিন টাইমে ওই স্বীকারোক্তি-কারীর কাছে গিয়ে একটিবার যেন বলেন, যতক্ষণ সে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার না করছে, ততক্ষণ আমাদের কারো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুবিধে হবে না। কিন্তু তিনি সাহস করলেন না। অন্যান্য আইনজ্ঞদেরও অনুরোধ করলাম; কিন্তু পাছে স্বীকারোক্তিকারী পুলিসের কাছে বলে দেয় যে, স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করবার জন্য তাঁরা তাকে প্ররোচিত করছেন, এই ভয়ে তাঁরাও আমার অনুরোধ রাখতে অসম্মত হলেন।

উপায় নেই—হাব মানলে চলবে না! শেষ স্বীকাবোক্তিটিও প্রত্যাহাব করাতেই হবে যে কোন মতে—Where there is a will: there is a way!—ইচ্ছের অভাব না থাকলে পথেরও অভাব হয় না। আপ্রাণ চেষ্টায় কোনমতে সুযোগ কবে যারা স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছে তাদের দু'জনকে জানালাম, তারা যেন প্রতিদিন মামলা চলাকালে প্রেসিডেণ্ট ও পুলিস কর্তাদের দৃষ্টি তাদেব নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট কবে। তারপর দু'জনে হাত নেড়ে নানারকম মুখভঙ্গী করে সামনে ঝুঁকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তৃতীয় স্বীকারোক্তিকারীর (যার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করাতে হবে) সঙ্গে 'সাধারণ আজে-বাজে কথা' এমনভাবে অলোচনা করে, যাতে কর্তৃপক্ষ সহজেই মনে করতে পাবে যে, তারা ওই ব্যক্তির স্বীকাবোক্তিটিও প্রত্যাহার করাবার জন্য দু'জনে মিলে তাকে প্রভাবান্বিত করছে। দাবার চালটি আশাতীত-ভাবে সফল হ'ল। পরের দিনই কর্তৃপক্ষ ভয়ে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারকারীদেব তাদের সবেধন নীলমণি সেই তৃতীয় স্বীকারোক্তিকারীর সঙ্গে এক কাঠগড়ায় বসতে দিল না। আমাদের সঙ্গে বড কাঠগডায় এই দু'জনের বসবার ব্যবস্থা হ'ল। স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে এসেছে—এদের আমরা আপন ভেবে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! এই সাজান দৃশ্যটি বন্ধুহীন, সাথীহীন একা দণ্ডায়মান ওই তৃতীয় স্বীকারোক্তিকারীর চোখের সামনেই ঘটলো। এর প্রতিক্রিয়া তাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করলেও সে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, স্বার্থ ও ভয়মুক্ত হতে পারছিল না—শত্রুর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা তখনও যেন

তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।" দ্বিধাগ্রস্ত মনে পরের দিন সে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ জানালো—

"Sir, please put me also in the same dock with other accused." —স্যার, আমাকেও অনুগ্রহ করে অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গে একই কাঠগড়ায় রাখুন।

বেশ বোঝা গেল এই অনুরোধ শুনে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে, ইউনী বেশ রেগে গেলেন এবং রীতিমত বিব্রত বোধ করলেন। তবু স্বাভাবিক ভাব বজায় রেখে একটু হেসে বললেন—"Oh! no—no—no!" আদালত-গৃহে উপস্থিত সবার সামনে কর্তৃপক্ষেব এইরূপ অসহায় অবস্থাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

আমাদের মামলার তদ্বির ও ডিফেন্স কিভাবে আরো জোরদার করা যায় তাই নিয়ে আমার দিদি ইন্দুমতী সিং এবং অন্যান্য অভিভাবকেরা খুবই ব্যস্ত। মামলার স্থচনায় দিদি কলকাতায়। তিনি পুলিসের চোখের অন্তরালে বৈপ্লবিক দলের নেতাদের সঙ্গে গোপনে সংযোগ রাখছিলেন। নেতারা সকলেই আত্ম-গোপন করে দিন কাটাচ্ছিলেন। কাজেই তাঁদের সঙ্গে দিদির স্বাভাবিক উপায়ে যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হয় নি। কালীদা ("Rolls of Honour" গ্রন্থটির লেখক—শ্রীকালীচরণ ঘোষ) সেই সময় শরৎবাবুর (৺শরৎচন্দ্র বসু) সঙ্গে দু'টি দিন ও দু'টি রাত ধরে অনেক পরামর্শ করেছেন—আমাদের মামলা নিয়ে আর কি করা যায়? এই সময় শরৎবাবু ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে তিনমাসের জন্য আদালত বর্জন করেছেন। "The Statesman"—দৈনিক পত্রিকা খুব ফলাও কবে এই সংবাদ প্রচাব করল—

"The Calcutta High-Court is going to be deprived for three months from the silvery tongue of Mr. Sarat Chandra Bose, a member and the doyen of English Bar."

শরৎবাবুর এই আদালত বর্জনের সংবাদ কেবল যে কলকাতা বা বাংলার আইন ব্যবসায়ীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল তা' নয়, সারা ভারতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। আমার দিদি, কালীদা ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষীরা আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য চট্টগ্রামে ট্রাইব্যুনাল বিচারে উপস্থিত থাকতে শরৎবাবুকে অনুরোধ জানালেন। তিনি প্র্যাকটিস সাসপেণ্ড করেছেন গান্ধীজীর অহিংস-আইন অমান্য আন্দোলনের আনুগত্যে—আর আমাকে এই অবস্থায় Defend করার একমাত্র অর্থ, বাংলার সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রতি খোলাখুলিভাবে তাঁর নৈতিক

সমর্থন! কাজেই শরৎবাবুর মনে বিশেষ দ্বন্দ্ব দেখা দিল। কালীদার মুখে শুনেছি এবং দিদির কাছেও জেনেছি শরৎবাবু অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি ভাববার জন্য দুটো দিন সময় নিলেন। অবশেষে তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত জানালেন—আমাদের মামলায় তিনি সরকারের বিরুদ্ধে আমার পক্ষ সমর্থন করবেন।

মামলায় আমার পক্ষ সমর্থন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা শরৎবাবুর পক্ষে একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। বহু বৎসরের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও সাংগঠনিক যোগসূত্র না থাকলে পরে শরৎবাবুর পক্ষে হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হ'ত না।

এই বিশেষ তথ্যটি সম্যকরূপে উপলব্ধি করার জন্য একটু আগে থেকে বলা প্রয়োজন। সেই সময়ে ১৯৩০ সালে, গান্ধীজীর ইতিহাস বিখ্যাত লবণ-আইন-ভঙ্গের ডাণ্ডী অভিযান সুরু। দিকে দিকে আইন-অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো। বাঙ্গলার বিপ্লবী ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে যুবকদের হাতে বোমা-পিস্তল গর্জে উঠলো। সূর্যসেনের নেতৃত্বে ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর শাখা সশস্ত্র বিদ্রোহে জয়ী হয়ে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করলো। ভারতের সর্বত্র গান্ধীজীর অহিংস-আইন-অমান্য আন্দালন অবশ্যম্ভাবী সহিংস গতি নেওয়ার মুখে। ভারতে ও বাংলা দেশে অহিংস আন্দোলন এবং তার পাশে পাশ সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টা এক বাস্তব ইতিহাস। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে হিংসা ও অহিংসা সংগ্রামের ইতিহাস বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার বিস্তারিত ইতিহাস হয়ত বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত হবে কিন্তু সেই গুরুদায়িত্ব বহনে আমি অক্ষম। তবে আমার সীমিত গণ্ডির মধ্যে আমাদের সঙ্গে গান্ধীরাজের অহিংস নীতির যে ভিন্নমুখী অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা প্রবাহিত এবং কংগ্রেসের খোলা ময়দানে যে সংঘাতের প্রকাশ, তার সামান্য বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতব্যাপী গণআন্দোলনে গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের নির্ভেজাল নীতি ও ধর্মের অবান্তর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার মূলগত পার্থক্য সকলের সুবিদিত। সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রধানতঃ বাংলার একসময়কার বিভিন্ন বিপ্লবীদলের চিন্তাধারার এক সমষ্টিগত বিকাশ। বাঙ্গলার ও ভারতের রাজনীতিতে, সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতেই, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বাঙ্গলার বিপ্লবীদলের যে যোগাযোগ ছিল এবং সেই সূত্রে পরবর্তিকালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবীদলের যে ঘনিষ্ঠতা ও সংযোগ দেখা যায়, তার সূত্রও জানা প্রয়োজন; আরও জানা প্রয়োজন, সরকার কিভাবে দেশবন্ধু,

সুভাষচন্দ্র ও বাঙ্গলার বিপ্লবীদের সন্দেহের চোখে দেখতো ও তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতো।

আমি বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে বন্দী হয়ে বর্ধমান জেলে এলাম। সেই দিন জেলে খবরের কাগজে দেখলাম—

যদি কর্পোরেশনের প্রধান-কর্মসচিব ফৌজদারী অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হয় তবে মেয়রও সেই একই দোষ দোষী নিশ্চয়ই—*"If love of country is a crime, I am a criminal. If the Chief Executive Officer is a criminal, the Mayor is a criminal also."*

বাংলার লর্ড লিটন্, ১৯২৪ সালে ৩নং রেগুলেশন ও অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে বিপ্লবীদের যখন বন্দী করলেন এবং সেই একই সঙ্গে কর্পোরেশনের প্রধান-কর্মসচিব (Chief Executixe Officer) সুভাষচন্দ্রকেও বিনা বিচারে কারাকক্ষে নিক্ষেপ করলেন, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলকাতা কর্পোরেশনে মেয়রের আসন থেকে উচ্চকণ্ঠে ও কঠোর ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

বাংলার লাট লর্ড লিটন্ ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর বিনা বিচারে আটক করবার জন্য অর্ডিন্যান্স জারী করলেন। সেইদিন সারা বাংলা থেকে আমাদের চুরাশিজনকে বিনা বিচারে বন্দী করে কারারুদ্ধ করা হ'ল। সেই একই দিনে ভোর রাত্রে সুভাষচন্দ্র, অনিলবরণ, সত্যেন মিত্র, গণেশ ঘোষ প্রমুখ বিশেষ বিশেষ ক'জনকে Bengal Ordinance-এ গ্রেফতার না করে কর্তৃপক্ষ ভারতরক্ষা তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। তাই বিনা বিচারে সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করার বিরুদ্ধে দেশবন্ধুর প্রতিবাদ বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—"যদি সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম অপরাধ হয় তবে আমিও অপরাধী।"

১৯২২ সালে বৃটিশ সরকারের দমন-নীতিতে গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলন যখন ব্যর্থতায় পরিণত হ'ল, তখন বাংলাদেশের তরুণদের হাতে আবার বোমা-পিস্তল গর্জন করে উঠলো। বিপ্লবী সমিতির কার্যকলাপ ও প্রস্তুতির জন্য রেল-কোম্পানী ও পোস্ট অফিসের টাকা লুঠ হতে লাগলো। গুপ্ত-পুলিস বিভাগের সাব্-ইন্স্পেক্টার প্রফুল্ল রায় অনন্ত সিংহকে গ্রেপ্তার করবার অপরাধে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হলেন। নাগারখানা পাহাড়ে পুলিসের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ, গোপীনাথের পিস্তলের গুলীতে সার চার্লস টেগার্ট ভ্রমে মিঃ আর্নেস্ট ডে-র মৃত্যু, প্রভৃতি বৃটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তুললো।

ক্ষুব্ধ জনতা চৌরিচোরাতে পুলিস-ঘাঁটি আক্রমণ করে পুলিসদের হত্যা করে। গান্ধীজী এতে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি "বরদলই" প্রস্তাব পাশ করলেন। অসহযোগ-আন্দোলন যখন তীব্ররূপ গ্রহণ করে এগোতে যাচ্ছে, তখন প্রস্তাব পাশ হ'ল—অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলন বন্ধ কর। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে যেমন বিপ্লবীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তেমনি আবার দেশবন্ধুর নেতৃত্বে ও সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতায় স্বরাজ্য পার্টি গড়ে উঠেছে। বঙ্গীয় জেলা ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে বিপ্লবীরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলো। দেশবন্ধুর সঙ্গে বাংলার তরুণ বিপ্লবীদের, ১৯০৮ সালের আলিপুর মামলার সময় থেকে, ঐতিহাসিক যোগাযোগের কথা সকলেরই জানা আছে। ১৯২২ সালে দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত—সুভাষচন্দ্র স্বভাবতই বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ধরে নেওয়া যায়, স্বরাজ্য পার্টি তখন বাংলার বিপ্লবীদের এক অংশের প্রকাশ্য সংগঠন ছিল। স্বরাজ্য পার্টির প্রকাশ্য সংগঠন ও গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির পরস্পরের যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে যে অত্যন্ত ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পুলিসের গোপন দলিল থেকে এই মর্মে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। দলিল থেকে উদ্ধৃত করছি:—

"2. 1922

Terrorists represented in Bengal Provincial Congress Committee and All India Congress Cammittee—

'The Chouri Choura massacre followed in February 1922. The Working Committtee then passed the famous Bardoli resolution suspending mass disobedience. This and the imprisonment of Mahatma Gandhi caused a lull in the non-co-operation movement. The extremist party, however which had no faith in the non-violent cult, was steadily increasing. In Bengal this section was composed of terrorists who succeeded in capturing a large number of seats in the Executive Committee of the various District Congres Organisations and became represented in the Bengal Congress Executive Committee and the All India Congress Committee. They made several

attempts to commit the Bengal Congress Committee to a violent programme'

(R. E. A. Ray Special Superintendent, I. B., C. I. D., The 25th Jannary 1932. Page. I)."

পুলিসের বক্তব্য, বাংলা দেশের বিপ্লবীরা জেলা-কংগ্রেস কমিটির বহু সভ্যপদ অধিকার করে এবং প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কমিটিতেও তাঁরা প্রচুর আসন লাভ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বিপ্লবীরা সহিংস প্রোগ্রাম গ্রহণ করবার জন্য বার বার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য, বাংলা কংগ্রেসে যুগান্তর পার্টি দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলতো।

১৯২২ সালে গয়া অধিবেশনে কংগ্রেস কর্মী ও নেতারা বিভক্ত হয়ে গেলেন। শ্রীরাজাগোপালাচারী প্রমুখ নেতারা "no changer" হিসেবে গান্ধীজীর নেতৃত্বের অনুরক্ত ছিলেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সেই সময় কংগ্রেসের আর একটি অধিবেশনে স্বরাজ্য পার্টি গঠন করা হ'ল। মতিলাল নেহেরু, এন, সি, কার্লেকার প্রমুখ নেতারা ১৯১৯ সালে ভারত সরকারের অ্যাক্ট অনুযায়ী কাউন্সিল বর্জন না করে ভোটযুদ্ধে কাউন্সিল অধিকার করা সাব্যস্ত করলেন। ১৯১৯ সালের অ্যাক্ট অনুসারে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পূর্বাহ্নে, স্বরাজ্য পার্টি ১৯২৩ সালে ম্যানিফেস্টো মারফত ঘোষণা করলেন যে, যদি তাঁরা এসেমব্লি ও কাউন্সিলে অধিক সংখ্যায় আসন লাভ করেন, তবে তাঁরা "Unifrom, Continuous and Consistent" ভাবে (সমান তালে, নিরবচ্ছিন্নভাবে ও সঙ্গতির সঙ্গে) কাউন্সিলে এবং এসেমব্লিতে ঘোর প্রতিরোধ সৃষ্টি করবেন। দ্বিতীয়ত, যদি তাঁরা ১৯১৯ সালের অ্যাক্টের গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে অপারগ হন, তবে গান্ধীজীর ডাকে আবার আইন-অমান্য-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেবেন।

১৯২৩ সালের কাউন্সিলে ও কেন্দ্রীয় এসেমব্লিতে স্বরাজ্য পার্টি সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নানা আইন প্রণয়ন বিষয়ে ও বাজেট পাশ করার ব্যাপারে সফলতার সঙ্গে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেন। স্বরাজ্য পার্টির কাউন্সিল ও এসেমব্লির আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং বিপ্লবী দলের সঙ্গে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের সংযোগ সূত্রকে বাংলাদেশের পুলিস বিভাগ বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থা বলে মনে করেছে। তারা এই বৈপ্লবিক সম্পর্ককে বিনষ্ট করবার জন্য কিরূপ বেপরোয়া হয়ে তিন নম্বর রেগুলেশন প্রয়োগ করেছে, তার বিবরণ পুলিসের গুপ্ত নথি থেকেই পাওয়া যায়—

"3. 1923. Terrorists support Mr. C. R. Dasss's 'Swarajya Party', in return for Mr. C. R. Das's connivance at the secret cnspiracy—

In 1923 Congress ranks in Bengal were torn by faction over the question of Council entry which Mr. C. R. Das and his Swarajya Party were sponsoring. Mr. C. R. Das was supported by the terrorists without whose help he could never have won his victory for Council entry over the no-changer. It is known that the leader of the Swarajya Party was aware that his terrorist-allies were engaged in criminal conspiracy. It is also known that his connivance at it was the price that the terrorists demanded for their support which was essential to his success in elections. Government attacked this conspiracy by arresting the ring leaders under Regulation III. Most of them were members both of the terrorist party, known as the 'Jugantar Party' and of the Swarajya Party. The Swarajya Party immediately accused Government of using Regulation III to crush the Sawarajya Party and demanded the *repeal* of Regulation III and the release of the persons arrested under it. It is interesting to record therefore that in 1923 it was noticed that the Headquarters of both parties in Calcutta were at one and the same place".

(Secret, Page I, 12th Jan. 1932 by R.E.A. Ray, Special Superintendent, I. B., C.I.D.).

তদানীন্তন বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত বাংলা সরকারের Political Secretary কর্তৃক যদি এই সম্বন্ধীয় কোন document বা নথিপত্র মুদ্রিত হয়ে থাকে তবে তা কূটনৈতিক ভাষায় প্রণীত হয়েছে। কিন্তু উপরের পুলিস বিভাগের secret document থেকে স্বরাজ্য পার্টি ও বৈপ্লবিক দলের ঐক্যের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের জঘন্য চক্রান্তের নগ্ন স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়! তারা লিখেছে—

"Government attacked this conspiracy by arresting the ring leaders under Regulation III. Most of them were members both of the terrorist party known as Jugantar Party and of the Swarajya Party."

১৯১৯ সালের বিধি অনুযায়ী কাউন্সিল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা কি conspiracy—ষড়যন্ত্র ?

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালের Montegu-Chemsford Reform আইনে পাশ করিয়ে তথাকথিত "আইনসভা" (কাউন্সিল) সরকারভজা Liberals-দের (উদারপন্থীদের) নিয়ে পরিচালিত করার আশা পোষণ করেছিল। দুটি বছর, ১৯২০-২২ সাল, ইংরেজ শাসক অবাধে উদার-পন্থীদের সমর্থনে ভারতবর্ষ শাসন করেছে। কিন্তু ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ্যপার্টি কাউন্সিল ও এসেমব্লির অধিক সংখ্যক ভোট অধিকার করে। তাদের "obstructionist policy"তে সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সময় দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী দলের এক অংশের ঘনিষ্ঠ বৈপ্লবিক সম্পর্কের বিষয় পুলিসের অজানা ছিল না। পুলিসের সেই ইংরেজীতে মুদ্রিত secret document থেকে পাওয়া যায়—

"Early in 1925 a promiment member of the Congress party admitted during an interview with a high Government Official that HE knew personally of the existence in Bengal of a terrorist movement, the members of which, were hand in glove with the Swarajist." (Ibd. P. 2, Para 5).

ঘরের শত্রু বিভীষণের অভাব নেই। পুলিসের এই গুপ্ত রিপোর্টে সেই বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসীর নাম সযত্নে গোপন রাখা হয়েছে। জানি না সেই কংগ্রেসী আজও নেতা হিসেবে বেঁচে আছেন কিনা এবং জীবিত অবস্থায় বর্তমানে কোন একটি কংগ্রেসী মন্ত্রীপদের শোভাবর্ধন করেছেন কিনা!

১৯২৩ সালে স্বরাজ্য পার্টি ও বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ বৈপ্লবিক সম্পর্ক—যা তখন সরকারের বিরুদ্ধে Revolutionary Strategy (বৈপ্লবিক রণনীতি)—সেই সময় বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত পুলিসের কাছে সেইটিকে গোপনে প্রকাশ করা গুরুতর অপরাধ—নিকৃষ্টতম দেশদ্রোহিতা! কিন্তু সেইদিন বাংলার বিপ্লবী দলের সঙ্গে

দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল সেই ঐতিহাসিক তথ্য বর্তমানে যদি জানা না যায় তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় অপরিহার্য অধ্যায় রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

১৯২১ সাল থেকে সুভাষচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনে বিপ্লবীদের সঙ্গী করে নিয়েছিলেন আর বিপ্লবীরাও সুভাষের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক সংগঠন সুদৃঢ় করতে সুযোগ পেলেন। Morning shows the day—ভোরের আলো আগত দিনের সূচনা করে! সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন গান্ধীজীর অহিংসা ধর্ম এবং খদ্দর ও চরকার মহিমার মধ্যে জন্মলাভ করে নি। তাঁর বলিষ্ঠ রাজনীতির প্রথম প্রভাত দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হয়েছে ক্ষুধিরাম, কানাইলাল, যতীন মুখার্জী ও শত শহীদের রক্তসিঞ্চিত বাংলার মাটিতে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কোন এক আকস্মিক ঘটনা নয়—এই বৈপ্লবিক সম্পর্ক—স্বদেশপ্রেমের চরম স্বার্থত্যাগ সাহসী ও নিরহঙ্কার প্রেরণার স্বাভাবিক প্রকাশ। সুভাষচন্দ্র বাংলার প্রবীণ ও তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগসূত্র স্থাপন করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চির সমাধি রচনার জন্য আপোষহীন বিপ্লবের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করলেন।

পুলিসের সেই একই গোপন মুদ্রিত নথি থেকে উদ্ধৃত করছি—

"....In 1924 the terrorist members of the Swarajya party supported the candidature of Mr. Subhas Chandra Bose as Chief Executive Officer of the Corporation and it is noteworthy that after his appointment to that post many jobs in the Corporation were given to terrorists."

সরকার মহল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষের গভীর বৈপ্লবিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা এর চাইতে বেশি করতে পারে নি। তখন কি বৃটিশ সরকার নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের "দিল্লী চল" অভিযানের ইতিহাস কল্পনা করতে পেরেছিল?

মিঃ আর্নেস্ট ডে, স্যার টেগার্ট ভ্রমে গোপীনাথ সাহার পিস্তলের গুলীতে প্রকাশ্য দিবালোকে চৌরঙ্গীর প্রশস্ত রাস্তার উপর নিহত হলেন। ১৯২৪ সালের ১লা মার্চ গোপীনাথ ফাঁসির মঞ্চে মরণের জয়গান গেয়ে গেল—"আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করবে।"

সেই দিন বিকেলে গোপীনাথের ফাঁসির প্রতিশোধ নিতে আমি ও দেবেন দে ফুটবল খেলার মাঠে, পুলিস গ্রাউণ্ডে, অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিস কমিশনার মিঃ

কিড্‌কে হত্যা করবার জন্য হরিদার (হরিনারায়ণ চন্দ্র) অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেই সময় হরিদার কোন এক গোপন আশ্রয়ে আমি, দেবেন ও গোপীনাথ একসঙ্গে থাকতাম। তাঁর নির্দেশ মতই তখন আমরা চলতাম। গোপীনাথের ফাঁসির দিন জনসাধারণের কাছে বিলি করবার জন্য হরিদা আমাদের নিজস্ব ছোট্ট গোপন প্রেসে তরুণ বিপ্লবী বাংলাকে আহ্বান জানিয়ে প্রচারপত্র ছাপলেন। প্রচারপত্র বিলি করা হ'ল, কিন্তু মিঃ কিড্‌ আমার ও দেবেন দের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেন—সেই দিন কিড্‌ সাহেব তাঁর ১০০ নম্বরের গাড়িখানা পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে অন্য গাড়িতে চলে গেলেন। সুভাষচন্দ্র সেই সময় দেশবন্ধু ও স্বরাজ্য পার্টির ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা—Forward-এর প্রধান পরিচালক ও কর্মসচিব। সেদিন সকালে গোপীনাথের শবদেহ আনবার জন্য সুভাষচন্দ্র জেল-গেটে যান। কিন্তু গোপীনাথের শবদেহ নিয়ে কোন মিছিল করবার অনুমতি দিতে সরকার অস্বীকার করলো। জেল-গেট থেকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সুভাষ সোজা Forward দৈনিক সংবাদপত্র অফিসে ফিরে এলেন। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন তাঁর 'সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থটিতে লিখেছেন—"তাঁর অফিসঘরে দেওয়ালে টাঙানো একখানা ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইছেন—'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি'। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে যখন চাইলেন, তখন সে মূর্তি দেখে আমি চমকে উঠলাম। সারা মুখে কে যেন সিন্দুর লেপে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদলে যেমন মুখের চেহারা হয় ঠিক তেমনি। দু'চোখের কোণায় জল।······সুভাষবাবু আবেগকম্পিত গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—'গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়ে গেল, জেলের গেট থেকেই বরাবর এখানে আসছি'।"

শহীদ গোপীনাথের প্রাণদান, বাংলার তরুণদের মধ্যে বিপ্লবী প্রেরণা জাগাল। বিপ্লবী বাংলা সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কনফারেন্সে গোপীনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতির আসন হ'তে গান্ধীপন্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানিয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"আমি শহীদ গোপীনাথের স্বদেশপ্রেমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাব করছি যদি কারও বাধা দেওয়ার শক্তি থাকে তবে বাধা দিন······।" স্বদেশের জন্য গোপীনাথের চরম স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাব পাশ হ'ল। তারপর আবার ১৯২৪ সালের ১লা জুন কংগ্রেস অধিবেশনে দেশবন্ধু জন্মভূমির জন্য গোপীনাথের চরম স্বার্থত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্তাব

উপস্থিত করতে চাইলেন। গান্ধীজী খুব বিরক্তি প্রকাশ করে সেইরূপ প্রস্তাব আনবার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানালেন। তবু দেশবন্ধু এই বিষয়ে এক সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন—

"This Committee while denouncing and dissociating itself from violence and adhearing to the principle of non-violence, appreciates Gopinath Saha's ideal of self sacrifice, misguided though it is, in respect of the country's best interest and expresses respect for his self sacrifice."

এই সংশোধনী প্রস্তাব গান্ধীজীর বিরোধিতায় মাত্র আট ভোটের জন্য পরাজিত হ'ল।

তবু বৃটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠলো পাছে কংগ্রেস ক্রমে ক্রমে বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। বৃটিশ সরকারী মহল সেইজন্য দেশবন্ধু ও সুভাষের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাদের গোপন নথিতে উল্লেখ পাওয়া যায়—

"At the Swarajya Congress Conference Mr. C. R. Das with the help of terrorist supporters succeeded in passing his Hindu-Moslem pact resolution enlogising Gopinath Saha, the assassin of Mr. Day, which was a clear incitement to the youth of Bengal to follow that assassin's example."

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দু'শ বছর ধরে আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে যে অত্যাচার, নিপীড়ন ও হত্যালীলার তাণ্ডব চালিয়েছে তার কোন সীমা নাই! আজ সেই নির্লজ্জ দস্যুরাই ঘোষণা করছে—হত্যাকারী গোপীনাথ! বিপ্লবী বাংলার তরুণদল প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলে আঘাতের পর আঘাত হানতে প্রস্তুত। বিভীষিকাগ্রস্ত হতবুদ্ধি বৃটিশ সরকার সন্ত্রস্ত ও ভীত হয়ে ১৯২৪ সালে ordinance (বিনা বিচারে আটক আইনে) পাশ করলো।

পুলিসের সেই একই গোপন নথিতে পাওয়া যায়—

"The terrorists continued there criminal conspiracies during the year, and the matter was so imminent that the Government found it necessary to promulgate in 1924

Ordinance. Many terrorists among whom there were also many Congress workers were arrested. The Swarajya party immediately accused Government of deliberately attacking not the terrorists but the Swarajists, and many meetings were held all over Bengal under the auspices of the Bengal Provincial Congress Committee at which prominent leaders of the Swarajist party enlogised assassins."

১৯২৪ সালে ২৬শে অক্টোবর লর্ড লিটনের আমলে আমিও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়ে বর্ধমান জেলে আছি। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্ক তখনও আমি প্রত্যক্ষভাবে কিছু জানতাম না। জেলে বসে এই প্রথম দেশবন্ধুর বক্তৃতা কাগজে পড়লাম—ঘুম থেকে উঠে শুনতে পাই চারিদিকে শিকল ঝন্‌ঝনা আর দেখতে পাই জেলের অভিযান! কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের আসন হতে অন্তরের জ্বালায় তাঁর ক্ষুব্ধ কণ্ঠের প্রতিবাদ জেল প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হতে শুনতে পাই—

"If the Chief Executive Officer is a criminal, the Mayor is a criminal also."

সেইদিন সুভাষচন্দ্রের প্রতি আমার বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানাই। তখন বুঝতে পারলাম প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগ আছে।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দার্জিলিং-এ দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে বাংলাদেশ শোকে মুহ্যমান। সুভাষচন্দ্র তখন বর্মায় মান্দালা জেলে কারারুদ্ধ। বহু বিপ্লবী বিনা বিচারে জেলে ও গ্রামে আটক বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাময়িক অবসাদ ও হতাশা হয়ত দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিকূল অবস্থায় স্বরাজ্য পার্টির নেতৃত্বের ভার পড়ল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সবল স্কন্ধে। পুলিসের নথি অনুসারে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনও বাংলার বিপ্লবীদের সমর্থন করে গেছেন।

সেই একই Secret Police Document থেকে উদ্ধৃত করছি—

"After Mr. C. R. Das died in June, Mr. J. M. Sengupta, his successor, pursued the same policy with terrorists...The terrorists depended on the financial support of the Swarajya party. It is thus clear that the Swarajya

party and the terrorists were interdependent and were component parts of the same revolutionary machine...."

বৃটিশ সরকার ও পুলিসের চোখে স্বরাজ্য পার্টি ও বাংলার বিপ্লবীদল অবিচ্ছেদ্যভাবে একটিই সংগঠন—একে অপরের উপর নির্ভরশীল। ১৯২৬ সালে বাংলা কংগ্রেসে কর্মীসঙ্ঘের প্রাধান্য ছিল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন তাঁদের সঙ্গেও সমঝোতা করে চলবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পদ পরিত্যাগ করেন। মেদিনীপুরবাসী দেশনেতা বি, এন, শাসমল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের স্থলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

বাংলার লাট লর্ড লিটন, বহু অত্যাচারের নিদর্শন রেখে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন। তাঁর স্থলে বাংলা দেশের শাসন দায়িত্ব নিয়ে এলেন স্যার স্ট্যান্‌লী জ্যাক্‌সন। নতুন লাট দায়িত্ব গ্রহণ করবার কিছুদিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। কর্মীসঙ্ঘ তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি বি, এন, শাসমলকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং ১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি পদে নির্বাচিত করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

সরকারের গুপ্ত দলিল থেকে প্রাপ্ত তথ্যটি এইরূপ—

"In August J. M. Sengupta compromised with the Karmi-Sangha....and appointed 12 of them in the Executive Committee of the Congress. In December he resigned and was succeeded as President of the Bengal Congress Committee by Mr. B. N. Sasmal who nominated only four Karmis to the Executive Committee. ....In 1927, however, the Karmi-Sangha were able to force Mr. B. N. Sasmal to resign, and of 60 members of the new Executive Committee 20 were terrorists. The Karmi-Sangha agreed to work under the Congress with Subhas Bose, who succeeded Mr. B. N. Sasmal as President."

সুভাষচন্দ্র ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এই সময়ে বাংলার বিভিন্ন দলের বিপ্লবীরাও কারামুক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্রের চার পাশে জড়ো হতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, বাংলা দেশে বিপ্লবীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিলেন। জেলের বাইরে তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা—অনেক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বা কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে শত্রুতাও লেগে ছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকারের রাজরোষে বিপ্লবীদের জেলে বন্দী হওয়া পক্ষান্তরে একটি আশীর্বাদ। সাময়িক-ভাবে হলেও জেলে বসে সর্বভারতের বিপ্লবী দায়িত্ব সম্বন্ধে বিরাট ও ব্যাপক চিন্তা তাঁদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও মনোভাবের পরিবর্তনে বহুল পরিমাণে সাহায্য করেছে। জেলের বাইরে এসে সারা বাংলার বিপ্লবী দল সুভাষের নেতৃত্বে একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার চেষ্টা করলো।

সেই একই সরকারী গোপন তথ্য থেকে আমরা জানতে পারছি—

"At this time there was an agreement between Subhas Bose and the terrorists that the latter should run the Bengal Provincial Congress Committee under his guidance. They drew up a scheme for a Worker's League, the basis of which was complete independence. This scheme was discussed at the Madras Congress of 1927 and the Bengal Revolutionary Group persuaded Pandit Jawaharlal Nehru to move the Independence resolution which was however defeated by Mr. Satyamurti's amendment."

১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত করার পেছনে বাংলার বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ছিল। মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার বিপ্লবীরা যে কাজ সম্পন্ন করতে পারেন নি, তা' পরের বছর ১৯২৮ সালে সম্পূর্ণ করতে চাইলেন। তাঁরা কলকাতা কংগ্রেস সমাবেশে সুভাষের নেতৃত্বে আরও সক্রিয় ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ করবার জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হলেন। ১৯২৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠানের পূর্বে সকলেই জেল ও অন্তরীণ হতে মুক্তি পেলেন। বাংলার বিপ্লবীরা প্রায় সমস্ত দল নির্বিশেষে সাময়িকভাবে হলেও, সুভাষের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে "Independence League" গঠন করলেন।

সারা বাংলা তথা সারা ভারতে সুভাষের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ বাংলার বিপ্লবীদল এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগালো। এই প্রথম ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সময় সুভাষের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিরাট স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হ'ল। এতদিন কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবকদল বলতে আমরা বুঝতাম—মাথায় খদ্দরের গান্ধী টুপি, গায়ে ছোট-হাতা ও কম ঝুলের

পাঞ্জাবী, মালকোচা দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরা ও খালি পা—এই রকম একদল যুবক।

কলকাতার এই কংগ্রেস অধিবেশন সারা ভারতে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটাবার জন্য ভলাণ্টিয়ারবাহিনী গঠনের পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনলো। খাকী পোশাকে সৈনিকের বেশে সুসজ্জিত এক হাজারেরও বেশি ভলাণ্টিয়ারের একটি বাহিনী গঠিত হ'ল। অফিসাররাও বৃটিশ সামরিক অধিনায়কদের মত uniform পরলেন। অশ্বারোহী ও মোটর সাইকেল দলও গঠন করা হ'ল। এদের হাতে কেবল বন্দুক ছিল না—নইলে বৃটিশ সৈন্যের সঙ্গে এই এক হাজার কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারবাহিনীর আর কোন পার্থক্যই ছিল না। সুদূরপ্রসারী বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৃটিশ সামরিক-বাহিনীর model-এ এই "বাংলা ভলাণ্টিয়ার ব্রিগেড" গঠিত হয়েছিল। গান্ধীপন্থী কংগ্রেসীরা সামরিক-বাহিনীর অনুকরণে গঠিত এইরূপ ভলাণ্টিয়ার দলকে নানাভাবে উপহাস করে তখন আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠি সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও বৃটিশ সৈন্যের অনুকরণে সুসজ্জিত এই বিরাট ভলাণ্টিয়ারদলকে ভবিষ্যতের এক অশুভ লক্ষণ মনে করে যে চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ সাক্ষ্য তাদের গোপন নথিতে পাওয়া যায়। নিম্নে সেই Secret Document থেকে উদ্ধৃত করছি :—

"Early in 1928 the Bengal Terrorist Party formed the Independence League for India and determined to capture the Bengal Provincial Congress Committee, in which they had largely succeeded by the end of the year, and formed a Congress Volunteer Corps called the Bengal Volunteers, which they intended to be their fighting force when the rising was brought about. Binoy Bose, Dinesh Gupta and Sudhir Dutta, the assassins of Colonel Simpson in 1930, were members of this Corps in Dacca, which was indeed largely, if not entirely composed of terrorists."

সর্বসম্মতিক্রমে সুভাষচন্দ্র এই ভলাণ্টিয়ারবাহিনীর সর্বাধিনায়ক G.O.C. —General-Officer-Commanding, নিযুক্ত হলেন। তিনি এই গুরুদায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিলেন। ভারতের কংগ্রেস ইতিহাসে সর্বপ্রথম বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অনুকরণে সুভাষের এই ভলাণ্টিয়ারদল যাদের কাছে উপহাসের

পাত্র ছিল, তারাই চোদ্দ বছর পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান দেখে নিজেদের মূর্খতার জন্য যে লজ্জা অনুভব করেছে, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। Bengal Volunteer-এর অনুকরণে চট্টগ্রামে আমরাও এক সুসজ্জিত ও ও সুসংগঠিত ভলান্টিয়ারদল গঠন করি। চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহের দিন পর্যন্ত এই প্রকার সামরিক বেশে আমরা শহরে ঘোরাফেরা করেছি এবং এই সুযোগ নিয়ে আমরা পাহারাদার সেপাইদের বিভ্রান্ত করে বৃটিশ অস্ত্রাগার আক্রমণ করি ও চট্টগ্রাম শহর দখল করে অস্থায়ী বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকার স্থাপন করতে সমর্থ হই।

আমাদের বিরুদ্ধে মামলার যে রায় দেওয়া হয়েছে তা থেকে একটু উদ্ধৃত করছি—

"In December, 1928, the All India Session of the Congress was held in Calcutta, which was attended by Ambika Chakrabarti, Surjya Sen, Nirmal Sen, Ananta Lal Singh, Harigopal Bal and Tarakeswar Dastidar (another absconding accused). At this Congress numerous volunteers were in evidence, wearing Khaki military uniform and commanded by Subhas Bose and Jatin Das wearing the uniform of military officers. The prosecution suggestion is that these Chittagong visitors after witnessing this display of pseudo-militarism returned home filled with a spirit of emulation which was soon to be translated into practice. (P. W. 149)."

আমিও কলকাতা কংগ্রেস সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। জেল থেকেই অবশ্য সংঘবদ্ধ যুব-বিদ্রোহের একটি পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে এসেছিলাম। তবু সামরিক সজ্জায় সজ্জিত সুভাষের নেতৃত্বে সুবিশাল "বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনী আমার চোখের সামনে ভবিষ্যতের এক বাস্তব রঙিন স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল। এর আগে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না—তাঁকে সামনা-সামনি দেখিও নি। খবরের কাগজেই তাঁর বিভিন্ন ছবি দেখেছি মাত্র! এই প্রথম সুভাষকে G.O.C. বেশে বিশাল সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে দেখলাম। রণবেশে সুভাষের যেরূপ অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও নির্ভীক সৈনিক-রূপ ফুটে উঠেছিল তা প্রাণভরে দেখলাম—স্বাধীন ভারতের সর্বাধিনায়কভাবে মনে মনে

সুভাষকে কল্পনা করে যেন গর্বে অন্তর ভরে উঠলো। ভবিষ্যৎ স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী সেনাপতির অসামান্য নির্ভীক ব্যক্তিত্ব অবলোকন করে অন্তরে বিপ্লবী স্পন্দন অনুভব করলাম! রণবেশে অশ্বপৃষ্ঠে সুভাষ—সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাঁর চোখে-মুখে—দৃপ্ত উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল জলজ্বল করছে! বিপ্লবী বাংলার সেনাপতি এই কংগ্রেস অধিবেশনেই পূর্ণ স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মতিলাল নেহরু ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল নেহরু বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে একত্র হয়ে স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। গান্ধীজী পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন যে, বর্তমান অধিবেশনে 'পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের" প্রস্তাবই পাশ করাবেন এবং "ডোমিনিয়ান স্টেটাস্" লাভের জন্য বৃটিশ সরকারের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে আরও এক বছর অপেক্ষা করবেন। কংগ্রেসের কর্ণধার গান্ধীজীর সদিচ্ছা—শুভ প্রস্তাব! কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালজী তাতে কোনমতেই রাজী নন অনুমান করে গান্ধীজী তাঁদের দু'জনের সঙ্গেই পৃথকভাবে আলোচনা করলেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব যেন তাঁরা কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপন না করেন, তার জন্য বিশেষ অনুরোধও জানালেন। জওহরলালজী গান্ধীজীর অনুরোধ মেনে নিলেন—মানলেন না অচল-অটল-দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সুভাষচন্দ্র!

সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। ভোটাভুটি হ'ল। ভোটের জোরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবই পাশ হয়ে গেল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই গৌরবময় পরাজয় তাঁকে বিপ্লবী ভারতের কাছে যে মহিমান্বিত করে তুলেছিল তা অস্বীকার কর যায় না।

১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসের আগে ভারতের বড়লাট বাহাদুর লর্ড আরউইন, মহামান্য সম্রাটের পক্ষ হতে ঘোষণায় জানালেন যে মহামান্য সম্রাটের বিবেচনায়—

"It was implicit in the Declaration of 1917 that the natural issue of India's Constitutional progress as there contemplated, is Dominion Status."

আর যায় কোথায়! আপোষবাদী কংগ্রেস নেতারা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ইংরেজ সরকার স্বীকার করছেন—১৯১৭ সালের ঘোষণায় Dominion Status প্রবর্তন করার কথাও পরিকল্পনায় আছে!

১৯১৭ সালের Montegu-Chamsford Report অনুযায়ী ইংরেজ সরকার যে ঘোষণা করেছিলেন তারই ব্যাখ্যা করে ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর বড়লাট কংগ্রেস কর্ণধারদের কাছে এই লোভনীয় টোপটি ফেললেন। এই ঘোষণায় Dominion Status কখন দেবে তার কোন উল্লেখ ছিল না। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আবেদনও সরকার মঞ্জুর করলেন না। তবু গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা গোলটেবিলের মারফত Dominion Status প্রণয়নের সদিচ্ছার প্রতি মহামান্য সম্রাটের সরকারকে ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু সেইরূপ গোলটেবিলে যোগদানের পূর্ব-শর্ত অনুযায়ী তাঁরা সরকারের কাছে দাবি জানালেন, কংগ্রেসের প্রাধান্যই যেন তাঁরা মেনে নেন ও রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপক মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। কংগ্রেসের তরুণ নেতারা প্রবীণদের আপোষজনক মনোভাব দেখে খুব বিচলিত হলেন। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভ্যপদ হতে ইস্তফা দিলেন।

১৯২৯ সালে লাহোর-কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ হ'ল। স্বাধীনতার এই প্রস্তাব যদি ইংরেজ সরকার প্রত্যাখ্যান করে তবে সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস কি প্রোগ্রাম গ্রহণ করবে—তার উত্তরে একা সুভাষচন্দ্রই জানালেন—"আমাদের পাল্টা সরকার গঠন করতে হবে।"

সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন স্বাধীনতার ঘোষণা ও বাংলার বিপ্লবীদের অকুণ্ঠ সমর্থন তরুণদের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তার প্রতিধ্বনি বাংলা সরকারকে সচকিত করে তুলেছিল। তাদের গোপন নথিতে উক্ত আছে—

"At the Calcutta Congress in 1928 Subhas Chandra Bose moved an amendment to Mr. Gandhi's resolution. His amendment was to the effect that there could be no freedom as long as the British connection remained and that the goal of the Congress should be complete independence. His amendment was lost, however, by 1,350 votes to 973. Two-thirds of the Bengal delegates voted for the amendment. The Bengal revolutionaries had strived hard to get this resolution carried."

বাংলার বিপ্লবীদের পূর্ণ সমর্থনে সুভাষচন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯২৮ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কংগ্রেসে পাশ হ'ল না। কিন্তু বিক্ষুব্ধ ভারতকে

ভুলিয়ে রাখাও কংগ্রেসী নেতাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। এক বছর পরে লাহোর-কংগ্রেসে স্বয়ং গান্ধীজীকেই পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব উপস্থিত করতে হ'ল।

১৯২৮—১৯২৯ সালের মধ্যে বাংলার বিপ্লবীরা চুপ করে বসে থাকতে পারে নি। কংগ্রেসের আপোষ মনোভাবের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করার পর থেকে, বাংলা কংগ্রেসে দু'টি চিন্তাধারা—দু'টি মত অতি প্রকট হয়ে উঠলো। সুভাষচন্দ্রের মত ও পথ বাংলার গান্ধী-পন্থীদের সঙ্গে স্বভাবতই ভিন্ন গতিতে ও ধারায় রূপ নিল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন গান্ধীজীর মতবাদ ও Dominion Status প্রস্তাবের অনুগত ও সমর্থক ছিলেন। বাংলা কংগ্রেসের দ্বিমুখী রাজনৈতিক trend বা ধারা বিপ্লবীদের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়ে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলো।

আমরা, চট্টগ্রামের ভারতীয় গণতন্ত্রীবাহিনীর শাখা, মাস্টারদার নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলাম। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল। চট্টগ্রাম জেলা-কংগ্রেসে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে আমরা বুলক্ ব্রাদার্স ও আসাম-বেঙ্গল রেল-ধর্মঘট সার্থকতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলাম। 'নাগারখানা যুদ্ধের' অপরাধে সরকারী মামলার বিরুদ্ধে মাস্টারদা, অম্বিকাদা, ও আমার পক্ষ সমর্থন করেছেন যতীন্দ্রমোহন এবং আমরা তিনজনেই তাঁরই কৃতিত্বে সেই মামলায় মুক্তি পেয়েছিলাম। তারপর আমাদের সাথী প্রেমানন্দকে তিনি আই, বি, পুলিস সাব্-ইন্স্পেক্টার প্রফুল্ল রায় হত্যার মামলা থেকেও বাঁচিয়েছিলেন। তবু আমরা বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচন দ্বন্দ্বে যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন করতে পারি নি। আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে জয়ী হই। আমাদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা দিতে হ'ল, যখন আমরা বিপিনদা জ্যোতিষদা, হরিদা (হরিনারায়ণ চন্দ্র) ও অনুকূলদার প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করলাম।

যুগান্তর পার্টি নামে বহু ছোট ছোট দল নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখে চলতেন। যাঁদের নাম উপরে বলা হ'ল ১৯৩০ সাল থেকে তাঁদের সঙ্গে ভারতের গণতন্ত্রীবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসের সময়েও তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আমি তখন অনুকূলদার সঙ্গে সময়ে অসময়ে—রাতে-দিনে—প্রাণ

খুলে মিশছি—রিভলভার-পিস্তল ইত্যাদি স্মাগ্‌লারদের কাছ হতে যোগাড় করা হচ্ছে। এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় জ্যোতিষদা ও বিপিনদা একসঙ্গে মোটরে করে এলেন। আমার এবং গণেশের সঙ্গে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে রাস্তার উপরে গাড়িতে বসেই কথা বললেন। জ্যোতিষদাই কথাটা পেড়েছিলেন—কথাগুলি প্রায় এই ধরনের—"দেখ আমরা এতদিন একসঙ্গে পথ চলে এসেছি—আজ আমাদের বোঝাপড়া করবার দিন এসেছে। এখন বুঝে নিতে হবে আমাদের অতীত সম্পর্ক অটুট্‌ আছে নাকি তার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।" জ্যোতিষদা এইভাবেই কথার সূচনা করলেন। তারপর স্পষ্ট করে জানতে চাইলেন—"খুলে বল প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্বাচনে তোমরা কাকে সমর্থন করবে—সুভাষকে না যতীন্দ্রমোহনকে ?" বলা বাহুল্য, যুগান্তর পার্টির অন্যান্য নেতারা তাঁদের গ্রুপপ্রাধান্য বজায় রেখেও সুভাষকেই সমর্থন করে চলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভূপেনদা ছাড়া অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল না। তাঁরা—অর্থাৎ 'যুগান্তরের অন্যান্য দল', সুভাষকে সমর্থন করেন বলেই আমাদেরও সুভাষচন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবার কোন বিশেষ কারণ ছিল না।

সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও তাঁকেই সমর্থন করার সিদ্ধান্তের কারণ তবে কি ভূপেনদা বা যুগান্তরের অন্যান্য দল সুভাচন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন বলে ? যুগান্তরের যে দলটির নেতাদের সঙ্গে—জ্যোতিষদা, বিপিনদা, অনুকুলদা, হরিদা, সন্তোষদা প্রমুখের সঙ্গে, ১৯২০ সাল থেকে আমরা বৈপ্লবিক কার্যকলাপে জড়িত ছিলাম, তাঁদের সম্পর্ক ছেড়ে কংগ্রেসে যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বকে স্বীকার না করে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকে শ্রেয় বলে বেছে নেওয়ার জন্য সুরেন্দ্রমোহন, অমর চ্যাটার্জী, ভূপেন দত্ত, অরুণ গুহ, কিরণ মুখার্জী প্রমুখ দাদারা কোন বিশেষ আকর্ষণের কারণ ছিলেন না। মাস্টারদার পরিচালনায় আমরা বিশ্লেষণী বিচারবুদ্ধি দিয়েই সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য দেওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং যাঁরা বা যে কোন দলেরই নেতারা বা কর্মীবৃন্দ সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে, অবস্থা অনুযায়ী, কংগ্রেসের মধ্যে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামাঞ্জস্য রেখে আমরা তখন যতীন্দ্রমোহনকে রাজনীতি ক্ষেত্রে সমর্থন করতে না পেরে সুভাষকেই সমর্থন করেছি। এমন কি কংগ্রেসের রাজনীতি ক্ষেত্রে বিপিনদা, জ্যোতিষদা, হরিদা ও অনুকূলদার গ্রুপের সঙ্গেও বন্ধন ছিন্ন করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। মাস্টারদার পরিচালনায় আমরা সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বে অটল ছিলাম।

সুভাষ ও আমাদের পরস্পরের প্রতি এই বৈপ্লবিক আকর্ষণ ও ঘনিষ্ঠতা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী ও অন্তরের বিপ্লবী প্রেরণার উপলব্ধি অভিন্ন না থাকলে সেইদিন সেই অবস্থায় "সবাইকে" ছেড়ে আমরা সুভাষের পাশে এসে দাঁড়াতাম না। জাতীয় কংগ্রেসে সুভাষের নেতৃত্ব নতুন প্রাণ সঞ্চার করুক—এই ছিল আমাদের অন্তরের কামনা—আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য। আমাদের সঙ্গে সুভাষের নিবিড় বৈপ্লবিক সম্পর্কের মূল তত্ত্ব Lenin-এর ভাষায় সুস্পষ্ট করে বলি—

"The old proverb says : 'Tell me who your friends are and I will tell you what you are.' Tell me who your political ally is, who votes for you—and I will tell you what your political complexion is." (Oue step Forward, To steps Back :—Lenin).

১৯২৯-৩০ সালে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। আমরা চট্টগ্রামে জেলা-কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান করলাম। তিনি এলেন। সামরিক কায়দায় Bengal Volunteers-এর অনুকরণে গড়া আমাদের সুসজ্জিত ভলাণ্টিয়ার বাহিনী তাঁকে অভিবাদন জানালো। তিনি তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় তরুণ বাংলাকে আগামী কালের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে ডাক দিলেন। আমাদের মামলার মুদ্রিত জাজ্‌মেণ্ট কপি থেকে উদ্ধৃত করছি—

"That day (12th May 1929) the presidential speech was delivered by Mr. Subhas Bose, its tenor being that he had faith in Mahatma Gandhi but he could not see how the country could be saved by nonviolence. The volunteers wearing Khaki Khaddar shirts and shorts were present in force at the confercnce under the command of Ganesh Ghosh who was styled as G. O. C. and wore a military uniform similar to that worn by Subhas Bose at the Calcutta Congreess.

সেইদিন দুপুরে মহালক্ষী ব্যাঙ্কের এক নির্জন কক্ষে গণেশ ঘোষ, আমি ও ত্রিপুরা সেন (জালালাবাদ যুদ্ধের শহীদ) সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করি। তিনিই আমাদের তিনজনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার এই প্রথম

সাক্ষাৎ। মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও গণেশ ঘোষের সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর পরিচয় ও আলাপ ছিল—পরিচয় ছিল না কেবল আমার সঙ্গে।

ঘণ্টা দুই আমরা নানা বিষয়ে আলোচনা করলাম। সকালে কন্‌ফারেন্স এলাকার মধ্যে বিপক্ষ দলের সঙ্গে আমাদের একটি ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়। তাই প্রথমে সুভাষবাবু আমাদের সাংগঠনিক ও ভলাণ্টিয়ার-বাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তাঁকে আমাদের শক্তির প্রাধান্যের কথা জানিয়েছিলাম। তারপর ভবিষ্যৎ বিপ্লবী কর্মসূচী নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা হয়। রাসবিহারী বোস, লালা হরদয়াল, গদর পার্টি এবং যতীন মুখার্জী প্রমুখ নেতারা সারা ভারত জুড়ে বিপ্লবের প্রচেষ্টা করেছেন—কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় নি। বিভিন্ন দলের সাংগঠনিক ক্ষমতা এক স্তরের নয় বলে এবং পুলিসের গুপ্তচর বিভিন্ন দলের মধ্যে বহুপূর্ব থেকে অবস্থান করার বহু নিদর্শন থাকার জন্য ভারত জুড়ে বা সারা বাংলায় সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা কতখানি, তা নিয়ে আলোচনা হ'ল। একটি জেলাতেও যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পুলিস ও মিলিটারী-ঘাঁটি দখল করে সাময়িকভাবে বিপ্লবী গণতন্ত্র সরকার স্থাপন করা যায়, তবে বিপ্লবী তরুণদের মনে আস্থা ফিরে আসবার আশা আছে। সেইহেতু আদর্শ স্থাপনের জন্য—সফলতার সঙ্গে একটি জেলাতেও যদি যুব-বিদ্রোহ পরিচালনা করা সম্ভব হয় তবে আমাদের তা করা উচিত কিনা তাও আলোচিত হ'ল। অতীতের বিপ্লব প্রচেষ্টার ধারাবাহিক বিফলতার ইতিহাস যুবকদের মনে অবসাদ ও নিরাশা সৃষ্টি করেছে; তাই জড়তা ও হতাশা দূর করার জন্য সফল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার নিদর্শন একান্ত প্রয়োজন—এইভাবে সেদিন আমরা আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করেছিলাম।

বাংলা দেশে তখন, ১৯৩০-৩১ সালে, প্রধানতঃ দুইটি বিপ্লবী পার্টি—অনুশীলন ও যুগান্তর আবার ভাগ হয়ে গেল। গুপ্ত পুলিস রিপোর্ট থেকে পাচ্ছি—

"When (1930-31) the agreement between Subhas Bose and the terrorist parties were hoping to resume there terrorist campaign in concert with each other. SUBSEQUENTLY, however, the LEADERS quarrelled and in this quarrel Subhas Chandra Bose supported the Jugantar party. The result was that the leader of the Dacca Anusilan Samiti resigned from the Executive of the Bengal Provincial Congress Committee. This split in the Congress

came to a head in 1931 when the supporters of the rival leaders actually came to blows. In these incidents Subhas Bose and his party were supported by members of the Jugantar party and J. M. Sengupta by members of the Dacca Anusilan Samity."

কর্তব্যের খাতিরে বাংলাদেশের অতীত দলাদলির ইতিহাস থেকে সামান্য উল্লেখ করলাম বলে আজ লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই। সকল দেশের ইতিহাসেই রাজনৈতিক দলাদলি ও সংঘর্ষের বহু নজির আছে। তা'ছাড়া বর্তমান রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রেও আদর্শগত মতভেদ, তীব্র প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা যখন বাস্তব সত্য এবং অনিবার্য, তখন অতীতের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ঐতিহাসিক তথ্যের প্রয়োজনে যদি রাজনৈতিক দলাদলির উল্লেখ করা হয়, তবে পাঠকবর্গের কাছে তা মার্জনীয় বলে আমি নিশ্চয়ই মনে করতে পারি।

১৯৩০ সালে অসহযোগ ও আইন-অমান্য-আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলো। সরকার বেপরোয়াভাবে আক্রমণ চালালো—নির্বিচারে লাঠি, গুলী ব্যবহার করলো। হাজার হাজার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বন্দী হ'ল। কিন্তু অসহযোগ-আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমেই কমে আসতে লাগলো। এই সময় বাংলার বিপ্লবী দল সশস্ত্র প্রতি আক্রমণ চালাবার প্রয়োজন মনে করে এবং তার উপযোগী সময় বলেও বিবেচনা করে। এইরূপ একটি অবস্থার জন্য বিপ্লবীরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল।

পুলিসের গোপন তথ্য থেকে লিপিবদ্ধ করছি—

"The Bengal terrorists took an active part in the Civil Disobedience Movement in 1930 and many of them were imprisoned for picketing. When this movement was wanning they considered that it was time for them to give effect to their policy of violence. The armoury raids took place at Chittagong in April and there the raiders used the Congress Office as a centre of preparation and a jumping-off ground for raiding parties...."

আমাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ফাঁসির অপেক্ষায় আছেন। বাংলা দেশে বিপ্লবীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে

সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে লাগলেন। গান্ধীজীর Individual Satyagraha (ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ) যেমন স্থিতাবস্থায়ও আন্দোলন বা সত্যাগ্রহের প্রেরণাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন বলে গণ্য, তেমনি তরুণদের প্রাণেও বিপ্লবী স্পন্দন জাগিয়ে রাখাতে ব্যক্তিগত ইংরেজ রাজপুরুষ হত্যা অপরিহার্য বলে বিপ্লবীরা যদি মনে করে থাকেন, তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সেইরূপ রণকৌশলের মধ্যে ত্রুটি ছিলনা বলেই আমার মনে হয়।

বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্ঘবদ্ধ ও খণ্ড খণ্ড আক্রমণ যেরূপ অপ্রতিহত গতিতে চলেছিল তার আতঙ্কে বৃটিশ সরকার গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়াই বিচক্ষণতার পরিচয় বলে মনে করলেন। ২৫শে জানুয়ারী ১৯৩১ সালে সরকার কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিলেন। ২৬শে জানুয়ারী গান্ধীজীর সঙ্গে লর্ড আরউইনের আলোচনা সুরু হ'ল। ৫ই মার্চ, ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট সই হ'ল। গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হলেন এবং তার পরিবর্তে কয়েকটি বিভিন্ন শর্তের মধ্যে, অহিংস আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার শর্তও বড়লাট মেনে নিলেন।

সারা ভারতে তখন তরুণদের দাবি ছিল—ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেওর ফাঁসি যেন রদ করা হয়। হিংসাত্মক কাজের জন্য বন্দীদের ছাড়তে সরকার রাজী হলেন না এবং গান্ধীজীও সেইজন্য মাথা ঘামালেন না! বিপ্লবীদের ফাঁসি রদ হওয়া আর মুক্তি পাওয়ার শর্ত এক নয়। অহিংসার প্রতীক গান্ধীজী যদি ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেওর মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য বড়লাটকে সামান্যতম অনুরোধও জানাতেন, তবে আমাদের বিশ্বাস তিনজন বিপ্লবীর নিশ্চয়ই প্রাণরক্ষা হ'ত। গান্ধীজী—অহিংসার উপাসক গান্ধীজী কেন তিনজন বিপ্লবীর প্রাণরক্ষা জন্য বড়লাটকে অনুরোধ বা রাউণ্ড টেবিলে যোগ দেওয়ার শর্ত হিসাবে প্রস্তাব করেন নি—বিপ্লবী ভারতের সেই ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা চিরকাল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লেখা থাকবে।

আমরা তখন চট্টগ্রাম জেল-হাজতে আছি। আমাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। সেই সময়ে গোপনে Smuggle করে গান্ধীজীর কাছে আমরা একটি চিঠি পাঠাই। অনুরোধ জানাই তিনি যেন সেই তিনজন বিপ্লবীর ফাঁসি রদ করার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করেন। আমরা জানি তিনি আমাদের অনুরোধ সরাসরি উপেক্ষা করেছিলেন। কেবল তাই নয়—তিনি সেই চিঠি পুলিসের কাছেও পাঠিয়ে দেন। অবশ্য এতে আমাদের কোন

অনুযোগ নেই। জেল থেকে সেইরূপ গোপনে লেখা চিঠির অস্তিত্ব কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে গান্ধীজী তাঁর পদমর্যাদার যোগ্য কাজই করেছিলেন। আমাদের উপায় ছিল না বলেই সেইভাবে গান্ধীজীর কাছে লিখতে হয়েছিল। বড়লাটকে ফাঁসি রদ করার আবেদন জানাবার মূল বিষয়বস্তুটি গোপন রেখে পুলিসের গুপ্ত নথিতে ঐ চিঠির উল্লেখ আছে দেখতে পাওয়া যায়—

"In March 1931 the under trial accused in Chittagong Armoury Raid Case sent a letter to Mr. Gandhi....they wrote as follows.

'You can certainty not deny the fact that in almost all the provinces the Congress Programme has been worked out by the men most of whom have got violence as their policy in heart and specially in Bengal where the disobedience Campaign has achieved the highest amount of success, ninety percent of the Congress workers are open revolutionaries to whom no doubt all the credit of the success goes."

এই চিঠির আসল বক্তব্য বাদ দিয়ে পুলিস তাদের গোপন রিপোর্টটি তৈরি করেছে। গান্ধীজীর মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া আমাদের এবং সুভাষচন্দ্রের ওপর কিরূপ ছিল, তার একটি সঠিক ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই আমার এই তথ্যটি প্রকাশ করা।

আমাদের দ্বীপান্তরের সাজা হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বহু বছরের জন্যে যোগাযোগ ছিন্ন হ'ল।

গান্ধীজী ও গান্ধীবাদের সঙ্গে আমাদের মূলগত বৈপ্লবিক পার্থক্য ছিল। সে পার্থক্য সুভাষচন্দ্রও আপোষহীনভাবে বজায় রেখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেসে গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আদর্শগত মত-বিরোধের যে অধ্যায়টি রচিত, তার অপরিহার্য অংশটির উল্লেখ না থাকলে গান্ধীবাদের অহিংস সংগ্রামের পথ নেতাজী যে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করেছিলেন তা আমাদের অজানা থাকবে। তাই নেতাজীর জীবনের এই অধ্যায়টি এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

আমরা যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড নিয়ে আন্দামানে নির্বাসিত হলাম। আন্দামান জেলে অনশন ধর্মঘট সুরু করলাম। দেউলি, বাক্সা, হিজলী, বহরমপুর

প্রভৃতি বন্দীশিবিরে মুক্তির দাবিতে একসঙ্গে অনশন আরম্ভ হ'ল। ভারতে, বিশেষ করে বাংলা দেশে, প্রবল 'বন্দীমুক্তি' আন্দোলনের ঢেউ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রথম ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল। ১৯৩৭ সালের ১৭ই মার্চ ফজলুল হক সরকার সুভাষচন্দ্রকে বিনা শর্তে মুক্তি দিলে তিনি ভগ্ন-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে ইউরোপ থেকে ফিরে এলেন। ১৯৩৮ সালের ১৮ই মার্চ তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

আমরাও জনগণের সংঘবদ্ধ দাবির জোরে আন্দামান জেল থেকে প্রায় সেই সময়েই বাংলার জেলে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে বিনা বিচারে আটক বন্দীরাও অনেকে মুক্তি পেলেন। জেলে আমাদের দু' ভাগে রাখা হয়—এক ভাগ ছিল আলিপুর জেলে ও অন্য অংশ দমদম জেলে। গান্ধীজী সেই সময় আমাদের সঙ্গে জেলে দু'বার দেখা করেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়-দুই আমরা প্রতিবারেই গান্ধীজীর সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষ বা পুলিসের অনুপস্থিতিতে আলোচনা করি। তিনি আমাদের মুক্তির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আমাদের সকলের মুক্তির জন্য এক বছর সময় তিনি দিলেন এবং আমরা তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, যদি এক বছরের মধ্যে মুক্তি না পাই তবে আমাদের অনশন করা ছাড়া অন্য কোন পথ থাকবে না।

সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেসের সভাপতি। তিনিও আমাদের সঙ্গে জেলে দেখা করলেন। কত বছর পরে সুভাষের সঙ্গে আমাদের দেখা! এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে কতকিছু ঘটে গেছে—কতজন আমাদের কাছ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছে! সুভাষবাবুর সঙ্গে আমাদের প্রাণ খুলে কথা হ'ল। শারীরিক অবস্থার কথাই তিনি সকলের কাছ থেকে জানতে চাইলেন। জেলের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধেও নানা বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। যতদিন আমরা মুক্তি না পাচ্ছি ততদিন কিভাবে জেলের সুখ-সুবিধেটুকু পাবো, তার জন্য তিনি যত্নবান হলেন। আমাদের সঙ্গে গান্ধীজীর যা কথা হয়েছে তাঁকে জনালাম—মুক্তি না পেলে ঠিক এক বছর পরে আমরা আমরণ অনশন করবো।

১৯৩৯ সাল। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার প্রার্থী হলেন। দেশবাসী পট্টভী সীতারামিয়াকে পরাস্ত করে অধিক ভোটে দ্বিতীয় বছরের জন্য সুভাষকে সভাপতি পদে নির্বাচিত করলো। গান্ধীজী সুভাষের বিরুদ্ধে পট্টভীজীকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাই গান্ধীজী প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে ঘোষণা

করলেন—সুভাষের কাছে এইটি তাঁর নিজেরই পরাজয়। প্রকাশ্যে ও অন্তরালে গান্ধীজী এমন একটি সুভাষ-বিরুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা প্রায় সবাই সভ্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন। সুভাষচন্দ্র এইরূপ বিরূপ অবস্থার জন্য সভাপতি পদ পরিত্যাগ করলেন।

গান্ধীজীর কথামত ধৈর্য ধরে এক বছর অপেক্ষা করেও মুক্তির কোন আশা আমরা দেখতে পেলাম না। তাই দমদম ও আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে মুক্তির দাবিতে আমরা অনশন আরম্ভ করলাম। গান্ধীজী মহাদেব দেশাইকে পাঠালেন আমাদের অনুরোধ জানাতে—আমরা যেন অনশন ভঙ্গ করি। বিধানবাবু, মধুদা (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) ও মহাদেব দেশাই আমাদের সঙ্গে জেলে দেখা করে অনশন ভঙ্গ করবার জন্য গান্ধীজীর অনুরোধটি জানালেন। কতদিনের মধ্যে আমরা সবাই মুক্তি পাবো তার সঠিক অঙ্গীকার না পাওয়া পর্যন্ত অনশন ভঙ্গ করা সম্ভব নয় বলে গান্ধীজীকে জানাবার জন্য আমারও মহাদেব দেশাইকে অনুরোধ করলাম। খুব দুঃখ ও সঙ্কোচের সঙ্গে আজ জানাচ্ছি, মহাদেব দেশাই রেগে গেলেন এবং আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে তাঁরা তিনজনেই তক্ষুণি সে স্থান ত্যাগ করলেন। তাঁরা বিরক্তি প্রকাশ করে রেগে চলে গেলেন বলে অনুযোগ করবার কিছুই নেই, কিন্তু গান্ধীজীর অনুরোধ রাখতে পারলাম না বলে আমরা মনে মনে খুবই সঙ্কোচ অনুভব করেছিলাম। বছরের পর বছর, সুদীর্ঘকাল জেলে বসে অথর্ব হয়ে মরার চাইতে—'মুক্তি নয়ত মৃত্যু' শ্রেয় মনে করে অনশন আরম্ভ করেছি, এখন মুক্তির সুস্পষ্ট ঘোষণা ছাড়া অনশন ভঙ্গ করলে নিজেদের শক্তি ক্ষয় হবে এবং ভবিষ্যতে মুক্তির জন্য আবার সকলে একত্র হয়ে অনশন করা সম্ভব নাও হতে পারে ; তাই সরকারের অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকাই সমীচীন মনে করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা রাগ কবে চলে গেলেন। কেবল তা নয়—গান্ধীজী আমাদের অনশনের করবার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিলেন। বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা এতে বিক্ষুব্ধ হ'ল এবং সুভাষের ওপর বৈপ্লবিক দায়িত্ব এসে পড়লো।

এই সন্ধিক্ষণে স্বয়ং সুভাষচন্দ্র তাঁর দাদা শরৎবাবুকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে জেলে দেখা করলেন। গান্ধীজীর বিবৃতির প্রতিবাদ জানিয়ে সুভাষচন্দ্র সংবাদপত্রে তাঁর বিবৃতি ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে বিবৃতির typed copy তিনি সঙ্গে নিয়ে এসে দেখালেন। সেই বিবৃতিতে আমাদের মুক্তির দাবির প্রতি তরুণ বাংলার আন্তরিক সমর্থন ছিল এবং আমাদের দাবি মানবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল।

এই তৃতীয়বার সুভাষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ। দু'জনেই—সুভাষবাবু ও শরৎবাবু, আমাদের অনমনীয় মনোভাবের কারণ বুঝেছিলেন—সরকার আমাদের মুক্তি দিতে কোনমতে প্রস্তুত ছিল না। সুভাষবাবু অনশন ভঙ্গ করার জন্য আমাদের অনুরোধ করলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন, একমাসের মধ্যেই আমাদের মুক্তির জন্য সরকারকে তিনি চরম পত্র দেবেন। যদি সরকার এই দাবি অস্বীকার করে, তবে তিনি 'বন্দীমুক্তি'র দাবিতে ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবেন······। সেই রাত্রে, পঁয়ত্রিশ দিন পর, আমরা অনশন ভঙ্গ করি। সুভাষবাবু ও শরৎবাবু আমাদের সবার খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলেন। নেতাজীর সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা! আর দেখা হ'ল না! কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। তারপর নেতাজীর বিপ্লবী জীবনের পট দ্রুত পরিবর্তিত হতে লাগলো।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য বুঝতে গেলে গান্ধীজীর অহিংস মতবাদের বিরুদ্ধে সুভাষের সশস্ত্র বিপ্লবের মতপার্থক্যের মূল খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র consistently অচল-অটলভাবে সামঞ্জস্য বজায় রেখে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ও বাইরে বাস্তব সংগ্রামী-নীতি গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন। সুভাষচন্দ্র এবং বাংলার বিপ্লবীরা কখনও গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনের প্রচণ্ড ক্ষমতাকে অস্বীকার করেন নি বা উপেক্ষা করবার কোনরূপ চেষ্টাও তাঁদের ছিল না। ভারতবর্ষের মত একটা উপমহাদেশে দু'শ' বছরের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অভিনব 'রণ-কৌশল' ও 'রণ-নীতি'-র বিরাট সম্ভাবনাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছি এবং সুভাষবাবু ও বাংলার বিপ্লবীরাও সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলনের বিরাট সাফল্যের সম্ভাবনাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও সুভাষবাবু ও আমরা বুঝেছিলাম, গান্ধীজীর এই আন্দোলন খুব অল্প সময়ের মধ্যে যদিও সারা ভারতের নিপীড়িত বিক্ষুব্ধ জনগণকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে পারে, তবু এই অহিংস সংগ্রামের দ্বারা বৃটিশ সরকারকে পরাভূত করে গণতন্ত্রী সরকার স্থাপন করা সম্ভব নয়। প্রথমত, গান্ধীজীর অহিংসাবাদকে স্বাধীনতা সংগ্রামে creed হিসেবে—ধর্ম মনে করে মেনে নেওয়াকে—আমরা utopian (অবাস্তব) বলে মনে করি। কারণ, অবাস্তব কল্পনায় বা কেবল theoryতেই ভাবা সম্ভব যে, সারা ভারতের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ সংগ্রামের সময় ইংরেজের অভাবনীয় বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সংযত, স্থির ও অহিংস থাকবে।

দ্বিতীয়ত—বিপ্লবী জনসাধারণের চরিত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বুঝে, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উৎখাত যে সম্ভব নয়, তা সুভাষবাবু ও আমরা নির্ভুলভাবে বুঝেছিলাম।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে গান্ধীজীর "অহিংসা-ধর্ম" স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বে ও সংগ্রামের প্রথম স্তরে অনেকখানি কার্যকরী হলেও চূড়ান্ত জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে নিষ্ফল হয়েছে। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের অহিংস সংগ্রাম, ১৯২১-২২ সাল বা ১৯৩০ সাল অথবা ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়" অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর সদিচ্ছাপূর্ণ নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সহিংস রক্তাক্ত সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। গান্ধীজীর অহিংস মন্ত্র ইংরেজ শাসক-বর্গকে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করা থেকে কিছুকাল পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় বা nutralise করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অহিংসার বাণী বা চরকার প্রত্যক্ষ অভিযানের ন্যূনতম প্রোগ্রাম সামনে রেখে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভের প্রস্তুতিকে সুভাষচন্দ্র একটি বাস্তব 'রণ-কৌশল' বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং আমরাও তাই মনে করেছিলাম।

বাস্তবতার গণ্ডি ছাড়িয়ে সুচিন্তিত গবেষণা করা সম্ভব নয়। তাতে ইতি-হাসের সত্যকে অস্বীকার ও বিকৃত করা হয়। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে অস্বীকার করলে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সঠিক অবদান কি, তা নির্ণয় করা যায় না। আবার তেমনি, ভারতের নিরবচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক ঘটনা প্রবাহ—১৮৯৭ সালে পুণায় চাপেকার ভ্রাতৃযুগলের ফাঁসির মঞ্চে প্রাণদান করার সূচনা থেকে বাংলা ও ভারতের বিপ্লবী তরুণদের বোমা-পিস্তলের তাণ্ডব ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল, আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর "দিল্লী চল" সশস্ত্র অভিযান এবং সর্বশেষ ভারতীয় নাবিক পরিচালিত নৌ-বিদ্রোহের সহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্য বাদী সিংহাসনকে যে চরম আঘাত দিয়েছে, তার সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করতে অস্বীকার করলে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হয়ে পড়বে।

গান্ধীজীর অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলনের বিশ বছরেরও আগে থেকে সহিংস বিপ্লবী প্রচেষ্টা ও বীর শহীদদের আত্মদানের প্রভাব, ভারতবাসীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সাহস যুগিয়েছে, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছে, স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত ও উর্বর ভারতভূমিতে বিশ বছর পরে গান্ধীজীর ন্যূনতম প্রোগ্রাম—এক কোটি

কংগ্রেস সদস্য, চরকা, খদ্দর, বিলাতি কাপড় বর্জন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং তারপর এক বছরে স্বরাজ—দু'শ' বছরের বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের এইটি যে একটি বাস্তব, নির্ভুল ও প্রচণ্ড শক্তিশালী রণ-নীতি ও রণ-কৌশল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই রণ-নীতি ও কৌশলের সঙ্গে যখন অহিংসবাদকে গান্ধীজী আপোষহীনভাবে ধর্ম বলে কংগ্রেস সেবকদের অন্তরে অন্তরে স্বীকার করে নিতে বললেন, তখন গান্ধীজীর "অহিংসা" creed-কে সুভাষচন্দ্র ও আমরা অবাস্তব বলে মনে করেছি এবং সুভাষচন্দ্র তা অন্তর থেকে কখনই মেনে নিতে পারেন নি।

সুভাষচন্দ্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যদি বুঝতে হয় তবে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মূল প্রভেদ কোথায় সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বশেষ সফলতার জন্য অহিংসাবাদকে নীতি ও ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করা কি বাস্তবতাকে অস্বীকার করা নয়? এই মূলগত দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য সুভাষচন্দ্রকে ধারাবাহিকভাবে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গান্ধীজীর মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে। ১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে দেশবন্ধু কংগ্রেস পরিত্যাগ করে স্বরাজ্য পার্টি গঠন করলেন এবং সুভাষচন্দ্র স্বরাজ্য পার্টির মুখপত্র—'Forward' দৈনিক কাগজের প্রধান কর্মসচিব নিযুক্ত হলেন। আরও আঠারো বছর পরে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর, স্বয়ং গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিয়ে সক্রিয়ভাবে বাধার সৃষ্টি করলেন। সেই পরিস্থিতিতে সুভাষের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভিতরেই 'ফরোয়ার্ড-ব্লক' গঠিত হ'ল। ১৯৪০ সালের ১৮ই মার্চ রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই সময় গয়া কংগ্রেসের ঐতিহ্য বহন করে সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড-ব্লকের কর্মীদের নিয়ে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের পাশেই আপোষ-বিরোধী পাল্টা কংগ্রেস সম্মেলনের সমাবেশ করেন।

সুভাষচন্দ্র সেই বছরেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্ধকূপ-হত্যার কল্পিত ও মিথ্যা নিদর্শন—হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য জেহাদ ঘোষণা করলেন। সুভাষ-চন্দ্রের এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফতার করা হ'ল। ৫ই ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র প্রায়োপবেশন করে মুক্তি পান। ১৭ই জানুয়ারী ১৯৪১ সাল—সুভাষচন্দ্র পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে জার্মানীতে উপস্থিত হন এবং শেষে তিনি আজাদ-হিন্দ সরকার ও আজাদ-হিন্দ বাহিনী গড়ে তোলেন। নেতাজী সুভাষের "দিল্লী চল" ধ্বনি ভারতের আকাশে-বাতাসে

ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আজাদ-হিন্দবাহিনীর মুহুর্মুহু কামান গর্জন বজ্র-নির্ঘোষে ভারতে বৃটিশ শাসনের নিপাত ঘোষণা করেছে। সহিংস "ভারত ছাড়" সংগ্রাম "দিল্লী চল" অভিযানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুর্বার দুর্জেয় ও অপ্রতিহত বৈপ্লবিক শক্তির সৃষ্টি করেছে—সেই শক্তি গান্ধীজীর অহিংসবাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত ও নীতির সাক্ষ্য বহন করে। সশস্ত্র বিপ্লবের এই মূল চিন্তাধার সঙ্গে আমাদের এবং সুভাষচন্দ্রের ও শরৎবাবুর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল বলেই শরৎবাবু অহিংস আন্দোলনের ডাকে আদালত বর্জন করেও আমাদের মামলায় আমার পক্ষ সমর্থনে চট্টগ্রামে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

দেখতে দেখতে চারিদিকে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। কাগজে কাগজে বড় বড় শিরোনামায় সংবাদ প্রচারিত হ'ল—শরৎ বোস অনন্ত সিংহকে ডিফেণ্ড করবেন। বাংলা দেশে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। শরৎবাবুকে অভ্যর্থনা করবার জন্য চট্টলবাসী উৎসাহে উদ্দীপনায় আকুল প্রতীক্ষায় রইল!

বাংলার অগ্নিযুগের চরম অধ্যায়ে, ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের পর, চট্টগ্রামের বুকের ওপর যখন পুলিস ও মিলিটারীর তাণ্ডবলীলা চলেছে, সেই সময় বাংলার মহান নেতা ৺শরৎচন্দ্র বসুর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। সেই সময়ে বিপ্লবীদের সমর্থন জানানো তো দূরের কথা, সামান্য সহানুভূতি প্রকাশও রাজদ্রোহমূলক অপরাধ বলে গণ্য হ'ত এবং তার জন্য বহু লোককে অকারণে কঠোর নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। বাংলাদেশের সেই বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে শরৎবাবুর চরিত্রের এমন একটি দিকের সন্ধান আমি পেয়েছিলাম, যার ফলে আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছিল বাংলার প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী ইতিহাসের উর্বর খনিতে আরো কত দুর্জয় সাহস, নির্ভীক স্বদেশপ্রেম ও সীমাহীন বিপ্লবী প্রেরণা লুকোনো!

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের বহুদিনের ঘনিষ্ঠতা। ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন দ্বন্দ্বে আমরা সুভাষ-বাবুর পক্ষ সমর্থন করি এবং নির্বাচনে সুভাষবাবুরই জয় হয়। এই সূত্রে এঁদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পায়। সেই সময় ১ নং উডবার্ন পার্কে —শরৎবাবুর বাড়িতে মাস্টারদা (সূর্য সেন), অম্বিকাদা, গণেশ ঘোষ প্রমুখ সকলেরই যাতায়াত ছিল। আমি অবশ্য সেখানে যেতাম না। কিন্তু নির্বাচন প্রতিযোগিতায় সুভাষচন্দ্রের সমর্থক হিসেবে, খুব সামান্য হলেও, আমারও কিছু অবদান ছিল। শরৎবাবু আমার সম্বন্ধে সব খবরই রাখতেন। তাই, কেবল আমি

বাদে অন্যান্য সকলকে তাঁর বাড়িতে দেখে আমার অনুপস্থিতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অম্বিকাদাকে একদিন শরৎবাবু বললেন—"অম্বিকাবাবু, আপনাদের সবাইকেই তো দেখতে পাই। কই অনন্তবাবু তো একদিনও আসেন নি? তাঁকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।" শরৎবাবু অম্বিকাদার কাছেই আমাকে "অনন্তবাবু" বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন প্রথম থেকেই তিনি আমাকে "অনন্ত" বলেই সম্বোধন করেছেন। আমিও তাঁকে সব সময় দাদা বলেই শ্রদ্ধা করে এসেছি।

অম্বিকাদার মারফত শরৎবাবু আমাকে ডেকেছেন জানা সত্ত্বেও তাঁর কাছে আমার যাওয়া হ'ল না। পাঠকবর্গের কাছে ব্যাপারটা হয়ত একটু অদ্ভুত ঠেকছে। ব্যাপারটা সত্যিই একটু সামঞ্জস্যহীন—অদ্ভুতই বটে! তবে এইটুকু বলতে পারি, আমার না যাওয়ার মধ্যে কোন অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল না। বলাই বাহুল্য, স্বয়ং মাস্টারদা যখন সব সময় তাঁর কাছে যেতেন, তখন অশ্রদ্ধার কথা তো উঠতেই পারে না। যদিও বলতে একটু বাধো বাধো ঠেকছে, তবু কথাটা খুলেই বলি—সেই সময় বৈপ্লবিক প্রস্তুতির জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ব্যাপারে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম এবং নানাভাবে এই সব বিষয়ে প্রায় সব সময়ই লিপ্ত থাকতাম। পাছে কোন প্রকারে পুলিসী চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ি ও আমাদের নেতাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, সেই জন্যে আমি তখন শরৎবাবু ও নেতাজীর সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করাটা সমীচীন মনে করি নি। ঠিক এই কারণেই আমি একদিনও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিসেও যাই নি।

শরৎবাবুর সঙ্গে তখন আর আমার দেখা হ'ল না। কিন্তু কিছুদিন পরেই, ১৯২৯ সালে, এক গুপ্ত বৈঠকে নেতাজীর সঙ্গে চট্টগ্রামে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই বিষয়ে আগেই উল্লেখ করেছি।

ফেণী স্টেশনের সংঘর্ষের পর কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় গণেশের সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল। কিন্তু তখনও জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তের কোন খবর পাই নি। আমরা যখন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টায় ব্যস্ত, তখন তারা দিব্যি বহাল তবিয়তে কালীদার (কালীচরণ ঘোষ) হেপাজতে ও শরৎবাবুর প্রত্যক্ষ তদারকে কলকাতার বুকে নির্বিবাদে বিচরণ করছে।

জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত যেদিন কালীদার আশ্রয়ে এসে পৌছলো,

সেইদিনই তক্ষুণি কালীদা ছুটে গেলেন শরৎবাবুর কাছে। শরৎবাবু কালীদার মুখে জীবন ও আনন্দের কথা সব শুনে অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং কালীদাকে জানালেন, যে-কোন উপায়ে হোক্ তাদের রক্ষা করতেই হবে; তাদের নিরাপত্তার জন্য সবরকম ব্যবস্থাই করতে হবে। ইংরেজ সরকার আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষালের গ্রেফতারের জন্য মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। মৃত কিম্বা জীবিত অবস্থায় তাদের গ্রেফতার করে মোটা পুরস্কার লাভের আশায় সরকারপুষ্ট দেশদ্রোহীরা মরিয়া হয়ে উঠলো এবং পুলিসবাহিনীও তৎপর হ'ল। সেই সময়—সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায়—পদে পদে বিপদ, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা ও প্রতিটি ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা জেনেও সব ভয়-শঙ্কাকে উপেক্ষা করে শরৎবাবু তক্ষুণি তাঁর নিজের মোটর গাড়িটি ড্রাইভার সমেত কালীদার হেপাজতে দিলেন, আর সেই সঙ্গে দিলেন টাকা। কালীদাকে বললেন যে, বিপ্লবী যুবকদের যে-কোনভাবে হোক্ রক্ষা করতেই হবে এবং সেই জন্যে কোন বিপদই আজ আর বড় নয়। কতখানি দরদ, কতখানি বিপ্লবী প্রেরণা ছিল বলে শরৎবাবুর পক্ষে ওই নিদারুণ বিপদের মধ্যেও সেদিন নিজের গাড়ি ও ড্রাইভার ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, সাধারণ দৃষ্টিতে তার বাস্তব গুরুত্বের উপলব্ধি হবে না।

আদালতে আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য শরৎবাবু চট্টগ্রামে আসছেন—এই খবরটি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আমার কানেও পৌছেছিল। এই খবরে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। উৎসাহে ও গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, মামলায় আমার পক্ষ সমর্থন করতে তাঁর আসাতে যত না আনন্দ ও উৎসাহ পেয়েছিলাম, তার চেয়েও সহস্রগুণে বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবো বলে—তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে বলে।

শরৎবাবুর সঙ্গে ভবিষ্যতের এই সাক্ষাৎ লুকোনো ছিল বলেই যেন সেদিন অম্বিকাদার কাছে খবর পেয়েও আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই নি! দু' তিনদিন পরে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট জেল পরিদর্শন করতে এসে আমাকে বললেন—"শরৎবাবু তোকে Defend করতে আসছেন আজ!" খাওয়া-দাওয়ার পর কোর্টে নেবার সময় জেল-গেটে একজন সার্জেণ্ট আমাকে হাতকড়া পরাতে পরাতে অন্যের অগোচরে খুব নিম্নস্বরে বলল—"Mr. Sarat Bose is coming to defend you to-day, Mr. Singh."

—মিঃ সিং, তোমাকে ডিফেণ্ড করতে মিঃ শরৎ বোস আজ আসছেন। আমি হাসিমুখে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। আর কিছুক্ষণ পরেই সৈন্য বেষ্টিত

হয়ে গাড়িতে ওঠার সময় Additional Supdt. of Police মিঃ স্থটার একটু হেসে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

"Well Mr. Singh, there is a good news for you—Mr. Sarat Bose is coming to defend you to-day."

স্থটার সাহেব "হাসিমুখে" আমাকে খবরটা শোনালেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল, সে মুখে খুশীর চিহ্ন মোটেই নেই। হয়ত ভাবছিলেন কেন এত বাড়াবাড়ি? শরৎবাবুর আবার case defend করবার কি দরকার পড়লো? ওঁকে নাহলে কি চলছিল না?

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিস ও মিলিটারীবাহিনী যথারীতি আমাদের সকলকে আদালতে হাজির করলো। আদালতকক্ষে প্রবেশ করেই আমার হু'টি চোখ চারিদিকে শরৎবাবুকে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছিল। ইতিপূর্বে আমি কখনও তাঁর চেহারা দেখি নি। তবু আমার মনে হয়েছিল তাঁকে দেখামাত্র আমি চিনতে পারবো।

সুবৃহৎ আদালতকক্ষটি প্রতিদিনের মত আজও লোকে লোকারণ্য। আমাদের কাঠগড়ার সামনে উকিল-ব্যারিস্টারদের আসন। পেছনে দর্শক গ্যালারী। আত্মীয়-স্বজন, অভিভাবক ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে special pass নিয়ে বাছাই করা দর্শকবৃন্দে গ্যালারী পরিপূর্ণ। সবার সামনে, মাঝখানে একটিমাত্র চেয়ার শরৎবাবুর জন্য খালি রাখা আছে। আদালতকক্ষে একটা চাপা আলোড়ন চলেছে। ক্ষণে ক্ষণে সকলে ফিরে ফিরে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। আমিও বিস্ফারিত নয়নে দরজার দিকে তাকিয়ে আছি—কতক্ষণে শরৎবাবু আসবেন—কতক্ষণে তাঁকে দেখতে পাবো!

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন জজ প্রতিদিনের মতই procession করে এসে নিজ নিজ আসনে বসলেন। মাঝখানে ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ ইউনী ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্টের আসন গ্রহণ করলেন। বিচারকদের আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎবাবুর আগমন প্রত্যাশায় আদালত কক্ষটি আরো ব্যাকুল ও চঞ্চল হয়ে উঠলো। মনে হ'ল এবারে তিনি আসছেন। পাহারায় নিযুক্ত পুলিসেরা নড়েচড়ে ঠিক হয়ে দাঁড়ালো। সবার চোখ দরজার দিকে। আমিও আকুল উৎকণ্ঠায় আমাদের পেছনে—দরজার দিকে তাকিয়ে আছি।

শরৎবাবু আদালতকক্ষে প্রবেশ করলেন—সৌম্য সুন্দর মূর্তি—স্বাভাবিক গাম্ভীর্য, দীপ্ত প্রতিভা ও অসীম ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গড়া অপূর্ব একটি মানুষ!

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে তিনি আসন গ্রহণ করলেন এবং ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলেন—

"I appear on behalf of Ananta Singh."

ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট জানতেন আমার পক্ষ সমর্থনে শরৎবাবু আসছেন। দৈনিক পত্রিকাতেও এই খবর প্রচারিত হয়েছে। আমি জেলখানায় বসেই সব খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মিঃ জে, ইউনী ভাবে দেখালেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না। "I appear on behalf of Ananta singh"—গুরুগম্ভীর গলায় শরৎবাবুর এই ক'টি কথা আদালত কক্ষের চারিটি দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হ'ল। বিচারকক্ষের সেদিন সে এক নতুন রূপ! জজ, ব্যারিস্টার, উকিল, কাগজের রিপোর্টার ও দর্শকবৃন্দ—সকলেই উদ্‌গ্রীব—শরৎবাবুর জেরা শুনবে। মামলা সুরু হ'ল—আই, বি, ইন্‌স্পেক্টার সারদা ভট্টাচার্য সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। ব্যারিস্টার মিঃ জে, কে, ঘোষাল সারদাবাবুকে জেরা করতে আরম্ভ করলেন। টিফিনের ছুটির আগে পর্যন্ত জেরা চললো। ইংরেজীতে জেরা হচ্ছিল, ইন্‌স্পেক্টারবাবুও ইংরেজীতেই উত্তর দিলেন। টিফিনের আগে মিঃ ঘোষাল তাঁর জেরা শেষ করলেন। এবারে টিফিনের পর ইন্‌স্পেক্টারবাবুকে জেরা করবেন শরৎবাবু।

ট্রাইব্যুনালের তিনজন বিচারক টিফিনের সময় বিশ্রাম করতে তাঁদের চেম্বারে গেলেন। শরৎবাবু আমার কাছে এসে, একটু চাপাকণ্ঠে স্বীকারোক্তিকারীর বর্তমান মানসিক অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি অভিভাবকদের কাছে ইতিমধ্যেই শুনেছেন যে, এস, ডি, ও-র কাছে যে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, সে তখনও তা প্রত্যাহার করে নি। আমি শরৎবাবুকে জানালাম—চেষ্টা করছি, হয়ত শেষ পর্যন্ত সে স্বীকারোক্তি সম্পূর্ণটাই প্রত্যাহার করে নেবে। আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি না এবং সেইজন্যে ব্যারিস্টার মিঃ মুখার্জীকে অনুরোধ করেছিলাম, আমার হয়ে স্বীকারোক্তিকারীকে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেবার জন্য বলতে, কিন্তু 'প্ররোচনার অভিযোগে অভিযুক্ত হবার ভয়ে তিনি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন—এই কথাটাও আমি শরৎবাবুকে জানালাম। আমার কথা শুনে শরৎবাবু নিজেই স্বীকারোক্তিকারীর সঙ্গে কথা বলবেন মনস্থ করলেন। কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব জানিয়ে, পাছে তিনি কোন বিপদে পড়েন এইজন্য, আমি তাঁকে এই ব্যাপারে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করি। শরৎবাবু আমার কথা মোটেই গ্রাহ্য করলেন না। একটু হেসে তিনি আমাকে বললেন—"একেবারেই ভেবো না, আমার ওতে কিছু হবে না।"

এই কথা বলেই তিনি সোজা স্বীকারোক্তিকারীর দিকে এগিয়ে গেলেন। পুলিসের এ্যাডিশনাল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্টার সেখানে পুলিসী তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন। স্টার সাহেব শরৎবাবুকে বাধা দিলেন না—তিনিও শরৎবাবুর পেছন পেছন সেখানে গেলেন। শরৎবাবু স্বীকারোক্তিকারীকে আশীর্বাদ জানিয়ে আইনজ্ঞ হিসেবে তাকে তাঁর মত জানালেন—সে যেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। শরৎবাবু কেবল একজন শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টারই ছিলেন না, তিনি যে বিপ্লবীদের দরদী বন্ধু—তাই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের চেষ্টায় প্ররোচনার অভিযোগে বিপদে পড়বার আশঙ্কাকে তিনি অতি তুচ্ছ মনে করেছিলেন।

আবার মামলা সুরু হ'ল। আই, বি, ইন্‌স্পেক্টার সারদা ভট্টাচার্য এখনও সাক্ষীর কাঠগড়ায়। এবার শরৎবাবুর তাকে জেরা করার পালা—শরৎবাবু উঠে দাঁড়ালেন। দেখতে দেখতে সারদাবাবুর মুখখানা একেবারে সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেল—সাক্ষী যেন আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, পা দুটো থরথর করে কাঁপছে—যেন একটা বলির পাঁঠা, এক্ষুণি বলি হবে। কিসের ভয় সারদা-বাবুর? তিনি তো একটু আগেই শপথ গ্রহণ করেছেন—'সব সত্য কথা বলিব, কোন কথা গোপন করিব না, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না।' পুলিসের আই, বি, ইন্‌স্পেক্টার যে সব সত্যি কথা বলবেন—তাই তাঁর এত ভয়! তবু উপায় কি—শরৎবাবু জেরা আরম্ভ করলেন।

এবারে সারদা ভট্টাচার্য আর ইংরেজীতে উত্তর দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে করলেন না—ইংরেজী ছেড়ে বাংলাতেই উত্তর দিতে সুরু করলেন। সাহেবী স্যুট পরে গলায় দিব্যি টাই এঁটে এতক্ষণ সারদাবাবু বেশ ইংরেজীতে জেরার উত্তর দিচ্ছিলেন। তিনি ইংরেজী ছেড়ে হঠাৎ যখন বাংলা ধরলেন, তখন শরৎবাবু বললেন: "Well, just answer me in English."

সারদাবাবু—"আমি ইংরেজীতে ভাল বলতে পারবো না।"

শরৎবাবু—"Had you not been answering so long in English?"

সারদাবাবু—"আমি আপনার ইংরেজী ভাল বুঝতে পারছি না।"

শরৎবাবু—"Why? Am I speaking different English than my other learned friends?"

সারদাবাবু—"আপনি 'impulse টিম্‌পালস্‌' কি সব বলছেন—তা' আমি মোটেই বুঝতে পারছি না।"

এই কথা বলে সারদাবাবু যেন প্রায় কেঁদেই ফেললেন। উকিল-ব্যারিস্টারেরা মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। দর্শকেরা হাসি চাপতে মুখ লুকালো। যারা ফাঁসি ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অপেক্ষায় আছে, তাদের আবার ভ্রূক্ষেপ কিসের—আমরা প্রাণ খুলে হো-হো করে হেসে উঠলাম। ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে, ইউনী একবার চোখ ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে অস্বাভাবিক ভাবে নিজের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে ব্যস্ত হলেন। রায়বাহাদুর ও খাঁ বাহাদুর, ট্রাইব্যুনালের দুই কমিশনার—মহাজন যে পথে করে গমন, সেই পথ অনুসরণ করে খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন।

এইভাবে প্রতিদিনই আমরা কিছু-না-কিছু নতুন বিষয় উপভোগ করতাম। দিন তিনেক পরে শরৎবাবু আবার বিচারকক্ষে প্রবেশ করছেন। তাঁর হাতে দেখলাম একটা ইংরেজী দৈনিক খবরের কাগজ। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল আজ তিনি যেন কোন সমর প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হবেন। ব্যাপারখানা কি, তখনও বুঝতে পারি নি। একটু পরেই দেখি প্রেসিডেণ্টকে সম্বোধন করে হাতের স্টেটস্‌ম্যান কাগজখানার সম্পাদকীয়তে প্রেসিডেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন। এমন ভাবে ও ভাষায় সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল যা' শরৎবাবুর পক্ষে মানহানিকর এবং তাঁর মক্কেলের স্বার্থবিরোধী। স্টেটস্‌ম্যান কটাক্ষ করেছিল—'শরৎবাবুর তিন মাস Practice ছেড়ে দিয়ে Non-violent Movement-এ যোগ দেওয়া কি Violence-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনন্ত সিংহের defence-এর জন্যে ভেস্তে গেল?' সম্পাদকীয়তে প্রেসিডেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণের পর তীব্র তিরস্কারের সুরে Statesman-কে লক্ষ্য করে তিনি বললেন—

"I damn care the barking of a cur masquerading under a borrowed hide of the British Lion!"

—বৃটিশ সিংহের ধার করা চামড়া পরিহিত একটা খেঁকি কুত্তার চেঁচামেচিকে আমি থোড়াই পরোয়া করি।

মুহূর্তে মিঃ ইউনীর লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠলো। কি করবেন, কি বলবেন, তিনি যেন ঠিক করতে পারছিলেন না। একটু থেমে খুব সংযত অথচ ধমকের সুরে শরৎবাবুকে বললেন—

"Mr. Bose, please repeat!"

অর্থাৎ, তিনি বোঝাতে চাইলেন, যদি সাহস থাকে তবে পুনরাবৃত্তি করুন! মিঃ ইউনী হয়ত ভেবেছিলেন, বিচারকের ধমকে কথাগুলির সুর বদলে শরৎবাবু মোলায়েম করে অন্য কিছু বলে নিজেকে সামলে নেবেন। কিন্তু এ যে বড় শক্ত

চাই! প্রেসিডেণ্ট একটু পরেই বুঝলেন, শরৎবাবুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা করেছেন।

মিঃ ইউনীর কথামতই সমগ্র বিচার কক্ষটি প্রকম্পিত করে আরও তীব্রতর তিরস্কারের স্বরে শরৎবাবুর কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হ'ল—

"I damn care for the barking of a cur masquerading under the borrowed hide of the British Lion !"

প্রেসিডেণ্ট তো হতভম্ব! সজোরে ধাক্কা খেয়ে তিনি যেন একটু পেছু সরে গেলেন। তারপর অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—

"It is a dreadful simile indeed !"

—বিলক্ষণ, এটা যে একটা ভয়ানক উপমা!

শরৎবাবু সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর জবাব দিলেন—

"I can't help. This is the only appropriate simile which I can use at the moment."

—কি করবো বলুন? এইক্ষেত্রে কেবলমাত্র এইরূপ একটাই উপযুক্ত উপমা আমি ব্যবহার করতে পারি।

সাপের মুখে যেন জড়ী ছোঁয়ানো হ'ল—প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে, ইউনী মাথা নিচু করে সুবোধ ছেলের মত কাগজ-কলমে মনোনিবেশ করলেন। শরৎবাবু তারপর Statesman-কে শাসালেন—যদি Statesman প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তবে তিনি মানহানি ও তাঁর মক্কেলের স্বার্থহানিকর সম্পাদকীয় লেখার জন্য Statesman-এর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করবেন। হায় রে Statesman! সে যে ভীষণ প্রতাপশালী! তার এত বিক্রম, এত দম্ভ, এত আস্ফালন—এক ফুৎকারে সব মুহূর্তে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে গেল। পরের দিনই Statesman শরৎবাবুর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে এ যাত্রা রক্ষা পেল।

শরৎবাবুর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে ও প্রভাবে জনবহুল আদালতগৃহ আলোড়িত ও মুগ্ধ! তাঁর কাছে সরকারপক্ষকেও মাঝে মাঝে নিরস্ত, নির্বাক ও হতভম্ব হতে হয়েছে! শরৎবাবুর চট্টগ্রাম আগমনে সমস্ত চট্টলবাসী উৎসাহে ও উদ্দীপনায় মাতোয়ারা! তাদের মনে অসীম আশা—শরৎবাবুর প্রতিভাবলে আমাদের কারোও হয়ত ফাঁসি হবে না এবং অনেকে মামলায় মুক্তি পাবে। চট্টগ্রামে মিলিটারী ও পুলিসী রাজত্ব চলেছে—ধরপাকড়, অত্যাচার, নিপীড়নের শেষ নেই, বিভিন্ন ধরনের লাল, নীল, সাদা পরিচয়পত্র প্রভৃতির প্রচলনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব এবং সভাসমিতি, মিছিল সব বন্ধ। কাজেই, এই অবস্থায় চট্টগ্রামে

শরৎবাবুর পদার্পণে চট্টগ্রামবাসীর মনে আশার আলো দেখা দিয়েছিল এবং তাঁকে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাতে কেউ কার্পণ্য করেন নি।

১৯২৯ সালে বাংলা কংগ্রেসে যে মত ও পথ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল, তা' ক্রমেই ছুইটি বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ভাবধারার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। একটি চিন্তাধারার মূল গতি গান্ধীজীর অহিংস আদর্শ, যা' বাংলাদেশে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে রূপ নিয়েছে, এবং অপরটি স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ, যা' গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ অহিংস সংগ্রামের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে সুভাষের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়েছে। এই দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারা যেমন বিভিন্ন কংগ্রেস কর্মীরা অনুসরণ করেছে, ঠিক তেমনি বাংলার ছাত্র ও যুব-সমাজও অনুশীলন এবং যুগান্তরের প্রবীণ নেতাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রকাশ্য ফ্রন্টে রাজনৈতিক কাজ ও সংগঠনের জন্য যতীন্দ্রমোহন বা সুভাষকে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সমর্থন করেছে। আমরা মাস্টারদার নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রকে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস-সভাপতিরূপে নির্বাচিত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করি। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে সাফল্যের জন্য অনুশীলন পার্টি ও যুগান্তরের একটা অংশ যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন জানায়।

চট্টগ্রামে সুভাষের সমর্থনে আমরা জয়ী হই এবং চারটি ভোটের সংখ্যাধিক্যে সুভাষ বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই ঐতিহাসিক সূত্রে শরৎবাবু ও সুভাষের সঙ্গে আমরা গভীরভাবে যুক্ত ছিলাম। আমাদের যুব-বিদ্রোহের পর তাঁদের সঙ্গে আমাদের ও চট্টগ্রামবাসীর সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠলো।

এই সঙ্গে মনে পড়ে চট্টগ্রামের প্রবীণ নেতাদের কথা। আমরা ১৯২৭-২৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে আসি। চট্টগ্রামে তখন আমরা—মাস্টারদা, নির্মলদা, অম্বিকাদা, লোকনাথ গণেশ ও আমি—কংগ্রেসের বরণ্যে নেতাদের তুলনায় নেহাতই নগণ্য। তবু কংগ্রেস নির্বাচনে আমাদের জয়ী হতেই হবে। অর্থাৎ, আমাদের সর্ব শক্তি নিয়ে যতীন্দ্রমোহন, ত্রিপুরা চৌধুরী মহিম দাস, চন্দ্রশেখর দে, লোন কোম্পানীর সতীশ নাগ, পাঞ্চজন্য পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী ও চট্টগ্রামের অনুশীলন দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আমরা কা'কে চট্টগ্রাম জেলা-কংগ্রেসের সভাপতিপদে মনোনয়ন করবো—কে এগিয়ে আসবেন আমাদের সঙ্গে? উত্তরাধিকার সূত্রে যাঁদের নেতৃত্ব কংগ্রেসে চিরস্থায়ী, তাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমাদের ছ'জনের পক্ষে বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অবস্থায়

কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় এমন কে আছেন যিনি সাহস করে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন?

আমরা ডাক্তার মহিমচন্দ্র দাশগুপ্তের কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেলাম—জেলা-কংগ্রেস সভাপতিপদে তাঁকেই আমরা নির্বাচন করবো। ১৯১৯ সাল থেকেই ডাক্তার মহিমবাবু কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় একজন। চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন, গান্ধীজী, দেশবন্ধু প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে প্রথম থেকেই মহিমবাবুর যোগ ছিল। ১৯২৮-২৯ সালে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার প্রভাব যখন বাংলা কংগ্রেসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ করে, তখন ডাক্তার মহিমবাবু সেদিকে আকৃষ্ট হন। তিনি আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। আমরা নির্বাচনে জয়ী হলাম—মহিমবাবু ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

শরৎবাবু চট্টগ্রামে আসবার পর কয়েকবার মহিমবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। তা'ছাড়া মহিমবাবু আমাদের Defence fund ও মামলা পরিচালনার ব্যাপারেও যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। এই কারণে শরৎবাবুর সঙ্গেও মহিমবাবুর আলাপ-আলোচনা হয়—কি করে মামলার সমস্যা সমাধান করা যায়?

কয়েকদিন পরে এক রবিবারে শরৎবাবুর সঙ্গে জেলে আমার Legal Interview হ'ল—জেলাশাসক মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলে দেখা করবার অনুমতি দেন। সকালে জেল পরিদর্শনকালে জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাকে জানান, মামলার বিষয় আলোচনার জন্যে শরৎবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন এবং আমরা যেন তাঁর টেবিলে বসেই আলোচনা করি

খাওয়া দাওয়ার পর থেকেই আমি প্রতীক্ষা করে আছি কতক্ষণে আমার ডাক পড়বে—কতক্ষণে "আইন সংক্রান্ত" আলোচনা আরম্ভ হবে। দুপুরে জেল অফিসে আমাকে ডেকে পাঠানো হ'ল। আমার পৌঁছবার আগেই শরৎবাবু সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের চেয়ারে বসেছিলেন। আমি একটা মস্তবড় টেবিলের অপর দিকে যথেষ্ট ব্যবধানে একটি নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলাম। জেলার মিঃ জোন্স সামনে দাঁড়ানো—ডিউটি অনুযায়ী সেখানে তাঁর উপস্থিত থাকার কথা। শরৎবাবু অবস্থাটা অনুমান করে জেলারের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন—

"Well Jailor, the legal interview is to be held not within the hearing but within the sight."

—দেখ জেলার, তোমার চোখের সামনে মামলার ব্যাপারে সাক্ষাৎ হতে পারে, কিন্তু তোমার শ্রুতির অগোচরে তা হবে।

জেলার সাহেব বললেন—"Oh! yes sir"—এবং তৎক্ষণাৎ কাছ থেকে সরে গেলেন—এমন কি "sight" থেকেও—জেলার একেবারে দৃষ্টির বাইরে অন্তর্হিত হলেন! এবারে আমাদের দু'জনের "Legal consultation" হবে। যে স্তরে আমাদের "Legal consultation" চললো, পাঠকবর্গ তা' জেনে স্তম্ভিত হবেন। শরৎবাবু আমাকে প্রথম প্রশ্ন করলেন—"জেল থেকে পালাতে পার?"

আমি বললাম—"চেষ্টা করতে পারি।"

শরৎবাবু উৎসাহ দিয়ে বললেন—"চেষ্টা করে যাও, জেল ভাঙ। যা টাকা লাগে আমি দেব। কত টাকা লাগবে?"

আমি উত্তর দিলাম—"আপাততঃ পাঁচ হাজার টাকা।" তিনি বললেন—"ভেবো না, টাকা নিশ্চয়ই পাবে।" তারপর সারাক্ষণ, প্রায় দু'ঘণ্টা, আমরা কেবল টেক্‌নিক্যাল details নিয়ে আলোচনা করলাম—কা'কে কিভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো, কার হাতে তিনি টাকা দেবেন, কখন দেবেন, কি উপায়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো—ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক কথা। এই হ'ল আমাদের "Legal consultation!" শরৎবাবু বুঝেছিলেন দু'শ' বছরের বে-আইনীভাবে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ সরকারের কারাকক্ষে বসে একজন বিপ্লবীর সঙ্গে আইনসংক্রান্ত আলোচনার বিষয়বস্তু জেল ভাঙার পরিকল্পনা ছাড়া অধিক প্রয়োজনীয় আর কিছু হতে পারে না।

আমাদের আলোচনার শেষে ঠিক হ'ল, যত দীর্ঘদিন ধরে সম্ভব মামলা চালিয়ে যেতে হবে। যাদের Defence-এর কোন ব্যবস্থা তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা করতে পারেন নি, তাদের জন্য শরৎবাবু চন্দননগরের ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র বোসকে ঠিক করে দিলেন। সুদীর্ঘ দু'টি বছর ধরে আমাদের মামলা চলে। শ্রীশবাবুর পারিশ্রমিক হিসেবে প্রতি মাসে প্রয়োজনীয় টাকা শরৎবাবু জুগিয়ে যেতেন এবং শ্রীশবাবুও যথেষ্ট পরিমাণে স্বার্থত্যাগ করেছিলেন। শ্রীশবাবু সম্বন্ধে যথাস্থানে লিখবো।

মামলা চলাকালীন শেষবারের মত শরৎবাবু চট্টগ্রামে এলে তাঁর সঙ্গে আমরা অর্ধেন্দু গুহের পরিচয় করিয়ে দিই। আমাদের মধ্যে অর্ধেন্দু ও অপর পাঁচজন জামিনে মুক্ত ছিল—এ সম্বন্ধে আগেই লিখেছি।

আমাদের মধ্যে অর্ধেন্দুর বয়সই সব চাইতে কম। শরৎবাবু তাকে 'শিশু' বলে ডাকতেন। সেই সময় আমরা এই গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য এই "শিশুটি-

কেই" বাছাই করলাম। যাদের বয়স হয়েছে—সংসার চিনেছে—সংসারের প্রতি আসক্তি জন্মাবার সম্ভাবনাও বেশী, বিশেষ বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাদের আমরা নির্বাচিত করতাম না।

কালীদার সঙ্গে শরৎবাবু শেষবার চট্টগ্রামে এলেন। তাঁর চট্টগ্রামের বাসায় (চট্টগ্রাম এলে তিনি যে বাসায় থাকতেন) অর্ধেন্দুর সঙ্গে দেখা করে নিজের স্যুটকেস থেকে চারটি তাজা T. N. T. ভর্তি হাতবোমা বার করে অর্ধেন্দুকে দিলেন এবং সেই সঙ্গে দু'হাজার টাকা দিয়ে বললেন—"সূর্য সেনকে এই আমার উপহার—তাঁকে আমার বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে এই চারটি হাতবোমা ও টাকা পাঠিয়ে দেবে।"

কতখানি দুর্জয় সাহস ও স্বদেশপ্রেম থাকলে পরে তখনকার পুলিস এবং মিলিটারী রাজত্বকে উপেক্ষা করে শরৎবাবুর মত একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি সূর্য সেনকে উপহার দেবার জন্য নিজের স্যুটকেস বোঝাই করে চারটি তাজা হাতবোমা কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে আসতে পারেন!

ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য সামান্য একটা ঘটনা বলি। আমাদের দলের একজন বিপ্লবী বন্ধু B. Sc. Final year-এ পড়তো। তার কলকাতার বাসায় একদিনের জন্য তাকে Revolver-এর কার্তুজ ভর্তি একটা বাক্স রাখতে দিই। পরের দিন যখন বাক্সটি নিতে গেলাম, তখন তার সেই একটি রাতের adventure সম্বন্ধে শুনলাম—সারারাত সে নাকি বাক্সটি বালিসের নিচে রেখে জেগে বসেছিল। প্রশ্ন করে জানলাম, সে ভয়ে ঘুমোতে পারে নি—কি জানি যদি accidentally কার্তুজগুলি ফাটতে থাকে! আরও একটু জানা দরকার—দেশী হাতবোমা যতই ভাল হোক্ না কেন, হঠাৎ ফেটে যাবার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে। ডালহৌসি স্কোয়ারে টেগার্ট সাহেবকে লক্ষ্য করে হাতবোমা ছোঁড়ার সময় সে'টি হঠাৎ ফেটে যাওয়াতে বিপ্লবী যুবক অনুজা ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সেই একই ধরনের তৈরি এই চারটি হাতবোমা শরৎবাবু নিজে স্যুটকেসে বহন করে নিয়ে এলেন! এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে বোঝা যায় দেশী হাতবোমা সঙ্গে বহন করা কতখানি ভয়াবহ ব্যাপার এবং কতখানি স্বদেশপ্রেমের অনুপ্রেরনাতে তা সম্ভব।

জানিনা সারা ভারতবর্ষে আর কোন নজীর আছে কিনা যে, এতবড় নেতা, প্রখ্যাত ব্যারিস্টার, ধনে-মানে এতবড় প্রতিষ্ঠাবান অপর কোন ব্যক্তি কি বিপ্লবীদের সঙ্গে এতখানি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে ভয়-শঙ্কা-বিপদ তুচ্ছজ্ঞান

করে সমান তালে পা ফেলে চলেছেন? এইরূপ ঘটনা ও ঘটনার নায়কের বর্ণনা রূপকথাতেই শোনা যায়—বাস্তবে অতি বিরল।

তারপর একদিন "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা" শেষ হ'ল। আমাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেই বেকসুর মুক্তি পেল। বাকি সকলের দ্বীপান্তরের সাজা হ'ল—ফাঁসি কারোই হ'ল না। শরৎবাবুর স্বপ্ন সফল হ'ল—তাঁর পরিকল্পনা সার্থক হ'ল। উকিল-ব্যারিস্টারেরা ভাবলেন ট্রাইব্যুনাল সুবিচার করেছে—আর তাঁরা সাক্ষীদের জেরায় বিধ্বস্ত করে বাকচাতুর্যে ও আইনের মারপ্যাঁচে মামলা জিতেছেন—কারণ, কারো ফাঁসি হয় নি।

কিন্তু আমরা জানি কোন আইনই আমাদের বাঁচাতে পারত না। ট্রাইব্যুনাল বিচার প্রহসনের অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে বেশি আর কারো আছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমরা বেঁচে আছি আমার সঙ্গে জেলে শরৎবাবুর সেই "Leagal consultation"-এর জন্যে—'জেল ভাঙতে পার? পালাতে পার? যত টাকা লাগে দেব, ভাঙ জেল, পালিয়ে যাও।'

তাঁর টাকা ও পরামর্শের সদ্ব্যবহার আমরা করেছিলাম। সে এক মহা আয়োজন—যথাস্থানে তার বর্ণনা আমি দেব।

শরৎবাবুর গভীর স্বদেশপ্রেম ও বিপ্লবী প্রেরণার উৎস যদি বক্তৃতামঞ্চে খুঁজে বেড়াই তবে আমরা ব্যর্থ হব—হতাশ হব। সেই বিপ্লবী প্রাণের স্পন্দন বক্তৃতামঞ্চে দেখা দেয় না, সভাস্থলে গলায় স্তূপীকৃত ফুলের মালার মধ্যে তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে বা লক্ষ লোকের করতালির ক্ষণিক উৎসাহের মাঝে সেই মহা-প্রেরণার জন্মসূত্র অন্বেষণের চেষ্টা করলে হতাশ হতে হয়। শরৎবাবুর স্বদেশপ্রেম ও হৃদয়ের বিপ্লবী স্পন্দনের নিদর্শন আমরা পাবো সেইখানে—সেইদিন—যখন টেগার্ট সাহেবের পুলিসী রাজত্বের মধ্যে চূড়ান্ত বিপদের সম্ভাবনা ভুলে জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তের নিরাপত্তার জন্য নিজের ব্যবহারের গাড়ি ও ড্রাইভার কালীদার হেপাজতে দিয়ে দিলেন! শরৎবাবুর বিপ্লবী প্রেরণার গভীরতার অনুভূতি আমাদের মধ্যে তখনই হবে, যখন নিজ অন্তরে উপলব্ধি করবো কি ভীষণ দুর্জয় শক্তি নিয়ে অনন্ত সিংহকে কারাগারে "আইন সংক্রান্ত" পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন—'জেল ভাঙতে পার, জেল থেকে পালাতে পার, যত টাকা লাগে আমি দেব।' বিপ্লবী শরৎবাবুর নিবিড় অথচ নির্বাক স্বদেশপ্রেমের অফুরন্ত উৎসের পরিচয় লেখা আছে বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসের পাতায়, যখন সকলপ্রকার বিপদ, শঙ্কা, ভয়, অত্যাচার ও জুলুমের বিভীষিকা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, সুট্‌কেস ভর্তি বোমা কলকাতা থেকে

চট্টগ্রামে নিয়ে গেলেন এবং মাস্টারদাকে উপহার দিয়ে বিপ্লবী অভিনন্দন জানালেন।

তরুণ বিপ্লবী বাংলার সত্যিকার দরদী শরৎবাবুকে—সাচ্চা বিপ্লবী শরৎবাবুকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের মামলা পুরোদমে চলেছে। কিন্তু মামলা চালানো ক্রমেই সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। আমার দিদি ইন্দুমতী সিং এই সময় বাড়ি ছেড়ে মাসের পর মাস আমাদের Defence-এর ব্যবস্থার জন্য কলকাতায় কাটিয়েছেন। তিনি বাংলা ও বাংলার বাইরে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের কাছে মামলা চালাবার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন নিয়ে গেছেন। দেশপ্রেমিক কেউই এই প্রয়োজন মেটাতে অস্বীকার করেন নি—সকলেই সরকারী নিপীড়নের আশঙ্কা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে তাঁদের সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করেছেন।

দিদি জওহরলাল নেহরুর কাছেও অর্থ সাহায্যের জন্য গিয়েছিলেন। দিদির সঙ্গে ছিলেন শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ। শ্রীঘোষও সেদিন আমাদের মতই একজন তরুণ ছিলেন। তাঁকেও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর জেলে আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছে। আজ আর তিনি জীবীত নেই। বেশিদিন আগে নয়—আমার দিদির মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর শয্যাপার্শ্বে সুধীরবাবুর সঙ্গে আমার মিলিত হবার সুযোগ হয়েছিল। সেই দিন তাঁর মুখে আর একবার শুনলাম, তিনি ও দিদি জওহরলালজীর কাছে আমাদের মামলায় অর্থ সাহায্যের আশায় উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিলেন।

জওহরলালজী সুধীরবাবু ও দিদির সঙ্গে সময়মত সাক্ষাৎ করে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন—

"You see 'Katunis' are staying here. They will not feel very happy about your presence. It is better you leave U. P. I like that you will not try to collect the Defence Fund from U. P.. I will write to Sarat so that the respective province look after the Defence of the Politicals of that particular province alone."

—কাটুনীরা, অর্থাৎ গান্ধীজীর নির্দেশে চরকায় যাঁরা সুতো কাটছেন, এখানে তোমাদের উপস্থিতি পছন্দ করবেন না। তোমরা ইউ, পি-তে চাঁদা সংগ্রহ কোরো না। আমি শরৎকে লিখবো রাজনীতিকদের মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা যেন নিজ নিজ প্রদেশের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে।

জওহরলালজীর এই মনোভাবে ও বিপ্লবী বাংলার প্রতি এই অবমাননাকর মন্তব্যে সুধীরবাবুর তরুণ মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। তিনি দিদিকে আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সেখান থেকে চলে আসতে বললেন। জওহরলালজী তরুণের ক্ষুব্ধ মনোভাব বুঝে তক্ষুণি তাঁর চেক্ বইটি বার করে পাঁচশ' এক টাকার একটি চেক্ কেটে দিদিকে দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সুধীরবাবু দিদিকে বললেন—"দিদি, এ টাকা নেবেন না।" সুধীরবাবু আমাকে বলেছেন—"দিদি তো একটু সেন্টিমেন্টাল, কাজেই সেই অবস্থায় চেক্ হাতে জহরলালজীর অনুরোধ উপেক্ষা করা দিদির পক্ষে খুব সহজ ছিল না।" দিদিকে ইতস্তত করতে দেখে জওহরলালজী বললেন—"It is just a gift from a brother, won't you accept it my sister?" দিদি ধন্যবাদের সঙ্গে সেই চেক্‌টি গ্রহণ করলেন।

কেবল আমাদের ক'জনের বিরুদ্ধেই যে সরকারের মামলা তা' নয়। আমার বাবা, রজতের বাবা ও আনন্দের বাবা—যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, কোনভাবেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না বলে সরকার নিশ্চিত জানতো, তাঁদেরও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ট্রাইব্যুনালের বিচারে সাজা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট ছিলেন। এ ছাড়া ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট নয় এমন আরো অনেকের বিরুদ্ধেই মামলা চলছিল এবং এদের জন্য আমাদের অভিভাবকদের দায়িত্ব ও চিন্তার অবধি ছিল না। বাস্তব অবস্থাটা অনুধাবন করলে মামলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অভিভাবকেরা কেন বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, তা' সহজেই বোঝা যাবে। তাঁদের চোখের সামনে চট্টলার তরুণ বিপ্লবীদের প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যাবে আর তাঁরা নির্বাক ও নিশ্চেষ্ট থাকবেন, এ একেবারেই অসম্ভব। প্রাণদণ্ড থেকে যদি আমাদের বাঁচানো যায় এবং যারা অল্প বয়সে হাসতে হাসতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা নিতে প্রস্তুত, তাদের যদি মুক্ত করে আনা যায়, তবে এই সব তরুণেরা অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে হয়ত আবার অনেক সুযোগ পাবে—এই রঙীন আশায় অভিভাবকেরা সরকারী মামলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিপ্রায়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

সরকারী নিষ্পেষণের ভয় এবং অহিংস আন্দোলনের প্রভাব যে মামলা চালানোর পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অভিভাবকেরা ও দিদি ইন্দুমতী সিং সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বেড়াজাল ভেদ করে মামলার শক্তিশালী Defence-এর ব্যবস্থা করতে দিন-রাত খেটেছেন। কলকাতায় চারুদা, বিমলপ্রতিভা দেবী, কালীদা, শরৎবাবু ও

অন্যান্য প্রবীন বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে ইন্দুমতী সিং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ীই Defence-এর ব্যবস্থা করেছিলেন।

কিন্তু দারুণ সমস্যা দেখা দিল। অভিভাবকেরা বা শরৎবাবু প্রমুখ নেতারা প্রথমে ভাবেননি যে, মামলা তিনমাসের বেশি চলবে। এই তিন মাসের জন্য যা ব্যবস্থা করা সম্ভব, তাঁরা তা' করেছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সংগৃহীত হবে বলেও আশা করেছিলেন। কিন্তু পরে বাস্তবে যখন বোঝা গেল যে, এই মামলা (সরকার যার নাম দিল—Chittagong Armoury Raid Case) কয়েক মাসের মধ্যে শেষ হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, তখন তাঁরা সুদীর্ঘকাল কিভাবে মামলা চালানো সম্ভব তা আবার নতুন করে চিন্তা সুরু করলেন।

'Whither the declivity is, thither flows the water'—বিপদ কখনও একা আসে না!

এক সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে গোপনে সংগৃহীত Statesman কাগজের শিরোনামায় বড় বড় অক্ষরে লেখা পড়লাম—

"A MIDNIGHT DRAMA OF REVOLVER BATTLE.

CHITTAGONG INSURGENTS FIGHT.

AT CHANDERNAGAR!"

বুঝতে আর বাকি রইল না। ২৮শে জুন আমার স্বেচ্ছায় শত্রুশিবিরে ধরা দেবার ২৬ দিন পরেই ট্রাইব্যুনালের বিচার সুরু। আমাদের পক্ষে সময়, পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রায় দেড়মাস বিচার চলার পর চন্দননগরের এই সংঘর্ষ। এই নতুন পরিস্থিতিতে অভিভাবকেরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন।

আমি বন্ধুদের অজান্তে চন্দননগরের বাড়ি থেকে চলে আসবার পর গণেশ প্রথমে তা' জানতে পেরেই ক্ষুব্ধ হয়ে অত্যন্ত উষ্মার সঙ্গে পুটুদিকেই (সুহাসিনী গাঙ্গুলী) দায়ী করে প্রশ্ন করলো—"আপনি কেন 'সুরেনকে' (আমার ছদ্মনাম) যেতে দিলেন? এইভাবে চলে যাবার সময় কেন বাধা দিলেন না? আমাদের কাউকে আপনি কেন জানালেন না যে সুরেন যাচ্ছে···?" গণেশের এইরূপ প্রশ্নে পুটুদি খুবই অপ্রতিভ হলেন। তিনি আমাকে 'সুরেন' বলেই জানতেন। সেই জন্যে গণেশের এই অভিযোগের বাস্তব কারণ বা সামঞ্জস্য খুঁজে পেলেন না। পুটুদি গণেশের ঐরূপ "অপ্রকৃতিস্থ" অবস্থা আগে কখনও দেখেন নি। "সুরেনের" ব্যাপারে অতখানি গুরুত্ব দেওয়া বাস্তবে তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কাজেই তিনি কোনমতেই বুঝতে পারলেন না "সুরেনকে" যেতে দেওয়া বা না দেওয়ার মধ্যে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন কোথায়? তাই পুটুদি মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে গণেশকে বললেন—"দেখ 'অতুল' তোমরা কে কখন কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাবে সেই সম্বন্ধে তদারক করবার অধিকার কি আমার আছে? আমার পক্ষে 'সুরেনের' গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করাটা কি বিধিবহির্ভূত হ'ত না?

গণেশ অপ্রস্তুত হ'ল। সত্যিই তো—পুটুদি তো জানেন সে 'সুরেন' আর আমার পরিচয় 'অতুল'—তবে পুটুদি—যাকে আমরাও তখন পর্যন্ত সুহাসিনী গাঙ্গুলী বলে জানবার সুযোগ পাই নি, কি করে গণেশের অভিযোগের পাত্রী হতে পারেন? গণেশ তার অবচেতন মনের ক্ষণিক ভুলের জন্য সেইরূপ উষ্মা প্রকাশে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে পুটুদির কাছে ক্ষমা চাইল।

তারপরদিন সকালে কলকাতার বড় বড় সংবাদপত্রে ফলাও করে সংবাদ প্রকাশিত হ'ল—

"Ananta Singh Surrenders!" "Ring Leader of Chittagong Insurgents Surrenders to Inspector General of Police!" "In Broad Day Light Ananta Singh walks into the Police Head Quarter."

"অনন্ত সিংহ স্বেচ্ছায় ধরা দিল।" "সরকারীমহল স্তম্ভিত!" "অনন্ত সিংহ ধরা দিল কেন?" চন্দননগরের বাড়িতে খবরের কাগজ হাতে শশধরদা, পুটুদি, গণেশ, আনন্দ ও মাখন অতিশয় চিন্তাকুলভাবে বসে আছে। আজ আর পুটুদি ও শশধরদার জানতে বাকি রইল না—কে সুরেন, কে অতুল! মাখন ও আনন্দের পরিচয় বুঝতেও তাদের আর কোন অসুবিধা হ'ল না। কারণ ফেণী স্টেশনের সংঘর্ষের কথাও ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়েছে। আমরা চারজন প্রধান-বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সেই ঘটনা, তাই অপর দু'জন যে মাখন এবং আনন্দ তা' বুঝতে দেরি হবার কথা নয়। দু' মাসেরও বেশি—২৮শে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ পর্যন্ত, অন্যান্য স্থান থেকে অধিক নিরাপদ বোধে গণেশরাও এই বাড়িতেই ছিল।

ইতিমধ্যে লোকনাথ বলের চট্টগ্রামে আত্মগোপন করে থাকা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। লোকনাথের চেহারা এত Prominent, এত আকর্ষণীয় এবং শারীরিক ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শনীর মাধ্যমে সে এত সুপরিচিত যে, কোন বাড়িতে তাকে কেউ আগে দেখে নি বা চেনে না—এমন পরিবেশ পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়লো!

মাস্টারদা ও নির্মলদা লোকনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন, লোকনাথকেও কলকাতা যেতে হবে। চট্টগ্রাম অপেক্ষা কলকাতা মহানগরীতে আত্মগোপন করে কাজ করা লোকনাথের পক্ষে অনেক সহজ হবে।

আমাদের সাথী হরলাল থাকতো কুমিড়া—এখানকার দলের সব দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত ছিল। কুমিড়া রেল-স্টেশন চট্টগ্রাম প্রধান স্টেশনের প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে। নিরাপদ পথে লোকনাথের কলকাতা পৌছবার সুব্যবস্থার ভার পড়লো হরলালের উপরে। হরলাল হাসিমুখে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে।

লোকনাথ ও হরলাল—দু'জনেরই মুসলমানের বেশ-বাস। লোকনাথ জমিদার আর হরলাল তার অনুগত সহচর। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে ও "কুমিড়ার ঢালা" (পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ) অতিক্রম করে লোকনাথ ও হরলাল কুমিড়ার পরের দু'টি স্টেশন বাদ দিয়ে সীতাকুণ্ড থেকে কুমিল্লার টিকিট কেটে ট্রেনে চাপলো। ভোর রাত চারটার সময় কুমিল্লা স্টেশনে ট্রেনটি থামে। ফেণীতে আমাদের সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষের পর কুমিল্লা স্টেশনে তো বটেই তা'ছাড়াও অন্যান্য বড় বড় স্টেশনেও কর্তৃপক্ষের কড়া সজাগ পাহারার ব্যবস্থা। লোকনাথের কাছেই শুনেছি, ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন-গেট পেরিয়েই প্রতি মুহূর্তে তারা বিপদের আশঙ্কা করেছিল—এই বুঝি শত্রুপক্ষের কেউ তাদের চিনে ফেলে! তারা শঙ্কা ও বিপদ মাথায় নিয়ে ইতস্তত না করেই স্টেশন অতিক্রম করে। কিন্তু এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। টিকিট-চেকারকে টিকিট দিয়ে হরলালেরা যখন গেট অতিক্রম করছে, তখন এক পরিচিত পুলিস-ইন্‌স্পেক্টারের প্রতি লোকনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। উভয়েই উভয়কে চিনলো—পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময়ও হ'ল। লোকনাথ বলেছে, ইন্‌স্পেক্টার কিশোরীবাবু তার বিশেষ পরিচিত—তিনি লোকনাথকে চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল করেন নি। ইচ্ছে করলেই তিনি লোকনাথকে গ্রেফতার করতে পারতেন। কিন্তু কিশোরীবাবু গ্রেফতারের চেষ্টা না করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন দেখে লোকনাথ একেবারে অভিভূত হয়ে যায়।

বহু বছর পরে, ১৯৬২ সালে, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড দৈনিকে লেখবার সময় লোকনাথ আমাকে এই বিষয় বলেছিল। এই বর্ণনা দেবার সময় শত্রুশিবিরে থেকেও কিশোরীবাবুর স্বদেশপ্রেমের এই নিদর্শন লোকনাথকে তাঁর প্রতি যে কতখানি শ্রদ্ধাবান করে তুলেছিল, তা তার প্রতিটি কথায় আমি অনুভব করেছি। আমি সেদিন কিশোরীবাবুর নির্বাক স্বদেশিকতার প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে আনন্দ পেয়েছি।

হরলাল কুমিল্লা কলেজে পড়তো। কুমিল্লায় অনুশীলন পার্টির সাংগঠনিক শক্তি সম্বন্ধে হরলালের উচ্চ ধারণা। তাদের নেতাদের সঙ্গে তার যথেষ্ট হৃদ্যতাও ছিল। তখন দলের মধ্যে শ্রীঅমূল্য মুখার্জীর বিশেষ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা। হরলাল তাঁর সঙ্গে লোকনাথের পরিচয় করিয়ে দিল।

বিপ্লবী বাংলায় অনুশীলন ও যুগান্তর এই দু'টি দল পার্টি হিসেবে এবং অন্যান্য ছোট ছোট দলে বিভিন্ন গতিতে নিজস্ব ধারায় কাজ করে গেছে। কখনও কখনও তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্যও হয়েছে আবার কখনও মিল হয়েছে। কিন্তু তবু বিপ্লবী বাংলা চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহকে কখনই দলের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখেনি। অমূল্যবাবুও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক আক্রমণকে দলের গণ্ডিতে বিচার না করে সমগ্র বাংলার বৈপ্লবিক সফলতা বলেই চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাই তাঁর বৈপ্লবিক নিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হয়ে লোকনাথ নিঃসঙ্কোচে ও বিনা দ্বিধায় অনুশীলন পার্টির এই নেতার কাছে গেল—এক বিপ্লবী অপর বিপ্লবীকে স্বাগত জানাল। এই হ'ল বাস্তব, এই হ'ল বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য—যুদ্ধপ্রাঙ্গণে বিপ্লবীরা কখনও এক হয়ে দাঁড়াতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

অমূল্যদা লোকনাথের নিরাপদে থাকা এবং কলকাতা যাওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করলেন। পুরোদস্তুর সাহেবী স্যুট পরে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হিসেবে লোকনাথ কলকাতায় পৌঁছলো। আমি চন্দননগরের বাড়ি পরিত্যাগ করে আসার পর, দিন পনেরোর মধ্যেই ভূপেনদার সাহায্যে লোকনাথ আমাদের সেই আস্তানায় হাজির হ'ল। শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ এড়াবার জন্য চন্দননগরের বাড়ি ও অন্যান্য প্রতিটি গোপন আস্তানায় উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা ছিল। চন্দননগরের বাড়িতে গণেশ, লোকনাথ, মাখন ও আনন্দ প্রতি রাত্রে দু'জন পালা করে পাহারা দিত, এই সময় কতকগুলি মারাত্মক ঘটনা পর পর সংঘটিত হওয়ায় পুলিস কর্তৃপক্ষ মরিয়া হয়ে ওঠে। বিপ্লবীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়াতে পুলিসের তৎপরতাও বেড়ে গেল। তাই চন্দননগরের বাড়ির নিরাপত্তা পাছে বিঘ্নিত হয় সেই জন্য, আমার বন্ধুরাও অনেক বেশী তৎপর হ'ল।

এই সময়ের অবস্থা সরকার পক্ষের তথ্য থেকে একটু জানা প্রয়োজন। Bengal Police Abstract of Intelligence, Vol. XXXIX অনুসন্ধান করে নিম্নের তথ্যাদি পেয়েছি—

"On 23. 8. 30 when Sir Charles Teggart, Commissioner

of Police, Calcutta, was passing through Dalhousie Sq., an attempt was made on his life by two terrorists, viz., Dinesh Majumder and Anuja Sen. Dinesh Majumder was arrested after a hot chase but the other assassin was killed by the premature explosion of a bomb which he was carrying.

On 27. 8. 30 a bomb was thrown into the Eden Garden Police out-post and the explosion injured one constable and two members of the Public.

"On 29. 8. 30 Mr. Lowman, Inspector General of Police and Mr. Hudson, Superintendent of Police, Dacca, were fired on in Mitford Hospital. Dacca, by Binoy Bose of Dacca. Mr. Lowman died.

"On 31. 8. 30 Sir Charles Teggart and other Police Officers raided a house in Chandernagore in search of Chittagong absconders. There were exchange of bullets."

ওপরের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ২৮শে আগস্ট ১৯৩০ সালে, টেগার্ট সাহেবের জীবননাশের চেষ্টা হয়। নিজের হাতের বোমা বিস্ফোরণে অনুজার মৃত্যু হয় এবং দীনেশ মজুমদারকে ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার করা হয়। ২৯শে আগস্ট ঢাকায় মিঃ লোম্যান নিহত হন ও স্থপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হাডসন সাহেব গুরুতরভাবে আহত হন। ৩১শে আগস্ট স্যার টেগার্টের পরিচালনায় আমাদের চন্দননগরের বাড়ি আক্রান্ত হয়। এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, টেগার্ট সাহেব স্বয়ং এই বাড়ির সংবাদ পেয়েছিলেন; তাই সর্বপ্রকার গোপনীয়তা বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই পুলিস পার্টি পরিচালনা করেছিলেন। এই সম্বন্ধে টেগার্ট সাহেবের বৈশিষ্ট্য ও বিচক্ষণতার বৃত্তান্ত কয়েকজন সার্জেণ্ট, যারা এই আক্রমণে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিল, তাদের মুখেই শুনেছি।

রাত প্রায় বারোটার সময় স্যার চার্লস টেগার্ট হঠাৎ লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত। তিনি বেছে বেছে জনা কুড়ি ইংরেজ সার্জেণ্টকে ডেকে পাঠালেন। তাদের ফল্‌-ইন করিয়ে খুব ধীর নিম্নস্বরে বললেন—"এক্ষুণি তোমরা তৈরি হয়ে এসো, আমার সঙ্গে অ্যাক্‌শনে যেতে হবে। বুট পরবে না,

টেনিস খেলার জুতো পায়ে দাও। প্রত্যেকে একটা করে টর্চ ও রিভলভার সঙ্গে নেবে। যাও, আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে এসো।" সার্জেণ্টরা আমাকে পরে বলেছে—তখনও তারা কিছুই আন্দাজ করতে পারে নি কোথায়, কি উদ্দেশ্যে তাদের এই যাত্রা। তবে চিরাচরিত প্রথার এই ব্যতিক্রম এবং এইরূপ অস্বাভাবিক অভিযানের প্রস্তুতি যে অতি গুরুতর পরিস্থিতির ইঙ্গিত, তাতে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

টেগার্ট সাহেব, পুলিসের দু'জন ডেপুটি কমিশনার ও আরো সাত-আটজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ পুলিস অফিসার প্রস্তুত হয়ে এলেন। রাত প্রায় একটা-দেড়টার সময় ছ' সাতটা মোটরে করে তাঁরা প্রায় ত্রিশ-বত্রিশজন কেবল রিভলভার ও টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে টেগার্ট সাহেব ছাড়া অন্যান্য অফিসারেরা কেউ জানতেন কিনা সার্জেণ্টরা তা' আন্দাজ করতে পারেন নি। দলের পুরোভাগে মোটরে পথ দেখিয়ে টেগার্ট সাহেব ট্রাঙ্ক-রোড অতিক্রম করে চলেছেন। ভোর রাতে, প্রায় তিনটের সময়, চন্দননগরে একটি স্থানে মোটর থামলো। স্যার টেগার্ট তখন সকলকে জানালেন চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহীরা সেখানে একটা বাড়িতে আস্তানা নিয়েছে। সেই বাড়ির একটা ম্যাপ দেখিয়ে তিনি সকলকে নির্দেশ দিলেন কে কোথায় পজিশন্ নেবে এবং হুকুম দিলেন বিদ্রোহীদের জীবিত অথবা মৃত ধরতেই হবে—গুলী চালাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন নেই। টেগার্ট সাহেবের পার্টি আবার প্রায় আধ মাইল এগিয়ে গেল। তারপর সেখানে সকলে গাড়ি থেকে নেমে খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে টর্চ ও রিভলভার হাতে সেই বাড়ি লক্ষ্য করে এগোতে লাগলো।

বাড়িটির বর্ণনা ও টেগার্ট সাহেবের এই অভিযানের বৃত্তান্ত আমাদের মামলার জাজমেণ্টের পাতা থেকে উদ্ধৃত করছি—

"About midnight on the 1st September a party consisting of ten sergeants and one Inspector of Calcutta Police and some *Ten Superior Officers* including Sir Charles Teggart, Commissioner of Police, and Deputy Commissioner, Bratley and Mackinty, left Calcutta in six motor cars and reached Chandernagore about 3 a. m. There they left the cars and proceeded on foot to their objective, a two-storied house situated in Gondolpara, at

some distance from the main road. This house faced west and stood on the edge of the side road by which they had approached. Behind it, to the east was a walled compound with a tank immediately behind the house and beyond the tank some jungle and trees on the east bank. On the north side of the compound wall was a narrow lane leading eastward into jungle and crossed at short distance from the house by a wicket gate.

On the south side of the compound wall was a similar narrow lane also leading eastward into jungle and in the compound wall towards its eastern end was a small gate closed from inside leading from this lane to the compound. The members of the party proceeded to surround the house and compound and among them Sergt. Keywood was posted between the two windows on the north wall of the house which overlooked the northern lane, while another sergeant was posted at the corner of the lane and the road and Sergeant Todd took up his position further along the lane on the east of the wicket gate across it. Sergeant Walters being posted a little to the west of the gate in the compound wall."

দু'জন ডেপুটি কমিশনার—ব্রাট্‌লি ও ম্যাকার্থি সাতজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসার, দশজন ইংরেজ সার্জেণ্ট এবং একজন ইংরেজ ইন্‌স্পেক্টার সমভিব্যবহারে টেগার্ট সাহেব ছ'খানা মোটরে করে এক অভিনব অভিযানে যাত্রা করলেন। ভোর রাত তিনটের সময় টেগার্টের পার্টি চন্দননগরে গোঁদলপাড়ার কাছে মোটর থেকে নেমে পায়ে হেঁটে খুব অন্তর্পণে বাড়িটি ঘেরাও করতে এগোলো। টেগার্ট সাহেব বাড়িটির অবস্থান সার্জেণ্টদের জানিয়ে দিলেন। গলিপথের ডান্ দিকে পশ্চিমমুখী বাড়ি। এই বাড়ির পূবদিকের কম্পাউণ্ড দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রায় সবটা জুড়ে একটা পুকুর—দেওয়াল ঘেঁষে খুব সরু পুকুর পাড়। দোতলা বাড়িটির পেছনের কম্পাউণ্ডে বাইরে বেরোবার জন্য একটা ছোট দরজা আছে এবং পশ্চিম দিকে রাস্তার উপরে বাড়ির

সদর দরজা। সার্জেন্টরা ওপরওয়ালার নির্দেশমত বাড়িটির চতুর্দিকে পজিশন্ নিল।

বাংলার বা ভারতের বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা আক্রমণের এইরূপ অভিনব পরিকল্পনা ও পুলিসী আয়োজনের ইতিহাস আমার আর জানা নেই। দুর্ধর্ষ টেগার্ট সাহেবের পরাক্রম বাংলার বিপ্লবী শক্তিকে নানাভাবে বিধ্বস্ত করেছে। স্যার চার্লস টেগার্টের বিচক্ষণতা ও বীরত্বের কাছে বিপ্লবীদের অক্ষমতার মর্মান্তিক ইতিহাস আজও যখন আমাদের উপহাস করে তখন টেগার্টকে কাগজে-কলমে তার সাফল্যের গৌরব হতে বঞ্চিত করবার চেষ্টার মধ্যে আমাদের আরও দীনতা প্রকাশ পাবে। টেগার্ট সাহেব শত্রু হলেও তাঁর সাহস, বীরত্ব ও বিচক্ষণতার প্রশংসাই করবো। স্যার চার্লস টেগার্ট ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শত্রু—লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রমুখ শাসকবৃন্দের হাত থেকে ভারতীয়দের রক্তরঞ্জিত পতাকা সার্থকতার সঙ্গেই বহন করেছেন। বিপ্লবীদের এই অক্ষমতা খুব দুঃখের হলেও, ইতিহাস সত্যকে অস্বীকার করবে না।

আবার এ-ও ঐতিহাসিক সত্য যে, চট্টলার চারজন যুবক-বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে গভীর রাত্রের এই অভিযানে টেগার্ট ভারতীয় পুলিস একজনকেও বিশ্বাস করেন নি। কত খাঁ বাহাদুর, রায় বাহাদুর পুলিস অফিসার ছিলেন তবু বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিভূ স্যার চার্লস টেগার্ট তাঁদের উপরেও কেন আস্থা রাখতে পারেন নি? যুব-বিদ্রোহের সফলতা স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীকে আকৃষ্ট করেছিল—এমন কি ভারতীয় পুলিসদের মধ্যেও যে অনেকে বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, সে সংবাদ কর্তৃপক্ষের অজানা ছিল না। তাই চন্দননগরের বাড়িটি অতর্কিতে আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ গোপন রাখবার জন্যই টেগার্টের এত উৎকণ্ঠা ও সাবধানতার প্রয়াস। একজন ভারতীয় মোটর চালককেও টেগার্টের পার্টিতে নেওয়া হয় নি। একটি রাইফেলও কেউ সঙ্গে নেয় নি; কারণ—বিচক্ষণ টেগার্ট আশঙ্কা করেছিলেন ট্রাঙ্ক-রোডে রাইফেল সমেত তাঁদের দেখে টেলিফোনযোগে সাঙ্কেতিক খবর পাঠাবার ব্যবস্থা বিপ্লবীদের হয়ত থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে তাঁরা চন্দননগরের বাড়িতে পৌছবার আগেই বিদ্রোহীরা উধাও হবে।

আমাদের অবশ্য সেরূপ কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কিন্তু টেগার্ট সেইরূপ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে তাঁর দিক থেকে সব রকম ব্যবস্থার কোন ত্রুটি রাখেন নি—তিনি যেন মাওসে-তুং-এর শিক্ষিত গেরিলা-বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে যাচ্ছেন! টেগার্ট কখনও তাঁর শত্রু—বাংলার বিপ্লবীদের শক্তিকে

খর্ব করে দেখেন নি—তাদের বৈপ্লবিক শক্তি সম্বন্ধে তিনি কখনও উদাসীন ছিলেন না বা এক মুহূর্তের জন্যও complacent ভাব পোষণ করেন নি। টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টায় বাংলার বিপ্লবীদের বারে বারে অকৃতকার্যতার কারণ, তাঁরা টেগার্টের মত শত্রুর শক্তির প্রকৃত মূল্যায়ন করেন নি। টেগার্ট কিন্তু বিচক্ষণতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করে গেছেন। এ থেকেই বুঝতে হবে—শত্রুর কাছেও শেখবার আছে!

প্রতিদিন রাত্রে যেভাবে দু'জন একত্রে পালা করে পাহারা দিত, ১লা সেপ্টেম্বরও ঠিক তেমনি চন্দননগরের বাড়িতে রাত্রির শেষের দিকে আনন্দ ও লোকনাথ পাহারায় মোতায়েন। প্রতিদিন তারা পাহারা দেয়, প্রতিদিন বিনিদ্র রজনী যাপন করে, প্রতি মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করে; কিন্তু দিনের-পর-দিন কেটে গেছে শত্রুর চকিত আক্রমণ-আশঙ্কা বাস্তব রূপ নেয় নি। এইরূপ একঘেঁয়েমির জন্যই খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রখর সতর্ক প্রহরার কর্তব্যে নিজেদের অজান্তেই শিথিলতা এসে গেছে। লোকনাথ ও আনন্দ আমাকে বলেছিল, তারা সজাগ দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করা সত্বেও দিনগুলি বিনা সঙ্কটে কেটে যাওয়ায় ক্রমেই তারা complacent হয়ে পড়ছিল—পাহারায় প্রখর দৃষ্টি আগের চেয়ে যেন বহুলাংশে শিথিল হয়ে পড়েছিল।

কে জানতো শত্রুপক্ষ এদিকে তখন রণসাজে সজ্জিত হচ্ছে? কে জানতো সেই গভীর নিশীথে টেগার্ট সাহেবের বাহিনী তাদের দিকে ছুটে আসছে? কে জানতো সময় আগতপ্রায়—এখনিই নির্মম নিদারণ সংঘর্ষ সুরু হবে এবং কি তার ফলাফল?

হঠাৎ বাড়ির দিকে আসবার রাস্তার ওপর আনন্দ ও লোকনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। তারা দেখে প্রায় দেড়শ' কদম দূরে রাস্তার ওপর অনেকগুলি কালো কালো ছায়া পড়ছে—কিসের ছায়া তা' দেখে বোঝা যায় না। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করেই তারা বুঝতে পারলো রাস্তার একেবারে পাশে বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে হাঁটু ভেঙে গুড়ি মেরে একদল লোক আসছে। এবারে পরিষ্কার বোঝা গেল এই বাড়ি অভিমুখে কারা এই নিশীথ রজনীর যাত্রী!

মুহূর্তে আনন্দ ও লোকনাথ তাদের রিভলভার এবং টর্চ নিয়ে প্রস্তুত হ'ল—তাড়াতাড়ি নিচে নেমে মাখন এবং গণেশকেও আসন্ন বিপদের সংবাদ দিল। তারাও রিভলভারের ট্রিগারে আঙুল রেখে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। পুটুদি ও শশধরদাকে নিজেদের ঘরে নিরীহ লোকের মত বসে থাকবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

এখন রণকৌশল অনুযায়ী তৎপরতার প্রয়োজন—কে আগে গিয়ে বাড়ির পেছনে দেওয়ালের আড়াল নেবে—যে আগে পজিশন নিতে পারবে তার পক্ষেই সুযোগ-সুবিধে অনেক বেশি।

এক মুহূর্ত সময়ও আর নেই! চার্লস টেগার্টের সশস্ত্র পুলিসবাহিনী ক্ষিপ্র গতিতে বাড়ি ঘেরাও করতে আসছে। বাড়ির পেছনে কম্পাউণ্ডের দেওয়ালের আড়াল আগে আমাদের নেওয়া চাই, তবেই আত্মরক্ষার সুযোগ নিয়ে পুলিস-বেষ্টনী ভেদের চেষ্টা হয়ত করা যাবে। কিন্তু শত্রুপক্ষেরই প্রাথমিক সুযোগ গ্রহণ করা স্বাভাবিক, কারণ, তারা অতর্কিতে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছে। গণেশ, লোকনাথ, আনন্দ ও মাখন বাড়ির দোতলা থেকে নেমে আসার আগেই, ইংরেজ সার্জেণ্টরা বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে। পুলিস বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও করেছে বলে যদি তারা আগেও জানতে পারতো, তাহলেও বাড়ির পেছনের দরজা দিয়েই পালাবার চেষ্টা করা ছাড়া তাদের অন্য পথ ছিল না।

অতি সন্তর্পণে, এক-একটা রিভলভার সম্বল করে গণেশ, লোকনাথ, আনন্দ ও মাখন পেছনের চোরা-দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সরু পুকুর পাড় দিয়ে একজনের পেছনে একজন পা টিপে টিপে এগোলো। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও খুব বেশি দূর এগোনো সম্ভব হ'ল না। হঠাৎ একটা বাঁশী বেজে উঠলো এবং এই বাঁশীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক সচকিত করে আরো বাঁশী বেজে উঠলো। একঝাঁক টর্চ লাইট একসঙ্গে জ্বলে উঠতে চারিদিক দিনের মতই আলোকিত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিশীথ রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সশব্দে শত্রুর রিভলভার গর্জে উঠলো—অবিশ্রান্ত ধারায় গুলী বর্ষণ সুরু হ'ল।

ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে গভীর রাতের এই রিভলভার যুদ্ধের বিবরণ আমার নিজের কথায় না লিখে, এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারী তিনজন ইংরেজ সার্জেন্টের জবানবন্দী থেকে উদ্ধৃত করছি—

"My name is R. D. Todd—a Sergeant, Calcutta mounted police—we got out of our cars some distance off and walked along the road towards the house. As we did so we noticed a light on the upper floor. I cannot say whether it continuted burning....I had an electric torch with me. The four men were approaching me in file one behind the other—about a yard from me the first man got

off his hands to climb over the wall. I flashed my torch and asked who they were and immediately I was fired at point blank and I hide behind the wall. In a minute or so there were some more firing....The first man fired at me point blank—he aimed at me point blank. He was then about a yard from me. He missed me. He got more of a surprise than I did. As soon as he fired I hide behind the wall....I fired my four rounds from outside the wall at the man, who was standing in the water...I heard an order from the other side of the tank—'fire'. It may have been Mr. Bartley. I am not positive whether it was he or Mr. mackinty or Sir Charle Teggart. The man had fired at me and I was bound to fire...."

অশ্বারোহী সার্জেণ্ট আর, ডি, টডের কথা—সে দেওয়ালের বাইরে গা ঢাকা দিয়ে দণ্ডায়মান ব্যক্তিটিকে লক্ষ্য করে চারবার গুলী ছুঁড়ছে। সার্জেণ্ট প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, আগে সে গুলী ছোঁড়ে নি—এক গজের ব্যবধানে তার দিকে সোজা বুক লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়াতে তাকে বাধ্য হয়ে 'ফায়ার' করতে হয়েছে—সাবাস সার্জেণ্ট!

আমাদের লক্ষ্যণীয় হ'ল যুদ্ধক্ষেত্রের বিশেষত্ব—ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী চলে বটে, কিন্তু গুলী চললেই লক্ষ্যভেদ হয় না।

এই সার্জেণ্টের উক্তি থেকেই আরো জানা যায়—

"....I remember one was Mr. Waterworth, D. I. G., Burdwan range. I cannot say now how many others there were, two or three or twenty-five....After the first round was fired the *bank itself was lit up by the electric torch lights of our Party.*"

সার্জেণ্ট টডের জবানবন্দীতেই পাচ্ছি যে, প্রথম গুলী চলার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস পার্টির টর্চের আলোতে সমস্ত পুকুর-পাড়টাই আলোকিত হয়ে উঠেছিল। দেওয়ালের আড়ালে থেকে টর্চের এই উজ্জল আলোতে দেখে দেখে পুলিস-বাহিনী বেঁপরোয়া গুলী চালিয়েছে।

সার্জেণ্ট P. A. Keywood রেখে ঢেকেও যা বলেছেন তা' থেকেই

অনুমান করা যায় যে, তাঁরা মরিয়া হয়ে গুলী চালাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।
সার্জেন্ট Keywood-এর উক্তি—

"....There was more firing and I moved towards the east along the lane and on reaching the point where the compound wall begins I flashed my torch over the wall into the compound. Towards the south side of the tank I saw that one man was just disappearing under water....

"About five minutes after Lokenath Bal had been brought into the lane more firing occured to the south of the compound and somebody shouted they had caught two more men....

"....I think it was Sir Charles Teggart who made the disposition of our forces around the house....More firing came from the east....He (Makhan Ghosal) had just disappeared. Just after that I heard shots from the south. I cannot say if there were shots from the south before he disappeared. But before he disappeared I had heard shots from the north. I shouted out that I had seen a man disappear in the water....Within five minutes of Lokenath being taken into the lane firing broke out on the south...."

উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে গুলী চলেছে। মাখন গুলীবিদ্ধ হয়ে পুকুরে তলিয়ে যাওয়ার পরেও গুলী বর্ষণ বন্ধ হয়নি। তারপর আরো দু'জনকে তারা গ্রেফতার করে।

সার্জেন্ট L. Walters বলেছে—"After some time I heard firing which seemed to come from the other side of the compound—and immediately after more firing followed.... These nine regulations '450 revolver cartridges are similar to those I found to the right hand pocket of Ganesh Ghosh and those are four of the five homemade cartridges I found with him....I found the revolver and on the ground, where the smaller of the two was lying, I found the automatic

pistol and an electric torch....the younger one did not have the look of having fallen senseless—after being hit by a bullet. I could not say whether he was senseless when he was pulled off, but when I saw him just inside the gate after he had been pulled there he was not senseless. When told to keep them covered, I apprehended them and kept them covered with my pistol. They were lying on their bellies—with their faces downwards and their arms bent under their chests....As far as I remember Mr. Bartley remained there. I cannot say if he saw me pick-up the pistols and the torch. I told him I had picked up from the bank two pistols and a torch...."

এই সার্জেণ্টের উক্তি থেকে জানা যাচ্ছে যে, আনন্দ ও গণেশকে তারা ভূপতিত অবস্থায় ধরেছে এবং তাদের পিস্তল ও টর্চ পুকুরপাড় থেকে উদ্ধার করেছে। . এই সার্জেণ্ট গুলীবিদ্ধ অবস্থায় আনন্দকে পড়ে থাকতে দেখেছে কিন্তু তখনও তাকে সংজ্ঞাহীন বলে মনে করেনি। পুলিসের ও সরকারী তথ্যে যদিও সত্যের অপলাপ সুনিশ্চিত, তবু এই সব সরকারপক্ষীয় সাক্ষীর উক্তি থেকে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটা ধারণা জন্মায় এবং সরকার পক্ষের আভ্যন্তরীণ তথ্যও কিছুটা জানবার সুযোগ থাকে। সেই উদ্দেশ্যে আজ প্রায় আটত্রিশ বছর পরে চন্দননগরের এই রিভলভার যুদ্ধের বর্ণনা লিখতে বসে সরকারী তথ্যের উদ্ধৃতি করা প্রয়োজন মনে করলাম। কিন্তু এর বাস্তব চিত্র কোনমতেই পাওয়া যাবে না যতক্ষণ না আমরা এই সম্বন্ধে গণেশ ও আনন্দের কাছ থেকে বা তাদের লেখার মাধ্যমে কিছু জানতে পারছি। খুব সুখের বিষয় যে, আনন্দ গুপ্ত তার লিখিত "চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী" গ্রন্থে এই বিষয়ে লিখেছে। এই তথ্য লোকনাথ এবং গণেশও পূর্ণভাবে সমর্থন করেছে। সুহাসিনী গাঙ্গুলী (পুঁটুদি) এবং শশধর আচার্যও আনন্দের লেখাটির বাস্তব বর্ণনা এবং তার সত্যতা দ্বিধাহীনচিত্তে সমর্থন করেছেন। এই কারণে আমার ভাষায় চন্দননগরের এই যুদ্ধের বর্ণনা পরিবেশন করা ধৃষ্টতা মনে করেই আমি আনন্দের সেই মূল্যবান গ্রন্থটি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

"১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সাল—বন্দীজীবনের প্রথম দিন। এতদিন কয়েদখানার বহু কাহিনী শুনে এসেছি গণেশদা, অনন্তদা প্রভৃতি ভুক্তভোগীদের

মুখে—রোমাঞ্চকর গল্পের মত। শুধু বন্দী-জীবনের বর্ণনাই নয়—গ্রেপ্তারের পর পুলিসের অত্যাচার কত অভিনব উপায়ে রাজনৈতিক কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়ে থাকে সে সব ভীতিপ্রদ কথাও বহুবার শুনেছি। কল্পনায় আঁকতে চেষ্টা করেছি সে সব সঙ্কটময় অবস্থা, আর বার বার মনে হয়েছে সত্যি যখন এরকম অত্যাচার সহ্য করার দিন আসবে তখন না জানি মনের অবস্থা কি রকম হবে!

"অবশেষে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রায় সাড়ে চার মাস পরে ১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর উপস্থিত হ'ল জীবনের এই বহু প্রত্যাশিত অগ্নিপরীক্ষার দিন, ফরাসী চন্দননগরে। ভোর হবার তখনও দু' তিন ঘণ্টা বাকি, রাত্রির অস্পষ্টতা ঘোচে-নি এমন সময় কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবের (কলকাতায় তৎকালীন পুলিস কমিশনার) নেতৃত্বে বাছা বাছা গোরা সার্জেণ্টদের এক বিরাট বাহিনী চন্দন-নগরের গোন্দলপাড়ায় যে বাসায় আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম সে বাসাটি চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললো। নিষ্ক্রমণের কোন পথ বা উপায় ছিল না। সুপরিকল্পিত নির্দেশ অনুযায়ী সুদক্ষ সার্জেণ্ট বাহিনী তাদের লৌহবেষ্টনীতে এতটুকু ফাঁক রাখে নি। আমরা কিছুদিন আগে থেকেই রাত্রিতে পালা করে ছাদের ওপর থেকে পাহারা দিতাম, কারণ, চারিদিকের অবস্থা তখন ক্রমশই ঘোরাল হয়ে উঠেছিল।

"সে রাত্রেও যথারীতি ছাদ থেকে বাইরের দু'দিককার রাস্তার উপর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। শেষ রাত্রের দিকে হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ল কতকগুলো অস্পষ্ট মূর্তি, মাথায় হেলমেট—ক্ষিপ্র গতিতে আমাদের বাসার দিকে এগিয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ আমরা প্রস্তুত হয়ে তড়িৎগতিতে নেমে এলাম দোতলা থেকে একতলায়, উদ্দেশ্য—পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

"কিন্তু প্রথম থেকেই সশস্ত্র সার্জেণ্ট-বাহিনী বাসার পশ্চাদ্দিককার পাঁচিলের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে নিষ্ক্রমণের সামান্যতম পথও আগলে বসেছিল—ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন থাকে শিকারের অপেক্ষায়। খিড়কির দুয়ার দিয়ে বেরুতে না বেরুতেই একসঙ্গে গর্জে উঠলো শত্রুপক্ষের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো এবং সেই সঙ্গে জলে উঠলো অনেকগুলো টর্চ আমাদের লক্ষ্য করে। তীব্র আলোর রেখা কেন্দ্রীভূত হল আমাদের উপর আর সেই আলোকজ্জ্বল দেহগুলোকে লক্ষ্য করে বর্ষিত হতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী···।

"আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলোও অবশ্য নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিল না, কিন্তু শত্রুপক্ষের প্রত্যেকটি দেহ পাঁচিলের আড়ালে এরূপ সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল এবং

এতগুলো টর্চের তীব্র আলো আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে এতটা বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল যে, আমাদের রিভলভার ও পিস্তলনির্গত গুলী কোথায় লাগছে বা না লাগছে তা' সঠিক দেখার ও জানার কোন উপায় ছিল না—তা'ছাড়া গুলীর রসদও আমাদের ছিল যৎসামান্য।

"বেশীক্ষণ এই অসমান যুদ্ধ স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না।…একদিকে বিপুল পুলিস-বাহিনী অপর দিকে আমরা চারজন—গণেশদা, লোকনাথ বল, জীবন ঘোষাল ও আমি।…অল্প কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জীবন ঘোষালের মাথায়, বুকে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে একঝাঁক গুলী এসে লাগলো এবং সেই মুহূর্তে তার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল পাশের পুকুরে, তলিয়ে গেল জলের ভিতর।…যেভাবে চারিদিক থেকে গুলীবৃষ্টি হচ্ছিল তাতে আমাদের কারুরই অক্ষত থাকার কথা নয়…কিন্তু সবগুলো বেছে বেছে যেন জীবনের দেহেই আশ্রয় নিল। মাত্র একটা গুলী এসে লাগলো আমার বাঁ পায়ে, আর বাকী দু'জন যে শেষ পর্যন্ত অক্ষত ছিলেন, তা' সত্যি অদ্ভুত বলতে হবে।

"কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেন বিরাট ঝড় বয়ে গেল…কিছুক্ষণ আগেও ছিলাম মুক্ত, বন্ধহীন, পুলিস প্রভুদের ফাঁকি দিয়ে; কিন্তু হঠাৎ সেই কর্মবহুল ও গতিবহুল জীবনের সমাপ্তি ঘটল—শুরু হ'ল কঠোর বন্দীজীবনের, যে জীবনের অনেক গল্প, অনেক কাহিনী আগে বহুবার শুনেছি।

"ইংরেজের রচিত আইনের বিধানে নাকি আছে যে, বন্দীদশায় বন্দীদের উপর শারীরিক নির্যাতন করা বে-আইনী, কিন্তু বন্দী হওয়া মাত্রই বুঝতে দেরী হ'ল না যে, রাজবন্দীদের হাতের মুঠোয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজপরিচালিত পুলিসের বে-আইনী বীরত্বের মাত্রাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। চন্দননগরে গ্রেফতার হওয়া মাত্রই আমরা তা সশরীরে উপলব্ধি করলাম। বন্দী ছিলাম আমরা মোট ছ'জন—উপরোক্ত চারজন ও শ্রীযুক্ত শশধ আচার্য এবং শ্রীযুক্তা সুহাসিনী গাঙ্গুলী, যিনি আমাদের সবার দিদির মত ছিলেন…।

"প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে এই কয়জনের উপর চলল অবিরাম নির্যাতন—বীভৎস, অমানুষিক নির্যাতন। হাতের ব্যাটন থেকে আরম্ভ করে পায়ের বুট ও রাইফেলের কুঁদো—সব কিছুরই সুপ্রচুর প্রয়োগ হল আমাদের শৃঙ্খলিত দেহের উপর।

"এমনকি সুহাসিনীদিও রেহাই পান নি সেই নিষ্ঠুর নির্যাতনের হাত থেকে। তাঁর দেহের উপরও চড়, ঘুষি, ব্যাটনের ঘা, বুটের লাথি—এর কিছুই বাদ যায় নি!"

"সুহাসিনীদির নির্যাতনের কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ে যায় ১৮ই এপ্রিলের রাত্রে অক্সিলিয়ারী ফোর্স অস্ত্রাগার প্রাঙ্গণে মিসেস ফ্যারেলের (অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট মেজর ফ্যারেলের স্ত্রী) কথা।

"সে রাত্রে সেই শ্বেতাঙ্গ মহিলা ছিলেন পরাজিতের দলে এবং আমরা ছিলাম বিজয়ী ; ইচ্ছা করলে তাঁর নিঃসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রতি আমরাও অসম্মানজনক আচরণ করতে পারতাম। কিন্তু আমাদের বিপ্লবী সম্মানবোধ এক মুহূর্তের জন্যও আমরা ক্ষুণ্ণ হতে দিই নি। এমন কি সেদিন সেই শত্রুপক্ষীয় মহিলাকে কোনো প্রকার শাস্তি না দিয়েই সম্মানজনকভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল—'আপনি এক্ষুণি এস্থান ত্যাগ করুন—চট্টগ্রাম শহরের প্রভু এখন আর ইংরেজ নয়—আমরা ; আপনার মঙ্গলের জন্যই এ অনুরোধ করা হচ্ছে, আশা করি আপনি তা অমান্য করবেন না… ।'

"সেদিন সেই ইংরেজ রমণীকে হাতের মুঠোর ভিতর পেয়েও আমরা তাকে যথোচিত সম্মান দিয়েছিলাম—আর তারই প্রতিদানস্বরূপ আমাদের একজন বিশিষ্টা মহিলা রাজনৈতিক কর্মী ইংরেজ প্রভুদের হাতে বন্দী হয়েই তাঁর বন্দীত্বের প্রথম মুহূর্তেই পেলেন বর্বরোচিত নির্যাতন।

"আমাদের অল্প কয়েকটি দেহ অথচ ঐ কয়েকটি দেহের উপর এতগুলি হিংস্র সার্জেণ্ট, পুলিস-কর্মচারী, গোয়েন্দা-কর্মচারী প্রভৃতি সবাই তাদের পুলিসসুলভ জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য যেন কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল ! ঊর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মচারীরাও বাদ গেল না সেই নিষ্ঠুর পশুসুলভ ক্রীড়া থেকে।

"আমাদের দেহের প্রতি পুলিস কর্তৃপক্ষের এতখানি কৃপা বর্ষণের আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। ধরা পড়ার কিছুদিন আগে থেকেই আমরা এক অভিনব পন্থায় রিভলভারের কার্তুজ তৈরীর কাজ সাফল্যজনকভাবে শুরু করেছিলাম। চন্দননগরে আমাদের আশ্রয়াবাসের দোতলার যে ঘরটিতে আমরা কাজ করতাম সেটিকে একটা ছোটোখাটো কারখানায় পরিণত করা হয়েছিল। ভাইস, তামার পাত (কার্তুজের খোল তৈরীর জন্য), সীসা, সীসা গলিয়ে গুলী তৈরী করার সরঞ্জাম, বারুদ, পারকাশন ক্যাপ (Purcussion cap) প্রভৃতি নানারকম যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামে ঘরটি ভর্তি ছিল।

"এতটা কার্যকরীভাবে যে রিভলভারের কার্তুজ তৈরী হতে পারে তা আগে কারুর ধারণা ছিল না।

"কিন্তু এই উদ্ভাবনী সাফল্য ঠিক যে কারণে আমাদের বিশেষ গর্বের বস্তু

ছিল ঠিক সেই কারণেই তা পুলিস কর্তৃপক্ষের বিশেষ ক্রোধের কারণ হয়ে উঠল।

'সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!······প্রশ্নের পর প্রশ্ন—ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্তস্বরে: 'কোন্ পথ দিয়ে চাটগাঁ থেকে কলকাতায় এলে?' 'এতদিন কোন্ কোন্ বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলে?······সে সব বাসার কত নম্বর?'······'কারা কারা তোমাদের সঙ্গে যোগ রাখতো?'······'টাকা কার কাছ থেকে পেতে?' ······'কার্তুজ তৈরীর যন্ত্রপাতি কে যোগাড় করে দিল?'······'কত কার্তুজ এ পর্যন্ত বানিয়েছ?'······শীগ্‌গির বল, নইলে একটা হাড়ও আস্ত রাখব না!' ······ইত্যাদি ইত্যাদি।

"একদিকে প্রশ্ন বর্ষণ আর অন্যদিকে মুষলধারে ব্যাটন ও বুটের ঘা আমাদের জর্জরিত করে তুলল! যে অগ্নিপরীক্ষার কথা এতদিন কল্পনায় ভেবেছি তা কঠোর বাস্তব রূপ নিয়ে যেন আমাদের ভেঙে চূর্ণ করে দিতে উদ্যত হ'ল!

"সেই নির্যাতিত মুহূর্তগুলির প্রতিক্ষণেই অনুভব করেছিলাম উদ্দীপ্ত বিবেকের সাবধানী কশাঘাত: 'সাবধান, বিপ্লবীর সম্মান যেন শত্রুর পশুশক্তির কাছে হার না মানে! এতদিনকার মানসিক প্রস্তুতি যেন মুহূর্তের দুর্বলতায় ধূলিসাৎ না হয়!

"গণেশদার দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল তাঁর অদ্ভুত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুখমণ্ডল—মুহূর্তের ভিতর মনের বল যেন বহুগুণ বেড়ে গেল।

"কিছু দূরেই ছিলেন তিনি শৃঙ্খলিত অবস্থায় এবং নির্যাতনও কেন্দ্রীভূত ছিল তাঁর উপরই সব চাইতে বেশী; দলের প্রধান নেতৃবৃন্দের অন্যতম হিসাবে তাঁকেই পুলিস প্রথম নম্বর শত্রু হিসাবে বেছে নিয়েছিল—আমাদের সবার তুলনায় তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল অনেক বেশী···।

"কানে এসে বাজছিল এক শ্বেতাঙ্গ পুলিস কর্মচারীর উন্মাদ গর্জন—গণেশদাকে লক্ষ্য করে: 'Answer our questions....Answer you must—otherwise we shall make you fill what is what?'

"শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি কথার আগে ও পরে সংযুক্ত ছিল বাছা বাছা শ্বেতাঙ্গসুলভ বিশেষণ যা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করলে সভ্যতার নিম্নতম সীমাও লঙ্ঘন করে ইতরতার গণ্ডিতে প্রবেশ করতে হয়!

"স্পষ্ট শুনতে পেলাম গণেশদার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জবাব—'I have nothing to say'—তারপর নির্যাতনের কঠোরতা যতই উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল

গণেশদার জবাবও হ'ল ততই সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ ও অবিচলিত। শুধু একমাত্র একটি আওয়াজ বার বার কানে এসে বাজল: 'Nothing !'....'Nothing !' ....'Nothing !'

"বিদ্যুৎ প্রবাহের মত সেই নির্ভীক স্পর্ধিত ধ্বনি আমাদের যেন নতুন করে অনুপ্রাণিত করে তুলল। নির্যাতনের যে পীড়া থেকে থেকে দুঃসহ মনে হচ্ছিল তা যেন মুহূর্তের মধ্যে একটা তুচ্ছ অনুভূতিতে পরিণত হ'ল।

"প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে পুলিসের এই বীরত্বলীলা শেষ হবার পর আমাদের টেনে ওঠানো হল পুলিস ভ্যানে—হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি।

"পথের দু'ধারে চন্দননগরের কৌতূহলী নাগরিকদের ভীড়···তাঁদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে সমবেদনার ইঙ্গিত—অনেকেই আমাদের লক্ষ্য করে নমস্কার জানালেন, আমরাও প্রত্যুত্তরে মাথা নোয়ালাম তাঁদের উদ্দেশ্যে।

"ভ্যানগুলো আমাদের নিয়ে হাজির হ'ল চন্দননগরের পাব্লিক প্রসিকিউ-টারের অফিসে। ভ্যান থেকে বের করে আমাদের ঢোকানো হ'ল অফিসের ভিতর আসামীর নির্দিষ্ট স্থানে। যথাসময়ে এলেন পাব্লিক প্রসিকিউটার এবং তাঁর কর্তব্যের গতানুগতিক নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন: 'নাম কি ?'···'পিতার নাম কি ?'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

"সব প্রশ্নের উত্তরে আমাদের ছিল একটি সুপরিকল্পিত জবাব: 'আমাদের যদি কিছু বলার থাকে তাহলে আমরা তা বিচারের সময় আদালতে বলব, তার পূর্বে আমরা কোন কথারই জবাব দেব না।'

"পাব্লিক প্রসিকিউটারের অফিস থেকে বেরিয়ে আবার পুলিস ভ্যানে ওঠার সময় আমাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল চন্দননগরের দেশপ্রেমিক যুব-সমাজ। দলে দলে স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ ও বহু যুবক পুলিসের ভ্রূকুটিকে পরোয়া না করেই এসে দাঁড়িয়েছিল সেই অফিসের সংলগ্ন রাজপথের উপর।

"এভাবে তারা জমায়েত হয়েছিল শুধু কৌতূহল মেটাবার জন্য নয়—ধৃত বন্দীদের প্রতি সম্মান ও সমবেদনা জানাবার জন্য। তার প্রমাণ পেলাম তাদের কণ্ঠনির্গত অভিনন্দন ধ্বনি শুনে: 'বন্দে মাতরম্ !'···'Long Live Revolution !'—প্রভৃতি যুবকণ্ঠের সমবেত ধ্বনিতে চন্দননগর মুখরিত হয়ে উঠল।

"শহীদ কানাইলালের চন্দননগরের উন্নত দেশপ্রেমের সেই প্রথম পরিচয় পেলাম—১লা সেপ্টেম্বরের সেই স্মরণীয় দিনটিকে অবলম্বন করে। পরে শুনেছি

শহীদ জীবন ঘোষালের মৃতদেহ নিয়ে চন্দননগরে বিরাট শোক-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানকার আবালবৃদ্ধবণিতা সেদিন বিপ্লবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শহীদ জীবনের প্রতি অকুণ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

"ভ্যানগুলো এবার আমাদের নিয়ে রওনা হ'ল হুগলী অভিমুখে। চন্দননগর ছেড়ে চললাম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। সারাক্ষণ শুধু জীবন ঘোষালের কথা মনে হচ্ছিল।—এই কিছুক্ষণ আগেও ছিলাম চারজন—তার ভিতর যে ছিল আমাদের সবারই অত্যন্ত প্রিয় সে চিরকালের জন্য পড়ে রইল চন্দননগরের মাটিতে।

শহীদ জীবন ঘোষাল জন্মেছিল এক ধনী পরিবারে। তার সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশস্ত নিষ্কণ্টক পথ। অভিভাবকদের সাধ ছিল তাকে বিলেত পাঠিয়ে একটা বড় রকমের কিছু পাশ করিয়ে এনে তার সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ততর করা।

"কিন্তু শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী পৃথিবীর সেই মোহিনী আকর্ষণ তাকে ধরে রাখতে পারলো না…আর একটা পৃথিবী, যেখানে আছে শুধু দুঃখীর রিরামহীন ক্রন্দন, পরাধীনতার লাঞ্ছনা, শোষিতের আর্তনাদ—সেই অভিশপ্ত পৃথিবীর ব্যাকুল ডাক তাকে করল ঘরছাড়া…সে বেছে নিল বিপ্লবীর কণ্টকাকীর্ণ পথ।

"একই স্কুলে আমরা পড়তাম। আমার এক শ্রেণী উর্ধ্বে ছিল তার স্থান। স্কুল-জীবনেই তার সঙ্গে পরিচয় এবং অল্পদিনের সেই ব্যক্তিগত পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হ'ল। পড়াশুনায় সে ছিল প্রথম শ্রেণীর ছাত্র—মাস্টারদের অত্যন্ত প্রিয়। যথাসময়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে কলেজে ভর্তি হ'ল

"ইণ্টারমিডিয়েট প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় ঘটল চট্টগ্রাম বিদ্রোহ। ১৮ই অপ্রিলের রাত্রে যে দলটি অক্সিলিয়ারী অস্ত্রাগার আক্রমণ করেছিল, সে ছিল সেই ছয়জনের একজন। যে মোটরে করে এই দলটি তড়িৎগতিতে ঐ অস্ত্রাগার আক্রমণ করে তা চালাবার ভার পড়েছিল জীবনের উপর।

"প্রায় চারমাস ধরে কর্মবহুল ফেরারী জীবন যাপন করে অবশেষে চন্দননগরে স্মরণীয় ১লা সেপ্টেম্বর শত্রুর গুলীতে সে নিহত হ'ল।

"চন্দননগর থেকে মোটরযোগে পুলিস পরিবেষ্টিত অবস্থায় আমরা ছয়জন উপস্থিত হ'লাম হুগলী জেলে।

"জীবনে এই প্রথম কয়েদখানার ভেতর ঢুকলাম।—গেট খুলে জেলারবাবু

যখন আমাদের ভিতরে ঢুকিয়ে সেলের দিকে নিয়ে চললেন, বেশ মনে আছে তখন শিশুসুলভ কৌতূহল নিয়ে সেই বিচিত্র স্থানের প্রতিটি দৃশ্য বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখতে লাগলাম, যেন কোন রহস্যপুরীতে ঢুকেছি!

"জেলারবাবু গণেশদার পূর্ব পরিচিত। প্রথমবারের বন্দীজীবনে কোন এক জেলে কিছুদিন এঁর জিম্মায় ছিলেন। দেখা হওয়া মাত্র উভয়ে উভয়কে চিনলেন।

"জেলারসুলভ কাষ্ঠ হাসি হেসে প্রথম দু' এক কথার পর তিনি আমার দিকে আঙুল নির্দেশ করে গণেদাকে বললেন: 'এই সব কচি ছেলেদেরও মা'র কোল থেকে ছিনিয়ে এনেছেন!'

"গণেশদাও তার উপযুক্ত জবাব দিলেন তৎক্ষণাৎ: 'কি করা যায়— আপনারা বড়রা যখন পিছপাও হয়ে ইংরেজের পোষ মেনে গেছেন তখন দেশের কাজে এমনি কচি ছেলের বেরিয়ে আসা ছাড়া আর উপায় কি?'— জেলারবাবুর মুখের হাসি শুকিয়ে গেল!

"আমাদের তিনজনকে নিয়ে রাখা হ'ল তিনটি সেলে। সুহাসিনীদি ও শশধর আচার্যকে জেলের ভিন্ন ভিন্ন দুই স্থানে রাখা হয়েছিল।

"খানিক পরে জেলের ডাক্তার এসে আমার পায়ের ক্ষত পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

"খাবার ঘণ্টা পড়তেই এলো খাবার—কয়েদখানার নিম্নতম শ্রেণীর কয়েদীকে যে আহার্য দেওয়া হয় তাই। কাঁকর মিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত ভাত, ডাল ও তরকারী নামক একটা ঘোলাটে পদার্থ! যথেষ্ট ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও ভাল করে খেতে পারলাম না।—জেলের সাধারণ কয়েদীদের কাছে শুনেছি প্রথম প্রথম তাদেরও এমনিই হয়! তার কারণ, আহার্যের দ্রব্যগুণ ততটা নয় যতটা আহার্যের এই উৎকট গন্ধগুণ যার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে কিছুদিন সময় লাগে।

"১লা সেপ্টেম্বরের দিন ও রাতটা হুগলী জেলের সেলেই কাটল আমাদের সবার। পরদিন সকাল হতেই আবার মোটরে চাপিয়ে আমাদের তিনজনকে (গণেশদা, লোকনাথ বল ও আমি) নিয়ে হাজির করা হ'ল কলকাতার বিখ্যাত লালবাজার থানায়। সেখানে পৌছনো মাত্রই সার্জেন্টদের ভীড় জমে গেল আমাদের দেখার জন্য! তাদের এতদিনকার অভীপ্সিত শিকার অবশেষে খাঁচার ভিতর আটকে গেছে!

"আমাদের তিনজনকে তিনটি আলাদা সেলে নিয়ে ঢোকানো হ'ল।

সেলের মেঝের উপর পাতা ছিল বহুদিনকার ও বহুজনের ব্যবহৃত খানদুয়েক কম্বল, যার দুর্গন্ধে সমস্ত সেল বিষাক্ত হয়েছিল !

"খাবার সময় হতেই একজন সার্জেণ্ট এসে জিজ্ঞাসা করল—কি খেতে চাই। প্রশ্নটা একটু অস্বাভাবিক মনে হ'ল—আমরা বন্দী, আমাদের রুচি অনুযায়ী খাবার কি তারা দেবে। তার আগের দিনের হুগলী জেলের আহার্যের কথা মনে পড়ে গেল। —সার্জেণ্টকে বললাম—'যা তোমার খুশি তাই দিতে পার।'

"কিছুক্ষণ পরে সার্জেণ্টটি একটি প্লেটে করে খানকয়েক পরোটা ও আলুর তরকারী দিয়ে গেল। প্রস্তুত হয়েছিলাম গতকালের মত অখাদ্য আহার্যের জন্য —কিন্তু আশাতীতরূপে উপস্থিত হ'ল সুখাদ্য এবং তাও আবার বহন করে এনে দিল একজন শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট ! সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম। মনে হ'ল আমার বয়স কম দেখে হয়ত আমার বেলায় আহার্যের তারতম্য করা হচ্ছে—আমাকে প্রলুব্ধ করার জন্য। বাকী দু'জনকে হয়ত অভুক্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছে !

"সার্জেণ্টটি হাসল আমার সন্দেহ বুঝতে পেরে। আমাকে আশ্বস্ত করে সে বলল: 'সবাইকে একইরকম খাবার দিয়েছি—তোমার কোনো চিন্তা নেই, খেয়ে ফেল।'—আমি একটু ইতস্তত করে বললাম: 'বাকী দু'জনকে কিরকম খাবার দেওয়া হয়েছে তা আমাকে একটু নিজের চোখে দেখতে দেবে ?'—'বেশ তোমার নিজের চোখেই তোমাকে দেখাচ্ছি'—বলে সে আমার সেলের দ্বার খুলে গণেশদার সেলের কাছে নিয়ে গেল। দেখলাম আহার্য সম্পর্কে তাঁদের বেলায় কোনো তারতম্য করা হয় নি। নিশ্চিন্ত হয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করলাম।

"পরদিন ভোর হতে না হতেই একদল সার্জেণ্ট ও তাদের একজন উর্ধ্বতন কর্মচারী খুব তাড়াহুড়ো করে আমাদের সেল থেকে বার করে হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বেঁধে আবার ভর্তি করলো পুলিসভ্যানে। গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করতেই রুক্ষ উত্তর এলো—'শেয়ালদা স্টেশন, তোমাদের অবিলম্বে চাটগাঁয় নিয়ে যেতে হবে।'

"যথাসময়ে আমাদের ভ্যান এসে উপস্থিত হ'ল শেয়ালদা স্টেশনে। নেমেই দেখতে পেলাম বিরাট একদল সশস্ত্র পুলিসও সেখানে হাজির রয়েছে আমাদের অপেক্ষায়।

"আমাদের নিয়ে ওঠানো হ'ল একটি বড় প্রথম শ্রেণীর কামরায় এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠল চারজন সার্জেণ্ট, একজন উর্ধ্বতন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী ও একদল গাড়োয়ালি মিলিটারী পুলিস ও তাদের হাবিলদার। যথাসময়ে

গোয়ালন্দগামী ট্রেন ছাড়ল—ফিরে চললাম আমাদের প্রিয় চট্টগ্রামে বন্দী অবস্থায়।"

আনন্দ তখন মাত্র ষোল বছরের বালক। পুলিসের অত্যাচার, প্রলোভন, ও মৃত্যুভয় তাকে বিচলিত করে নি। অত অল্প বয়সেই সে শিখেছিল—"আমাদের যা বলবার আছে তা' আদালতে বিচারকের কাছে বলবো।" এই শিক্ষা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে পুলিসের তর্জন-গর্জন ও বিভিন্ন প্রশ্নবাণকে সে প্রতিহত করেছে। আজো লিখতে বসে গর্বে আমার বুক ভরে উঠছে—বালক বিপ্লবী আনন্দ ক্লান্ত অভুক্ত অবস্থায় ক্ষুধার জ্বালায় যখন অস্থির, তখন সামনে গরম সুখাদ্য আসা সত্ত্বেও তার মনে সন্দেহ হ'ল—"এ কি কেবল আমারই জন্য বিশেষ ব্যবস্থা? আমাকে ছোট দেখে তারা কি রাজসাক্ষী খাড়া করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করছে? এই জন্যই কি আমার খাওয়ার ব্যাপারে এই পরিপাটি? না—খাব না।" আনন্দ সন্দিগ্ধ হয়ে খাবার ফিরিয়ে দিল।

এই বিশেষ ঘটনাটি যদিও সকলের কাছে খুবই সামান্য এবং খুবই নগণ্য মনে হবে কিন্তু গণেশের তা' একবারও মনে হয় নি। গণেশ নিজে আমাকে এই ঘটনাটির উল্লেখ করে বলেছে—"আনন্দ খাবার ফিরিয়ে দিলে প্রহরারত সার্জেণ্ট আমাকে এসে বললো, 'সে তো খাচ্ছে না। তুমি যদি বল সে হয়ত খাবে।' আমি সার্জেণ্টকে বলি, 'তাকে আমার কাছে একবার নিয়ে এসো বা আমাকে তার সামনে নিয়ে চল, আমি বুঝিয়ে বলবো।' গণেশ যতক্ষণ পর্যন্ত আনন্দকে বলে নি যে, তারাও একই খাবার পেয়েছে এবং সে অনায়াসে তারটা খেতে পারে, ততক্ষণ এই বালক বিপ্লবী লালবাজারে আহার্য স্পর্শ করে নি। এইরূপ দৃঢ়চিত্তের বালক বিপ্লবীরাই ছিল চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পুরোভাগে—তাই যুব-বিদ্রোহ সফল হয়েছে, আমরা হয়েছি জয়ী!

চন্দননগরের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য বাঙালী কোনদিনই ভুলতে পারে না। বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসুকে বাল্যবয়সে মাতৃস্নেহে লালন করেছে চন্দননগর! বিশ্বাসঘাতকের রক্তে তর্পণ করবার জন্য আদর্শ বিপ্লবী কানাইলালকেও আমরা পাই চন্দননগরে। আবার বহু বছর পরে গোন্দলপাড়ায় মধ্যরাত্রের রিভলভার যুদ্ধের বাস্তব নাটকে মাখনের আত্মদানে চন্দননগরের বুকে আর একটি বৈপ্লবিক স্তম্ভ রচিত হ'ল!

অগ্নিযুগের ইতিহাসের যে অধ্যায়টুকুর সঙ্গে আমি পরিচিত ও তার যে ক'টি পাতা আমাদের কেন্দ্র করে চন্দননগরে রচিত হয়েছে, আমার মনে হয় তাতে আরো একটি বিশেষ তথ্য লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।

ভারতে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের আইন-আদালত ফরাসী সরকারের আইনকানুন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত। দুই-ই সাম্রাজ্যবাদী সরকার—'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।' তবু তাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব থাকে বলেই প্রত্যেক সরকার নিজ-নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সরকারী নীতি প্রণয়ন করে। চন্দননগরে প্রাণ-দণ্ডের বিধি ছিল না। আমাদের বন্ধুরা—লোকনাথ, আনন্দ ও গণেশ চন্দননগরে ধরা পড়েছে। কাজেই তারা চন্দননগর সরকারের বন্দী। এই জন্যে আইনজ্ঞরা প্রশ্ন তোলেন—এক দেশের বন্দী অন্য দেশের আইনে বিচারার্থে স্থানান্তরিত ও সমর্পিত হতে পারে কি? স্যার চার্লস টেগার্টের পরিচালনায় ফরাসী শাসিত চন্দননগরে বৃটিশ পুলিস কোন্ আইনে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? আমাদের পক্ষের ব্যারিস্টার চন্দননগর নিবাসী শ্রদ্ধেয় ৺শ্রীশ বোসের প্রচেষ্টায় চন্দননগরের ফরাসী কর্তৃপক্ষের কাছে চন্দননগরের অধিবাসী ও আইন-বিশারদেরা একটি প্রতিনিধিদল পাঠান এবং তিনজন বিপ্লবী বন্দীকে ইংরেজ সরকারের হাতে সমর্পণ করার বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। চন্দননগরের ফরাসী সরকার তাঁদের কোন সদুত্তর দিতে না পেরে 'এই প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র অধিকারী ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় সরকার'—এই অজুহাত দেখান।

এই বিষয়ে নথিগত তথ্য আমি যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তা' নিম্নে উল্লেখ করলাম। চুঁচুড়ার পুলিস-ইন্স্পেক্টার বিমলাপদ ব্যানার্জী তাঁর জবান-বন্দীতে বলেছেন—

"There were a number of sergeants and some superior officers—including Water-worth, D. I. G., Burdwan Range and my S. P. There were also some French Polic and officials—including the Administrator, the Commissioner of Police, Chandernagore. The accused and the articles found with them were all brought by the French Police and some sergeants to the Office of the Commissaire du Police. The Commissioner of the Police was there. He examined the accused when they were brought, through an interpreter. The Calcutta sergeants went away. I had been told by my S. P. to wait as he told me the prisoners would be extradited. From there the Commi-ssioner held them and the article were taken before the

French Magistrate.....Half an hour or so after the accused and search lists and the articles were brought back and made over to me by COMMISSAIRE of the French Police. In the meantime I had rung up Chinsurah and a Police Party came down from there and we took the three accused and the articles and the search list to the District Magistrate of Hoogly, Mr. J. B. Kindersley....."

ইন্‌স্পেক্টার বিমলাপদ ব্যানার্জীর জবানবন্দী থেকে জানা যাচ্ছে, ফরাসী চন্দননগরের Administrator বৃটিশ সরকারের হাতে বন্দী তিনজনকে সমর্পণ করে। বন্দীদের এই extradition আইনবহির্ভূত বলে প্রতিবাদ ওঠে এবং ফরাসী চন্দননগরের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পণ্ডিচেরীতে ফরাসী গভর্নরেরর কাছে আইনগত প্রতিবাদ জানানো হয়। এতেও কোন সুরাহা হয় নি। অবশ্য সুফল পাওয়ার আশাও আমরা পোষণ করি নি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকলেও বিপ্লবীশক্তিকে খর্ব করতে তারা যে দ্বিমত হবে না তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অসম্ভব জেনেও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন চন্দননগরে ধৃত গণেশ, আনন্দ ও লোকনাথের বিচার যেন ফরাসী সরকারের অধীনে ফরাসী আইন অনুসারেই হয়। কারণ, ফরাসী সরকারের আইনে প্রাণদণ্ডের বিধান না থাকায় তাঁরা আশা করেছিলেন, বিপ্লবী বন্দীদের প্রাণদণ্ড হবে না। কিন্তু পণ্ডিচেরীর ফরাসী গভর্নর বৃটিশ সরকারের সঙ্গে নেপথ্যে হাত মিলিয়ে আমাদের তিন বন্ধুর extradition অনুমোদন করলো। এই extradition অনুমোদন করার সময় ফরাসী সরকারকে আইনগতভাবে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ আদালতের রায় নিতে হয়—নইলে তথাকথিত গণতন্ত্রী বিধানসভায় সাম্রাজ্যবাদীদের Constitutional Position-এর ঠাট যে বজায় থাকে না!

আমাদের ব্যারিস্টার স্বর্গত শ্রীশ বোসের কাছে উপর মহলের খবর ছিল যে, বৃটিশ সরকার কোন ইংরেজ আইনজ্ঞের সাহায্যে ফ্রান্সের আদালতে প্রমাণ ও তথ্যাদি উপস্থিত করার পর তিনজনের extradition order চূড়ান্তভাবে আদায় করতে সমর্থ হয়। এই সংবাদের ভিত্তিতে ৺শ্রীশ বোস সরকার পক্ষের সাক্ষী, ইন্‌স্পেক্টার বিমলাপদ ব্যানার্জীকে জেরা করে এই extradition প্রশ্নে দুই সাম্রাজ্যবাদী সরকার কিভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তা' উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন। কিন্তু একে সরকারী সাক্ষী তায় আবার পুলিস-কর্মচারী—কাজেই সব

প্রশ্ন বেমালুম অস্বীকার করে গেলেন। তবু প্রকাশ্য আদালতে সর্বসমক্ষে শ্রীশবাবুর ওজস্বিনী ভাষায় তীব্র প্রশ্ন ও সাক্ষীর উত্তর, ঘটনার সত্যতাকে চাপা দেবার চেষ্টা করলেও একেবারে উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় নি।

শ্রীশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ইন্‌স্পেক্টার জবাব দিলেন—

"I do not know if Sir Charles Teggert and Messrs Bratly and Mackinty have gone on leave one after another and whether that has anything to do with this Chandernagore affair.

Q.—"Have you been asked by anybody to be very cautious in your evidence so that the name of the person who killed the boy may not transpire ?"

Ans.—"No."

চন্দননগরের ঘটনার পর Administrator ও পণ্ডিচেরীর গভর্নরের কাছে যখন extradition order রহিতের চেষ্টা হচ্ছিল, তখন বৃটিশ সরকার গণেশ, লোকনাথ ও আনন্দের বিচার আমাদের সঙ্গেই চালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। তাদের চন্দননগরে গ্রেফতার করার কয়েক দিনের মধ্যেই চট্টগ্রাম জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

সেই সময় জেলে আমাদের কোন দৈনিক সংবাদপত্র সরবরাহ করা হ'ত না। বহু অনশন ও অনশনে জীবননাশের আরও প্রায় বছর পনেরো পর রাজনৈতিক বন্দীরা জেলের অভ্যন্তরে দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের সুযোগ পায়। কাজেই চন্দননগরের এত বড় একটি বিপর্যয়ের সংবাদ স্বাভাবিকসূত্রে আমার পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। ত'ছাড়া জেলবাসের এই মাস দুয়েক পর্যন্ত জীবনে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, নিতান্ত নিরীহ গোবেচারা সেজেই আমি দিন কাটাচ্ছিলাম। সেই জন্য এই সময়ের মধ্যে চোরাই পথে স্মাগল্ করে খবরের কাগজ আনানোও যুক্তিযুক্ত মনে করিনি।

চন্দননগরের এই খণ্ডযুদ্ধের খবর প্রথম আমার কানে এলো এক ছুটির দিনে। কোন একজন জেল-কর্মচারী আমাকে বলেন—"চন্দননগরে রিভলভার যুদ্ধ হয়েছে। আপনাদের একজন মারা গেছে ও তিনজন ধরা পড়েছে···।" খবরটা শুনে আমার মন গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'ল! যেদিন মরণপণ যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছিলাম, সেইদিন থেকেই এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির আশঙ্কায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছি। কিন্তু তবু এই বহু প্রতীক্ষিত শোচনীয়

পরিণাম আমাকে ব্যথিত ও বিচলিত করলো কেন? এই কেনর উত্তর কবির ভাষায় যতই ভাবি না কেন—ঘরছাড়া দিক্‌হারা বৈরাগী মঙ্গলশঙ্খ নহে নহে তোর তরে—তবু অমঙ্গলসূচক পরিণতির প্রভাবমুক্ত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে—আমরা একজন সাথীকে চিরতরে হারিয়েছি, তিনজন বন্দী হয়েছে—এই সংবাদ আমার মনকে তোলপাড় করে তুললো।

আমি চন্দননগরের বাড়ি পরিত্যাগ করার পর লোকনাথ গিয়ে যে আমার শূন্যস্থান ইতিমধ্যে পূরণ করেছে তা আমি তখনও জানতাম না। চন্দননগরে স্যার চার্লস টেগার্টের সশস্ত্র অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমি সেই যুদ্ধে লোকনাথের উপস্থিতির কথা ইতিপূর্বে লিখে গেছি। তাই পাঠকবর্গের মনে ধারণা হতে পারে, আমি ধরা দেবার পরেও চট্টগ্রাম জেলে বসে চন্দননগরের বাড়ির বা আমাদের দলের অন্যান্য খবর রাখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু আগেই বলেছি, এই দু'টি মাসের মধ্যে সেরূপ যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন সুযোগ হয়ে উঠে নি। আমি জানতাম চন্দননগরের বাড়িতে আমি ছাড়া কেবল গণেশ, মাখন ও আনন্দ ছিল। কাজেই খবর অনুযায়ী একজন যদি মারা যায় তবে তারা দু'জন ধরা পড়বে—তিনজন গ্রেফতার হয়েছে বলার কারণ কি? আবার, সুহাসিনীদি ও শশধরদা যদি বন্দী হয়ে থাকেন, তবে চারজনের গ্রেফতারের খবর পাওয়া যেত—তিনজন কি করে হ'ল?—এইরূপ নানা প্রশ্নে আমার মন খুব বিচলিত ও বিষণ্ণ হ'ল।

আমার যত দূর মনে পড়ে সেপ্টেম্বরের দুই তারিখের ঘটনা কলকাতার সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয়েছিল তিন তারিখে আর চট্টগ্রামে তা' প্রকাশিত হয়েছিল চার তারিখ সকালে। স্থানীয় পাঞ্চজন্য পত্রিকা তিন তারিখেই সেই সংবার সরবরাহ করেছিল, কিন্তু তা' খুবই সংক্ষিপ্ত বিবরণী। যাই হোক, আমাকে আর বেশি সময় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হ'ল না—চার তারিখ আমার কাছে সংবাদ পৌছল। পাঁচ তারিখ সকাল থেকেই জেল-কর্তৃপক্ষের তৎপরতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে মনে হচ্ছিল আমাদের আরো কাউকে জেলে আনবার ব্যবস্থা হচ্ছে। জেলের যে নির্জন কক্ষটিতে আমি ছিলাম তার পাশে পাশে আরো পাঁচটি অনুরূপ নির্জন কক্ষ ছিল। তারই মধ্যে তিনটি সেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীর ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র রাখা হ'ল। সেলের ডিউটির জন্য আরো বেশি প্রহরী মোতায়েন হ'ল।

৫ই সেপ্টেম্বর সকাল দশটা-এগারোটার সময় আমাদের তিনজন বন্দী সাথী

—লোকনাথ, আনন্দ ও গণেশকে চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে পুলিসের গাড়িতে তোলা হ'ল। স্টেশনে জেল-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট S. D. O. এবং এডিশন্যাল পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ও তাঁদের সঙ্গে বহু জেল-ওয়ার্ডার উপস্থিত ছিলেন। চতুর্দিকে পুলিস ও মিলিটারীর লৌহবেষ্টনীর মধ্যে বন্দীদের গাড়ি থেকে নামিয়ে চট্টগ্রাম জেলে নিয়ে আসা হ'ল। ফেণী স্টেশনের সংঘর্ষে যে সমস্ত পুলিস কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন ও আমাদের গুলীতে আহত হয়েছিলেন, আমাদের সাথী দু'জনকে—শ্রীগণেশ ঘোষ ও শ্রীআনন্দ গুপ্তকে, তাঁদের সুস্পষ্টভাবে চিনিয়ে দেওয়া হয় এবং এই দু'জনকে সনাক্ত করার জন্য তাঁদের ওপর কড়া নির্দেশ জারী হ'ল। কিন্তু Test-identification Parade-এ তাঁদের কেউই আমাকে সনাক্ত করেন নি। ইন্‌স্পেক্টার বসেত্‌ মিঞা স্বয়ং কোর্টে আমাকে বলেছিলেন যে, কর্তৃপক্ষ এঁদের সততার উপর যথেষ্ট সন্দিহান হয়ে, পাছে চিনতে পারেন নি বলে তাঁরা কোন অজুহাত তোলেন, সেই ভয়েই সনাক্তকরণ ব্যাপারে তাঁদের এইভাবে বাধ্য করেছিলেন।

তা'ছাড়া যখন লোকনাথের জেলে আসার দু' ঘণ্টার মধ্যেই Test-indentification-এর ব্যবস্থা হয়েছে এবং ফেণী স্টেশনের সব ক'জন সরকারী সাক্ষীকেই উপস্থিত করা হয়েছে, তখন বুঝতে একটুও অসুবিধে হ'লনা যে, ফেণী থেকে একই ট্রেনে পুলিসের এইসব সাক্ষীকে আনা হয়েছে। তারা নির্দেশ অনুযায়ী সময় ও সুযোগমত গণেশ ও আনন্দকে চিনে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং চাকরীর খাতিরে নিরুপায় হয়েই এদের দু'জনকে সনাক্ত করেছে। সরকারপক্ষের সমস্যা —যদি সাক্ষীরা শেষ পর্যন্ত কাউকে সনাক্ত না করে তাহলে ফেণী সংঘর্ষের মামলার কোন ভিত্তিই যে থাকবে না! তাই আদর্শগত মানবিক নীতির ভূমিকা কেন ইংরেজ সরকারী কর্মচারীরা পরিহার করলো, তা' নিয়ে অনুশোচনা করে রাজনীতির মৌলিক শাস্ত্রকে যেন না ভুলি। ছলে বলে কৌশলে শত্রুকে পরাজিত করতেই হবে—এই হ'ল রাজনীতি—এই হ'ল রণকৌশল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তা' অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে বলেই অতি সহজে দু'শ' বছরেরও অধিককাল ধরে ভারতবাসীকে পদানত রাখতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উচ্ছেদের জন্য তদপেক্ষা বহু গুণ অধিক ছল বল ও কৌশলের প্রয়োজন। তাই আজ আক্ষেপ করবো না—সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি হতে শিক্ষা গ্রহণ করবো।

প্রচণ্ড শক্তিশালী ইংরেজ সরকার—ছোট্ট বন্দর শহর চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে আজ তাদের মিলিটারী ছাউনী—শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে

মিলিটারী প্রহরার ব্যবস্থা—প্রতিটি রাস্তায় পুলিস ও মিলিটারীর রাত্রিদিনের অতন্দ্র পরিক্রমা! তবু তাদের চোখে ঘুম নেই—জেলে আছে গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও অনন্ত সিংহ, বাইরে আছেন নির্মলদা, অম্বিকাদা ও মাস্টারদা। আমি আবার ধরা দিয়েছি স্বেচ্ছায়। কে জানে আমাদের কি উদ্দেশ্য—কে জানে আমরা জেলের ভেতরে ও বাইরে সংযোগ ঘটাবো কিনা—কে বলতে পারে যে আমাদের আর কোন ষড়যন্ত্র বা আক্রমণের প্ল্যান নেই!

চট্টগ্রামের জেল এমনিতেই যথেষ্ট সুরক্ষিত। চারিদিক সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। আমি আসবার আগে থেকেই এই জেলে যুব-বিদ্রোহের বন্দীরা ছিল। তাই কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত প্রহরীর ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি এই জেলে আসার পর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আরো পল্টন আমদানী হলো। এর ওপর আবার গণেশ ও লোকনাথ এলো। দিন দিন নতুন নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে। Inspector General of Prison এসে নিজে তদারক করলেন। বাংলা দেশের জেলসমূহের আবহমানকালের নিয়ম লঙ্ঘন করে ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল জেলের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইংরেজ জেলার ও ইংরেজ ওয়ার্ডারদের সাহায্যে আরো পাকাপোক্ত করতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট জেলে এই প্রথম ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার ও ইউরোপীয়ান জেলার বহাল হ'ল। কেবল তাই নয়, বাছাই করা হিন্দুস্থানী জেল-ওয়ার্ডার, যাদের Retire করে পেন্‌শন পেতে মাত্র কয়েক বছর বাকি তেমন একদল জেল সেপাই স্পেশাল ডিউটিতে এলো—এরা কেবলমাত্র জেলের অভ্যন্তরে আমাদের পাহারা দেবে। জেলের ভেতরে পুলিস পাহারার কোন আইন নেই। বন্দুক নিয়ে জেলের ভেতর পাহারা দেওয়া Joil-code-এর একেবারে বাইরে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে আমাদের ওয়ার্ডের চতুর্দিকে রাইফেলধারী পুলিস মোতায়েন হ'ল।

এই তো গেল জেল-কর্তৃপক্ষ তরফের ব্যবস্থাপনার নমুনা। জেলা-কর্তৃপক্ষ কিন্তু এতেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না—তাঁরা Eastern Frontier Rifles-এর এক কম্পানি গুর্খা সৈন্য (প্রায় ১৫০ জনেরও অধিক) নিযুক্ত করলেন। তারা মিলিটারী কায়দায় প্রায় বারো ফুট পরিধি জুড়ে জেল-প্রাচীরের বাইরে চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিল। জেল-প্রাচীরের একটু উপরে চার পাঁচ জায়গায় রিফ্লেক্টারের সাহায্যে তীব্র ইলেকট্রিক্ আলোর ব্যবস্থা করলো। জেলের সামনে তাদের ক্যাম্প—তারা জেল-গেট, অফিস ও জেল-অস্ত্রাগার সব আগলে রইল। সব জেলেরই দুইপাশে জেল অফিস। চট্টগ্রাম

জেলেও একই ব্যবস্থা। জেল-অফিসের উপরে গুর্খা সৈন্য মেসিনগান নিয়ে পজিশন্ নিল। এক কথায় চট্টগ্রাম জেলটি তারা লৌহদুর্গে পরিণত করলো; ঠিক যেন বিশ্বকর্মা নির্মিত লখিন্দরের লৌহ-বাসর। একটি স্থচ প্রবেশের ছিদ্রও কোথাও নেই।

এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শত্রুর শক্তি ও চাতুর্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য কোথায় যেন একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখেছিলাম। কিন্তু ক্রমেই সেই আলোও নিভে যেতে লাগলো। কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন আবার নতুন করে আমাদের বিচার স্থরু করবেন। এই দেড় মাসে আমাদের যা টাকা-পয়সা ব্যয় হয়েছে এবং তা'ছাড়াও পরিশ্রম ও নানা ক্ষয়ক্ষতির প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ না করেই ইংরেজ সরকার কলমের এক খোঁচায় Denovo Trial-এর হুকুম দিল। কতখানি আইন-বহির্ভূত কাজ! আবার যদি কেউ ধরা পড়ে এবং আবার যদি denovo trial-এর আদেশ হয় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের শক্তির উপর এটা যে কত বড় আঘাত তা' সহজেই অনুমেয়।

আমাদের মামলার Judgement থেকে উদ্ধৃত করছি—

"It may be mentioned here that the trial commenced on 27-7-30, when 32 accused were brought before us but as subsequently on 8-9-30, three absconding accused namely, Ganesh Chandra Ghosh, Lokenath Bal and Ananda Gupta who had been arrested on 2-9-30, in Chandernagore, were produced before us, we decided for reasons stated in the order recorded in the order sheet on 10-9-30 to try them jointly with the other accused. On 11th September, 1930, therefore the trial was recommended Denovo and all the witnesses who had been previously examined were examined afresh."

নতুন করে আবার সব সাক্ষীদের ডাকা হবে, আবার প্রথম থেকে বিচার স্থরু হবে! বৃটিশ আইন অনুযায়ী খোলা আদালত গৃহে সর্বসমক্ষে ন্যায়বিচারের বিধি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আমাদের ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষের স্থবিধার্থে, সেই বিধান বিকৃতভাবে প্রযোজ্য হ'ল—সদর আদালতে মাসের পর মাস বিচার চালাবার ঝুঁকি নিতে কর্তৃপক্ষ সাহস করলেন না। তাঁরা জেলের চার দেয়ালের ভিতরে খোলা আদালত গৃহেই স্থবিচারের স্থব্যবস্থা করলেন!

জেলের ভেতর দিন রাত রাজমিস্ত্রী ও ছুতোরের কাজ সুরু হল—খটাখট্ ঠকাঠক্ সব সময় লেগেই আছে। সাধারণ কয়েদীদের বাসের জন্য তৈরি দোতলার দু'টি খুব বড় বড় ঘরে দু'দিনের মধ্যেই বিচারকক্ষ নির্মিত হল। ট্রাইব্যুনালের এজলাস—এক ধাপ নিচে পেশকারদের বসার ব্যবস্থা; উকিল-ব্যারিস্টারদের ব্যবহারের জন্য টেবিল-চেয়ার সাজানো; সাক্ষীর কাঠগড়া ও অভিযুক্তদের জন্য আরও একটি সুবৃহৎ কাঠগড়া এবং অপর পাশে, বেশ কিছুটা দূরে স্বীকারোক্তিকারীদের জন্যও একটি পৃথক কাঠগড়া প্রস্তুত হ'ল। এজলাসের পেছনে পর্দা ঘিরে জজদের Retiring Room-এর ব্যবস্থা—ইলেকট্রিক্ লাইট ও ফ্যান কোনটারই কোন ত্রুটী রইল না। কেবল সদর আদালতের সুযোগ-সুবিধে ও স্পেশাল দর্শকের উপস্থিতির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। জেলের অভ্যন্তরে এইরূপ পরিবেশের গাম্ভীর্য ভীতিপ্রদ—বহির্দৃষ্টিতে সুবিচারের আয়োজনের অনুকূল নয়।

নতুন করে বিচার আরম্ভ হবে—ক্ষয়-ক্ষতি লোকসান যা হ'ল, তা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের। এই অভিনব বন্দোবস্তের জন্য আমরা অভিভাবক ও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং সরকারের এইরূপ অবৈধ Denovo Trial-এর প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেও এই নতুন ব্যবস্থায় মামলা শেষ হতে আরো যে অন্তত দু'টি মাস সময় বেশি লাগবে, এর জন্য মনে মনে আনন্দিত হলাম।

কি শোচনীয় অবস্থা! জেলের বাইরে মিলিটারী, জেলের ভেতরে ইংরেজ জেলার, ইংরেজ ওয়ার্ডার ও বাছাই করা কুড়ি-বাইশ বছরেরও অধিক পুরনো বিশ্বাসী সেপাই দল। এর ওপরেও আবার পুলিসী ব্যবস্থা—জেলের ভেতর বন্দুক উঁচিয়ে ছ'জন সেপাই আমাদের ওয়ার্ডের চতুর্দিকে পাহারা দিচ্ছে। রাতদিন বাইরে ও ভেতরে বুটের আওয়াজ—ডিউটি চেঞ্জ হচ্ছে, অফিসারেরা রাউণ্ডে আসছে—তাদের সেলাম ঠোকা হচ্ছে, রাত্রে হাঁকডাক চলছে—Halt! Who comes there? এতদিন তবু আশায় ছিলাম, বহুকাল ধরে মামলা চলবে এবং প্রতিদিন জেলের বাইরে আদালতে যাবো। কিন্তু জেলের মধ্যেই বিচারের ব্যবস্থা হওয়ায় আমাদের শেষ আশার আলোও বুঝি নিভে যায়!

শরৎবাবু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—"জেল থেকে পালাতে পার?" উত্তর দিয়েছিলাম—"চেষ্টা করতে পারি।"— "কত টাকা লাগবে?"—"অন্তত পাঁচ হাজার।"

শরৎবাবু টাকা দিয়েছেন—কলকাতা থেকে নিজে বয়ে এনে বৈপ্লবিক উপহার

পাঠিয়েছেন মাস্টারদাকে—বোমা ও টাকা। আমাদের জেল-ভাঙার প্রচেষ্টায় তাঁর সর্বপ্রকার সমর্থনের ইচ্ছেও তিনি প্রকাশ করেছেন। আমরা শরৎবাবুর কাছ থেকে জেল-ভাঙার প্রোগ্রামের জন্য টাকাও নিয়েছি।

এটা তো গেল শরৎবাবুর কাছে আমাদের commitment! এ ছাড়াও আমরা যে শপথ নিয়েছি বৈপ্লবিক অন্তরের অতি গভীরে—জালালাবাদ, ফিরিঙ্গীবাজার, কালারপোল ও চন্দননগরের হত্যালীলার প্রতিশোধ নেবো—জেল ভাঙবো এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাহায্যে ব্যাপক ধ্বংসলীলার এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করবো!

কিন্তু সরকারের অপ্রতিহত প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে এবং এইরূপ দুর্ভেদ্য পুলিস ও মিলিটারী ব্যূহ ভেদ করে আর কোন সক্রিয় বাস্তব বৈপ্লবিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা কি সম্ভব? মিলিটারী, পুলিস ও জেল-কর্তৃপক্ষ একজোট হয়ে যে অভাবনীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে এবং সর্বোপরি কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে বিচার ব্যবস্থা যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তাতে যে-কোন বিপ্লবীরই নৈতিক ও মানসিক বল হ্রাস পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। পৃথিবীর যত অস্ত্রাগার আছে এবং তাতে যতই শক্তিশালী মারণাস্ত্র থাকুক না কেন, তার চাইতেও অধিক শক্তিশালী অস্ত্র—সৈন্যের morale (মনোবল)! প্রবল শত্রুর প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের মহাস্ত্র—তাদের morale! সেদিন বুঝেছিলাম শত্রুর দুর্ভেদ্য ব্যূহ দেখে মনোবল হারালে চলবে না। আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব বলে মনে হয় তাকেও সম্ভব করা যায় যদি বৈপ্লবিক morale বজায় থাকে—প্রথমেই আশাহত হয়ে পরাজয় মেনে নেওয়া না হয়।

আজ এই প্রসঙ্গে সীমিত গণ্ডির মধ্যেও তুলনামূলকভাবে বলতে ইচ্ছে করছে ভিয়েত্‌কংদের কথা। কি করে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের হেলিকপ্টার রাখবার সুরক্ষিত এলাকা আক্রমণ করে প্রায় চল্লিশটি হেলিকপ্টার প্রতিবার ধ্বংস করতে ভিয়েত্‌কংরা সমর্থ হয়েছে? আমেরিকান মিলিটারী কম্যাণ্ড প্রথমবারের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই সবধান হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু যত সাবধানতাই অবলম্বন করুক না কেন—Where there is a will there is a way! ভিয়েত্‌কংরা তিন-তিনবার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত সাবধানতা ও রণকৌশল ব্যর্থ করে প্রতিবারই কোন-না-কোন নতুন পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে আমেরিকান হেলিকপ্টার ধ্বংস করেছে। এই সেদিনও সাইগন যুদ্ধে পঞ্চাশটি হেলিকপ্টারকে জমি ছেড়ে ওড়বার আর সময় দেয়নি, ময়দানেই তাদের সমাধি রচনা করেছে। পৃথিবীর সমর ও বৈপ্লবিক ইতিহাসে এইরূপ শত-সহস্র ঘটনার

উল্লেখ আছে। এইসব ঘটনার মূলে যে বাস্তব দুর্দমনীয় morale আছে তা হ'ল—পরাজয় মানবো না, 'আর কোন উপায় নেই' তা কখনই হতে পারে না, 'অসম্ভব' শব্দ কেবল মূর্খের অভিধানেই পাওয়া যায়—বিপ্লবীর অভিধানে নয়!

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম জেলে বসে কর্তৃপক্ষের সেইরূপ ব্যাপক আয়োজন দেখে আমাদের সীমিত শক্তিতেও আমরা morale হারাই নি। জেলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও দিবারাত্রি ইংরেজ সরকারের সামরিক ব্যূহের অট্টহাসি আমাদের অন্তরে বিভীষিকার সঞ্চার করতে পারে নি। আমরা ল্যাণ্ডমাইন ও ডিনামাইট দিয়ে জেল ও শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান উড়িয়ে দেবার ব্যাপক আয়োজন সফলতার সঙ্গেই করেছিলাম—এই ব্যাপারে সরকারকে শেষ পর্যন্ত পর্দার অন্তরালে আমাদের সঙ্গে মীমাংসায় আসতে হয়। এই ঘটনা প্রকাশ করবো বলেই পাঠকবর্গকে সরকারের ব্যাপক ব্যবস্থার এত বিশদ বিবরণ জানাবার প্রয়োজন মনে করেছি। নইলে সঠিক উপলব্ধি করা যাবে না—কেন সরকারকে আমাদের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। ঘটনার সামঞ্জস্য রেখে আমাদের প্রস্তুতি যেভাবে চলেছিল স্থান অনুযায়ী তার বিবরণ ব্যক্ত করবো।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সাল—জেলে কোর্ট বসেছে। আমাদের অভিভাবকেরা এবং জামিনে যাঁরা মুক্ত ছিলেন তাঁরা বাইরে থেকে আসবেন। আমাদের ও সরকার পক্ষের ব্যারিস্টারদেরও জেলে আসতে হবে। কিন্তু জেলের বিধান অনুযায়ী যে-কেউ জেলের মধ্যে প্রবেশ করুক না কেন, জেল-গেটে তার শরীর তল্লাসী হবেই। কাজেই জেল-কর্তৃপক্ষ আইনমত জেল-গেটে একের-পর-এক সবাইকে সার্চ করে জেলের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে। কিন্তু জেলের এই নিয়ম আদালতে প্রবেশের সময় কেন প্রয়োগ করা হবে? হোক্ না বিচার জেলে—বসুক না কোর্ট কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, তাতে কি আসে যায়? উকিল, ব্যারিস্টারেরা স্বাধীনভাবে বিনা বাধায় কোর্টে যাবেন—তাঁরা কেন এইরূপ অপমানসূচক ব্যবহার বরদাস্ত করবেন? কুমিল্লার বাঘা উকিল—কুমিল্লা কেন, বাংলার দেশনেতা ও প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় জেলের এইরূপ তল্লাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানালেন। জেল সুপারিনটেণ্ডেন্টের কোন ওজর-আপত্তি তিনি শুনলেন না। শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত সুস্পষ্টভাবে জানালেন—

"I am not concerned at all with the jail. I am to go to Court to defend my client. I will go straight to Court on a legal mission. What do I care for the Jail rules? They do not concern me at all. I refuse to attend as a captive

lawyer. I do protest against the legality of being searched. As a free lawyer I shall go straight to attend court, or else my client would go undefended."

অখিলবাবুর এইরূপ দৃঢ় আপোষহীন মনোভাব আমাদের পক্ষের সব উকিল ব্যারিস্টার একবাক্যে সমর্থন করলেন। সকলেই একমত—শরীর তল্লাসী ছাড়াই তাঁদের জেলের কোর্টে উপস্থিত থাকতে দিতে হবে, আর তা নাহলে কর্তৃপক্ষের এইরূপ অশোভন হস্তক্ষেপের ফলে তাঁদের মক্কেলরা আত্মপক্ষ সমর্থনে বঞ্চিত হবেন। স্বর্গীয় অখিলবাবুর সেই ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের জয় হ'ল! উকিল ব্যারিস্টারেরা সকলেই বিজয় গৌরবে জেল-কোর্টে প্রবেশ করলেন।

বিচার সুরু হ'ল। ট্রাইব্যুনালের বিচারকেরা স্ব স্ব আসনে আসীন। মামলা আবার প্রথম থেকে আরম্ভ হবে। কাজেই সরকারী উকিল খাঁ সাহেব আব্দুল সত্তর তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতা সুরু করলেন। এই বক্তৃতার সারমর্ম সাক্ষীদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে এবং জজসাহেব তাঁর জাজ্‌মেণ্টে উল্লেখ করেছেন—

"The three accused, Ganesh Ghosh, Anantalal Singh and Lokenath Bal and also Ambica Chakravarty, accused now awaiting trial and absconding accused Surjya Kumar Sen and Nirmal Sen had been interned during the period 1924 to 1926....They were subsequently released....In December 1928, the All India session of the Congress was held in Calcutta which was attended by Ambika Chakravarty, Surjya Sen, Nirmal Sen, Anantalal Singh, Harigopal Bal and Tarakeswar Dastidar (another absconding accused). At this Congress numerous volunteers were wearing khaki military uniform and commanded by Subhas Bose and Jatin Das, wearing the uniform of military officers. The prosecution suggestion is that these Chittagong visitors after witnessing this display of pseudo-militarism returned hom filled with a spirit of emulation which was soon to be translated into practice.

"After their release Ananta Singh, Lokenath Bal and Ganesh Ghosh proceeded to interest themselves in the

development and organising of physical culture clubs of which at the time there were many in existence in Chittagong where youths, chiefly of the student class, indulged in physical exercise and lathi play. Among these were the Sadarghat, Nalapara, Rahamatganj, Brindaban, Chandanpura and Asadganj clubs. Sometime in 1927-28, a Central Physical Culture Association had been formed for the better organisation of these clubs....The grant was utilised by the Association in appointing Anantalal Singh as the Instructor to the various physical culture clubs…"

একদিনে এই বক্তৃতা শেষ হয়নি। পরের দিনও Public Procecutor আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মূল উদ্ঘাটন করতে ধারাবাহিকভাবে অনেক কথা বললেন!

মামলার দ্বিতীয় দিন—জেলের অভ্যন্তরে আদালত বসেছে। সশস্ত্র পুলিস, অভিযুক্ত রাজদ্রোহী যুবকদল, স্বীকারোক্তিকারী, উকিল-ব্যারিস্টার ও আদালতের কর্মচারীবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট; ট্রাইব্যুনালের বিচারকেরা এখনও আসন গ্রহণ করেন নি। প্রতিদিনের মতই ঠিক দশটা তিরিশ মিনিটের সময় তাঁরা তাঁদের আসন অলঙ্কৃত করবেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জজদের শূন্য আসন পূর্ণ হ'ল।

পাব্‌লিক্ প্রসিকিউটার খাঁ সাহেব আবদুল সত্তর তাঁর গত দিনের মামলা সংক্রান্ত অসমাপ্ত প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালেন। সমবেত সকলের দিকে একটু তাকিয়ে একটু কেশে তিনি ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের সম্বোধন করলেন—"মাননীয় বিচারপতি…!" তাঁর মুখের কথা মুখেই রইল—সরকারী উকিল বক্তৃতার সুরুতেই বাধাপ্রাপ্ত হলেন।

আদালতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, উপস্থিত সকলকে সচকিত বিস্মিত করে এবং সরকারী পক্ষকে স্তম্ভিত করে তরুণ কণ্ঠের উচ্চৈঃস্বর ধ্বনিত হ'ল—

"Your honour! I like to make a statement."

স্বীকারোক্তিকারী তার কাঠগড়ায় একেবারে একা। সেখান থেকেই সে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে বলছে—"আমি একটি বয়ান দিতে ইচ্ছুক।" আইন-আদালতের বিধি অনুসারে "আসামী" যে কোনো সময়ে

তার বিরুদ্ধে মামলার Proceedings (কার্যধারা) স্থগিত রাখবার অনুরোধ জানিয়ে স্বপক্ষে স্টেটমেণ্ট দেবার সুযোগ দাবি করতে পারে এবং বিচারক আইনত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই সুযোগ দিতে বাধ্য। কাজেই মামলার Proceedings, অর্থাৎ সরকারী উকিলের প্রারম্ভিক বক্তৃতা, সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হ'ল। জজসাহেবকে স্বীকারোক্তিকারীর নতুন বয়ান লিপিবদ্ধ করার জন্য কাগজ কলম টেনে নিতে হ'ল।

জজ সাহেব বললেন—"Well, speak out."

স্বীকারোক্তিকারী—"The statement I made to the S. D. O. is not a voluntary one. I beg to withdraw the statement here and now !"

—আমি S. D. O. মহাশয়ের কাছে যে স্বীকারোক্তিটি দিয়েছি তা স্বেচ্ছাকৃত নয়! আমি সেই স্বীকারোক্তিটি এখনই প্রত্যাহার করতে চাই।

এ কি হ'ল ! এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! প্রায় দেড়মাস মামলা চলার পর স্বীকারোক্তিকারী হঠাৎ আজ কেন বলছে স্বীকারোক্তিটি সে স্ব-ইচ্ছায় দেয় নি এবং তাও আজ একেবারে প্রত্যাহার করতে চাইছে? অন্যেরা আগেই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছে, এখন সরকারপক্ষের হাতের শেষ ঘুঁটিটিও বানচাল হ'ল।

আমার চেষ্টায় এতদিন পর্যন্ত স্বীকারোক্তিকারী আদালতের কাছে বলেছে—"পুলিসের কাছে যে স্বীকারোক্তি দিয়েছি তা প্রত্যাহার করলাম।" কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তিই আদালতে গৃহীত হয়, পুলিসের কাছে যে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয় আদালতে বিচারকের কাছে তার কোনো মূল্যই নেই। S. D. O. মহাশয়ের কাছে লিপিবদ্ধ রাজদ্রোহীর যে স্বীকারোক্তিটি আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে বলে সরকারপক্ষ এতদিন আশা পোষণ করছিল, তা স্বীকারোক্তিকারীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

আমার চেষ্টায় যা এতদিন পুরোপুরি সম্ভব হয় নি, তা সার্থক ও সফল রূপ নিল আনন্দের (আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত) প্রভাবে। চন্দননগরের যুদ্ধ-প্রত্যাগত বালক আনন্দ আদালতে স্বীকারোক্তিকারীর সামনেই দাঁড়িয়ে! তার দেহে রিভলভারের গুলীর ক্ষতস্থান তখনও ব্যাণ্ডেজ করা! আনন্দের ব্যক্তিত্ব ও বন্ধুত্বের প্রভাব তারই মত আর একজন বালক স্বীকারোক্তিকারীকে প্রভাবান্বিত করলো—দুর্বলতা জয় করে সে ঘোষণা করলো—"আমি স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করছি।" সরকারী উকিল ও মামলার ভারপ্রাপ্ত পুলিসের Investigation

Officer মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নীরব রইলেন। নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত এডিশনাল পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বি, জে, স্টার মনে ভাবলেন—এ যেন তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয়—ক্রোধে অধর দংশন করে তিনি পরাভবের গ্লানিমুক্ত হতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে, ইউনী গত্যন্তর নেই দেখে উদাস নয়নে স্বীকারোক্তিকারীর দিকে একবার তাকিয়ে তার Statement লিপিবদ্ধ করলেন—"...আমার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলাম।"

আকস্মিকভাবে শেষ স্বীকারোক্তিটিও প্রত্যাহৃত হ'ল। সরকারী উকিল আবার তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতা সুরু করলেন—

"In February, 1929, as has already been stated, a District Congress Committee was formed of which Surjya Sen became Secretary and Ananta Lal Singh, Ganesh Ghosh, Lokenath Bal, Ambica Chakravarty and Nirmal Sen became members. About the same time a Youth Association (Juba Samity) was formed with Ganesh Ghosh as Secretary (P. W. 149). About the same time also Ganesh Ghosh, became the Secretary of the Sadarghat Physical Cultural Club.

"In March, a volunteer organisation was formed by these six ex-detenus. ....References to these parades of the volunteers are to be found in Ananta's report for March [Ex. 261 (4)]....At the same time members of the students' committee were attracted by displays of physical feats given by Lokenath Bal and Ananta Singh. The former used to stop motor cars in motion and the latter used to twist iron rods.

"Thus by the end of March these six ex-detenus, by prominently associating themselves with every movement calculated to appeal to the youth of the town, and particularly the student community, had come into close touch with them and acquired manifold facilities for

securing recruits to a secret revolutionary organisation of their own under the cloak of these ostensibly innocent activities.

"On 11th, 12th and 13th May, four conferences, viz, a District Congress Conference, a Youth Conference, a Student's Conference and a Ladie's Conference were held in the organisation of which these six ex-detenus took a leading part. Surjya Sen and Ganesh Ghosh were Secretaries of the District Congress and Youth Conference respectively while Lokenath Bal was President of the Reception Committee of the Student's Conference. Immediately before the conferences posters, bearing slogans such as 'Paradhinater Bedana' were exhibited at prominent places throughout the town. Starting with the invitation 'Come, come young men' and a quotation from Tagore 'Shall the altar of the Goddess of Bondage remain erect for ever' goes on to state in extravagantly rhetorical language that to-day all over the world the youth have awakened like a dormant volcano to sweep away all existing evils and usher in a golden age, that the power of youth has changed the fate of China, has awakened new aspirations in the hearts of the Turks and has infused new life into the weak and decaying body of Russia and concludes with the moral, 'To-day your unhappy mother-land eagerly awaits the employment of energy slumbering in you. Join atonce the Chittagong Youth Association which is the meeting place of all servants of the country.'

"Inside the Conference pandal were displayed other placards bearing mottos of a similar character and one with the inscription, '*Age Desh—pare nyay ebang*

dharma' (the country first and three-after right and religion). On the 12th May the concluding portion of this motto was torn off. That day, the presidential speech was delivered by Mr. Subhas Bose, ***its tenor being that he had faith in Mahatma Gandhi but he could not see how the country could be freed by non-violence.*** The volunteers, wearing khaki khaddar shirts and shorts, were present in force at the Conference under the command of Ganesh Ghosh who was styled G. O. C. and wore a military uniform similar to that worn by Subhas Bose at the Calcutta Congress, 'Majors' Naresh Roy and Sudhir Chatterjee, 'Captain' Ananta Lal Singh and 'Lieutenant' Tripura Sen.

"On the afternoon of the 12th the volunteers appeared armed with heavy cane lathis.....A case was instituted in which on 23.10.29 Ananta Singh was convicted and sentenced to undergo four month's rigorous imprisonment while Lokenath Bal, Naresh Roy and Tripura Sen were fined....On the 2nd March, 1929, Rohimdad (P. W. 307).... noticed on the carrier of the cycle a book he thought resembled the 'Agnibina', stolen from his desk at the college two months previously. He challenged Ardhendu about it whereupon Ardhendu made off with the book leaving behind his cycle which Rohimdad deposited at Kotwali P. S. at the time of lodging his first information. That same evening Rohimdad and his two companions on their way home from Kotwali were set upon and beaten by Ganesh Ghosh, Lokenath Bal, Ananta Singh, Ardhendu Dastidar and two or three others....This incident and that of the conference indicate, according to the prosecution, the existence of a mentality prone to violence and that

even then these ex-detenus had gathered round them a number of followers and were prepared to deal violently and summarily with anybody offering any kind of opposition to them, either individually or collectively.

"Then on the 15th September, 1929, a procession took place in honnur of Jatin Das who had died shortly before in Lahore Central Jail. The procession was led by Ganesh Ghosh, Ambika Chakravarty, Lokenath Bal, Ananta Lal Singh, Surjya Sen, Nirmal Sen and others. The processionists carried banners bearing inscriptions such as '*Bir Jatindra nather Mahaprayan*' (Death of the hero Jatindra Nath) ; '*Du paye dale gelo maran shankare sabare deke gelo shikal jhankare*' (he trampled upon death and gave a call to all to rise), and raised shouts of 'Bande Matarm', 'Long live Revolution. Down with Imperialism', 'Up with Revolution', etc. The procession was followed by a meeting in the compound of the J.M. Sen Hall which was addressed by several speakers including Lokenath Bal, Ananta Lal Singh and Ganesh Ghosh who seized the opportunity to inflame the minds of their youthful listeners. Lokenath Bal said that the bloody memory of Jatindra Nath had raised a fire in their hearts for the destruction of the *British Government.* There could never be any co-operation with them. Ananta Singh said: 'Our blood boils at fever pitch—the oppressive Government had killed him', and Ganesh Ghosh's contribution was 'Let the blood of Jatin Das, flowing in our veins, create the strength of hundreds and thousands of Jatin Dases and strike terror in the heart of the tyrannical Government' (P. Ws. 149, 150 and 920). Two photographs of Jatin Das in uniform were found, as we shall see, at the

Congress office, one of them bearing underneath it the lines,

'A soldier's life is the life for me ;
A soldier's death ; so India's free.'

"A few days later on the 21st September a meeting was held in the J. M. Sen Hall for the election of office-bearers of the District Congress Committee. On the day of the meeting Surjya Sen and his supporters arrived first and packed the hall. After the meeting fresh trouble ensued on the road and hearing of it Abdul Azim, S. I., proceeded to the Congress office, where he found Ganesh Ghosh, Ambika Chakravarty, Ananta Lal Singh, Tripura Sen, Naresh Roy, Bidhu Bhattacharji and outside on the road and in the neighbouring field some 300 Hindu youths, all armed with lathis. They found Sukhendu Bikash Dutta lying seriously wounded. Sukhendu was stabbed by some one. Azim sent Sukhendu to hospital. They called their supporters who formed up in the road in two rows and under Azim's direction deposited their lathis in the Congress office and proceeded to their homes. A considerable number of these youths had come in from villages outside the town. Sukhendu subsequently died of his injuries.

"These September incidents, according to the prosecution, afford us glimpses of the mentality of Ganesh Ghosh, Ananta Lal Singh, Surjya Sen ete., of their increasing tendency to violence for the crushing of any opposition offered to them and their increasing following among the youth of the town.

"From the beginning of 1930 the activities and movements of the six ex-detenus and their associates began to

increase in a manner which intensified the suspicions of the police. They were seen to be constantly meeting together at all hours of the day at Ganesh Ghosh's shop, the Congress office, and the Sadarghat Club and also moving about the town either on foot or in Ananta Lal Singh's Baby Austin Car No. 24666. Elaborate arrangements were made by the D. I. B. Staff for watching their movements. Members of the Party were seen from time to time wearing different styles of dress, sometimes khaki uniform, sometimes European dress and sometimes Indian dress. It was noticed also that youths were being deputed to watch the houses of the D. I. B. officers and note their movements by way of counter espionage. The D. I. B. Inspector Sarada Bhattacharji spoke to several parents and guardians about the undesirability of allowing their boys to abandon their studies and spend their days associating with these six ex-detenus. On the 27th February, Ganesh Ghosh and Ananta Singh, accompanied by Jiban Ghoshal and Bidhu Bhattacharji, came to Sarada Babu and remonstrated with him for warning guardians against them (P. Ws. 70, 220 and 149).

"....Next we come to the 14th March (Doljatra day). Until then Ramkrishna Biswas had been living in Chittagone at his house of the brother-in-law....Some minutes later she (Ramkrishna's sister) heard a noise in her uncle's room and hastening there found Ramkrishna with his face and hands and chest all burnt and the room filled with smoke. Half an hour later four or five youths came to the house and carried Ramkrishna off in a motor car. The next evening about 6 p.m. Ganesh Ghosh arrived in a Baby Austin car at the house

of Dr. Jogada Biswas (P. W. 170) and asked him to attend a case of burning injuries. The circumstances in which Ramkrishna's injuries were caused, his hasty removal from his brother-in-law's house and concealment in one house after another in different parts of the town, the arrangements made for his medical treatment and nursing by Ganesh Ghosh and his associates, his subsequent complete disappearance, all indicate according to the prosecution, that Ramkrishna had been injured while engaged in a criminal activity on behalf of the party, viz., the preparation of a bomb.

"On the 5th April Azim called Ganesh Ghosh, Ananta and Bidhu Bhatracharji, to Kotwali P. S. and questioned them about Ramkrishna's whereabouts. They came accompanied by Naresh Roy and Lokenath Bal. From Kotwali Ganesh, Ananta, Lokenath and Naresh Roy went on to the D. I. B. Inspector and questioned him regarding the policy of the Government towards them (P. Ws. 70 and 314).

"Then on the 8th April........a complaint to the Deputy Superintendent of Police (P. W. 52), which was treated as a first information (Ex. 46). and a case under Section 380 I. P. C., was instituted against Fakir. Abdul Azim searched for Fakir at Ganesh Ghosh's house, Sadarghat Club and many other places in the town but could get no trace of him. On the 17th April printed leaflets with the heading *Chattal Bashider Prati* (to the people of Chittagong) and the name of Surjya Sen, Ambika Chakravarty and Ganesh Ghosh as signatories were distributed in the town. The following morning Abdul Azim obtained one from Ganesh Ghosh (Exh. CDLV 4).

The leaflet states that the trumpet-call of independence has been heard throughout the land, and on every side the war of civil disobedence has commenced, that it is a matter of regret and shame that Chittagong the pioneer of the independence movement in 1921 should lag behind in the struggle; and that about a month previously a Satyagraha Committee had been formed for the purpose of disobeying the Salt Law.

"We shall wait some days more, the leaflet goes on, 'to see what that committee does. But in Calcutta and other places disobedience of laws other than the Salt Law—for example, the law of sedition—has begun. We want to commence disobedience of the sedition law in Chittagong also without delay.

"For this purpose we require the sympathy of the public of all classes—we want Satyagrahi soldiers. We hope the public will help us with men and money. Those willing to be volunteers should see any of the undersigned by the 21st April next."

সরকারী উকিল অনেক বাক্‌চাতুর্য প্রকাশে অবশেষে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন—

"........The six ex-detenus having extraordinary organising ability successfully evaded the elaborate watch system of the police, and ultimately with the full advantage of the diversionary leaflet purporting the disobediedce of the Sedition Law on the 21st April, they actually a few days before, on the 18th April, broke the criminal law of the country as they rose in arms to raid against the police and A. F. I. Head quarters, as well as destroyed the communication system to isolate the town."

মামলার স্থচনায় পাবলিক্ প্রসিকিউটার আমাদের সংগঠন, কর্মধারা ও

বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে যেরকম ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করেছেন তারই সারাংশ ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট তাঁর জাজ্‌মেণ্টে উল্লেখ করেছেন। পাবলিক্ প্রসিকিউটার খাঁ সাহেব আব্দুল সত্তর আমাদের দলের ইতিহাস বলতে গিয়ে ১৯২১-২২ সাল থেকে সুরু করেছিলেন। পরইকোড়া ডাকাতি, রেলের টাকা লুঠ, নাগারখানা পাহাড়ের যুদ্ধ, সুলুকবাহার ষড়যন্ত্র, আমাকে গ্রেফতারের অপরাধে আই-বি-সাব্‌ইন্‌স্পেক্টার প্রফুল্ল রায়ের হত্যা, আমাদের বিরুদ্ধে ১৯২৪ সালের মামলা, তারপর Bengal Ordinance-এর প্রয়োগ প্রভৃতির সুদীর্ঘ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। রচনাটির কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমি পুনরায় তার উল্লেখ করলাম না। যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্ব ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে যে গতিপথে চলেছে এবং ইংরেজ সরকার যেভাবে বা যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তা লক্ষ্য করেছে তার কোনো ব্যতিক্রম না করে তাদেরই দলিল থেকে তা উদ্ধৃত করলাম।

সরকারের বক্তব্য—(১) আমরা ছ'জন—মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা, লোকনাথ এবং আমি ও আমার বন্ধু গণেশ ঘোষ জেল থেকে বেরিয়ে জেলা-কংগ্রেস ছাত্র-সঙ্ঘ, যুব-সমিতি, শরীরচর্চার ক্লাব ও ভলাণ্টিয়ার দল গড়ে তুলি; (২) আমরা সন্দেহাতীতভাবে ছাত্র-যুবকদের নিয়ে সঙ্ঘ, সমিতি, প্রভৃতি গড়ে তুলে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলাম যার মাধ্যমে বিপ্লবী যুবকদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হই। (৩) ১৯২৯ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে জেলা-কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স এবং সেই সঙ্গে ছাত্র, যুবক ও মহিলা কন্‌ফারেন্সও অনুষ্ঠিত হয়। সেই সব কন্‌ফারেন্সের সুযোগ নিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রচারপত্র মারফত ছাত্র ও যুবকদের বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করেছি। (৪) 'আগে দেশ পরে ন্যায় ও ধর্ম' —এইরূপ শ্লোগান লিখিত পোস্টারে আমরা কন্‌ফারেন্স প্যাণ্ডেল সাজিয়েছি। কন্‌ফারেন্সে প্রেসিডেণ্ট সুভাষ বোস গান্ধীজীর অহিংস নীতির সমালোচনা করেছেন এবং G. O. C. গণেশ ঘোষের কম্যাণ্ডে সেই সব কন্‌ফারেন্সের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। (৫) এই সব কন্‌ফারেন্সে খুব গোলযোগ হয় এবং আমরা বিপক্ষ দলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হই। আমাদের মধ্যে কারও কারও বিচারে সাজা হয়েছে। (৬) রহিমদাদ আমাদের বিরুদ্ধে একটি Proscribed পুস্তক নিয়ে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছিল বলে তাকে লাঠিপেটা করি এবং এইভাবে চট্টগ্রামবাসীর মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করি যে, আমরা কোন বিপক্ষ দলকেই সহ্য করবো না। (৭) লাহোর জেলে দীর্ঘ অনশনের পর যতীন দাসের মৃত্যু ঘটে। সেই উপলক্ষে আমরা চট্টগ্রামে আলোড়ন সৃষ্টি করি এবং এই প্রথম চট্টগ্রামের

রাজপথ প্রকম্পিত করে শ্লোগান তুলি—"Long live Revolution, Down with Imperialism, Up with Revolution, etc. etc." (৮) কিছুদিন পর যাত্রামোহন-হলে জেলা-কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচন সমাধা হয়। এই নির্বাচন-দ্বন্দ্বে বিপক্ষ দলের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়; আমাদের সাথী সুখেন্দু দত্ত বিপক্ষ দলের কারও ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারায়। এই অভিযোগে জাজকোর্টে জুরীদের সামনে অনেকের বিরুদ্ধে বিচার সুরু হয়। তবু আমরা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে যাই নি; কারণ, ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতির ব্যাপারে আমরা লিপ্ত ছিলাম। (৯) সুখেন্দুর শ্রাদ্ধবাসরে কেবল আমরা ক'জন মিলিত হই—অন্যান্য কেউই সেখানে উপস্থিত ছিল না। (১০) ১৯২৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর (খুব সাধারণ ঘটনা হলেও সরকারপক্ষ এর উল্লেখ করেছে) নরেশ ব্যানার্জীকে গণেশ ঘোষের দোকান থেকে এসে আমরা হঠাৎ আক্রমণ করি (পুলিসের গুপ্তচর সন্দেহে তাকে প্রহার করা হয়েছিল)। (১১) ১৯৩০ সালের প্রথম থেকেই আমাদের কার্যক্রম ও তৎপরতা বেড়ে যায়। আমরা পুরোদস্তুরভাবে ঘোড়ায় চড়া, মোটর চালানো প্রভৃতি সুরু করি। পুলিসের ওপরেও আমাদের কড়া নজর ছিল। কোনো কোনো পুলিস অফিসারের বাড়ি গিয়ে তাঁদের শাসিয়ে আসি যেন তাঁরা আমাদের পেছনে না লাগেন। (১২) 'অসির চাইতে মসীর শক্তি অনেক বেশি'—এই বিষয়ে স্কুলে বিতর্ক সভা ডাকা নিয়ে আমাদের সাথীদের সঙ্গে বিপক্ষ দলের কলহ ও মারামারি হয়। আমাদের দল লেখনী অপেক্ষা তরবারির প্রাধান্য অনেক বেশি—এটা প্রমাণে সচেষ্ট ছিল। দুই পক্ষ থেকেই মামলা রুজু করা হ'ল। গণেশ ঘোষের প্রভাব পুলিস বুঝতে পারলো, যখন তার এক কথায় যুবক সাথীরা থানা অফিসারের কাছে উপস্থিত হ'ল।

এই সব তথ্য ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে সরকারপক্ষ বলতে চাইল আমরা হিংসাত্মক কার্যকলাপে ব্যস্ত ছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত যুব-বিদ্রোহ সম্ভব করে তুলেছি।

"Gain Time by Space"—চীনের বিপ্লবী সমরনায়কেরা মাও সে তুং-এর সুদূর প্রসারী বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রবল শত্রুকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পশ্চাদপসরণে সময় সঞ্চয় করার রণনীতি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট চিয়াংকাইশেকের বিরাট সমর শক্তির পরাজয় ঘটিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী জাপান ব্রহ্মদেশ অধিকার করার পর জেনারেল ওয়াভেলও এই একই রণনীতি অনুসরণ করে বলেছিলেন—'শত্রু যখন শক্তিশালী তখন তাকে

বড় এক টুক্রো মাংস দিতে হয় এবং সে তা' নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সেই সুযোগে নিজেদের সংহত করে প্রতি-আক্রমণ চালাতে হয়।'

প্রবল শত্রুর কারাগারে আমরা বন্দী। চট্টগ্রাম শহর ও গ্রাম কড়া মিলিটারী শাসনে পিষ্ট। এই সময়েও আমরা মনে-প্রাণে অনুভব করেছি আমাদের সীমিত শক্তি নিয়ে শত্রুকে আবার আঘাত করতে হবে—জেল ভাঙতে হবে—ভয়াবহ বিস্ফোরণের সাহায্যে শহরে শত্রু-ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করতে হবে—এই জন্যে চাই প্রস্তুতি। কিন্তু কোনো প্রস্তুতিই সম্ভব নয় যদি প্রয়োজন অনুযায়ী সময় পাওয়া না যায়।

কাজেই, "Gain Time by Space" (স্থান ছেড়ে দিয়ে সময় নেওয়া)—এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই রণনীতি, Gain time by delaying the proceedings of the Court (আদালতের কর্মসূচীর বিলম্ব ঘটিয়ে সময় লাভ করতে হবে), প্রয়োগে আমরা তৎপর হলাম।

সময় যদি পাওয়া যায় তবে জেলের অভ্যন্তরে ও বাইরে যুগপৎ আক্রমণ চালাবার প্রোগ্রাম গ্রহণ করতেই হবে। তাই আমাদের প্রথম পর্যায়ের কাজ হ'ল, যে কোনো উপায়ে হোক্ না কেন, সরকারের Denovo Trial-এর পূর্ণ সুযোগ নেওয়া—সহজ ও শান্ত পরিবেশে মামলা চালাতে দেব না—প্রতি পদে বাধা দেব, প্রতি স্তরে জটিলতার সৃষ্টি করবো এবং প্রতিটি সরকারী সাক্ষীকে যতদিন পারি জেরা করে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আবদ্ধ রাখবো, আদালতের কর্মসূচী বানচাল করবো।

লোকনাথ, গণেশ ও আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো ব্যারিস্টার নিযুক্ত করলাম না। নিজেরাই আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ নিলাম। বলা বাহুল্য, মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে আমরা মুক্তি পাবো বা আমাদের প্রাণদণ্ড রহিত হবে—আমাদের মনে বিন্দুমাত্রও এইরূপ ভুল ধারণা ছিল না। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রত্যেকটি সাক্ষীকে কি করে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস ধরে জেরা করা যায় এবং এইভাবে মামলা সুদীর্ঘ বছর পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায়।

ট্রাইব্যুনাল বিচার পদ্ধতি অনুসারে সরকারপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দির পরেই তাদের জেরা করবার রীতি। সাক্ষী কি বলবে তা আগে জানবার কোনো উপায় নেই। সাধারণ বিচারে বা জুরীর বিচারে সাক্ষীর বক্তব্য বিষয় আগে থেকে জানা সম্ভব। কারণ, ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেই সাক্ষীর জবানবন্দি সম্পন্ন হয়ে থাকে। যা হোক্, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ—ইংরেজ

সরকারের ট্রাইবুনাল পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমি কোনো অভিযোগ করছি না। সাম্রাজ্যবাদী নীতি বজায় রাখতে তারা তাদের স্বার্থে সব কিছুই করবে। মোট কথা আমাদের Extempore জেরা করতে হবে—অসুবিধে প্রচুর—তবু দমে গেলে চলবে না!

সাক্ষীর জবানবন্দি শেষ হওয়ার পর আমাদের পক্ষের ব্যারিস্টার মহোদয়গণ জেরা সুরু করতেন। সুবিখ্যাত আইনবিদ্‌রা সাক্ষীকে জেরা করেন মামলা জয়ের উদ্দেশ্যে। কাজেই তাঁদের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ও সুচিন্তিত জেরা যে গতি নিয়ে চলতো তাতে অবান্তর প্রশ্নের স্থান থাকতো না। কোনো উকিল ব্যারিস্টারই প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রশ্ন করে বিচারকের বিরক্তির উদ্রেক করেন না। কাজেই আমাদের উকিল ব্যারিস্টারেরা অল্প সময়ের মধ্যেই জেরা শেষ করে ফেলতেন। তারপর আসতো আমাদের পালা। সাক্ষীদের জেরা করবার ভঙ্গী ও উদ্দেশ্য আমাদের একেবারে ভিন্ন—মামলা জেতার আশায় নয়, মামলার পরিসমাপ্তি যতদূর সম্ভব বিলম্বে ঘটানো এবং সেই সুযোগে ব্যাপক ও তীব্র আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হওয়া।

এই সময়ে আমাদের বয়স, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাই বা কতখানি? মামলা সম্বন্ধে আমরা বুঝিই বা কতটুকু? কোর্ট-কাছারী এবং আইন-কানুন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের তো কোনো কথাই ওঠে না। অবশ্য Criminal Case-এ সাক্ষীদের জেরা করার মধ্যে আইন জানবার ততটা প্রয়োজন হয় না যতটা প্রয়োজন হয় প্রশ্ন করে fact (বাস্তব ঘটনা) উদ্‌ঘাটন করার।

চোখের সামনে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাংলার বিখ্যাত আইনজ্ঞদের দেখেছি। দেখেছি কিভাবে তাঁরা প্রশ্ন করেন, কিভাবে বিচারকের কাছে কোনো বিষয় উত্থাপন বা নিবেদন করেন এবং কখন কিভাবে পাবলিক্ প্রসিকিউটারের সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও আমার বিরুদ্ধে মামলা চলার সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে দেখেছি কি দক্ষতা, কতখানি বিচক্ষণতা ও কৌশলের সঙ্গে মামলা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারপক্ষকে কি নিদারুণভাবেই বিপর্যস্ত করতেন! জুরী ও জজসাহেবের সামনে অপূর্ব ভঙ্গীতে দাঁড়াতেন যতীন্দ্রমোহন। কি অপরিসীম ব্যক্তিত্ব—সরকারী উকিল, জুরী, জজসাহেব সকলেই যেন তাঁর কাছে শিশু! তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে সাক্ষীরা যেন সম্মোহিত হয়ে পড়তো! কখনও শান্ত স্বরে, কখনও তীব্রকণ্ঠে আবার কখনও বা মুচকি হেসে সুমিষ্ট ভাষায়, প্রশ্নবাণে সাক্ষীদের তিনি বিধ্বস্ত করতেন। মনে

হ'ত রঙ্গমঞ্চে কোনো অভিনেতা বুঝিবা অভিনয় করছেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ! চেয়ারে একটা পা তুলে দাঁড়াবার ভঙ্গী, কখনও বা টেবিলে বসবার এবং রিমলেস্ চশমাটি খুলে জজের সঙ্গে কথা বলবার ভঙ্গী—সবই যেন খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হ'ত এ সমস্তটাই তাঁর ইচ্ছাকৃত "অভিনয়"। একটাই উদ্দেশ্য—তিনি চাইতেন সরকারপক্ষকে ঘাবড়ে দিয়ে বিচারকের মনে অভিযুক্তদের প্রতি অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে। পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ শ্যালোকে তিনি হাসতে হাসতেই জেরা করলেন। ডি, এস, পি, মিঃ ব্রাউনকে বাইবেলের নামে দোহাই দিয়ে উপহাস করে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আই, বি, অফিসার মনোরঞ্জনবাবু ও ডি, এস, পি, ব্রজবিহারী বর্মণের কাছ থেকে তাঁদের দু'টি সাইকেলই বিপ্লবীদের গুলীর আওয়াজে একই সঙ্গে বিকল হয়ে পড়লো—এইরূপ উত্তর আদায় করে আদালত কক্ষে যথেষ্ট হাসির খোরাক জোগালেন। রাইফেলধারী যে দু'জন কন্‌স্টেবল গুলীবিদ্ধ করে মাস্টারদা ও অম্বিকাদাকে ধরেছিল, তারা দু'জনও সাক্ষী দিল। যতীন্দ্রমোহন তাদেরও জেরা করেছিলেন—সে যেন এক মেসিনগান ফায়ার করা! নিঃশ্বাস ফেলবার সময় না দিয়ে একটার পর একটা প্রশ্নে সাক্ষীদের তিনি নিমেষে একেবারে ধরাশায়ী করলেন। Argument-এর সময় আমাদের পক্ষে জবাব দিতে উঠে —বিচারক, জুরী, সরকারী উকিল ও সমস্ত আদালত কক্ষকে স্তম্ভিত করে, যতীন্দ্রমোহন তাঁর আইনের তূণ থেকে একটি অব্যর্থ তীক্ষ্ণ বাণ সযত্নে নিক্ষেপ করলেন—"Youı honour ? Section 19F can't go."

খুব ধীরে ধীরে আইনের এই ধারাটি তিনি পড়ে শোনালেন। গভর্নমেণ্টের আর্মারি থেকে যদি কোনো অস্ত্র অপহৃত হয়, তবে তা' এক মাসের মধ্যে সরকারী record থেকে আদালতকে জানাতে হয়। আমাদের "সুলুকবাহার" বাড়িতে গভর্নমেণ্টের তীর মার্কা রাইফেল পাওয়া গেছে বলে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। আমাদের তিনজনের বিরুদ্ধে এই ধারাটি প্রথমেই বাতিল হয়ে গেল। পাবলিক্ প্রসিকিউটার বিব্রত বোধ করলেন—লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইলেন।

যতীন্দ্রমোহনকে নকল করতে আমার খুব ভাল লাগতো। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে যতীন্দ্রমোহনকে নকল করে আমি অভিনয় করেছি। তারপর ছ' বছর পরে ট্রাইব্যুনাল ট্রায়ালের সময় আমরা দেখেছি সদ্য বিলেত ফেরত মিঃ এন, আর, দাশগুপ্তকে। মাত্র তিন-চার বছরের প্র্যাক্‌টিস তাঁর। অপূর্ব বলেন—মুখে যেন খৈ ফুটছে। আর সঙ্গে সঙ্গে retort দিতে কখনও

ছাড়েন না। তিনি এস, পি, মিঃ জনসনকে জেরা করছিলেন—পুলিসসাহেব তাঁর record প্রভৃতি না দেখলে উত্তর দিতে পারবেন না জানালেন। জজসাহেব মিঃ ইউনী নিজে ইংরেজ; কাজেই তিনি বেচারা জনসন সাহেবের পক্ষ নিয়ে খুব উষ্মার সঙ্গে মিঃ এন, আর, দাশগুপ্তকে বললেন—"Well, how can Mr. Jhonson anticipate your questions in advance and can come prepared with his different files ?"—(কি করে মিঃ জনসন আগে থেকে আপনার প্রশ্নের বিষয়বস্তু ভেবে নিয়ে তাঁর বিভিন্ন ফাইলপত্র নিয়ে উপস্থিত থাকবেন)।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ এন, আর, দাশগুপ্ত উত্তর দিলেন—"That's strange, how can I anticipate in advance what the witness will depose in the examination-in-chief ?—(এ তো অদ্ভুত! আমিই বা কি করে আগে ভাগে জানবো সাক্ষী কি সাক্ষ্য দেবে এবং আমাকে কি প্রশ্ন করতে হবে)!

ব্যারিস্টার মিঃ জে, কে, ঘোষাল (মাখন ঘোষালের জ্যেঠামশাই)—দীর্ঘ সুঠাম গৌরবর্ণ দেহ, দেখে মনে হয় যেন পুরোদস্তুর আমেরিকান সাহেব। তাঁকে বলতে শুনেছি—"The latter part is not the answer to my question—it must be expunged."—(শেষ ক'টি কথা আমার প্রশ্নের উত্তর নয়—তাই তা' বাদ দিতে হবে)।

প্রখ্যাত উকিল ও বাংলার সংগ্রামী কংগ্রেস নেতা ৺অখিল দত্ত যখন জেরা করতে উঠতেন, তখন তাঁর তেজোদৃপ্ত চেহারা দেখে সাক্ষীরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রীতিমত কাঁপতো। তাঁর কঠোর প্রশ্ন, সাক্ষীর কাছ থেকে তিনি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ততম উত্তর দাবি করছেন—"Well, answer me yes or no—did you see it or not—অদ্ভুত, "হ্যাঁ" ও "না" জবাবের বাইরে সাক্ষীকে তিনি যেতে দিলেন না।

ব্যারিস্টার ৺শ্রীশ বোস শরৎবাবুর সঙ্গে এসেছিলেন এবং তাঁর কলকাতা High-Court-এর Practice বন্ধ রেখে আমাদের মামলা শেষ হওয়া পর্যন্ত, প্রায় দু'টি বছর, আমাদের ওখানেই ছিলেন। তিনিও চমৎকার বলতেন—যেমন সুন্দর ইংরেজী তেমনি অপূর্ব বাচনভঙ্গী! যতীন্দ্রমোহনের মত তাঁর চোখেও রিমলেস্ চশমা। বলবার ভঙ্গী, দাঁড়াবার কায়দা, যথাসময়ে যথাস্থানে সংযত ও কঠোর ভাষার প্রয়োগ, তাঁরও বৈশিষ্ট্য। একদিন ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেন্ট মিঃ ইউনী তীক্ষ্ণ স্বরে ও কঠোর ভাষায় মিঃ শ্রীশ বোসকে শাসিয়ে

বললেন—"Why you are trying to influence the witness—I have noticed you are repeatedly hinting him to answer your question...."—(কেন সাক্ষীকে প্রভাবান্বিত করতে চাইছেন—আমি লক্ষ্য করেছি আপনি বারবার সাক্ষীকে ইঙ্গিত করছেন)।

বিচারপতির ঐরূপ দোষারোপে শ্রীশবাবুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। এত বড় বদনাম মুখ বুজে সহ্য করা শ্রীশবাবুর পক্ষে অসম্ভব। তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানালেন—"....Being the member of an English Bar I am not prepared to put up with such an insinuation. Unless your honour withdraws the remark I am the last person to participate to defend my client."—(আমি ইংলিশ বারের একজন সদস্য হয়ে আপনার এই ধরনের বদনাম সহ্য করতে প্রস্তুত নই। যতক্ষণ আপনি আপনার মন্তব্য প্রত্যাহার না করছেন, ততক্ষণ আমি আমার মক্কেলকে ডিফেণ্ড করা থেকে বিরত থাকবো)। এই বলে শ্রীশবাবু Dramatic pose-এ বসে পড়লেন। ইউনী সাহেব অগত্যা তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মামলার শেষে argument করার জন্য ৺বি, এন, শাসমল ও ৺সন্তোষকুমার মিত্র এসেছিলেন। তাঁদের কথা এখন আর উত্থাপিত করলাম না। মোট কথা আমরা তিনজন—লোকনাথ, গণেশ ও আমি, ওকালতিতে এপ্রেণ্টিস নিযুক্ত হলাম। আইন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা প্রখ্যাত আইনজ্ঞদের কায়দা-কানুন অনুকরণেই বেশি সচেষ্ট ছিলাম। এই বিদ্যায় কিছুটা রপ্ত হবার পর আমাদের আর পায় কে?

সাক্ষীর জবানবন্দী ও আমাদের পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টারদের জেরা শেষ হবার পর আমাদের জেরা করবার পালা এলে আমাদের একমাত্র চেষ্টা হ'ত সেই দিনটিতে সেই সাক্ষীর জেরা যে কোনোমতে অসমাপ্ত রাখা। সেই দিনটি extempore জেরা করে যদি একবার সাক্ষী ধরে রাখা যেত তবে কাজ হয়ে গেল—সহজে সে আর ছাড়া পেতো না। পরের দিন আমরা সারাদিনের জন্য প্রশ্ন তৈরি করে নিয়ে আসতাম। প্রেসিডেণ্ট মিঃ ইউনী সাহেব আমাদের কৌশল বুঝে ফেললেন। তাই তিনি সরকারপক্ষের নতুন নতুন সাক্ষীদের জবানবন্দি নেওয়ার চেষ্টা করতেন এবং আমরা তিনজন বাদে আদালতের কাজ শেষ হওয়ার দু'একা ঘণ্টা আগেই যেন অন্যান্যেরা তাঁদের জেরা শেষ করেন, সেই ব্যবস্থা করতেন। প্রেসিডেণ্টের ধারণা হয়েছিল এই ক্ষেত্রে আমরা

হয়ত extempore জেরা চালিয়ে যেতে পারবো না—তাহলেই সেই সাক্ষী পার পেয়ে গেল। কিন্তু দু'একটা ক্ষেত্র ছাড়া আমরা অন্যান্য সাক্ষীদের গুরুত্ব আছে কি নেই, সে ছোট কি বড় অথবা সে কতটুকু কি জানে—এ সব নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাতাম না; আমাদের কাছে সে সাক্ষী হলেই হ'ল। সাক্ষী যদি ইংরেজ কর্মচারী বা পুলিস হ'ত, তবে তো কথাই ছিল না! মনের ঝাল মিটিয়ে তাদের প্রশ্ন করে করে নাজেহাল করতাম। Handwriting expert মিঃ বেনেট, Explosive expert ডাঃ শেলডন, Arms expert মিঃ ডেভিস, পুলিসসাহেব মিঃ জনসন, মিঃ স্টার, মিঃ লুইস্, ডি, আই, জি, মিঃ ফারমার প্রভৃতিকে যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় পেয়েছি, তখন দিনের পর দিন আমরা তাদের cross-examine করেছি। আমাদের যে time gain করতেই হবে।

আমাদের এই delaying tactics-কে বাধা দিতে বিচারপতি প্রায় রোজই নানাভাবে চেষ্টা করতেন। মিঃ জে, ইউনী প্রশ্ন করতেন—"Why do you ask the question? What's the relevancy?"—(কেন প্রশ্ন করছ—প্রশ্নের যৌক্তিকতা কি)। আমরা ইতিমধ্যে ব্যারিস্টারদের কাছ থেকে কৌশল শিখে নিয়েছি। তাই বেশ একটু pose নিয়ে জজ-সাহেবকে বলতাম—"This particular question has a significance. Oh yes, I will explain the relevancy but the witness must go out of the Court-room first."—(হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বলবো; কিন্তু তার আগে সাক্ষীকে আদালতকক্ষ পরিত্যাগ করতে হবে)।

কোনো কোনো দিন আবার ট্রাইব্যুনাল জজ প্রথম থেকেই খুব কড়া মনোভাব নিতেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছি, আর প্রতিবারই তিনি বলছেন—"The question is disallowed." "Next question." "Disallowed"...ইত্যাদি।

তবু আমরা প্রশ্ন করে করে কেবল time gain করেছি। তবে সাক্ষীদের এইভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে না দিলে সেই দিনের জন্য যেসব প্রশ্ন তৈরি সেগুলি তো সব ফুরিয়ে যাবে! তাই এইরূপ বাধাদানের counter-tactics-ও আমরা ইতিমধ্যে আমাদের ব্যারিস্টারদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সাহেবকে সম্বোধন করে বলতো—"It is a life and death question to me. I am trying hard to extract the truth

from the witness. It will be a great injustice to me if the question be disallowed."

কয়েকটি প্রশ্ন বাতিল করার পর জজসাহেবের সঙ্গে এইভাবে বাক্‌-বিতণ্ডা করতাম। তারপর জজসাহেবের ঐরূপ মনোভাবের প্রতিবাদ জানিয়ে কেউ বলতাম—"This is impossible to get a fair chance of defence. I must file an affidavit."

এইভাবে আমাদের শেখা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে আরো কিছু সময় নষ্ট করতাম।

আমাদের এই time gain করার tactics-টি কর্তৃপক্ষ ঠিক আন্দাজ করতে পেরেছিলেন এবং বিচারপতি মিঃ ইউনী আইন বাঁচিয়ে ও আদালতের সম্মান রক্ষা করে যতটুকু সম্ভব আমাদের cross-examination process-টিকে খর্ব করতে চাইতেন। তিনি যেমন নতুন নতুন পদ্ধতিতে আমাদের বাধা দিতেন আমরাও ঠিক তেমনি প্রতিদিন বিলম্ব ঘটাবার নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টায় থাকতাম।

ইতিমধ্যে একদিন আমরা বিশেষ তৈরি হয়ে কোর্টে যেতে পারি নি। অথচ সেদিনের সাক্ষীকে ধরে রাখা প্রয়োজন। কাজেই প্ল্যান হ'ল কোনরকমে আদালতের কর্মসূচী সেদিনের জন্য বন্ধ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে গণেশ রণধীরকে একটু অভিনয় করতে শিখিয়ে দিল। স্থির হ'ল রণধীর আসামীর কাঠগড়ায় হঠাৎ "অজ্ঞান" হয়ে পড়বে আর আমরা সকলে তাকে ঘিরে ব্যস্ততার ভান করবো। ব্যাস্, প্ল্যান পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেল। রণধীর "অজ্ঞান" হয়ে পড়লো—আমরা প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। হঠাৎ এই ঘটনায় অভিভাবকেরা চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। প্রেসিডেন্টের আদেশে মিঃ স্থটার রণধীরকে ডকেয় বাইরে নিয়ে গেলেন। আমাদের মধ্যেও দু'একজন সাহায্যের জন্য বাইরে গেল। রণধীরের "জ্ঞান" সহজে ফিরে আসছে না। বহুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে সে "জ্ঞান" ফিরে পেল। প্রেসিডেন্ট সেইদিনের মত আদালতের কাজ বন্ধ করলেন—আমাদের আবার জেলে ফিরিয়ে নেওয়া হ'ল।

তারপর আর একদিন লোকনাথ বল আসরে নামলো। আজও আদালতের কাজ বন্ধ করা চাই। প্ল্যান মত ঠিক সময়ে লোকনাথ "অজ্ঞান"। আবার হৈ-চৈ পড়ে গেল। আমরা সকলেই লোকনাথকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আগের দিনের মত আবার সেদিনও আদালতের কাজ বন্ধ হ'ল—আমরা জেলে ফিরে গেলাম।

সুবোধ বিশ্বাস (গোপাল) খুবই expert অভিনেতা। এটা মঞ্চের অভিনয় নয়—বাস্তব অভিনয় ও নিখুঁতভাবে ভান করা। এই অভিনয়ে পুলিসের শ্যেনদৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে হবে। রণধীর ও লোকনাথ এইরূপ পর পর অজ্ঞান হয়ে পড়ায় পুলিস ও মিঃ ইউনীর মনে বেশ সন্দেহ হয়েছে যে, আমরা এইরূপ ভান করেই বোধ হয় court-proceedings-এর বিলম্ব ঘটাচ্ছি। তাই তৃতীয়বারের জন্য আমাদের বেছে নিতে হ'ল গোপালকে। গোপালের বালকসুলভ সৌন্দর্যের একটা আকর্ষণ ছিল। নিরীহ শান্ত অপরূপ রূপলাবণ্যের অধিকারী এই বালক কি মিথ্যে মিথ্যে জ্ঞান হারাতে পারে? কোনমতেই যাতে মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের উদ্রেক না হয়, সেই জন্য গোপালকে বেছে নেওয়া হ'ল। সার্থক অভিনয় করলো গোপাল। পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং তার চোখে-মুখে জল দিতে লাগলেন। তারপর গোপাল ধীরে ধীরে "জ্ঞান" ফিরে পেল। সেদিনের মত আবার কোর্টের খেলা সাঙ্গ করে আমরা কারাগারে ফিরে এলাম।

সব সময় এই রকম হাল্কাভাবে চেষ্টা করে আমরা পুরো দু'টি বছর মামলা টেনে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম বলে যদি কারও ধারণা হয় তবে খুবই ভুল হবে। অত সহজে মামলার proceedings সুদীর্ঘ করা সম্ভব হ'ত না যদি দীর্ঘদিন ধরে জেরা করে সাক্ষীদের ধরে রাখা না যেত।

আমাদের মামলার Judgement থেকে নিচে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"In the course of his examination under Section 342 Cr. P. C., the accused made no attempt to explain any of the circumstances appearing in the evidence against him but indulged instead in theatrical vituperation (which recalls the arrogant braggadocio of his letters) characterising the trial as mockery, the court as prejudiced and the Government as tyrannical and unjust."—৩৪২ ধারা অনুসারে বয়ান দিতে গিয়ে সে (অনন্ত সিং) তার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু বলতে চেষ্টা না করে নাটকীয় ভঙ্গীতে নিন্দা করে বলে—বিচার একটা প্রহসন, আদালত প্রভাবদুষ্ট এবং সরকার অত্যাচারী ও অবৈধ—এতে আমাদের স্বঃতই স্মরণ করিয়ে দেয় তার সেই উদ্ধত দম্ভপূর্ণ চিঠিগুলির কথা।

জাজ্‌মেণ্টের পরিসমাপ্তিতে শেষ পাতায় ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে, ইউনী লিখেছেন—

"The case has lasted much longer than it ought to have done, either on account of its importance or the number of the incidents dealt with. For this we think both sides are responsible, though not equally. The prosecution have introduced a number of incidents and witness that might have been dispensed with without any appreciable detriment to the case for the Crown. *And the three accused who on 27th April last gave up the Counsel who had previously represented them and undertook their own defence, have since then subjected each successive witness to minute and protracted cross-examination which would have been just as effective if it had been reduced by ninty percent.*"

মামলা যে এত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে সেই জন্য বিচারপতিরা উভয় পক্ষকেই যদিও দায়ী করেছেন, তবু আমাদের ওপর দায়িত্বের বোঝা বেশি চাপিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, সরকারপক্ষ অনেক অবান্তর সাক্ষী হাজির করেছে। আরও বলেছেন যে, তিনজন "অভিযুক্ত আসামী" (আমরা তিনজন) নিজেরাই আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করে বিলম্ব ঘটিয়েছে— আমরা যা জেরা করেছি তার নব্বই ভাগ কমও যদি করতাম, তবু পুরোপুরি জেরায় যা ফল হয়েছে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ফলপ্রসূ হ'ত না।

মন্ত্রের সাধনা কিংবা শরীর পাতন! পুলিস-কর্তৃপক্ষ, ট্রাইব্যুনালের জজ, সরকারী উকিল, আমাদের কাউন্সেল এবং আত্মীয়-স্বজন ও সমর্থকগণ কেউই বুঝতে পারলেন না কেন আমরা তিনজন নিজেরাই মামলা পরিচালনা করছি এবং কেনই বা সুদীর্ঘ জেরাতে সাক্ষীদের ব্যতিব্যস্ত করে কালক্ষয় করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি! মামলা দীর্ঘকাল স্থায়ী করার পেছনে যে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের কৌশল বা উদ্দেশ্য ছিল তার সামান্যতম ধারণাও কেউ করতে পারেননি! প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত খুব গুরুত্বের সঙ্গে মামলা লড়ে যাওয়ার অভিনয় করেছিলাম বলে আজ হয়ত বলা যায় যে, সফলতার সঙ্গেই শত্রুপক্ষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

মাস্টারদার সঙ্গে পরামর্শ করে গণেশ ও আমি যুব-বিদ্রোহের যেরূপ চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও স্থির করেছিলাম—আমাদের দীর্ঘায়ু মামলার সুযোগে আমরা আর একটি ঠিক সেইরূপ সক্রিয় ও বাস্তব বৈপ্লবিক প্ল্যান প্রস্তুত

করলাম। সেই প্ল্যানের চূড়ান্ত রূপ দানের জন্য আমরা মাস্টারদার অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। প্ল্যানের বিস্তারিত খসড়া তাঁর কাছে না পৌছনো পর্যন্ত তিনি যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না, তা বলাই বাহুল্য।

আগেই বলেছি—যুব-বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়েই এই দ্বিতীয় প্ল্যান কার্যকরী করার অভিপ্রায়ে আমাদের মধ্যে বয়সে যে সব চেয়ে ছোট, তাকেই বেছে নিয়েছিলাম। এই দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্ধেন্দু গুহ অতি সফলতার সঙ্গে পালন করেছে। প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরে—প্রতি পদক্ষেপে অর্ধেন্দু যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়তা ও অবিচলিত বৈপ্লবিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা বিরল। ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে আমরা অর্ধেন্দুর অপরিহার্য ভূমিকার বৃত্তান্ত জানতে পারবো।

অর্ধেন্দু আর পাঁচজন সাথীর সঙ্গে জামিনে মুক্ত ছিল। মামলার শুনানীর সময় প্রতিদিন তারা আদালতকক্ষে কাঠগড়ায় আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকতো। দিনের কাজ শেষ হওয়ার পর ট্রাইব্যুনালের জজেরা যখন বিচারকক্ষ পরিত্যাগ করতেন, তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ত কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অন্তরালে—আর জামিনে মুক্ত এই ছয়জন নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যে'ত।

এই নাটক প্রতিদিন অভিনীত হ'ত। পুলিস-কর্তৃপক্ষ দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতি ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছে—বিড়ালের মত তপস্যা করেছে, যদি একবার তাদের ভাগ্যে মাছের শিকেটি ছেঁড়ে! পুলিস অতি সঙ্গোপনে জামিনে মুক্ত এই সব অভিযুক্তদের পেছু নিত এবং আশায় আশায় থাকতো যদি কোন ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা জানতে পারে বা গোপন চিঠিপত্র কিছু হস্তগত করতে পারে। বঁড়শির ছিপটি হাতে এক লক্ষ্যে টোপের দিকে তাকিয়ে আছে—যদি কোন মতে মাস্টারদা বা বিপ্লবীদের কোন গোপন আস্তানার সন্ধান পাওয়া যায়! বৃটিশ আমলের পুলিস তাদের অফুরন্ত শক্তি নিয়ে বুদ্ধি ও কৌশলের সঙ্গে বিপ্লবীদের পেছনে যখন গাছের ডালে ডালে ঘুরছে—আমরা তখন গাছের পাতায় পাতায়!

প্ল্যান যদি কার্যকরী করতে হয় তবে তার গোপনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে এবং শত্রুকে অসাবধান অবস্থায় হতবাক্ করে অতর্কিতে আক্রমণ করতে হবে। তাই আমরা প্রাথমিক কাজ হিসাবে স্থির করলাম—যে কোন উপায়ে হোক্ না কেন, যত শীঘ্র সম্ভব প্ল্যানের ড্রাফ্‌টটি মাস্টারদার

কাছে বিস্তারিত লিখে পাঠাবো। যদিও আমরা অর্ধেন্দুর মাধ্যমে মাস্টারদার সঙ্গে এ বিষয়ে সকল প্রকার আলোচনা করেছি, তবু পাছে মুখের কথায় কিছু ব্যতিক্রম ঘটে তার জন্য লিখিতভাবে প্ল্যানটি তাঁকে দেওয়া উচিত মনে করলাম।

লিখিতভাবে প্ল্যানটি পাঠানো খুবই বিপজ্জনক—পাছে তা শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়। সেইজন্য আমাদের এমন একটি উপায় বার করতে হ'ল যাতে প্ল্যানটি মাস্টারদার হাতেই পৌছয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কোন উপায়ে কেউ সে'টি হস্তগতও করে—বিষয়বস্তু কিছুই যেন বুঝতে না পারে।

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেলে উপায়ও উদ্ভাবন করা সম্ভব! স্থির হ'ল cypher-এ সাঙ্কেতিক অক্ষর বা শব্দের ব্যবহারে প্ল্যানটি লেখা হবে এবং সেই লেখাটি কিভাবে decode করা যায় বা তার প্রকৃত অর্থে অনুবাদ করা সম্ভব সেই "চাবিটি" মাস্টারদার কাছে আগেই গোপনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটি অতি সামান্য একটি বিষয়, খুব যে একটা অসাধারণ কিছু করেছিলাম তা নয়। তবে এইরূপ সামান্য বিষয়ও উপেক্ষণীয় নয়।

বিস্তারিত ইতিহাস লিখছি বলেই এই সামান্য তথ্যটিও লিপিবদ্ধ থাকুক —হয়ত ভবিষ্যতে ইতিহাসবিদ্‌রা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গবেষণাকার্যে এর প্রয়োগ করলেও করতে পারেন।

মাস্টারদার কাছে প্রথমে invisible ink-এর (দেখা না যায় একরকম সাদা কালি) সাহায্যে সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলি লিখে পাঠানো হ'ল। এই সাধারণ কাজটিও রীতিমত একটি প্ল্যান করে করতে হয়েছে। অর্ধেন্দুকে বলেছিলাম সে আদালতে আসার সময় যেন একটি গীতা নিয়ে আসে। গীতা একেবারে নির্দোষ একটি ধর্মপুস্তক—পুলিস কর্তৃপক্ষের আপত্তি করার কিছুই নেই—এক-আধটু ওলোট-পালট করে দেখে তারা গীতাটি অর্ধেন্দুকে ফেরত দিল। কাঠ-গড়ায় বসে বসে অর্ধেন্দু খুব ভক্তি সহকারে মন দিয়ে সারাদিন গীতাটি পড়লো —কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় গীতাটি সঙ্গে নিল না—আমাদের কেউ সে'টি জেলে নিয়ে গেল। আবার পরের দিন আর একটি গীতা হাতে নিয়ে অর্ধেন্দু কাঠগড়ায় প্রবেশ করলো। আমাদের একজন জেল-হাজত থেকে আদালতে আসার সময় সেই গীতাটি নিয়ে এসে গভীর মনোযোগ দিয়ে পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সারাদিন পাঠ করলো। এই অভিনয় যখন বিনা বাধায় কয়েকদিন চললো তখন পরবর্তী কাজটি সহজ হয়ে গেল।

নিম্নলিখিত ধরনের *cypher* প্রস্তুত করি-

A—ট	H—দ	O—য	V—হ
B—ঠ	I—ধ	P—র	W—ং
C—ড	J—ন	Q—ল	X—ঃ
D—ঢ	K—প	R—ব	Y—ঁ
E—ণ	L—ফ	S—শ	Z—অ
F—ত	M—ভ	T—স	
G—থ	N—ম	U—ষ	

২৬টি ইংরেজী অক্ষরের পরিবর্তে ২৬টি বাংলা অক্ষর সাঙ্কেতিক অর্থে প্রয়োগ করা হবে বলে স্থির হ'ল। কিন্তু এতেও অনেক দুর্বলতা থাকে—সাঙ্কেতিক লেখা উদ্ধারকারী সরকারী দফ্তর এইরূপ সাধারণ cypher-এ লেখার মর্ম অতি সহজে বিশ্লেষণ করতে পারে।

১৯২৪ সালে মাস্টারদা যখন আমার সঙ্গে জেল-হাজতে ছিলেন তখন সাঙ্কেতিক চিঠি লেখার পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেন। ইংরেজী ভাষায় বাংলা সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখলেও বিশ্লেষণকারীরা কতকগুলি বাছাইকরা শব্দের মাধ্যমে সাঙ্কেতিক alphabets-গুলি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। যেমন নাকি "I" একটি অক্ষর, ইংরেজীতে তার অর্থ 'আমি'। "I" অক্ষরটি লেখার অংশ থেকে একটু চেষ্টা করলেই উদ্ধার করা যায়। তারপর ধরুন "The" "And" প্রভৃতি অতি আবশ্যক তিন অক্ষরের ব্যবহারিক ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ জানা আছে বলে একটু বিশ্লেষণ করলেই সেইরূপ শব্দ cypher-এ লেখা চিঠির অংশ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব। ধরুন "I" সাঙ্কেতিক অক্ষরটি উদ্ধার করা হয়েছে। তারপর তিন অক্ষরযুক্ত "The" "And" প্রভৃতি শব্দগুলির কোন্ বিশেষ অক্ষরটি "I"-এর সঙ্গে যুক্ত হলে ইংরেজী অর্থ হওয়ার মত শব্দের বিন্যাস পাওয়া যায়, তা খুঁজে বার করা শক্ত নয়। "The" শব্দের "T" টি "I" এর সঙ্গে যোগ দিলে "It" হয়। এইভাবে সরকারী decypher করা department গবেষণা করে সাঙ্কেতিক দলিল বা চিঠিপত্রের অর্থ উদ্ধার করে।

শত্রুপক্ষের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সাঙ্কেতিক লেখার অর্থ যাতে উদ্ধার করা না যায়, তার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হ'ল—

(১) ইংরেজী ভাষায় প্রতিটি শব্দের মধ্যে সাধারণতঃ যা gap থাকে তা বাদ দেওয়া গেল।

(২) দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতির ব্যবহার বাতিল হ'ল।

(৩) চিঠির আরম্ভ ও সমাপ্তির সাধারণ পদ্ধতি—যেমন নাকি—'my dear' 'yours sincerely' প্রভৃতির প্রয়োগ সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হল'।

(৪) ২৬টি প্রয়োজনীয় সাঙ্কেতিক alphabets ছাড়া আরো প্রায় দশ বারোটি অর্থহীন alphabets ব্যবহার করা হ'ল—যেমন নাকি—ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ প্রভৃতি।

সাঙ্কেতিক চিঠি বা প্ল্যানের ড্রাফট পাঠাবার জন্য এইরূপ চিন্তা করে cypher-এ মাস্টারদার কাছে লেখা হবে স্থির হ'ল। ধরুন আমরা লিখবো—

"Masterda we have planed to blow up the Jail wall on Monday at 10 P.M."

আমাদের cypher-এ তা লেখা হবে—"ক ঙ ট শ স ট র ঢ ট গ চ ং ণ চ ছ দ ট ক হ ক ণ র ফ ট ম ম ণ ঢ ঘ ছ ক স য ঙ ঠ ফ য ং ছ ঙ ষ র ফ গ স দ ন ক গ ন ট ধ ক চ ছ ং ট ফ ফ গ ঙ য ম ক ঙ ভ য ম চ ট ঁ ছ ফ ট স ক চ স ণ ম খ চ র গ ভ ক ক।"

এই cypher-এ লেখাটির মর্ম উদ্ধার করতে—যার জানা আছে সেই অর্থহীন অক্ষরগুলি বাদ দেবে এবং নির্ধারিত alphabets-গুলি লিখে নিলেই প্রকৃত অর্থ জানতে পারবে।

গীতা দু'টি নিয়ে অভিনয়পর্ব শেষ করার পর একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার সাদা মার্জিনে ভাতের ফ্যান বা ভাত চটকে জলে গুলে ফ্যানের মত করে নিয়ে সেটাতে মোটা নিব ডুবিয়ে cypher-গুলি লেখা হ'ল। খুব গবেষণার চোখে নিরীক্ষণ না করলে কোন লেখা আছে বলে বোঝা যায় না। গীতাটি অর্ধেন্দুর মারফত মাস্টারদার কাছে পাঠানো হ'ল। মাস্টারদার চিঠিতে প্রাপ্তিসংবাদ জানলাম। মাস্টারদার হাতের লেখা—বিশেষ reference দিয়ে তিনি লিখেছেন, কাজেই তাঁর চিঠির যাথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ রইল না। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্তিসংবাদ পাওয়ার পর আমরা জানলাম বিশেষ ক'টি পৃষ্ঠার সাদা অংশটুকু তুলি দিয়ে একটি সাধারণ রাসায়নিক জলীয় দ্রব্যে ভিজিয়ে নিয়ে লেখাগুলি পড়তে হবে। এক আউন্স জলে দু'এক ফোঁটা টিন্‌চার আইওডিন মিশিয়ে সেই লোশনের সাহায্যে অদৃশ্য লেখার আবিষ্কার পদ্ধতি মাস্টারদার জানা ছিল। কাজেই cypher-এ লেখা পড়তে তাঁকে কোন বেগ পেতে হয়নি।

আজ এই কথা লিখতে গিয়ে মনে মনে হাসছি। প্রথম যখন cypher-এ

চিঠি লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করলাম তখন বালক-সুলভ বুদ্ধিতে প্রেমানন্দদার কাছে cypher-এ চিঠি লিখলাম—"My dear Premanandada", এবং শেষ করলাম "Yours Sincerely" প্রভৃতি দিয়ে। এতগুলি অক্ষর যে অতি সহজে বুঝে ফেলা যায়, তা তখন ভাবিই নি। আর এখন যা লিখলাম এইরূপ cypher decode করা সম্ভব নয়। তবু প্রতিটি দেশ Deplomatic channal-এ যেরূপ code ও cypher ব্যবহার করে থাকে সেই তুলনায় আমাদের cypher যে একটা বিশেষ কিছু, তা ভেবে নেওয়া ভুল হবে। এই লেখার মাধ্যমে মাত্র এইটুকু জানা যাবে যে, তখনও আমাদের অল্পবুদ্ধি ও জ্ঞান নিয়ে অতি সাবধানতার সঙ্গে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করেছি বলেই আমাদের পক্ষে কিছুটা সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

যুব-বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় প্ল্যানটির সারমর্ম এইরূপ—

(১) মামলা দীর্ঘস্থায়ী করে সময় পাওয়া চাই। তার জন্য যা করা সম্ভব আদালতের কর্মসূচী ও বিচারপদ্ধতির বিঘ্ন ও বিলম্ব ঘটিয়ে আমরা তা করবো।

(২) মাস্টারদা ও নির্মলদা জেলে আমাদের কাছে পাঠাবার জন্য কয়েকটি রিভলভার, দু'তিন ডজন শাণিত ছোরা, দু'তিন ডজন ডিনামাইট বা তা' সম্ভব না হলে, অন্তত আধ মণ দেশী বারুদ, টর্চের কয়েক ডজন ব্যাটারী, মোটর গাড়ির আলোর বালব্ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগাড় করে রাখবেন।

(৩) আমরা জেলের সেপাইদের হাত করে সেই সব অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে আনাবার ব্যবস্থা করবো।

(৪) জেলের অভ্যন্তরে সরকারী ব্যবস্থার কড়াকড়ি শিথিল করবার জন্য যেমন করে ধীরে ধীরে তাদের মনে ভরসা ও বিশ্বাস স্থাপন করে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, তা আমরা করবো। জেলে আমরা প্রায় ত্রিশজন আছি বলেই অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি জেলের মধ্যে লুকিয়ে রাখার সুযোগ নেবো। ত্রিশজনের মধ্যে দশ-বারোজনকে আমরা এই কাজের জন্য বেছে নেবো।

(৫) অর্ধেন্দু গুহ আমাদের ও মাস্টারদার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ রাখবে এবং মাস্টারদার নির্বাচিত অন্য কোন দলের সভ্যের সঙ্গেও তার যোগাযোগ থাকবে। আমাদের নির্দেশ মতই অর্ধেন্দু আমাদের নিযুক্ত জেল-সেপাই বা সার্জেন্টকে ব্যবস্থা অনুযায়ী অস্ত্রাদি ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সরবরাহ করবে।

(৬) আমাদের যেখানে রেখেছে, পুলিস ও জেল সেপাইদের সেখানে অতন্দ্র পাহারা। জেলপ্রাচীরের কাছে গিয়ে LAND MINE বা ডিনামাইট

পুঁতে রাখা সহজ সাধ্য নয়। তবু আমাদের বিশ্বাস সেপাইদের সাহায্যে তা করা সম্ভব।

(৭) প্রাচীরের বাইরে মিলিটারীর পাহারা। জেলের চারটি কোণে তাঁবু খাটিয়ে সব সময়ের জন্য এই পাহারার ব্যবস্থা। সৈন্যদের বিশেষ তাঁবু দু'টিকে zero-hour-এ বোমা বা অস্ত্র ব্যবহার করে engage রাখতে হবে। সেই জন্য চার বা ছয়জন যুবককে মাস্টারদা প্রস্তুত রাখবেন।

(৮) জেল-প্রাচীরের বাইরে মিলিটারী কায়দায় যেভাবে প্রায় দশ বারো ফুট পরিধি জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া আছে, তা অতিক্রম করবার ব্যবস্থা আমরাই করবো। আমাদের ব্যবহারের জন্য ছোবড়ার মোটা তোষক আছে—সেই সব তোষক কাঁটাতারের ওপর ফেলে সেই বাধা অনায়াসে পেরিয়ে যেতে পারবো।

(৯) জেল-প্রাচীরের বাইরে যাওয়া এই উপায়ে যদি সম্ভব না হয়, তবে বিকল্প ব্যবস্থা করা আছে—যে সব পুলিস রাইফেল নিয়ে হাজত ঘরের প্রাঙ্গণে আমাদের পাহারায় নিযুক্ত, অতর্কিত আক্রমণে তাদের রাইফেল ছিনিয়ে নেবো। এইভাবে অস্ত্র দখল করা আমাদের পক্ষে অতি সহজ। তাদের রাইফেল নিয়ে আমরা দোতলায় কয়েদী রাখবার বড় একটি ঘর দখল করবো এবং দু'তিন দিন, সম্ভব হলে আরো কয়েকদিন বেশি, সেখানের পাকা আড়ালের পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ চালাব। কামান দিয়ে উড়িয়ে বা শূন্য থেকে বোমা নিক্ষেপ করে যদি সেই ঘর ধ্বংস করা না যায়, তবে সেইরূপ সুরক্ষিত স্থান থেকে শত্রুসৈন্য আমাদের স্থানচ্যুত করতে পারবে না।

(১০) জেলের এই প্ল্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাইরেও বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহারে এক ব্যাপক আক্রমণের strategy নেওয়া স্থির হ'ল। যদি ডিনামাইট পাওয়া যায় ভালো; কিন্তু বর্তমানে যদি ডিনামাইট যোগাড় করা সম্ভব নাও হয়, তবু চেষ্টার যেন ত্রুটি না থাকে। বন্দুকের দেশী বারুদ দিয়েই ডিনামাইটের অভাব আমাদের মেটাতে হবে। শত্রুর কড়া পাহারা, শত বিপদ, বিবিধ ধরনের হাজারটি সমস্যা উপেক্ষা করেও ১০।১২ মণ বারুদ যে তৈরি করা যায়, অর্ধেন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হলাম।

(১১) ইতিমধ্যে আমরা ল্যাণ্ডমাইন তৈরি করবার একটি কার্যকরী ডিজাইন করলাম। ইলেকট্রিকের সাহায্যে খুব সহজ উপায়ে এই সব land mine ব্যবহার করা সম্ভব এবং তৈরি করে সেইগুলি শত্রুপক্ষীয় বিশেষ বিশেষ target-এর বিরুদ্ধে খুব নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করা যাবে।

(১২) আপাতত শহরের দশটি স্থানে আমরা সেইরূপ ল্যাণ্ডমাইন ব্যবহার করার প্ল্যান করতে পারি। ট্রাইব্যুনালের জজেরা, পুলিস সাহেব তিনজন, মিলিটারী কমাণ্ডার, সেইরূপ উচ্চপর্যায়ের অফিসারদের—D.I.G. ও বিভাগীয় কমিশনারকে, আঘাত হানতে পারি।

(১৩) অর্ধেন্দুর কাছে শহরের সংবাদ যা সংগ্রহ হয়েছে, তা বিচার করে বোঝা যাচ্ছে, শত বাধা থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ স্থানে ল্যাণ্ডমাইন পুঁতে রাখা সম্ভব।

(১৪) মাস্টারদা যদি এই প্ল্যান অনুমোদন করেন—তবে আরো অনেক বিশদভাবে সব আলোচনা করা যাবে।

(১৫) এই প্ল্যান কার্যকরী করার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং তা পাওয়া যাবে বলেই বিশ্বাস। দিদিকে দিয়ে শরৎবাবুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আসতে হবে, প্ল্যান অনুমোদন করলে যাতে কাজ সুরু করতে পারি।

এই প্ল্যানটি invisible ink-এ গীতার কতকগুলি নির্দিষ্ট পাতায় লিখে সেই গীতাটি অর্ধেন্দুর মারফত মাস্টারদাকে পাঠানো হ'ল। আমাদের সঙ্গে (গণেশ ও আমি) পরামর্শ করে প্রয়োজন হলেই সে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে যেত। সুচতুর পুলিস যে অর্ধেন্দুকে অনুসরণ করবে না, তা আমরা কখনও মনে করিনি। কাজেই শহর থেকে দূর গ্রামে মাস্টারদার সঙ্গে কিভাবে দেখা করতে যেতে হবে তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ তাকে দেওয়া ছিল। রাত্রে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে সবার অগোচরে গোপনে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির সামনে প্রহরারত ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সাদা পোশাক পরিহিত পুলিসের কর্তব্যপরায়ণতায় কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করেই সে মাস্টারদার উদ্দেশ্যে গ্রামে চলে যেত।

গোপনে ঘর থেকে বেরুতে কেউ দেখলো কিনা অথবা কেউ পেছু নিল কিনা, সেটা বড় কথা ছিল না। তার প্রতি আমাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, নৌকোয় চড়বার আগে সে যেন filtered হয়ে বেরিয়ে আসে, অর্থাৎ এমন এমন গলি দিয়ে বেরোবে যাতে বেরিয়ে নিশ্চিত হবে যে পেছনে কেউ তাকে অনুসরণ করছে না, তখনই সে নৌকোয় উঠবে। এমন কি, যদি কোন নিরীহ কানা-খোঁড়া, অথবা অসুস্থ বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাও কাউকে তার পেছনে বা ধারে কাছে দেখে, তবে সে দিন সে আর মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাই করবে না। এ কথা গর্ব করেই বলা যায় যে, প্রতি মাসে অন্তত দু'বার অর্ধেন্দু মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করেছে, কিন্তু পুলিস তাকে

অনুসরণ করতে পারে নি; এমন কি তার বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কাজও জানতে পারে নি। আবার আমার সেই কথাই প্রমাণিত হ'ল—ঘরে বিভীষণ না থাকলে পুলিস মন্ত্রবলে কিছু করতে পারে না।

মাস্টারদা আমাদের লিখিত প্ল্যানটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং অর্ধেন্দুকে বলেছিলেন আমাদের জানাতে—"গণেশ ও অনন্তের এই প্ল্যান যদি সার্থক হয় তবে যুব-বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ের তুলনায় এইরূপ ব্যাপক ও অভিনব আক্রমণের কর্মসূচী এক নতুন ইতিহাস রচনা করবে।"

আমরা জানতাম মাস্টারদা আমাদের প্ল্যানটি অনুমোদন করবেন এবং তার বাস্তব রূপ দিতে পরাঙ্মুখ হবেন না। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে মত জানালেন—"এগিয়ে যাও। উল্কাপিণ্ডের মত ছুটে যাও। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শত্রুকে আঘাতের পর আঘাত হানো! তোমরা চেষ্টা করে যাও আর আমি নির্মলবাবু ও অম্বিকাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে যা' যা' করা সম্ভব তা' করে যাব। অর্ধেন্দুর সঙ্গে তোমাদের যখন রোজ ছ'টি ঘণ্টা ধরে দেখা হয়, তখন তার মারফত তোমাদের প্রস্তুতির কাজ চালানো অনেক সহজ হবে। আর Preparation যখন শহরেই করতে হবে, তখন তোমাদের সুবিধে আছে। অবশ্য অর্ধেন্দু জামিনে মুক্ত না থাকলে এইরূপ ভাবা যেত না। এখন যেহেতু আমাদের এই সুবিধে আছে, পূর্ণমাত্রায় তার সুযোগ নিতে হবে।"

কাগজে কলমে প্ল্যান করা এক কথা আর তার বাস্তব রূপ দেওয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা। কি ব্যাপক আয়োজন, কি নিদারুণ পরীক্ষা—মুখে ও মনে একই ভাষার প্রতিধ্বনি শোনা চাই। দুর্বলতার সঙ্গে কোনো আপোষ নয়। সাহস ও আত্মত্যাগের ডঙ্কা বাজিয়ে অন্তরে সাজ সাজ রব তুলে সর্বতোভাবে প্রস্তুত হতে হবে!

কিন্তু আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে, আমাদের এই পথের প্রতিটি বাঁকে গুপ্ত সর্পের ক্রূর ফণা অধীর প্রতীক্ষায় আছে—সুযোগ পেলেই ছোবল হানবে! লোকনাথ ও গণেশ চন্দননগরে ২রা সেপ্টেম্বর ধরা পড়ায় আমরা সাময়িকভাবে বাধা পেয়েছি। এখন আবার নিজেদের সংহত করে ব্যাপক প্ল্যান নিয়ে এগিয়ে যাব। মাস্টারদার কাছ থেকে এগিয়ে যাবার নির্দেশও পেয়েছি, কিন্তু আবার বাধা। পটিয়ার কোন গ্রামে অম্বিকাদা থাকতেন। কোন নির্দিষ্ট সংবাদের ভিত্তিতে—আমার বিশ্বাস কোনো বিশ্বাসঘাতকের কাছ থেকেই খবর পেয়ে—৯ই অক্টোবর ১৯৩০ সালে আসানুল্লা সদলবলে গিয়ে অম্বিকাদাকে বন্দী করলেন।

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ—কাজেই আমাদের ধরবার জন্য তারা যে সারাক্ষণ ওৎ পেতেই থাকবে, এতে আশ্চর্যের কি আছে? কিন্তু আশ্চর্য বা আফসোসের কথা নয়, কথা হচ্ছে কি নিদারুণ প্রতিশোধ স্পৃহা! প্রয়োজনাতিরিক্ত রাজভক্তিতে অধীর হয়ে—অম্বিকাদার অসুস্থ শরীরের ওপর তারা পশুর মত অকথ্য অত্যাচার চালালো! অম্বিকাদার ওপর আসানুল্লার বর্বরোচিত ব্যবহার নিকৃষ্টতম অসভ্যতার কল্পনাকেও ম্লান করে দেয়!

অম্বিকাদার গ্রেফতারের পর আসানুল্লা বীর পদে অভিষিক্ত হলেন। খাঁ সাহেব উপাধির পরিবর্তে তিনি খাঁ বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হলেন! আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দাপটে চট্টগ্রামবাসীর জীবন বিষময় হয়ে উঠলো!

অত্যাচারী আসানুল্লার শাস্তি চাই—তার অত্যাচারের প্রতিবিধান চাই—প্রতিকার চাই! চট্টগ্রামবাসীর ক্ষুব্ধ মনের প্রতিক্রিয়া আদালত গৃহে আমাদের কাঠগড়ায় প্রতিধ্বনিত হ'ল! অভিভাবকেরা আমাদের কাছে অভিযোগের স্বরে বললেন—

"তোমরা এখনও চুপ করে আছ কেন? আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। আসানুল্লার অত্যাচার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তাকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না। তোমরা যদি না পার তবে আমাদের একটি রিভলভার দাও, আমরাই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করবো। বুঝতে পারলাম আসানুল্লার অত্যাচার চট্টগ্রামবাসীর ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেছে—এর প্রতিবিধান চাই—প্রতিশোধ চাই।

যুব-বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্ল্যান মাস্টারদার অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। নির্মলদা ও মাস্টারদা সাংগঠনিক শক্তির বর্তমান অবস্থা অনুধাবন ও বিবেচনা করেই জেলখানায় আমাদের নির্দেশ পাঠালেন, "এগিয়ে যাও।" এখন আমাদের কর্তব্য, যে প্ল্যান আমরা কাগজে-কলমে গ্রহণ করেছি তার বাস্তব রূপ দেওয়া। শত বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়ে শত্রুর সুদৃঢ় বেড়াজাল ভেদ করেই প্রস্তুত হতে হবে, সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। সম্মুখের উত্তাল তরঙ্গ গর্জন প্রতি মুহূর্তেই কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে; দুরূহ গিরিশৃঙ্গের প্রতিচ্ছবি থেকে থেকে অন্তরে আতঙ্ক জাগাচ্ছে; মরুপথের সুদীর্ঘ অভিযানের নিদারুণ কাঠিন্য ও অনিশ্চয়তার বিভীষিকা বারে বারে মনকে আচ্ছন্ন করছে! তবু এই ভয়াল অন্ধকারের মধ্যেও পথ করে নিতে হবে! দৃঢ়চিত্তে অশান্ত উদ্বেলিত বিপদ-সমুদ্র মথিত করে শত সহস্র বাধা সত্ত্বেও শত্রুকে আমাদের স্বহস্ত নির্মিত ল্যাণ্ডমাইনের সাহায্যে

বিধ্বস্ত করতে হবে—শত্রুর সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অচল করে দিয়ে আমাদের প্ল্যান সফল করতেই হবে।

প্রস্তুতির কাজ সুরু করেছি। এইরূপ ব্যাপক প্ল্যান কার্যকরী করা সময় সাপেক্ষ; কাজেই প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের কাছে অতি মূল্যবান। আমাদের মামলা শেষ হবার আগে যদি প্ল্যান কার্যকরী করা না যায়, তবে আমাদের সব ভাবনা-চিন্তা আকাশ-কুসুমে পর্যবসিত হবে—মনের নিভৃত কোণে ঘটবে তার নীরব পরিসমাপ্তি। কিন্তু মাঝপথে যদি বাধা আসে, কোনো সমস্যা দেখা দেয় বা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অনুযায়ী মূল প্ল্যানকে সাময়িক তাবে স্থগিত রেখেও শত্রুর বিরুদ্ধে অ্যাকশন্ যদি অপরিহার্য মনে হয়, তবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মিথ্যা দোহাই দিয়ে তা' ঠেকিয়ে রেখে নিজের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কূটনীতি বিপ্লবী নেতা মাস্টারদার অভিধানে কখনই স্থান পায় নি।

অত্যাচারে নিপীড়নে জর্জরিত চট্টগ্রামবাসীর তীব্র কণ্ঠের প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ গ্রহণের ক্রুদ্ধ দাবি চট্টগ্রামের আকাশ-বাতাস আলোড়িত করে তুললো—খাঁ বাহাদুর আসানুল্লার রক্ত চাই—তার সহস্র অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত চাই! এই কুখ্যাত, সার্থান্ধ খাঁ বাহাদুর ইংরেজ শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজ অধিকারের গণ্ডি ছাড়িয়ে চট্টগ্রামের বুকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তার অসীম প্রতাপের তাণ্ডব-লীলা অবাধে চালিয়ে যাচ্ছেন। অম্বিকাদাকে গ্রেফতারে সমর্থ হওয়ায় তাঁর অত্যাচারের মাত্রা একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেল!

চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকেরা ক্রমেই অধীর হয়ে উঠলো। অধিনায়ক সূর্য সেনের কম্যাণ্ডে প্রতিটি রাইফেল ও রিভলভার বিপ্লবী যুবকদের হাতে আদেশের অপেক্ষায় একেবারে attention-এ আছে। সকলেই আশা করে আছে মাস্টারদা আদেশ দেবেন—"খাঁ বাহাদুরের বক্ষ লক্ষ্য করে দৃপ্ত পদে এগিয়ে যাও!" সংগঠনের প্রতিটি যুবক ভাবছে—মাস্টারদা কার ওপর এই কর্তব্যভার ন্যস্ত করবেন?

খাঁ বাবাহাদুর সব সময়েই বিশেষ দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে চলাফেরা করতেন। ইংরেজ সরকার বাহাদুর খাঁ বাহাদুরের জীবনরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। খাঁ বাহাদুরকে সরকারের বিশেষ প্রয়োজন—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে—ভারতবাসীর সাহায্যেই ভারতবর্ষ শাসন করতে হবে! কাজেই আসানুল্লার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাপক ও প্রচুর। সরকারী কর্তব্যে বা সামাজিক ব্যাপারে আসানুল্লা যেখানেই যেতেন, সেখানেই সাদা পোশাকে সশস্ত্র পুলিস পাহারা

মোতায়েন থাকতো। মাস্টারদা আসানুল্লার দেহরক্ষার এই ব্যাপক ব্যবস্থার সব সংবাদই পুরোমাত্রায় রাখতেন। আসানুল্লাকে সুনিশ্চিতভাবে রিভলভারের পাল্লায় পাওয়া যে খুব সহজ সাধ্য নয়, তা তাঁর জানা ছিল। দূর থেকে হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু দূর হতে নিক্ষিপ্ত হাত-বোমার প্রতিক্রিয়া কতখানি ফলপ্রসূ হবে তার উপর নির্ভর না করে, খুব close range-এর '৪৫০ ব্যাসের রিভলভার দিয়ে যদি গুলী করা হয়, তবে অব্যর্থভাবে লক্ষ্যভেদ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

এই প্ল্যানটি সফল করার জন্য মাস্টারদা ও নির্মলদা স্থির করলেন একজন যুবক একটি রিভলভার হাতে আসানুল্লাকে close range-এ আক্রমণ করবে।

মাস্টারদা ভালভাবেই জানতেন যদি সেইরূপ একজন দুর্ধর্ষ মরণজয়ী যুবক পাওয়া যায়, তবেই প্ল্যান কার্যকরী হওয়া সম্ভব। সেই যুবককে একাই আসানুল্লার খুব কাছে যেতে হবে। আসানুল্লার সন্নিকটে একসঙ্গে দু'জন বা তার অধিক যুবকের আনাগোনা পাছে তাঁর দেহরক্ষীদের পূর্বাহ্নেই সজাগ করে দেয় সেই আশঙ্কায় মাস্টারদারা একা একজনের উপরেই এই ভার ন্যস্ত করবেন স্থির করলেন।

কে সেই যুবক—এক হাতে প্রাণ ও অন্য হাতে রিভলভার নিয়ে যে মুখোমুখি আক্রমণ করতে যাবে? এমন কোনো যুবক আছে কি, যে দেখতে অতি বিনীত শান্ত ও নিরীহ? প্রাপ্তবয়স্ক "বীরদের" প্রতি আমাদের মনে সব সময়েই প্রশ্ন থেকে গেছে। যারা যুবক—সংসারের মায়া মোহে আচ্ছন্ন হবার তখনও সুযোগ পায় নি, তাদেরই বেছে নিয়েছি। এই বিশেষ ক্ষেত্রে মাস্টারদা সেই নিয়মের আরো ব্যতিক্রম করলেন।

পনেরো বছরের বালক—সুঠাম সুগঠিত দেহ, স্বর্ণাভ গাত্রবর্ণ, অপরূপ মুখাকৃতি, সরল সুন্দর দৃষ্টি, সদ্য হাস্য বদন, শান্ত ধীর, একেবারে গোবেচারা—তার প্রতি কারোই (হোক্ না কেন সে আসানুল্লার বিচক্ষণ দেহরক্ষী) কোন সন্দেহের কারণ থাকতে পারে না। মাস্টারদা একটি প্রকৃত বিপ্লবী চরিত্রের বালককে এই সাংঘাতিক "অশ্বমেধ যজ্ঞের" হোতা নির্বাচন করেছিলেন বলেই প্রথমেই সফলতার সঙ্গে নব্বইভাগ strategic gain-এ সমর্থ হন।

এই প্ল্যানের প্রতিটি দাবি উপযুক্তভাবে পূরণে সমর্থ হয়েছিল এই বালক—হরিপদ ভট্টাচার্য্য। দেখতে শুনতে একেবারে নিরীহ হলেও বিন্দুমাত্র বহিঃ-প্রকাশশূন্য বিপ্লবের প্রজ্বলিত অগ্নিতে তার অন্তর আলোকিত! বিপ্লবী

morale—ভয়ে হাত কাঁপবে না, কাজ অসমাপ্ত ফেলে আসবে না—অত্যাচারীর হৃদয়-শোণিতে তর্পণ করবে হরিপদ।

মাস্টারদা প্রেসিডেণ্ট—বিপ্লবী পরিষদে আসানুল্লার প্রাণদণ্ডের আদেশ ঘোষিত হ'ল। বিশদ প্ল্যানটিকে আনুসঙ্গিকভাবে বিচার করে বাস্তব রূপ দেবার ভার দেওয়া হ'ল নির্মলদাকে। প্ল্যানের মূল ভিত্তি হ'ল হরিপদর morale —একা যাবে, ফিরে আসবে না। নির্মলদা হরিপদর সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিকূল অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে—তার মানসিক প্রস্তুতিতে যথেষ্ট সাহায্য করলেন।

মহালগ্ন সমাসন্ন! দ্বিধাহীন ভয়-ভাবনা শূন্য দৃঢ়চিত্ত—রিভলভার কটিবদ্ধ—দু'টি চোখ দৃপ্ত উদ্ভাসিত হরিপদকে দেখে মাস্টারদা ও নির্মলদা বুঝেছিলেন এই বালকের হাতে আসানুল্লার নিস্তার নেই—প্রাণ তাকে দিতেই হবে, কিন্তু হরিপদকে তাঁরা হয়ত আর ফিরে পাবেন না। তবু বিপ্লবী কর্তব্য—হরিপদ মরণ তুচ্ছ করে বেরিয়ে যাবে—আজ—এক্ষুণি।

মাস্টারদা হরিপদকে বললেন—"তোকে হয়ত হারাবো আমরা—আর ফিরে পাবো না। তবু কঠোর হাতে তোর শত্রুদমন করতে হবে। প্রাণ যাক্ তবু ভাল—কিন্তু আসানুল্লা যেন রক্ষা না পায়। কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দেহরক্ষীদের কোন বাধাই যেন তোকে কর্তব্য সাধনে বিরত না করে—মরণ-পণ প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।"

হরিপদ সহাস্য বদনে মাস্টারদা ও নির্মলদাকে অভয় দিয়ে বলল—"মাস্টারদা, আমি ভারতীয় গণতন্ত্রীবাহিনীর একজন সৈনিক। আমার ওপর আপনি এই গুরুভার ন্যস্ত করেছেন। আমার কর্তব্য আমি পালন করবোই। আশীর্বাদ করুন।"

মাস্টারদা ও নির্মলদাকে প্রণাম করে হরিপদ বিদায় নিল। তাঁরা হরিপদকে শেষবারের মত বুকে নিয়ে সস্নেহে বললেন—তোর সাধনা, তোর মৃত্যুপণ শত্রুনিধন-অভিসার সফল হোক্।

হরিপদ শহরে এলো। আসানুল্লা টাউন ক্লাবের সভাপতি। ফুটবল খেলায় আসানুল্লার উৎসাহ আছে। কিন্তু তাঁর উৎসাহের চাইতে চারপাশের তাঁবেদারদের উৎসাহ অনেক বেশি। আজ চট্টগ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট মাঠে চূড়ান্ত লীগ খেলা। আসানুল্লার ফুটবল টীম লীগ ফাইনালে আজ খেলবে—সকলেরই ধারণা জিতবেও। আসানুল্লা এবং চট্টগ্রামের সরকারী ও বেসরকারী প্রবীণ ব্যক্তিরাও সকলে খেলার মাঠে খেলা দেখতে সামিয়ানার নিচে বসেছেন।

দ্রুত তালে খেলা চলেছে। তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। শেষপর্যন্ত মহা সমারোহে খেলা সাঙ্গ হ'ল। আসানুল্লার ফুটবল টীম বিজয় গৌরবে শীল্ড লাভ করলো। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!—উল্লাসধ্বনিতে ফুটবল মাঠ মুখরিত। বিজয়ী দলের আনন্দ উল্লাস আর ধরে না!

বড় রাস্তার ওপর আসানুল্লার মোটর দাঁড়িয়ে আছে। খেলার মাঠ ছেড়ে স্তাবকদল সমভিব্যবহারে আসানুল্লা নিজ মোটরে ওঠবার আগে বিজয়ী শীল্ডটি হাতে নিয়ে দেখছিলেন।

নয়ন ভরে শীল্ডটি দেখে তৃপ্তিলাভের সুযোগে আসানুল্লাকে বঞ্চিত হতে হ'ল। হরিপদর রিভলভার ঠিক সময় মত Point-blank range-এ গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে দু'টি বার গর্জে উঠলো। '৪৫০ ব্যাসের রিভলভারের গুলীর আঘাতে আসানুল্লা ধরাশায়ী হলেন। রুধিরাক্ত দেহে চট্টগ্রামের ভূমিতে মাথা নুইয়ে আসানুল্লা তার বর্বর অত্যাচার ও বহুবিধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ইংরেজ প্রভুদের কাছে চিরতরে বিদায় নিলেন।

গুলীর শব্দে উপস্থিত সকলেই সচকিত। সাধারণ লোক প্রাণভয়ে ছুটে পালালো। পুলিস প্রহরীরা হতভম্ব। এই অবস্থার ফাঁকে হরিপদ সেই স্থান পরিত্যাগের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু দিনের আলোতে অত লোকের মাঝে হরিপদ পালাবার পথ করে নিলেও হত্যাকারীর ভূমিকায় তাকে দেখেছে এমন অনেক লোকের পক্ষে তার গতিপথ লক্ষ্য করা বিন্দুমাত্রও কষ্টকর হ'ল না। পুলিস-বাহিনী তার পেছু নিল। এই বাহিনীর পুরোভাগে সিদ্দিক দেওয়ান ও হেম দারোগা। এরা দুজনেই ফুটবল খেলোয়াড় এবং আসানুল্লার প্রিয় পাত্র। উদ্যত রিভলভার হাতে হরিপদ মাঠের উপর দিয়ে ছুটেছে। সে তাদের ভয় দেখিয়েছে—নিরস্ত হতে বলেছে এবং শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে তাদের লক্ষ্য করে গুলীও ছুঁড়েছে। হেম দারোগা ও সিদ্দিক দেওয়ান রিভলভারের গুলীও ভ্রূক্ষেপ না করে একেবারে উন্মত্ত বাঘের মত হরিপদর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রাণপণে ছুটে চলেছে। মাঠ ক্রমে শেষ হয়ে এলো। মাঠের পাশ দিয়ে রেল-লাইন। সিদ্দিক দেওয়ান হরিপদকে একটা পাথর ছুঁড়ে মারলো। এই আঘাতে হরিপদর একটি চোখ গুরুতররূপে আহত হলে হরিপদ জ্ঞান হারালো। আমরাও জেলে এই আঘাতের ভয়াবহ চিহ্ন দেখেছি। হরিপদ ধরা পড়লো।

এইবার সুরু হ'ল অকথ্য অত্যাচার। সে জীবিত কি মৃত সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেই নির্বিবাদে পীড়ন চলতে লাগলো। পুলিসের যে কেউ তার

কাছে আসছে, সেই তাকে লাথি চড় ও ঘুষি মারছে অথবা বেটন দিয়ে আঘাত করছে। হরিপদর মুখেই শোনা—তার কখন জ্ঞান হয়েছে বা কখন জ্ঞান হারিয়েছে সে কিছুই বলতে পারে না।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। শৃঙ্খলিত হরিপদ কোতোয়ালিতে বাঁধা। উন্মত্ত কর্তৃপক্ষ ও পুলিস চট্টগ্রামের বুকে আজ আবার দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠিত করবে স্থির করেছে। বৃটিশ অত্যাচারের বহু কাহিনী জানা আছে, কিন্তু আসানুল্লা হত্যার পর চট্টগ্রামে সেইদিন তারা যে অভিনব অত্যাচার চালিয়েছিল আর কোথাও তার নজীর আছে বলে আমার জানা নাই।

জেলা-শাসক মিঃ ক্যাম্প, জেলা সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ জনসন, এডিশনাল পুলিস সাহেব মিঃ বি, জে, সুটার, মিঃ ডব্লু, ভি, হিকস্, মিঃ লুইস্ প্রভৃতি সাহেবগোষ্ঠী ও তাদের সঙ্গে রেলওয়ের কয়েকজন উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারীও মিলিত হয়ে দলবদ্ধভাবে পাঞ্চজন্য দৈনিক পত্রিকার অফিসে ও প্রেসে হানা দিলেন। সেখানে খানাতল্লাসী করার বা কাউকে গ্রেফতার করার কোন উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। তাঁরা হানা দিয়েছেন প্রেসটিকে চুরমার করবার জন্য —প্রত্যেকের হাতেই বড় বড় হাতুড়ি। প্রেসে ঢুকেই তাঁরা প্রিণ্টিং মেশিনের উপর দমাদম হাতুড়ি চালাতে লাগলেন—তাঁদের যত আক্রোশ পত্রিকাটির উপর। কাজেই প্রিণ্টিং মেশিনটির আজ আর নিস্তার নাই! প্রেসের ম্যানেজার বা সহকারী সম্পাদক হীরেন চৌধুরী, সাহেবদের এই দস্যুজনোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারিত হবার সুযোগ ঘটলো না—তার আগেই বেটনের আঘাতে অজ্ঞান হয়ে রক্তাপ্লুত দেহে তিনি মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। জেলা-কর্তৃপক্ষের দল আসাম ও বেঙ্গল রেলওয়ের উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারীবৃন্দ প্রেসটি ভেঙে, অফিসে আগুন দিয়ে, হীরেন চৌধুরীকে মারাত্মকভাবে আহত করে উধাও হলেন। এই ধ্বংসলীলায় জেলা-শাসক ও জেলা-পুলিস সাহেব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই বাস্তব ঘটনা এতখানি অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় যে, আমার এই লেখা পড়ে মনে হবে আমি যেন একটা সস্তা প্রপাগাণ্ডা করছি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই তথ্য সম্পূর্ণ সত্য। সেই সময়কার চট্টগ্রামের বহু লোক আজো বেঁচে আছেন। আসানুল্লা হত্যার সময়ে ও পরে সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন আমার কথা তাঁরা সমর্থন করবেন। এই ব্যাপার কতখানি গড়িয়েছিল তার বিবরণ আরো খানিকটা দিচ্ছি। উচ্চপদস্থ ইংরেজদল যখন পাঞ্চজন্য প্রেস ও অফিস ধ্বংস-কার্যে ব্যস্ত, তখন সারা শহরে অত্যাচার চালাবার জন্য

এ্যাংলো ও ইংরেজ সার্জেণ্টদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় গণতন্ত্র-বাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল বা যোগাযোগ আছে সন্দেহে তালিকাভুক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের প্রায় হাজারটি বাড়িতে ইন্‌স্পেক্টার ও সাব-ইন্‌স্পেক্টারদের দলকে সশস্ত্র সান্ত্রীদের সঙ্গে সংগঠিতভাবে পাঠানো হয়েছিল। কাকেও বন্দী করা বা কোন বাড়িতে খানাতল্লাসীর উদ্দেশ্য তাদের একটুও ছিল না। গুলীবিদ্ধ ক্ষিপ্ত পশুর মত তারা প্রতি গৃহের আসবাবপত্র সব ভেঙেচুরে তছ্‌নছ্‌ করে অধিবাসীদের নির্বিচারে নির্মম মারধোর করে বেড়ালো। বুটের লাথি, রাইফেলের গুঁতো, বেটনের আঘাত এবং ঘুষি ও চড়চাপড়ের হাত হতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কেউই রেহাই পেলো না। কেউ সামান্য বাধা দেবার চেষ্টা করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে জ্ঞান হারাতে হয়েছে। আমি আগেই লিখেছি—কালারপোল যুদ্ধের শহীদ মনোরঞ্জন সেনের বৃদ্ধ পিতা তাঁর ছোট ছেলের উপর ক্ষিপ্ত জানোয়ারদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ জানান—"কেন তোমরা স্কুলের একটি ছোট ছেলেকে এমনভাবে মারছ? এতো এখুনি মরে যাবে!" বৃদ্ধ পিতার চোখের সামনে পুলিসের নির্যাতনে নাবালক পুত্রের জীবনাশঙ্কা—তবু পিতার প্রতিবাদ করার এত স্পর্ধা! সার্জেণ্ট কেলী মনোরঞ্জনের পিতার বুকে সজোরে তাঁর বুটের চিহ্ন এঁকে দিলেন! মনোরঞ্জনের পিতার প্রতিবাদধ্বনি আর শোনা গেল না—সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের চির অবসান কামনা করে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন!

সেই রাত্রে প্রতিটি বাড়িতেই এইরূপ পুলিসী তাণ্ডব চলেছে। বেপরোয়া আক্রমণের মুখে বুটের লাথি, বন্দুকের কুঁদোর বা বেটনের আঘাতের মাত্রা ঠিক রাখা সম্ভব নয়—কে যে বাঁচবে বা আধমরা হয়ে থাকবে আর কে কিভাবে পরিত্রাণ পাবে, তার হিসাব করা কঠিন! মনোরঞ্জনের পিতার মত সবাই বুটের লাথিতে প্রাণ হারাননি বটে, তবে কে যে কিভাবে বেঁচেছিলেন তা কেবল তাঁরাই জানেন।

পুলিসী জুলুমের আর একটি অভিনব প্রয়োগকৌশল এই সময়েই প্রথম দেখা গেল। কর্তৃপক্ষের লিস্ট অনুযায়ী প্রায় সাত-আটশ' প্রৌঢ় ও যুবককে ঘর থেকে বার করে এনে প্রহার করতে করতে সারা পথ হাঁটিয়ে কোতোয়ালিতে নিয়ে আসা হ'ল। দু'তিনটি বড় বড় ঘরে তাদের সবাইকে ঠাসাঠাসি অবস্থায় পুরে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। তারপর উচ্চপদস্থ পুলিস সাহেবরা, সার্জেণ্টরা এবং বৃটিশের অনুরক্ত ভারতীয় ইন্‌স্পেক্টার ও সাব-ইন্‌স্পেক্টারের দল হঠাৎ দরজা খুলে সেই সব ঘরে ঢুকে, কোনরকম বাছবিচার না করেই সবাইকে বেদম প্রহার

করতে স্বরু করে দিলেন। জামিনে মুক্ত আমাদের মামলায় অভিযুক্ত প্রত্যেককে সেই রাত্রে সেই সব "যন্ত্রণা কক্ষে" নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সতীদা ও তাঁর মত অনেকেই এই নিদারুণ অভিনব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। সতীদার শিক্ষাদীক্ষা ও তাঁর সামাজিক উচ্চমানের কোন মূল্যই পুলিস সেদিন দেয় নি। চট্টগ্রামবাসীর মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করার অভিপ্রায়েই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠি পূর্ব পরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী এইরূপ আইনবহির্ভূত অত্যাচারের পথ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন এইরূপ বিভীষিকা সৃষ্টি করেই তারা বিপ্লবী যুবকদের morale ভেঙে দেবে। সারারাত ধরে চট্টগ্রাম শহরের বুকে এই ভয়াবহ দৃশ্যের পুলিসী নাটক অভিনীত হ'ল। ভোর হওয়ার আগে দু'একজন ছাড়া অন্যান্য সবাইকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিল।

রাত্রের এই গোপন নাটক সমাপ্ত করে পরের দিন সকাল থেকেই জেলা-শাসকের সম্পূর্ণ সমর্থনে পুলিস ও জেলা-কর্তৃপক্ষ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয়ে মনোনিবেশ করলেন।

আসানুল্লার মৃতদেহের সৎকার তখনও বাকি। মহা সমারোহে মিছিল করে শবদেহ গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা আজো যদি সাম্প্রদায়িক দুর্বলতার সুযোগ না নেয়, তবে আর কখন নেবে? কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লুঠতরাজ বাধাবার ব্যাপক আয়োজন করলেন। প্রশ্ন আসতে পারে—কর্তৃপক্ষ কি কখনও দাঙ্গা করবার ব্যবস্থা করতে পারেন? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আপনা হতেই হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ তাতে হয়ত হস্তক্ষেপ করেননি! সত্য ঘটনা কিন্তু তা নয়—সাধারণের চিন্তার বাইরেই ঘটনা ঘটেছিল! সুপরিচিত সমাজদ্রোহী, দাঙ্গাবাজ লোকদের কোতোয়ালিতে অভ্যর্থনা করে আনা হয়েছিল ও আসানুল্লা হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, দু' ঘণ্টা ধরে তাদের রাজত্ব চলবে, এর মধ্যে কর্তৃপক্ষ কোন বাধা দেবেন না। এই দু'টি ঘণ্টার মধ্যেই নাগরিকদের যতখানি ক্ষতিসাধন করা সম্ভব তারা যেন তাই করে। এও শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমি যা জানি—যার সত্যতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই, তাই আমি লিখছি।

লালদীঘির পাড়ে মাঠের উপর আসানুল্লার মৃতদেহ রক্ষিত। পুলিস সাহেব মিঃ স্টুয়ার ছাড়া সমস্ত উচ্চপদস্থ সাহেব ও ভারতীয় ইংরেজ ভক্তের দল "কফিন" সামনে রেখে সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নিয়ে সমবেত সবাইকে উত্তেজিত করে বক্তৃতা দিলেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং বন্ধু আসানুল্লার অকাল তিরোধানের

জন্য সজল চোখে বিগলিত কণ্ঠে "গডের" কাছে আসানুল্লার আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা জানালেন। হত্যা-প্রতিশোধ স্পৃহায় সমবেত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো—সাম্প্রদায়িকতার চরম বীভৎস রূপ দেখা দিল! আন্দরকিল্লার প্রধান রাজপথের দুধারে যতগুলি বড় বড় দোকান ছিল দেখতে দেখতে সব লুঠ হয়ে গেল। লামার বাজার পর্যন্ত দু'ধারের ধনীদের সমস্ত বড় বড় বাসগৃহ ও সাজানো দোকানপাটগুলির কোনটাই গুণ্ডাদের হাত হতে রেহাই পেলো না—কর্তৃপক্ষের নির্দেশে লুঠ করেই সঙ্গে সঙ্গে সবগুলিতে আগুন লাগানো হ'ল। আগুনের লেলিহান শিখায় দু'তিন মাইল এলাকা জুড়ে সমস্তটাই পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

চট্টগ্রামের জেলখানা আন্দরকিল্লার পোয়া মাইলের মধ্যেই অবস্থিত। বাইরের তাণ্ডব চোখে দেখতে না পেলেও—লোকজনের চীৎকার, ছুটোছুটির শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপর দেখতে দেখতে চট্টগ্রামের আকাশ আগুনের প্রচণ্ড ছটায় লালে লাল হয়ে গেল। এই ধ্বংসলীলার শেষ কোথায়! ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করে আমরা মনে মনে প্রমাদ গুনলাম।

প্রায় দুটোর সময় বীরপুঙ্গব W. B. Hicks—পুলিসের অতিরিক্ত সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এবং জেল-সুপারও বটে—মুখে ক্রূর হাসি নিয়ে আমাদের পরিদর্শন করতে এলেন। Hicks সাহেব ব্যঙ্গভরে বললেন—

"Look here how much the people are enraged at the loss of their beloved Khan Bahadur! There is riot and arson. Just within 'Two Hours' the Hindus of Chittagong have lost more than fifty lakhs worth of property. Now it is quiet."

—প্রিয় খাঁ বাহাদুরের তিরোধানে জনসাধারণ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত। দুটি ঘণ্টার মধ্যে হিন্দুদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকারও বেশি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। এখন দাঙ্গা বন্ধ হয়েছে।

পুলিস সাহেবকে আমাদের পাল্টা জবাব শুনতে হ'ল—

"You British agents! you must know that your days are numbered and you will not get enough time to exploit our communal weakness!"

—সাহেব তোমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমাদের সাম্প্রদায়িক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণের সময় তোমরা আর বেশি দিন পাবে না।

আমরা তখন ধারণাও করতে পারি নি যে, আমাদের সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে ভারতবাসীকে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান উপহার দিয়ে তবেই তাঁরা বিদায় নেবেন।

চট্টগ্রাম জেলা-কর্তৃপক্ষ পরাজয়ের গ্লানিতে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হয়েছেন। নির্ভীক যুবকদল অতর্কিত আক্রমনে শহর দখল করে নিয়েছে। জালালাবাদ যুদ্ধে রণে ভঙ্গ দিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন! অমরেন্দ্র নন্দী সমবেত পুলিস ও মিলিটারী বাহিনীকে ব্যঙ্গ করে নিজের রিভলভারের গুলীতে মৃত্যুবরণ করেছে—তবু আত্মসমর্পণ করে নি। ফেণী স্টেশনে চারটি রিভলভারের গর্জন সুদৃঢ় পুলিসবেষ্টনী ভেদ করে বিপ্লবীদের প্রস্থান পথ সুগম করেছে। কালারপোল শহীদদের গৌরবোজ্জল মৃত্যুবরণ জেলা-কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি মুহূর্তে বিদ্রূপ করেছে—হেয় প্রতিপন্ন করেছে। তদানীন্তন বাংলা ও ভারত সরকারের দরবারে জেলা-কর্তৃপক্ষের পদমর্যাদা রীতিমত ক্ষুণ্ন! হৃত পদমর্যাদা ও লুপ্ত কর্মদক্ষতা পুনরুদ্ধারে জেলা-কর্তৃপক্ষের আহার-নিদ্রা ঘুচেছে! তাঁদের কাতরতায় বিচলিত ভগবানই যেন ত্রাণকর্তারূপে খাঁ বাহাদুর আসানুল্লাকে পাঠিয়েছিলেন এবং আসানুল্লা এসেই যুব-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীকে (অম্বিকাদা) গ্রেফতারে সমর্থ হলেন!

খাঁ বাহাদুরের দোর্দণ্ড প্রতাপ! জেলা-কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছ অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাবার খোলা সনদ খাঁ বাহাদুরকে অর্পণ করেছেন! জেলা শাসক-গোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আশা—খাঁ বাহাদুরই তাঁদের লুপ্ত মর্যাদা ফিরিয়ে আনবেন। কাজেই খাঁ বাহাদুরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল চূড়ান্ত রকমের; কিন্তু শেষরক্ষা হ'ল না। এ হেন খাঁ বাহাদুরকেও বিপ্লবীর ক্ষমাহীন পিস্তলের গুলীতে প্রাণ দিতে হ'ল—কোন মিলিটারী বা পুলিসী ব্যবস্থাই তাঁকে রক্ষা করতে পারলো না। বৈপ্লবিক দৃঢ়তার কাছে জেলা-কর্তৃপক্ষকে হার মানতেই হ'ল।

খাঁ বাহাদুরের হত্যা যেন শাসকবর্গের দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও পৌরুষের উপরেই কশাঘাত—এই পরাজয় মর্মান্তিক—দুঃসহ। শাসক গোষ্ঠী প্রতিশোধ স্পৃহায় একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন!

জেলা-কর্তৃপক্ষের এই উন্মত্ততা শহরের ওপর অত্যাচারেই যদি সীমাবদ্ধ থাকতো তবে হয়ত কারও কারও মনে প্রশ্নের অবকাশ থাকতো যে—তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ কি বৃটিশ জাস্টিসকে ধূলায় মিশিয়ে রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙতে পারেন? ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কি বিনা পরোয়ানায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেন? —শত শত নিরপরাধীকে সারা রাত্রিব্যাপী

থানায় বেঁধে তাদের ওপর কি অমানুষিক শারীরিক উৎপীড়ন চালাতে পারেন? উচ্চপদস্থ ইংরেজেরা জেলা-শাসকের উপস্থিতিতে ও প্ররোচনায় পাঞ্চজন্য প্রেস হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙে কি চুরমার করতে পারে? কিন্তু শুধুমাত্র শহরের বুকে তাণ্ডব চালিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। শহরের ওপর এই নিষ্ঠুর আক্রমণ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গেই চট্টগ্রামবাসীকে স্তম্ভিত করে, তাদের চিন্তাধারারও বাইরে, জেলা কর্তৃপক্ষ গ্রামাঞ্চলেও আসানুল্লা-হত্যা-প্রতিশোধ অভিযানের আয়োজন করলেন!

বাস্তব ঘটনাবলী এমনই অকাট্য প্রমাণ বহন করে যে, বৃটিশ জাস্টিসের প্রেমে বিগলিত ভক্তবৃন্দেরা যদি আমার বর্ণিত ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন এবং বর্তমান 'ঘেরাওকে' "বৃটিশ জাস্টিসের" নামে তুলনামূলক সমালোচনায় অবতীর্ণ হন, তবে তাঁদেরও লজ্জায় মুখ লুকোনো ছাড়া উপায় থাকবে না।

জেনারেল ও'ডায়ার এবং গভর্নর মাইকেল ও'ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে বৃটিশ জাস্টিসের যে নমুনা রেখে গেছেন, তার তুলনা পাওয়া ভার। কিন্তু আসানুল্লা হত্যার পর কর্তৃপক্ষ যেরূপ অভিনব পদ্ধতিতে অবাধ অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়ে গেছেন তার দ্বিতীয় নজীর ভারতে আর নেই।

এডিশন্যাল পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ সুটার Eastern Frontier Rifies Regiment-এর একশ'জনের এক সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে গ্রামে গ্রামে অমানুষিক অত্যাচার চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই সুসজ্জিত সৈন্যদলের মধ্যে সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত দাঁড়িয়ে নির্ভীক বালক হরিপদ—হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি, রুধিরাপ্লুত দেহ, শতছিন্ন রক্তরঞ্জিত বসন, সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর নির্যাতনের চিহ্ন এবং নির্মম আঘাতে একটি চোখ প্রায় দৃষ্টিশক্তি হীন। হরিপদর স্বদেশ-প্রেমের এইসব উপহার-পদক ইংরেজের 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' বা 'কিংস মেডেলকেও' যেন ম্লান করে দিচ্ছিল! সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রচণ্ড শক্তির এই কি পরিণতি?

মিলিটারী বেষ্টিত শৃঙ্খলিত হরিপদকে নিয়ে সুটার সাহেব তিনটি লঞ্চ যোগে কর্ণফুলী নদীপথে গ্রাম অভিমুখে চললেন। কোন ম্যাজিস্ট্রেট কি হত্যাপরাধে ধৃত কোন আসামীকে জেল-হাজতে বন্ধ রাখার আদেশ না দিয়ে পারেন? স্বাভাবিক নিয়মের কি অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম? ম্যাজিস্ট্রেটের ওইরূপ বিধিবহির্ভূত হুকুম ছাড়া কি সুটার সাহেব হরিপদকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে

বিভীষিকা সৃষ্টির মহান দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হতেন? ম্যাজিস্ট্রেট ক্যাম্প সাহেব এইরূপ নির্দেশই দিয়েছিলেন এবং এই কুখ্যাত জেলা-শাসকই ইংরেজ সঙ্গীদের নিয়ে আগের দিন রাত্রে 'পাঞ্চজন্যের' প্রিন্টিং প্রেসটি চূর্ণ করেছিলেন—There is a Method in Madness! There is a Method in British Justice!

স্টুটার সাহেব অত্যাচারীর মুষল হস্তে ভোর থেকে রাত সাতটা আটটা পর্যন্ত বড় বড় গ্রামগুলি পরিভ্রমণ করলেন। পাঁচ ছ'টি হাটের জনতাকে আহ্বান করে তাদের সামনে তিনি ও তাঁর সাব-ইন্‌স্পেক্টারেরা বুটের লাথি, বেটনের আঘাত ও অবিশ্রান্ত ঘুষিতে হরিপদকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করে চললেন এবং বক্তৃতা দিলেন—"হত্যাকারীর নিস্তার নেই। এ নিতান্ত বালক বলে সে নিজে বা তার নেতারা ভেবেছে আমরা তাকে রেহাই দেব—কেবল ফাঁসি দেব—ফাঁসি তো অনেক দিন পরের কথা! আমরা তাকে তিলে তিলে মারবো—জীবন্ত পুঁতে ফেলবো! সকলে মনে রেখো, আবার যদি কোন হত্যাকাণ্ড ঘটে তবে হত্যাকারীর চামড়া ছিঁড়ে ফেলবো—তার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে জনসাধারণকে দেখাবো···।"

গ্রামে গ্রামে বেপরোয়াভাবে এই ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বে-আইনী বক্তৃতা দিয়ে স্টুটার সাহেব জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চারের আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। তাঁদের নির্দয় অত্যাচারে হরিপদ ছ'সাতবার জ্ঞান হারালো। আমি হরিপদর মুখেই এই সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনেছি। তা'ছাড়া আমাদের মামলা চলাকালে অনেক পুলিস অফিসার, যাঁরা এই নৃশংসপর্বে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ আমাদের বলেছেন—"মশাই, ভাবতে পারি না ছেলেটি বেঁচে রইলো কি করে? এক-একটি লাথিতে দশ-বারো হাত দূরে ছিটকে পড়েছে—মুখে কোঁক্ করে একটি শব্দ হয়েই একেবারে চুপ—প্রতিবারেই মনে হয়েছে—'এই বুঝি গেল'! আমরা তো মশাই পুলিস, আমাদের তো দয়ামায়া কিছুই নেই—কিন্তু আমরাও সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলাম না! কি নিদারুণ দৃশ্য—চোখে জল না এসে পারে না।"

স্টুটার সাহেবের তাণ্ডব কেবল হাটে-বাজারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই প্রথম অধ্যায়টি নিষ্ঠার সঙ্গে সমাপ্ত করার পর তিনি গ্রামের বড় বড় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে আরও ভয়ঙ্কর মূর্তিতে সদলবলে হানা দিলেন। সঙ্গের রাইফেলধারী গুর্খা পল্টনের প্রত্যেকটি রাইফেলের মুখের সঙ্গীনের ফলা রৌদ্র-কিরণে ঝলসিত হয়ে যেন হৃদয় বিদীর্ণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করছে! শৃঙ্খলিত

হরিপদকে নিয়ে এঁদের এই আকস্মিক আবির্ভাবে স্কুল-কর্তৃপক্ষের মনে নিদারুণ ত্রাসের সঞ্চার হ'ল। স্কুলে প্রবেশ করেই স্টার সাহেব প্রধান শিক্ষককে ডেকে সন্দেহভাজন ছাত্রদের নামের একটি তালিকা দিয়ে আদেশ করলেন ওই সব ছাত্রদের সেই মুহূর্তেই যেন তাঁদের সামনে হাজির করা হয়। কি অনধিকার চর্চা ? হিংস্র ক্রোধোন্মত্ত স্টার সাহেবের সামনে অসহায় অবস্থায় ছাত্রদের পেশ করা হ'ল। স্টার সাহেবের কঠিন নির্দেশে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রদের সারিবদ্ধভাবে স্কুল-প্রাঙ্গণে দাঁড় করানো হ'ল। ভীত-ত্রস্ত শান্তিপ্রিয় শিক্ষকবৃন্দ আদেশ অবজ্ঞা করতে সাহস করলেন না। ছাত্রেরা সকলে সমবেত হ'ল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় শিক্ষকেরাও ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। স্টার সাহেব হরিপদর প্রতি সমবেত ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। নির্যাতনে ও নিপীড়নে জর্জরিত হরিপদকে দেখিয়ে সাহেব হিন্দীতে বললেন—"দেখ, অপরাধের ক্ষমা নেই। এই ছোক্‌রা খাঁ বাহাদুরকে হত্যা করেছে। ইংরেজ সরকারের শক্তি প্রবল—ব্যক্তিগতভাবে অফিসারদের খুন করে তোমরা কিছু করতে পারবে না। তোমাদের সংঘবদ্ধ শক্তিও কিছু করতে পারবে না। সূর্য সেনকেও খুব শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে। তোমরা কে কে বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিয়েছ তা' আমাদের জানা আছে। শেষবারের মত তোমাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি—বিপ্লবী দলে মিশবে না···।"

স্কুলে স্কুলে এইভাবে বক্তৃতা দিয়ে সাহেব আদেশ ও নির্দেশ জারী করলেন ; শুধু তাই নয়, সন্দেহভাজন ছাত্রদের কিল, চড়, ঘুষি ও লাথি মেরে চুল ছিঁড়ে, কান টেনে, ওঠ-বোস করিয়ে প্রত্যেককে শপথ করিয়ে নিলেন—বৈপ্লবিক সংগঠনে আর তারা যোগ দেবে না। ছাত্রদের মনে বিভীষিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিটি স্থানে প্রতি বারেই হরিপদর ওপর ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মত আক্রমণ চালানো হয়েছিল। কোন কোন পুলিস অফিসারের কাছে শুনেছি, অজ্ঞান অবস্থায়ও এই নিদারুণ নির্যাতন হতে হরিপদ রেহাই পায় নি। এর একমাত্র ব্যাতিক্রম ঘটেছিল শারওয়াতলী হাই-স্কুলে। এই নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে এই স্কুলের প্রধান-শিক্ষক মহাশয় বড় একটি টর্চের আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। যে কোনো শিক্ষকই ছাত্রদের এই প্রচণ্ড মারের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন—সামান্যতম বাধা দিতেও চেষ্টা করেছেন, তাঁকেই তক্ষুণি তার জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে।

এইভাবে গ্রামে গ্রামে বিভীষিকা ও ত্রাস সঞ্চারের পর স্টার সাহেব

অত্যাচার ও পাশবিক নির্যাতনের যে অভূতপূর্ব ভূমিকা গ্রহণ করলেন তার কোন উপমা নেই।

পশুশক্তি যখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, তখন তার কাছে করুণা ভিক্ষা করা পাপ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার সাম্রাজ্য রক্ষার্থে ও নিস্পেষণ চালাতে সুটার সাহেবের মত আরও অনেক অত্যাচারীকে নিযুক্ত করবে। শত্রুর অত্যাচার ও নিপীড়ন সম্বন্ধে কোনো প্রকার ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অভিমানভরে প্রতিবাদ জানাবার ইচ্ছে আমার নেই। অবলার মত ক্রন্দন—"সুটার সাহেব বড় নির্দয়, বৃটিশ সরকারের আইন সে মানে নি···", ইত্যাদি আমার বক্তব্যের মূল কথা নয়। ইংরেজ সরকার অত্যাচার করেছে—ধনিকতন্ত্র যতদিন বজায় থাকবে ততদিন ধনিকশ্রেণীও শোষিত জনগণের ওপর অত্যাচার চালাবে। সুতরাং শ্রেণীসংগ্রাম লুপ্ত হবে—রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে—এটা যেমন মিথ্যা ও অবাস্তব, ঠিক তেমনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ ভারতের বুকে চলতে থাকবে আব সুটার সাহেবের দল তাদের প্রভুত্ব বাজায় রাখতে ভারতীয়দের প্রতি নির্মম, নিষ্ঠুর ও নির্দয় হবে না—মুর্খের মত এরকম বিলাপ আমি করবো না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের কাঠামোতে সুটার সাহেব যে অত্যাচার চালিয়েছিল তা সরকারী স্বার্থেরই পরিপন্থী। কাজেই অত্যাচার আরও চরমে উঠলেও অভিযোগ করবার কিছু নেই। আমাদের কেবল উপলব্ধি করবার বিষয়—সাম্রাজ্যবাদী চক্রের ধনিকতন্ত্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পূর্বে, অর্থাৎ যতক্ষণ না শ্রেণী সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটছে—অর্থাৎ যতক্ষণ মনুষ্যসমাজ সমাজতন্ত্রবাদের একেবারে শেষধাপে উপনীত হতে না পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অসংখ্য জনগণের ওপর মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণীর অত্যাচার ও নিপীড়নের অবসান ঘটতেই পারে না।

সুটার সাহেব লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস সহোদরদেরই বংশধর—তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে ভারতীয়দের উপর প্রভুত্ব করবার জন্য বিলেত থেকে বিশেষ শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। পশুশক্তির ভিত্তিতে বেআইনীভাবে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা শাসকশ্রেণীর জন্য নয়—শাসিত ও নিস্পেষিত ভারতবাসীর জন্য। বৃটিশ রাজশক্তির দোর্দণ্ড প্রতাপের নমুনা দেখিয়ে এবং নানা প্রমাণ রেখে সুটার সাহেব বন্দী হরিপদকে নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম পরিভ্রমণ করলেন।

স্কুলের ওপর সুটার সাহেবের "আক্রমণ-লীলা" শেষ হলেও তার কর্মসূচীর প্রধান অংশ তখনও বাকি। এবার সেই শেষ অঙ্ক সুরু হ'ল। পুলিসের তালিকায় Indian Republican Army, Chittagong Branch-এর প্রথম শ্রেণীর

সৈনিকদের নাম ছিল। স্টার সাহেব বেছে বেছে তাদের বাড়ি আক্রমণ করলেন। তারকেশ্বর দস্তিদার, অর্ধেন্দু দত্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, নির্মলদা, শচীন সেন, প্রমুখ আরও অন্যান্য বিপ্লবীদের বাড়ি সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করে বাড়ির লোকজনদের প্রচণ্ড মারধোর ও আসবাবপত্র সব ভেঙেচুরে তছ্‌নছ্‌ করা হ'ল। সৈন্যদের ওপর ঢালাও হুকুম হ'ল—ভাঙ, মার, খেদাও, কেরোসিন ছড়াও, পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগাও।

এইভাবে ঝড়ের মত হানা দিয়ে ভেঙ্গেচুরে সকলকে প্রহার ও অপমান করে এবং ইংরেজী ভাষায় অকথ্য গালিগালাজ দিয়ে প্রতিটি বাড়িতেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। নিজেদের এই সর্বনাশে অসহায় গ্রামবাসী নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। আর মদমত্ত স্টার! সৈন্য-বলে বলীয়ান স্টার মনে মনে ভাবছেন, এইরকম বিভীষিকা সৃষ্টি করেই বুঝি বিপ্লবী শক্তিকে খর্ব করবেন! কিন্তু পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাস সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির এই দুরাশার বিরুদ্ধে অভ্রান্ত সাক্ষ্য দেয়—বিপ্লবের পরাভব নেই, শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী শক্তির জয়ই অবশ্যম্ভাবী।

অর্বাচীন স্টার সাহেবের তখন ভবিষ্যত নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিলনা এবং তার প্রয়োজনও মনে করেন নি! সেই সময় তিনি চট্টগ্রামের যুব-শক্তিকে খর্ব করবার দায়িত্ব নিয়েছেন! এই কর্তব্যপালনে যে কোন প্রকারেই হোক্ যুবক-মনে ত্রাস সঞ্চারের নীতি অবলম্বন করতে হবে। তাঁর বাসনা—চূড়ান্ত নিপীড়নে বিপ্লবীদের দরদী বন্ধু ও সমর্থকদের ভয় দেখিয়ে Indian Republican Army-কে কোনরূপ সাহায্য দানে বা সহানুভূতি প্রদর্শনে বিরত করা। চরম অত্যাচারের বিভীষিকাময় আদর্শ স্থাপনের প্রয়াসে সৈন্যদল সঙ্গে স্টার সাহেব শৃঙ্খলিত হরিপদকে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে তার গৃহে হানা দিলেন—হরিপদর মাকে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে পুত্রের সামনে উপস্থিত করা হ'ল। বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণকারী ইংরেজ শাসকের কাছে দেশপ্রেমিক পুত্রের গর্ভধারিণীর অপরাধ তো সামান্য নয়! তাই আইন-আদালত ছাড়াই মাকেও নিশ্চয়ই স্টার সাহেবের দরবারে শাস্তি পেতে হবে! মায়ের চোখের সামনেই আঘাতের পর আঘাতে হরিপদ অজ্ঞান হয়ে পড়লো—মায়ের আকুল ক্রন্দন সাহেবকে একতিল কর্তব্যচ্যুত করতে পারলো না! খানিক পরেই জ্ঞান হতে হরিপদ দেখলো তার বাবা একটা খুঁটির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এবং সারা বাড়িতে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগাবার জন্য গুর্খা সৈন্যদের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

দশ বারোজন সেপাই ছুটোছুটি করে বাড়ির চতুর্দিকে কেরোসিন ছিটিয়ে দিল। আগুন লাগাবার আগে স্টুটার সাহেব হরিপদর বাবাকে ক্ষিপ্ত রূঢ়কণ্ঠে সমানে প্রশ্ন করতে লাগলেন—"কেন তোমার ছেলে হত্যা করেছে? কেন তুমি তাকে সামলাতে পার নি? —জবাব দাও …।" কিন্তু কোনো উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই নিষ্ঠুর প্রহারে বন্দী পুত্রের সামনে পিতাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুললেন। পিতামাতার উপর এই জঘন্য নৃশংসতা শৃঙ্খলিত নিরুপায় হরিপদকে মুখ বুজেই সহ্য করতে হ'ল!

বাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। মাটির ও বাঁশের ঘর আর টিনের চালা—চারিদিক ফুট্ ফাট্ আওয়াজে মুখরিত। স্টুটার সাহেব হরিপদকে নিয়ে আবার রওনা হলেন। যেতে যেতেও হরিপদ দেখতে পেল তার বাবা তখনও খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছেন। হরিপদ আমাকে নিজ মুখে বলেছে—"বাবার সেই করুণ অসহায় অবস্থা দেখে আমার মন অস্থির হয়ে উঠলো—কি করি? কি করা যায়? প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে জ্বলন্ত টিন-গুলির একটাও যদি ছিটকে এসে বাবার গায়ে পড়ে তবে কি হবে? এই ভয়াবহ দৃশ্যই কেবল আমার চোখের সামনে ভাসছিল। যাবার পথে যতক্ষণ দৃষ্টি গেছে ফিরে ফিরে তাকিয়েছি। ক্রমেই আগুন ব্যাপকতর হ'ল এবং সেই আগুনে আমাদের জ্বলন্ত বাড়ির শেষ পরিণতি দেখবার সুযোগ আমি আর পেলাম না।. মাঝে মাঝে কেবল বাঁশ ফাটার শব্দ আমার কানে আসছিল। যা হবার তাই হ'ব—বিচলিত হই নি বটে, তবু মা-বাবার কথা না ভেবেও পারি নি। কেবলই মনে হয়েছে—বাবার কি হ'ল? মা কোথায়? বাবাকে কেউ কি মুক্ত করে নিয়ে গেছে? মা-বাবার ওপর বৃটিশের এই আক্রোশের কারণ বুঝি এবং সেই জন্যে মানসিক প্রস্তুতিও ছিল। কিন্তু ভাবনা চিন্তা ও বাস্তব ক্ষেত্রে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, আগে তা' বুঝি নি…।"

গ্রামবাসীর মনে আতঙ্ক সঞ্চারের উদ্দেশ্যে নির্মম অত্যাচারে নিপীড়িত শৃঙ্খলাবদ্ধ হরিপদকে গ্রামের হাটে-বাজারে ঘোরানো হ'ল—স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দেরাও অসহ্য অপমান ও দৈহিক অত্যাচারের হাত হ'তে রেহাই পেল না। গ্রামের বিশেষ বিশেষ বাড়িগুলি আগুনে ভস্মীভূত হ'ল। এই তাণ্ডব ও বহ্ন্যুৎসব সমাপ্ত করে সন্ধ্যে সাতটা আটটায় স্টুটার সাহেব সদলবলে শহরে ফিরে এলেন।

নিরপরাধ গ্রামবাসীর ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে নির্বিচারে অসহায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে মদমত্ত হস্তীর মত স্টুটার

সাহেব বৃটিশ সরকারের প্রচণ্ড পশুশক্তির পরিচয়ে সারা দেশে আতঙ্কের সঞ্চার করলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেদিনকার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার চিহ্ন তাতে ঢাকা পড়ে নি, বরং তা' আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বীরত্বের মিথ্যা দম্ভে ও অহঙ্কারে আচ্ছন্ন সুটার! তুমি সেদিন জানতেও পারনি তোমার পৌরুষ, তোমার বীরত্বের দীনতাকে সেদিন শত ধিক্কারে জর্জরিত করেছে। তোমার মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় নি—তোমাকে কলকাতায় University Service Club-এ আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে!

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার আশা করেছিল—অত্যাচার ও নিপীড়নের এই বিভীষিকা চট্টগ্রামবাসীর মানসিক শক্তি খর্ব করবে। সরকারের সে আশা অপূর্ণ রয়ে গেল—বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রামবাসী অত্যাচারের ভয়ে মাথা নত করলো না—তাদেব রোষবহ্নিতে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন হ'ল—বাংলার যুবকদল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ধলঘাটে ক্যাপ্‌টেন কেমারনকে ও কুমিল্লায় পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এলিসন্‌ সাহেবকে বিপ্লবীদের গুলীতে প্রাণ দিতে হ'ল—ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুর্নকে তাঁর অপকীর্তির উপহারস্বরূপ শরীরে গুলীর চিহ্ন ধারণ করতে হ'ল—বোমা ও রিভলভারের মুখে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর সাহেব-ক্লাবকে এই অত্যাচারের ঋণ পরিশোধ করতে হ'ল।

সাম্রাজ্যবাদীরা পশুশক্তির বলে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে মানুষের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার মিথ্যা স্বপ্নই কেবল দেখলো! এঙ্গেলসের কথায়—

"Well contested battle even if defeated it will have the same morale effect as is the easily won victory"—(সহজসাধ্য জয়ের তুলনায় সুপ্রতিযোগিতামূলক যুদ্ধে যদি শেষ পর্যন্ত পরাভবও সূচিত হয়, তবু সেই পরাজয়ও জয়ের সমতুল্য)।

বিপ্লবী যুব-সমাজ যখন অত্যাচারের বদলে অত্যাচার, হিংসার বদলে প্রতিহিংসা, রক্তের বদলে রক্ত, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন সাধারণ চট্টগ্রামবাসীরাও এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। সারা বাংলায় এই নৃশংসতার খবর ছড়িয়ে পড়লো। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন তখন কলকাতায়। তাঁর কাছে বিভিন্ন সূত্রে খবর গিয়ে পৌছলো। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে সভা আহূত হ'ল। সভাগৃহে জন-সমাগমে তিল ধারণেরও স্থান নেই। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রস্তাব পাশ হ'ল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সভাপতিত্বে বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হ'ল।

কমিশনের অন্যতম তুইজন সদস্য—দেশপ্রাণ শাসমল ও বাংলার অন্যতম কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহন তদন্তের জন্য চট্টগ্রামে এলেন।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যতীন্দ্রমোহনের আগমনে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন—আহত অভিমানে ভাবতে লাগলেন—এ কি! যতীন্দ্রমোহন কংগ্রেসের একজন খ্যাতনামা কর্মী, অহিংসাবাদের একনিষ্ঠ পূজারী, গান্ধীজীর একান্ত অনুগত ভক্ত—তিনি কেন বিপ্লবীদের সমর্থনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করবেন—তিনি কেন হিংসাত্মক কাজ দমনে ইংরেজ শাসকের অপরিহার্য দমননীতির অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন?

প্রথম রাউণ্ড-টেবিল কন্‌ফারেন্সের শোচনীয় পরিণতির পর, ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী গান্ধীজীকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হ'ল। ১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন্ প্যাক্ট বা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল। গান্ধীজীর সর্ত অনুযায়ী আইন-অমান্য আন্দোলনে ধৃত সমস্ত কংগ্রেসকর্মী মুক্তি পেল। হিংসাত্মক কার্যে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তির দাবিতে গান্ধীজী বড়লাট আরউইন্‌কে কোন অনুরোধ জানালেন না। এমন কি দেশবাসীর একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেও-এর প্রাণদণ্ড রোধের জন্যও কোন দাবি বড়লাটের কাছে পেশ করা প্রয়োজন মনে করলেন না। ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ তাঁদের ফাঁসি হয়ে গেল। বৃটিশের Divide and Rule (বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা) নীতির জয় হ'ল —কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা কর আর কঠোর হস্তে বিপ্লবীদের দমন কর। তাইতো শাসকগোষ্ঠী পুলিসের এক অত্যাচারী খাঁ বাহাতুরের হত্যাকে উপলক্ষ করে বিপ্লবী চট্টগ্রামকে সায়েস্তা করবার জন্য এইরূপ নৃশংস দমননীতি চালালেন!

ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবীদের প্রাণদণ্ড রহিত করার ব্যাপারে স্বয়ং গান্ধীজীই যখন সম্পূর্ণ উদাসীন, তখন যতীন্দ্রমোহন কেন চট্টগ্রাম শাসকগোষ্ঠীর এইরূপ হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও নৃশংস দমন নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত করতে এলেন? জেলা-শাসকগোষ্ঠীর তাই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের প্রতি অভিমান!

যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে এই বেসরকারী তদন্ত কমিশন শহরের বিভিন্ন স্থানে ও বাড়িতে অনুসন্ধান চালালেন। প্রতিটি বাড়িতে নির্মম নির্যাতনের চিহ্ন দেখে এবং গৃহবাসী ও পাড়াপড়শীর কাছ থেকে অত্যাচার ও জুলুমের কাহিনী শুনে তাঁরা স্তম্ভিত হলেন। প্রধান বাণিজ্য অঞ্চল আন্দরকিল্লা ও লামার বাজারের শোচনীয় দৃশ্য দেখে যতীন্দ্রমোহন তাঁর ভাবাবেগ সংবরণ করতে পারলেন না। কি ভীষণ ভয়াবহ মর্মান্তিক দৃশ্য! সব দোকানপাট পুড়ে ছাই হয়েছে—

আশেপাশের সব বাড়িঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কত স্ত্রী-পুরুষ শিশু সন্তানদের হাত ধরে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন! চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে মা-বোনেরা লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, প্রৌঢ় ও যুবকেরা চরম অত্যাচারে নিপীড়িত বিধ্বস্ত! তবু সকলে পুলিসী জুলুমকে ভ্রুক্ষেপ না করেই তদন্ত কমিশনের কাছে নিদারুণ ঘটনাবলীর বিবরণদানে এগিয়ে এলেন। ঘটনাস্থলে বাইরের আগুন নিভলেও তাদের বুকের আগুন তখনও নেভে নি—অন্তরের ক্ষতস্থান হতে তখনো রক্ত ঝরছে!

ইংরেজ বণিকেরা সেইদিন চট্টগ্রামের বুকে আগুন জ্বালিয়ে সারা বাংলার জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তদন্ত কমিশন বুঝতে পেরেছিল, বাংলার জনসাধারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের এই জুলুম নীরবে সহ্য করবে না।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সভাপতিত্বে বেসরকারী তদন্ত কমিশন এই নির্মম নিদারুণ অত্যাচারের বিভিন্ন ক্ষয় ক্ষতি ও ধ্বংসের নানারূপ তথ্যপূর্ণ ফটোগ্রাফ ও সাক্ষী-সাবুদ সংগ্রহ করেন এবং এই করুণ কাহিনী দেশবাসীকে জানানো একান্ত প্রয়োজন মনে করেন। শ্রীমান আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত লিখিত "চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী" পুস্তকের ১৯২ পৃষ্ঠা হতে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাব সমর্থন করে যতীন্দ্রমোহন এই দাঙ্গা প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করলাম ঃ—

"I have personally inspected the places where these occured. I have visited the houses which have been destroyed. I have visited a printing press which has been broken to picees, I am sorry to say, by some non-offiicial Europeans. (This press belonged to the Chittagong Printing and Publishing House Ltd. from which the daily 'Punchajanya' is published). I have visited the villages where poor woman's houses have been destroyed and burnt in the middle of day not by Mahomedans not by paid hooligans but by the so called protectors of the peace, the police, the British Officers and the Gurkhas. Therefore it does not to my mind require any investigation. One has to merely go and witness the havoc, the destruction of houses in the town and in the villages. One need not

do anything but merely look at the severe injuries which still remain on the bodies of persons on whom these injuries were inflicted."

তদানীন্তন বাংলা সরকার এতে প্রমাদ গুণলেন ! অবস্থা বেগতিক দেখে এই বেসরকারী তদন্ত কমিশনের রিপোর্টটিকে অসত্য প্রমাণ করবার জন্য বাংলার লাট ডিভিশনাল কমিশনার মিঃ বেলকে ও পুলিস ইন্স্পেক্টার জেনারেল মিঃ ক্রেগকে সরকারীভাবে বিভাগীয় (Departmental) তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত করলেন। বেল-কমিশনের তদন্ত ও পুলিসের বিভাগীয় তদন্ত শেষ হ'ল বটে, কিন্তু বাংলার লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলে সরকারী তদন্ত কমিশনের রিপোর্টটিকে উপস্থিত করার জন্য "উদারপন্থী" কাউন্সিলারেরা পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও এই সরকারী রিপোর্টটি উপস্থিত করতে তাঁরা সাহসী হলেন না।

আমার সুস্পষ্ট মনে আছে—আমাদের মামলা চলাকালে আমি কয়েকজন উচ্চপদস্থ বাঙালী পুলিস অফিসারকে জিজ্ঞেস করি, "মামলায় সরকারী রিপোর্টটি অন্তত জনসাধারণের সামনে রাখা হচ্ছে না কেন ?" উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন —"কি করে এই রিপোর্ট প্রকাশ করবে ? বিশেষ করে ছ'টি ঘটনার কোন যে সমর্থনই তাঁদের পক্ষে নেই—পৃথিবীতেও বোধহয় এইরূপ নজীর আর নেই যে, রাত্রিবেলা কেবল সাহেবরা গিয়ে ছাপাখানার মেশিন ভেঙেছে এবং পরের দিন গ্রামে গ্রামে অতগুলি ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। যদি বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ বিক্ষোভের মুখে প্রেস ভেঙেছে ও গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালিয়েছে বলে কোন নজীর সরকার দেখাতে পারতো, তবে হয়ত বা জেলা-শাসকদের কীর্তি সমর্থন করে সরকারী রিপোর্টটি রচনা করা সম্ভব হ'ত। যে সরকার জনসাধারণের রক্ষক, ন্যায়দণ্ডের প্রতীক—তার হাতেই যদি জনসাধারণের প্রেস, সম্পত্তি, ধন প্রাণ—কোন কিছুরই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না থাকে, তবে স্বভাবতই জনসাধারণ সেই সরকারের ওপর আস্থা হারাবে। যদি সরকারী রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় তবে ন্যায় ও ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুনিয়াদ মুহূর্তেই যে পৃথিবীর কাছে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে ! কাজেই সরকার কি কখনও রিপোর্টটি প্রকাশ করতে পারেন ?"

দ্বিতীয় রাউণ্ড-টেবিল-কন্ফারেন্সে বিফলমনোরথ হয়ে গান্ধীজী লণ্ডন হতে ভারতে ফিরলেন। বড়লাট আরউইন্ ভারতের কার্যভার লর্ড উইলিংডনকে অর্পণ করে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন। নতুন পলিসি নিয়ে নতুন বড়লাট লর্ড উইলিংডন কঠোরহস্তে ভারত শাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। দ্বিতীয় গোল-

টেবিল-বৈঠক বিফল হওয়ার পর গান্ধীজী আবার আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত হতে বললেন। কিন্তু ভারতব্যাপী এই আইন-অমান্য আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা ভারত সরকারকে যে কতখানি বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে এবং এই গণ-আন্দোলন যে কতখানি হিংসার আগুন ছড়িয়ে দিতে পারে, তা সম্যক উপলব্ধি করাবার উদ্দেশ্যেই বোধহয় আইন-অমান্য আন্দোলনের ডাক দেবার আগে গান্ধীজী আর একবার শেষবারের মত লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। বড়লাট বাহাদুর গান্ধীজীর এই সাক্ষাৎ প্রার্থনা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন।

ভগৎ সিংহের ফাঁসি, চট্টগ্রামের ওপর এইরূপ চরম নিপীড়ন, গোল-টেবিলের মরীচিকা, গান্ধীজীর বড়লাট সাক্ষাৎ প্রার্থনা নামঞ্জুর, প্রভৃতি জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো। আবার সাজ-সাজ রব পড়ে গেল! ভারতের আকাশ আবার ঘন গাঢ় কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে এলো। বিক্ষুব্ধ-ভারত ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হ'ল।

ভগৎ সিংহের ফাঁসির পর প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলাশাসক মিঃ পেডি প্রাণ হারালেন। ১৯৩১ সালের ২৭শে এপ্রিল—তখনও দীনেশ মজুমদারের প্রাণদণ্ডের জাজ্-মেণ্টের কালি শুকিয়ে ওঠে নি—আলিপুরের সেসন্ জজ মিঃ গার্লিকের বুক লক্ষ্য করে বিপ্লবীর বন্দুক অব্যর্থ লক্ষ্যে গর্জে উঠল; হরিপদর গুলীতে অত্যাচারী খাঁ বাহাদুর আসানুল্লাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল। একের পর এক এইরূপ বৈপ্লবিক ঘটনা সংঘটিত হতে লাগলো।

আইন-অমান্য আন্দোলন আবার স্থরু হলে আন্দোলন অপ্রতিহত গতিতে চলার পথে বিক্ষুব্ধ জনগণ যে হিংসাত্মক বৈপ্লবিক পথ নিতে বাধ্য—এই বাস্তবতার উপলব্ধি আর কারও না থাকলেও গান্ধীজীর যে ছিল, সেই সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বাংলার কংগ্রেস নেতারা বাংলার বিপ্লবী যুব-সমাজকে কখনই উপেক্ষা করতে পারেন নি। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন প্রমুখ শহীদদের আত্মদানের প্রভাব ও বাংলার বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য বাংলার মাটিতে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল তার গভীর প্রেরণা থেকে গান্ধীজীর অনুগত কংগ্রেস নেতারাও নিষ্কৃতি পান নি।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনও বাংলার বৈপ্লবিক বানের স্রোত হতে নিজেকে সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। আসানুল্লা হত্যার পর যে অত্যাচার সারা

বাংলাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে, তার রিপোর্টটি বৃটিশ পার্লামেন্টের হাউস-অফ-কমন্সে উপস্থিত করবার জন্য যতীন্দ্রমোহন সস্ত্রীক ইংলণ্ডে যান। সেখানে বহু স্থানে তিনি ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে বর্বরোচিত ঘটনাবলীর বিবরণের মাধ্যমে অবৈধ ইংরেজ শাসনের জঘন্যরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন।

এই পৈশাচিক ঘটনার খুব সামান্য বিবরণ শ্রীপূর্ণেন্দু দস্তিদারের "স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম" গ্রন্থে পাই। পূর্ণেন্দু দস্তিদার জালালাবাদ যুদ্ধের শহীদ অর্ধেন্দু দস্তিদারের বড় ভাই। অর্ধেন্দুর পরের ভাই সুখেন্দু দস্তিদার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আমাদের সঙ্গে আন্দামানে বন্দী ছিল এবং এক সঙ্গে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই পূর্বপাকিস্তানে সক্রিয়ভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে আত্মগোপন করে আছে। তাব অন্যান্য ভাইয়েরাও কম্যুনিস্ট। পূর্ণেন্দু দস্তিদার কৃতী ছাত্র ও একজন এম, এল, এ। প্রাক্ আয়ুবশাহী নির্বাচনে অসংখ্য ভোটের অধিকারে তিনি আইন সভায় নির্বাচিত হন। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের এই পুস্তকখানির প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৭৪ সাল। মনে হয় আসাহুল্লা হত্যার কিছুটা বিবরণ পূর্ণেন্দুর এই পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করলে পাঠকবর্গের কাছে তা' বিশেষ সমাদৃত হবে। এই পুস্তক পূর্বপাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার লিখেছেন—"এই অত্যাচারের সংবাদ চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠানো হয়। সেখানে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে বিরাট জনসভায় চট্টগ্রামের জনসাধারণের উপর এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনলবর্ষী ভাষায় সুবক্তা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রতিবাদ জানান। এই সভায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতা নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়, বীরেন শাসমল ও দেশপ্রিয়কে নিয়ে এক তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। ঐ বেসরকারী তদন্ত কমিশন চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে গিয়ে পুলিসী বর্বরতার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও লাঞ্ছিতা মা-বোন ও নির্যাতিত সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করেন। শহরে যে সকল লুঠতরাজ ও অত্যাচার ইংরেজ পুলিস কর্মচারীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পরিচালনায় চলে, এই কর্মীদল তারও বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করেন।

"বিশেষ করে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের চেষ্টায় সারা বাংলার জনমত ইংরেজ সরকারের এই সুপরিকল্পিত অত্যাচারের ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিদারুণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার ফলে সরকার—বিভাগীয় কমিশনার মিঃ বেলকে সভাপতি করে একটি সরকারী বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে। ঐ

তদন্ত কমিটির বিভিন্ন সাক্ষ্য গ্রহণের পরে, যে ইংরেজ পুলিস কর্মচারী ঐ সব লুঠতরাজ, নির্যাতন, বলাৎকার ও অন্যান্য অত্যাচার চালানোর জন্য কোতোয়ালি থানায় আহূত এক বৈঠকে উপস্থিত থেকে পরিকল্পনাটি দিয়েছিল, সে কলকাতার এক হোটেলে নিজের রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করে। আর 'বেল তদন্ত কমিটির' রিপোর্টে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের ঘোষিত প্রায় সকল অভিযোগই প্রমাণিত হওয়ায় সে রিপোর্ট আর জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয় নি।

"ঐ সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে তৎকালীন রামজে ম্যাকডোনাল্ডের শ্রমিক মন্ত্রিসভা 'হাউস অফ কমন্স'-এ তাঁকে বক্তৃতা দিতে অনুমতি দেয়। ঐ সভায় যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রামের বুকের উপর পুলিসের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে যে বর্বরতা সংঘটিত হয়েছিল, তার বিবরণ জ্বালাময়ী ভাষায় ইংরেজ পার্লামেণ্টে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেন। ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকারের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হয় নি। তাই কিছুদিন পর দেশপ্রিয় যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন বোম্বাই বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই ১৮১৮ ইং ৩ নং বেঙ্গল রেগুলেশন আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হয়।"

বাংলা সরকার বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মানসিক সংযোগ ও সক্রিয় যোগাযোগ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। আগেই বলেছি বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংযোগ কোন স্তরেই উপেক্ষণীয় ছিল না। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও বিপ্লবীদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগ যতখানি প্রকট ছিল—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে ততখানি ছিল বলে প্রকাশ পায় নি। তবু সরকারী সূত্রে জানতে পারি, যতীন্দ্রমোহনকে পুলিস বিপ্লবীদের সমর্থক বলে জানতো এবং সেই কারণেই শেষপর্যন্ত ভারতরক্ষা-আইন Regulation III-র সাহায্যে বিনা বিচারে দেশপ্রিয়কে আটক করা হয়েছিল। ইংরেজীতে মুদ্রিত গোপন পুলিস রিপোর্ট কলকাতা, ২৫শে জানুয়ারী ১৯৩২, পৃষ্ঠা ৫—৬ থেকে উদ্ধৃত করছি—

"Mr. J. M. Sen Gupta's views in connection of Congress with terrorists—the following extracts from a speech made by Mr. J. M. Sen Gupta a member of the All India Congress Committee show in what light the Congress viewed the detenus, persons who were interned

by Government because they were engaged in terrorists conspiracies and who style themselves 'the front rank fighters in the cause of freedom.' On the 8th March 1931 at the All Bengal Students' Conference Mr. J. M. Sen Gupta said :

'My friends, it seems to me that it was all ordained by Providence. otherwise how is it that when I entered this hall a resolution should actually be under discussion on a question which has been agitating the whole of India and particularly the young minds of Bengal for the past few days ?

'My friends, I am not here to speak on behalf of the Indian National Congress or the Working Committee of the Congress or Mahatma Gandi, the leader of the Indian Nation. I am here as one of you. Mahatma Gandi represents you, me, all men and women of the whole of India. And because both you and I know that you will not, in the interest of your country, in your own interest, in the interest of all that you hold dear to yourselves, pass a resolution which will make you later hang down your heads in shame. (Applause).

'You have not heard Mahatmaji, you do not know the implications of the document issued to the press by the Government of India. Do not be superficial readers. Read that Document through and through. Get to the bottom through. Get to the bottom of the words. Read it carefully and find out what the significance of that document is.

'My friends, you and I know and so also knows Mahatma Gandhi that there can be no peace in India unless every young man is released from prison. (Applause). There is no doubt about that. There is no man

who could have fought with greater ability, with greater strength for the release of these young men than Mahatma Gandhi himself. Remember my friends, that there has been a war and after the war a truce has been declared. I ask you to realise and understand the distinction between truce and peace. But even in this circumstances we did a lot which in ordinary case we could not claim. We got back actually those who were taken as prisoners in the non-violent war.

'With reagard to the violent prisoners I pressed for their release all through and asked Mahatmaji to press for their release before the Viceroy when he met him. But it was found impossible to make the release of those convicted of violent crime a condition precedent of truce. My friends, I do not blame you, because I know that you are all filled with the loftiest of sentiments because all of you feel for those detained without trial. But you do not know that most of the 500 young men who have been interened without trial and without charge are my intimate friends and co-worker in the Congress. (Hear hear). I told this to Mahatma Gandhi and others. I further told Mhatmaji that every one of them is a staunch Congress man—many of them are office-bearers of the different Congress Committee, I have represented their case to Mahatmaji and I have pressed their case before the Working Committee. My friends, you can create such a situation by so strengthening the hands of the Congress and of Mahatma Gandhi that in the course of a few days, in the course of a fow weeks, they will be with us. If you can create such a situation by strengthening your national organisation it would be possible to have

even the 'violence' prisoners released just as the 'non-violence' one's."

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন আইন বাঁচিয়েই এই বক্তৃতা দিয়েছেন—তবু পুলিস এই বক্তৃতাটি সযত্নে তাদের গোপন নথিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে এবং বিভিন্ন গুপ্ত তথ্যের সমর্থনে বিপ্লবী বাংলার সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের সম্পর্ক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে। এই কারণেই ইংলণ্ড হতে প্রত্যাবর্তনের পথে বোম্বাই বন্দরেই Regulation III-তে যতীন্দ্রমোহনকে বন্দী করা হয়।

চট্টগ্রামের অবস্থা ভয়াবহ—চারিদিকেই থমথমে ভাব। সরকারের এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিক্ষোভ অপেক্ষা প্রতিশোধস্পৃহা জনসাধারণের মনে তুষের আগুনের মতই নিরন্তর জলছিল। জেলা-শাসকগোষ্ঠীও সাময়িক উত্তেজনা ও উন্মত্ততার ঝোঁকে নিজ ক্ষমতা লঙ্ঘন করে রাজ্যপালনের পরিবর্তে যে অরাজকতার সৃষ্টি করেছেন, প্রতিমুহূর্তেই তার অশুভ পরিণতির আশঙ্কায় বিচলিত হয়েছেন—এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

চট্টগ্রাম শহরে কার্যত মিলিটারী শাসন চলছিল। সর্বত্রই অস্বাভাবিক অবস্থা। আমাদের মামলাও সাত দিনের জন্য মুলতুবি রাখা হয়েছে।

তিন মাসের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর জেলা জজ জে, ইউনী (ট্রাইব্যুনালের সভাপতি) আমাদের বিচার জেল থেকে আবার চট্টগ্রাম আদালত-ভবনে স্থানান্তরিত করেছেন। জজসাহেবের সুবিধার্থেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। অনির্দিষ্টকাল মামলা চলার আশঙ্কায় জজসাহেব জেলের সাময়িক আদালত-ব্যবহারে নারাজ ছিলেন। আদালত-ভবনে নিজের অফিসের সুবিধে ও আরাম জেলের এই অস্থায়ী বিচার কক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। অগত্যা আমাদের বিচার আদালত-ভবনে হওয়াই সাব্যস্ত হ'ল এবং এই অবস্থায় পুলিস ও মিলিটারীর দায়িত্বও বেড়ে গেল। প্রতিদিন আমাদের জেল থেকে আদালতে আনা এবং আবার জেলে ফিরিয়ে নেওয়া—এই কঠিন কাজের গুরুদায়িত্ব পুলিস কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হ'ল। সাতদিন পর আদালত ভবনেই আবার বিচার সুরু হ'ল। আদালতে প্রবেশ করে মনে হ'ল পুলিস ও মিলিটারীর সংখ্যা দ্বিগুন বাড়ানো হয়েছে এবং তারা অত্যন্ত সজাগ হয়ে পাহারা দিচ্ছে। আদালত কক্ষেও ব্যবস্থার নতুনত্ব দেখা গেল। মামলা চলাকালে এতদিন পর্যন্ত আমরা যে কাঠগড়ায় আবদ্ধ থাকতাম, তার রেলিং-এর উচ্চতা ছিল প্রায় আমাদের গলার সমান। ইচ্ছে করলেই যে-কোন সময়ে যে কেউ রেলিং টপকে শত্রু-পক্ষের কাউকে অনায়াসে আক্রমণ করতে পারতো—কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা

রক্ষার্থে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। সাতদিন পরে আদালত কক্ষে প্রবেশ করে এই পুরনো কাঠগড়ার অস্তিত্ব দেখা গেল না। তার পরিবর্তে Cage-Dock, অর্থাৎ লোহার ডবল জাল দিয়ে ঢাকা একটি পিঁজরা প্রস্তুত করা হয়েছে দেখলাম এবং তাতে ঢোকবার ও বেরোবার মাত্র একটি দরজা। এই খাঁচায় একবার পুরে দিয়ে দরজাটি বন্ধ করলে বেরোনা অসম্ভব।

জেল থেকে আনবার পর আমাদের সকলকে বিচার কক্ষ সংলগ্ন অন্য একটি কামরায় নেওয়া হ'ত এবং প্রত্যেকের শরীর তল্লাসী করে তবেই বিচার কক্ষের কাঠগড়ায় আবদ্ধ করতো।

জেল-বিধি অনুসারে জেল-ওয়ার্ডার আসতে-যেতে জেল-গেটে প্রত্যেকের শরীর তল্লাসী করবে—জেলের এই কড়া নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। আমাদের ক্ষেত্রে এর ওপরেও আরো কঠিন নিয়ম প্রয়োগ করা হ'ল। প্রথমে জেল-কর্তৃপক্ষ ও পরে গোয়েন্দা সাব-ইন্‌স্পেক্টারের অনুমতি ছাড়া কোনও সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসপত্রও আমাদের কাছে পৌছতো না। তাঁরা ঐসব জিনিসপত্র পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হলে তবেই অনুমতি দিতেন। জেল-গেটের তল্লাসী ছাড়াও বিচারকক্ষের নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত পুলিস অফিসারের মনোরঞ্জনার্থে আমাদের শরীর তল্লাসী করা হ'ত।

দিনের পর দিন এই নিয়মই চলছিল। কিন্তু এই রুটিন মাফিক কাজে সেপাই ও হাবিলদারদের শিথিলতা আসা খুবই স্বাভাবিক এবং বাস্তবেও তাদের সেই শৈথিল্য এসেছিল, আর আমরাও তার নানা সুযোগ নিয়েছি। পুলিসের ওপরওয়ালারাও নিজেদের ভেতরকার এই দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। খাকী পোশাক পরিহিত পুলিস রক্ষীরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারতো না—কি জানি তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের প্রতি যদি আকৃষ্ট হয় এবং আমরা তাদের সাহায্যে তাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র যদি যোগাড় করি! আক্রমণাত্মক দুরভিসন্ধি বা ষড়যন্ত্রের কথা ভেবেই কর্তৃপক্ষ আমাদের বার বার তল্লাসী করা এবং পুলিসের ওপরে পুলিস নিয়ে Check করার পদ্ধতি বা System চালু রেখেছিলেন।

সাতদিন পরে আবার বিচার আরম্ভে আদালতের নিরাপত্তার জন্য পুলিস-কর্তৃপক্ষ কঠোর সাবধানতার চরম পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। স্টুটার সাহেব স্বয়ং আমাদের প্রত্যেকের শরীর সার্চ করবেন। প্রত্যেককে আলাদা করে একটা সুরক্ষিত ঘরে নিয়ে গেল। এই ঘরের ভেতরে সাত-আটজন সশস্ত্র সেপাই উদ্যত রাইফেল হাতে যেন কেবল আদেশের অপেক্ষায় আছে। আমাদের

এক-একজনকে নিয়ে স্টার সাহেব স্বয়ং ঘরে প্রবেশ করছেন—তাঁর ঠোঁটে বাঁকা হাসি। সকলকেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তল্লাসী করা হ'ল। মূর্খ স্টার—মূর্খ পুলিসের উর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ। কোন প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাই বিপ্লবী দৃঢ়তার কাছে যথেষ্ট নয়। বিপক্ষ দলের শত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাকে বিপর্যস্ত বা বিধ্বস্ত করার উপায় থাকবেই—নতুন নতুন আক্রমণ পদ্ধতির কখনও শেষ নেই! বিপ্লবী সংগ্রামের অসংখ্য ইতিহাস পড়ে এবং আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে অব্যর্থ সত্য হিসেবে বুঝেছি, বিপ্লবীরা যদি অন্তরে পরাজয় মেনে না নেয়, তবে প্রবল শত্রুর প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধেও আক্রমণের নতুন নতুন কার্যকরী উপায় আবিষ্কার করা কখনই অসম্ভব হয়না। তাই স্টার সাহেবের বাঁকা হাসি আমাদের মনে বৈপ্লবিক দৃঢ়তা দৃঢ়তর করতেই সাহায্য করেছিল। এর প্রমাণ কিছুকাল পরে কর্তৃপক্ষ পেয়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আক্রমণ প্রস্তুতি অব্যাহত থাকবে।

সাতদিন পর কোর্টে আমাদের পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টারদের দেখেও মনে হ'ল, তাঁরাও নিরীহ জনসাধারণের ওপর সরকারের এই বর্বরোচিত অত্যাচারে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। প্রেস রিপোর্টারদের মুখেও সেই একই বিক্ষুব্ধ ভাব—এই অত্যাচারের কি প্রতিবাদ নেই—প্রতিকার নেই—প্রতিশোধ নেই! গ্যালারীতে উপবিষ্ট আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই একেবারে চুপচাপ, স্থির গম্ভীর! এঁদের কারও মুখে কথা নেই—প্রত্যেকেই অপমানিত, লাঞ্ছিত ও চরম নির্যাতিত হয়েছেন। তাঁরা কালারপোলের শহীদ মনোরঞ্জনের পিতাকে (এই কোর্টেরই উকিল) পুলিসের উন্মত্ত তাণ্ডবে চিরকালের মত হারিয়েছেন,—সার্জেণ্ট কেলীর বুটের লাথিতে অকালেই তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন। এই সব নির্মম অত্যাচারের ঘটনায় সকলেরই মন ভারাক্রান্ত—ভবিষ্যতের চিন্তায় অধীর। তাঁদের ধারণা হয়েছিল আমরা এই অত্যাচার মুখ বুজে কোনমতেই সহ্য করবো না। কাজেই আরো বিপদ, আরো অত্যাচার ঘনিয়ে আসবে এবং আমাদের মামলা চালানো সুকঠিন হয়ে পড়বে। এই সব চিন্তা করে শেষ পরিণতির কথা ভেবেই তাঁরা কোন কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না।

জামিনে মুক্ত আমাদের অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে সাতদিন পরে কাঠগড়ায় আবার দেখা হ'ল। প্রত্যেকের শরীরেই আঘাতের চিহ্ন। তাদের মধ্যেই একজন সাথী তার অজস্র ক্ষতের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে অভিযোগ ও অভিমানের সুরে বলল—

"দেখুন এইসব ক্ষতচিহ্ন। আমার বাড়ির মা-বাপ, ভাই-বোন—কাউকেই

পুলিস রেহাই দেয় নি। প্রত্যেকেই অকথ্য অপমান ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে জর্জরিত···। আপনারা তো আমাকে বিশ্বাস করতেন না—সব সময় সন্দেহের চোখে দেখতেন।"

সত্যিই আজ এই সাথীর যেন দুঃখ রাখার জায়গা নেই—এত বড় পৃথিবীতে দাঁড়াবার সামান্য স্থানও যেন তার নেই! সে সাথীদের সন্দেহভাজন—এ তথ্য পুলিসের জানা থাকা সত্ত্বেও তাদের অত্যাচার থেকে সে রেহাই পায় নি। এই অবস্থার মানসিক প্রতিক্রিয়ায় সে একান্ত বিষণ্ণ ও ব্যথিত, তবু এই সাথীর প্রতি সমবেদনা থাকলেও তার কথার জবাবে অপ্রিয় সত্য বলতে আমার দ্বিধা হ'ল না। আমি তাকে স্পষ্টই বললাম—

আমি—"সত্যিই আমরা তোমাকে আগে বিশ্বাস করি নি।"

প্রশ্ন—"আমার দেহের এইসব ক্ষতচিহ্ন দেখে এখন কি বিশ্বাস করতে পারেন?"

আমি—"হ্যাঁ, এখন বোধহয় বিশ্বাস করতে পারি।"

প্রশ্ন—"আমাকে বিশ্বাস করবার পর যদি আমি পুলিসের চর হই?"

আমি—"তখন আমি তা' ঠিক বুঝতে পারব।"

সাথীটি আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

আমি কখনই কাউকে সুদীর্ঘদিন জেলখাটার মাপকাঠিতে বা কে পুলিসের কাছে কতখানি লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নির্যাতিত হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক সঙ্ঘে গ্রহণের যোগ্য বলে মনে করি নি—এটাই আমার জীবনের শিক্ষা। কাউকে পুলিস আহত করেছে বলেই তার রক্তাক্ত দেহ দেখে ভাবপ্রবণ মন নিয়ে তাকে বিশ্বাস করা বিপ্লবী সঙ্ঘের মূল নীতিবহির্ভূত—এই বাস্তব উপলব্ধিই রূঢ় সত্য বলতে আমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে নি।

এই সাথীটিকে বিভ্রান্ত করে যুব-বিদ্রোহের কিছুকাল আগে থেকেই পুলিসের ডি, এস, পি,-কে মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করার পূর্ণ সুযোগ আমরা নিয়েছিলাম। পুলিস জেনেছিল আমরা লবণ-আইন ভঙ্গ না করে Sedition Law উপেক্ষা করবো।

আমরা পুলিসকে বিভ্রান্ত করে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ সুগম করেছিলাম। পুলিস সেই কারণে এই "সাথী"-কেও সন্দেহ করলো—ভাবলো সেও বোধহয় সুপরিকল্পিতভাবে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে তাদের বিভ্রান্ত করেছে। কাজেই তাকেও পুলিসী জুলুমের শিকার হতে হয়েছে। পুলিসী জুলুমের শিকার হয়ে

সাময়িকভাবে তার যে বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে, সেইটুকুর মূল্য দিয়েই তাকে তখনকার মত আমি বিশ্বাস করতে পারি, এই কথাই বলেছিলাম।

বহু বছর পর যখন চীন-ভারত পঞ্চশীলের যুক্ত দায়িত্ব বহন করছিল, তখন চীন দেশের একটি ছায়াচিত্র—TRAP ছবিটি কলকাতার কোনো চিত্রগৃহে আমার দেখবার সুযোগ হয়। তাৎপর্যপূর্ণ ছবিটি দেখে আমার এই সাথীটির ঘটনা মনে পড়ে গিয়েছিল। ছবিটির মূল বিষয়বস্তু এইরূপ—জেলের নির্জন কক্ষে এক প্রৌঢ়া বিপ্লবী রমণী কালাতিপাত করছেন। হঠাৎ বাইরে শোনা গেল রমণীকণ্ঠের চিৎকার। পরক্ষণেই দেখা গেল অল্পবয়স্কা একটি মেয়েকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় সেই একই কক্ষে ছুঁড়ে ফেলা হ'ল। মেয়েটির মাথা থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে। প্রৌঢ়া ছুটে গিয়ে সযত্নে তার মাথা কোলে নিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করলেন। তারপর উভয়ের বৈপ্লবিক পরিচয় বিনিময় হ'ল। প্রৌঢ়া সেই মেয়েটিকে গুপ্ত দলের কর্মকেন্দ্রের কথা বলে ফেললেন। ঠিক সময় মেয়েটির ডাক এল—সে মুক্তি পাবে।···এই মেয়েটি—পুলিস স্পাই—পুলিসের গুপ্তচর।

ছবিটি দেখে সেদিন আমার কিছু শেখার ছিল না। আমার ভাল লেগেছিল—আমি কখনও নির্যাতনের ডিগ্রী হিসেব করে কাউকে বিশ্বাস করি নি এবং কারও গোপন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে যোগদানের যোগ্যতা আছে কিনা বিচার করি নি। যে অধিকারে আমি সবাইকে সন্দেহ করেছি, সেই অধিকারেই আমি সকলকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছি—সর্বস্তরে আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে কেউ যেন কসুর না করে।

মামলার দু'টি বছর জেলে ও আদালতে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের দিন কেটেছে। আদালত কক্ষে ছোটখাটো ঝগড়াঝাঁটি প্রায় লেগেই থাকতো, আবার জেলেও কিছু-না-কিছু গণ্ডগোল হামেশাই চলতো। বহু দিনের ঘটনা—কাজেই আজ লিখতে গিয়ে হয়ত কিছুটা আগে-পিছে হয়ে যাচ্ছে। মোট কথা এই দু' বছরের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার কিছু কিছু উল্লেখ করছি। প্রতিদিনের নানা খুঁটিনাটি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আবার আমাদের জেল ভাঙা ও বিস্ফোরকের সাহায্যে শহর আক্রমণের পরিকল্পনাও সমান তালে চলেছে। আগে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির উল্লেখ করে তারপর যুব-বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্বের সার্বিক প্ল্যান ও ঘটনার বিবরণ দেবো।

আসানুল্লা হত্যার ঠিক এক বছর আগে, ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট, ঢাকায় পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হাড্সন ও মিঃ লোম্যানকে (আই, জি, পি,) গুলী করা হয়। ঘটনাস্থলে কেউ ধরা পড়ে নি। এই সংবাদ সেই সময় আমাদের

খুব উৎসাহিত করেছিল। আমরা আকুল আগ্রহে বাংলায় বিপ্লবীদের কর্মসূচীর বাস্তব প্রয়োগের প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমরা যত উৎসাহী হয়েছি কর্তৃপক্ষ ততোধিক বিব্রত বোধ করেছেন।

আই, জি, মিঃ লোম্যানের স্থলে মিঃ ক্রেগ্ ইন্স্পেক্টার জেনারেলের পদে বহাল হলেন।

মিঃ ক্রেগ্ পুলিসের কাজকর্ম পরিদর্শনে চট্টগ্রামে এলেন। আমরা জেলে ও আদালতে বিভিন্ন পুলিস সার্জেণ্ট, সাব-ইন্স্পেক্টার ও ইন্স্পেক্টার প্রমুখের সঙ্গে কথা বলার প্রচুর সুযোগ পেতাম। সেই সুযোগে আমরা জানতে পারলাম মিঃ ক্রেগ্ জেলা-পুলিস-অফিস পরিদর্শনে তিন দিনের জন্য চট্টগ্রামে আসছেন। জেলে বসে সচরাচর এইরূপ সংবাদ পাওয়া কঠিন। অনুসন্ধান করে আরও জানতে পারলাম তিনি কোন্ ট্রেনে আসবেন এবং কবে ফিরে যাচ্ছেন। এইরূপ সঠিক তথ্যের ওপর প্ল্যান করা যত সহজ অন্যথায় তা' সম্ভব হয় না এবং বিপদের আশঙ্কাও অনেক বেশি থাকে। সেই যুগে যখন ইংরেজ রাজপুরুষদের হত্যা করা আমাদের প্রোগ্রাম ছিল, তখন এই সংবাদ পেয়ে গণেশ ও আমি স্থির করলাম যত শীঘ্র সম্ভব মাস্টারদাকে খবর পাঠাবো এবং যতদূর সম্ভব একটি প্ল্যানও এঁকে দেবো মিঃ ক্রেগ্‌কে সশরীরে যাতে আর ফিরে যেতে না হয়—বিপ্লবীরা যেন বাংলার ইন্স্পেক্টার জেনারেলের পদ চিরকাল শূন্য রাখার ব্যবস্থা করে।

হাতে সময় মাত্র তিন দিন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে মাস্টারদার কাছে খবর পাঠানো, এবং একজন বা দু'জন যুবককে এই কাজে নিযুক্ত করা যে খুব সহজ নয়, তা' বুঝেছিলাম। তবু এই সুযোগ গ্রহণের সব রকম চেষ্টা করবো বলে স্থির করলাম।

আমাদের সংবাদবাহক "শিশু" একেবারেই নিরীহ শিশু! পুলিস তাকে নিরীহ জেনেও সর্বক্ষণ অনুসরণ করবার জন্য ছ'জন গোয়েন্দা পুলিসকে বহাল করেছিল। কর্তৃপক্ষ সোজাসুজি অর্ধেন্দুর (শিশু) সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তারা যে সব সময় অর্ধেন্দুর গতিবিধি লক্ষ্য করবে তা অর্ধেন্দুকে জানিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল। এইরূপ পুলিস বেষ্টনীতেই অর্ধেন্দু নিজের বাড়িতে থাকতো এবং সে যেখানেই যেত, তার পেছনে এরা ছুটত। কিন্তু মানসিক দৃঢ়তার কাছে যে-কোন পাহারার ব্যবস্থাই যথেষ্ট বাধা নয়। আমরা স্থির জানতাম অর্ধেন্দু পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করবেই। মাস্টারদার সঙ্গে এইরূপ যোগাযোগের ব্যবস্থা আমরা আগে থেকেই করে

রেখেছিলাম। সুতরাং আমাদের মনে কেবল একটাই চিন্তা ছিল—এত অল্প সময়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে কি ?

সময়ের গুরুত্ব এবং প্ল্যান সফল করতে হলে সেইদিন রাত্রেই মাস্টারদার সঙ্গে সাক্ষাতের একান্ত প্রয়োজন—এই সম্বন্ধে অর্ধেন্দুকে ভালভাবেই বোঝানো হ'ল। মাস্টারদার কাছে প্ল্যানটির নিখুঁত ব্যাখ্যার প্রয়োজনে অর্ধেন্দুর সঙ্গে প্ল্যানটি সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করলাম। পুলিসবেষ্টিত কাঠগড়ার অন্তরালে ট্রাইব্যুনালের নাকের ডগায় বসে এই প্ল্যানটি রচিত হ'ল। প্ল্যানটির সারমর্ম এইরূপ—

১। একটু ভিন্ন ধরনের পোশাকে দু'জন লোক নিযুক্ত করতে হবে।

২। এদের সঙ্গে রিভলভার থাকবেই উপরন্তু সম্ভব হলে হাতবোমাও রাখতে হবে।

৩। সন্ধ্যের সময় চট্টগ্রাম-মেইলে মিঃ ক্রেগ্ রওনা হবেন। আমাদের অপর কোন বন্ধু সেই ট্রেনে মিঃ ক্রেগের কামরার পাশের কামরায় উঠবে। এর সঙ্গে কোন অস্ত্রাদি থাকবে না।

৪। যে দু'জন সশস্ত্র হয়ে যাবে, তারা কুমীরা স্টেশন থেকে এই ট্রেনে চাপবে।

৫। যে বন্ধুটি চট্টগ্রাম স্টেশন থেকেই মিঃ ক্রেগ্‌কে অনুসরণ করবে, সে এই দু'জনকে কুমীরা স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠবার সময় সে ট্রেনেই যে আই, জি যাচ্ছেন তা' সুনিশ্চিতভাবে জানাবে এবং ক্রেগের কামরাটি দেখিয়ে দেবে।

৬। লাকসাম জংশনে তারা মিঃ ক্রেগ্‌কে আক্রমণের চেষ্টা করবে। যদি সেখানে সম্ভব না হয় তবে আবার চাঁদপুরে সুযোগ নেবে। এই দু'টি জংসনের কোনোটাতেই যদি সুযোগ পাওয়া না যায়, তবে আই, জি,-কে অনুসরণ করে আরো এগোবে এবং গোয়ালন্দ স্টীমার-ঘাটে আক্রমণ করবে।

৭। দৃঢ়তা চাই। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দু'জন যুবক চাই—মিঃ ক্রেগ্ অক্ষত দেহে প্রাণ নিয়ে কোনমতেই যেন ফিরে যেতে না পারেন।

১৯৩০ সাল—১লা ডিসেম্বর মিঃ ক্রেগ্ চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করবেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের দিনটিও আমরা মাস্টারদাকে জানালাম। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্ল্যানটি ও সেই সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি খবর মাস্টারদার কাছে পৌঁছলো। তিনি নির্মলদার সঙ্গে পরামর্শ করে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালী চক্রবর্তীকে এই কাজের জন্য মনোনীত করলেন।

কালী চক্রবর্তী ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহের প্রথম সারিতে অংশ গ্রহণ

করেছে, ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধে অমর শহীদদের পাশে দাঁড়িয়ে বীরত্বের সঙ্গে রাইফেল চালিয়েছে। কালীর ওপর এই দায়িত্ব দিয়ে মাস্টারদা খুব নিশ্চিন্ত ছিলেন। তা'ছাড়া দৃঢ়চিত্ত রামকৃষ্ণের সহযোগিতায় তাদের মিলিত শক্তি হবে দুর্বার ও অপ্রতিহত।

রামকৃষ্ণ ও কালী চক্রবর্তী গ্রাম থেকে শহরে এলো। পল্টনের কাছে রামকৃষ্ণ ও শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্তের সহপাঠী রমেশের বাড়ি। রমেশ, রামকৃষ্ণ ও দেবু—এই তিনজন বিশেষ বন্ধু। রমেশ ও রামকৃষ্ণ উভয়েই বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র। রামকৃষ্ণ ও কালী শহরে এসে দুপুরের দিকে রমেশের বাড়ি গেলে রমেশ তার বাড়ীতে তাদের সন্ধ্যা অবধি থাকবার সবরকম ব্যবস্থা করলো।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই রামকৃষ্ণ ও কালী মোটরযোগে কুমীরা স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। মোটরে প্রায় বারো মাইল পথ যেতে হবে। তাই তারা একটু সময় হাতে নিয়ে বেরোনোই সমীচীন মনে করলো। মিঃ ক্রেগ্ চট্টগ্রাম স্টেশনে ট্রেনে চাপলেন। আমাদের একজন সাথীও পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর দৃষ্টির অগোচরে সেই ট্রেনে উঠে পড়লো। ব্যবস্থা মতই কুমীরা স্টেশনে এই সাথীটি রামকৃষ্ণ ও কালীকে মিঃ ক্রেগের কামরাটি দেখিয়ে দিয়ে টুক্ করে নেমে গেল।

কুমীরা স্টেশন থেকে লাকসাম জংশন প্রায় সত্তর মাইল। এর মধ্যে ছোটখাটো আরো অনেক স্টেশন আছে এবং ট্রেনটি কয়েক মিনিট করে প্রতিটি স্টেশনেই থামছে। রামকৃষ্ণ ও কালী দু' তিনবার ট্রেন থেকে নেমে মিঃ ক্রেগের কামরার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। প্রতিবারই দেখলো তাঁর কামরাটি ভেতর থেকে বন্ধ। মিঃ ক্রেগের দেহরক্ষীরা তাঁর প্রথম শ্রেণীর কামরা সংলগ্ন অন্য একটি পৃথক কামরায় তাদের কর্তব্য পালনে সদা জাগ্রত ও সচেতন। রাত প্রায় দুটোর সময় গাড়ি লাকসাম জংশনে পৌছলো। রাত্রে প্রায় সব যাত্রীরাই ঘুমিয়ে আছে। কেবল যারা গন্তব্যস্থলে এসে গেছে তারাই গাড়ি থেকে নামছে। লাকসাম জংশনে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ট্রেনটি থেমে থাকলেও মিঃ ক্রেগ ঘুম থেকে ওঠেন নি বা তাঁর কামরার দরজা খোলেন নি। শীতের রাত না হলে অন্তত জানালাগুলিও খোলা পাওয়া যেত। কিন্তু শীতের রাতের দরুণ তাও বন্ধ।

রামকৃষ্ণ ও কালীর ওপর নির্দেশ ছিল—'ট্রেনের কামরার বাইরে থেকে জানালার ফাঁক দিয়ে গুলী ছুঁড়তে কোনো বাধা নেই; কিন্তু যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকে তবে সেইরূপ অনিশ্চয়তার সম্ভাবনাকে

উপেক্ষা করবে না—বরং চাঁদপুর জংশনে সুনিশ্চিতভাবে মিঃ ক্রেগকে বাইরে পাবেই।'

ভোর রাত প্রায় চরটার সময় ট্রেনটি চাঁদপুর পৌঁছলো। ট্রেন থেকে নেমে বেশ কিছুটা পথ হেঁটে তবেই যাত্রীদের স্টীমারে উঠতে হয়। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদেরও এই পথটুকু হেঁটেই পার হতে হয়; তবে তাঁদের হাঁটা পথটি ভিন্ন—সকলের সঙ্গে ভিড় ঠেলে যাবার প্রয়োজন হয় না।

চট্টগ্রাম থেকে কলকাতার পথে আক্রমণের এইরূপ সুযোগ অন্যত্র কোথাও ছিল না। চাঁদপুর থেকে স্টীমারে গোয়ালন্দ পৌঁছনোর পর যাত্রীদের স্টীমার ছেড়ে আবার হেঁটে ট্রেনে উঠতে হয়। তাই গোয়ালন্দেও মিঃ ক্রেগকে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে পাওয়ার যথেষ্টই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দুপুরবেলা গোয়ালন্দে পৌঁছে দিনের আলোতে ক্রেগের পথ অনুসরণ করে আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ পাওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাই ভোর রাতের অন্ধকারে চাঁদপুর জংশনেই আক্রমণের পূর্ণ সুযোগ নিতে রামকৃষ্ণ ও কালী প্রস্তুত হ'ল।

ট্রেনটি যথাসময়ে লাকসাম থেকে ছাড়লো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চাঁদপুর পৌঁছবে। কালী ও রামকৃষ্ণের চোখে ঘুম নেই। বাংলার ইন্‌স্পেক্টার-জেনারেল-অফ-পুলিস সুখ-নিদ্রায় বিভোর।

যে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি তা' কালী চক্রবর্তীর মুখ থেকেই আমার শোনা এবং আগের বৃত্তান্তটি প্রত্যক্ষ জানা; বাকিটুকু অর্ধেন্দুর কাছ থেকে জেনেছি।

চাঁদপুরে ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে কালী ও রাকৃষ্ণ তড়াক্ করে নেমে পড়লো—সঙ্গে মালপত্তরের কোনো বালাই নেই। তাদের মহামূল্য "লাগেজ"—রিভলভার ও হাতবোমা কোমরে বাঁধা এবং গায়ের সার্ট দিয়ে সযত্নে ঢাকা আছে! শীতের ভোররাত—ইলেকট্রিক লাইটে চাঁদপুর জংশন আলোকিত হলেও মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারের কালোছায়া। ভোর চারটায় শীতে ঠক্ ঠক্ করে শরীর কাঁপছে। অনিশ্চয়তা, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার মানসিক প্রতিক্রিয়ায় শীতের কাঁপুনি তারা আরও তীব্রভাবে অনুভব করছে।

মিঃ ক্রেগের কামরার দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে কালী ও রামকৃষ্ণ খুব সন্তর্পণে হেঁটে চলেছে। একটু পরেই তারা দেখতে পেল মিঃ ক্রেগ্ কামরা থেকে একা নেমে এলেন। মিঃ ক্রেগ্ উচ্চতায় সাত ফুটেরও অধিক—শীতের দরুণ সাহেবের গায়ে একটি ওভারকোট চাপানো এবং মাথায় নাইট-ক্যাপের মত এক ধরনের টুপি। মিঃ ক্রেগকে নামতে দেখেই তারা রিভলভার হাতে নিল—একেবারে ট্রিগারে আঙুল স্পর্শ করে আছে। মিঃ ক্রেগ্ যেন সন্দেহ করতে না পারেন,

সেভাবে একটু পেছনে থেকেই তারা তাঁকে অনুসরণ করছিল! মিঃ ক্রেগ্ দশ-বারো কদম এগিয়ে গেলে রামকৃষ্ণ ও কালী দ্রুত এসে ঠিক তাঁর পেছনে পয়েণ্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে ফায়ার করলো। গুলীবিদ্ধ হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ধরাশায়ী মুমূর্ষু ব্যক্তির কাতর কণ্ঠ নিঃসৃত আর্তনাদ শোনা গেল—"উঃ—বাবা, গেলুম···।"

আশ্চর্য! কে নিহত হ'ল? এ তো ক্রেগ্ নয়? মিঃ ক্রেগ্ তবে গেলেন কোথায়?

পুলিস-ইন্স্পেক্টার তারিণী মুখার্জী দেখতে প্রায় মিঃ ক্রেগের মতই ছিলেন। আই, জি,-র কম্পার্টমেণ্ট থেকে তিনিই আগে অবতরণ করেন। আবছা অন্ধকারে, গায়ে ওভারকোট ও মাথায় টুপি—ইনি বাঙালী কি ইংরেজ—এটা পরীক্ষা করে নেবার কথাও তাদের মনে জাগে নি।

কি হতে কি হয়ে গেল! মারতে গেল কা'কে, মরলো কে! মনে হবে—'রাখে হরি মারে কে?' হরিনামের দোহাই দিয়ে বিপ্লবীদের নিজ অক্ষমতা ঢাকার চেষ্টার করার অর্থ বিপ্লবী অভিধান কলঙ্কিত করা।

"If we abstractly theorise, we will find, that in each battle, there are elements of defeat. But the danger of such defeat can be reduced to the minimum if we are organised more and more thoroughly."—Lenin

—যদি কেবল অবাস্তব কল্পনা করে যাই তবে দেখতে পাবো, প্রত্যেকটি যুদ্ধে পরাজয়ের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু পরাজয়ের বিপদকে ন্যূনতম স্তরেও নির্মূল করা যায়, যদি আমরা ক্রমেই সম্যকরূপে সংগঠিত হই।

১৯৩০-এর পয়লা ডিসেম্বর—আদালত-গৃহে কাঠগড়ায় ঢুকেই অর্ধেন্দু গুহের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। ইঙ্গিতে স্পষ্ট বুঝলাম প্ল্যান অনুযায়ী রামকৃষ্ণ ও কালী চক্রবর্তী মিঃ ক্রেগের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্যে পরিণত করতে চলে গেছে। সেই সংবাদের জন্য অর্ধেন্দু অপেক্ষা করছে। আমরা মিঃ ক্রেগের মৃত্যু সংবাদের অপেক্ষায় থাকলেও ইতিমধ্যে আমাদের আশা নির্মূল করে ব্যতিক্রম ঘটে গেছে।

পরের দিন সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হলো—"চাঁদপুরে লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড! ভুলবশতঃ আততায়ীর গুলীতে আই, জি, মিঃ ক্রেগের পরিবর্তে পুলিস-ইন্স্পেক্টার তারিণী মুখার্জী নিহত!······দুপুরের দিকে ট্রাঙ্ক-রোডের উপর কুমিল্লার পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্তৃক দুইজন আততায়ী

ধৃত! তাহাদের সঙ্গে হাতবোমা ও সরকারী আর্মারির রিভলভার পাওয়া গিয়াছে······।"

দুইজন আততায়ী কা'রা—সে পরিচয় অন্য কেউ না জানলেও আমাদের তা জানতে বাকি ছিল না। গুলী করার পরমুহূর্তেই রামকৃষ্ণ ও কালী বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের শিকার নিষ্কৃতি পেয়ে গেল! এই অক্ষমতার গ্লানি ও অকৃতকার্যতার অসহ্য যন্ত্রণা তাদের মন এমন মারাত্মকভাবে আচ্ছন্ন করে তোলে যে, তারা নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও একেবারে উদাসীন হয়ে পড়ে। এইরূপ একটি প্রতিকূল মানসিক অবস্থায় তারা ট্রাঙ্ক-রোডে ধরা পড়লো। স্পেশাল কোর্টের বিচারে দু'জনেরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। আপীলে রামকৃষ্ণের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বহাল রইলো—কালী চক্রবর্তীর ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হ'ল। উভয়কেই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পৃথকভাবে রাখা হয়। রামকৃষ্ণকে condemned cell-এ বসে ফাঁসির অপেক্ষায় দিন গুণতে হচ্ছে—আর কালী জেলের অন্য প্রান্তে ভিন্ন একটি সেলে সময় কাটাচ্ছে!

রামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মাস্টারদা ও নির্মলদা চেষ্টা করে চলেছেন। ইতিমধ্যে কলকাতায় আমাদের দলের সভ্যরা এদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। নিরীহ আত্মীয়-আত্মীয়া সেজে না গেলে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব ছিল না। প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার রামকৃষ্ণের আত্মীয়ার পরিচয়ে পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে আলিপুর জেলে বহুবার তার সঙ্গে দেখা করেন।

রামকৃষ্ণ মেধাবী, বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র। প্রীতিলতাও অনুরূপ বৃত্তিপ্রাপ্তা ছাত্রী। শিক্ষাজগতে তাদের এই পরিচিতি সেই যুগে কর্তৃপক্ষকে তাদের অনুকূলে প্রভাবান্বিত করেছিল। রামকৃষ্ণ ও প্রীতির কারা-সাক্ষাতের সময় জেল ও গোয়েন্দা পুলিসের অফিসারেরা তাদের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করতো। যদিও জানালার জালের বাইরে ওপারে দেখা করার নিয়ম এবং সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব থাকার দরুন একটু জোরে জোরেই কথা বলতে হয়—তবু চেষ্টা করলে কর্তৃপক্ষের অন্যমনস্কতার সুযোগে দু-একটা প্রয়োজনীয় কথাও বলা চলে।

সে যুগে পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবী সাথীর সঙ্গে এইরূপ সাক্ষাতের বিশেষ একপ্রকার adventure ছিল। পুঁটুদির (সুহাসিনী গাঙ্গুলী) কাছে শুনেছি, তিনিও সেইদিন এইরূপ একটি রোমাঞ্চকর সুযোগ গ্রহণের দুর্দমনীয়

ইচ্ছা প্রতিরোধ করতে পারেন নি। রামকৃষ্ণের সঙ্গে জেলে দেখা করেছেন। নির্জন কারাকক্ষে মৃত্যু প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ রামকৃষ্ণ পুঁটুদিকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিল! পুঁটুদি এক ফাঁকে তাকে জানান যে, তাঁরই পরিচর্যায় আমরা চন্দননগরে আত্মগোপন করেছিলাম। এই কথা জানার পর রামকৃষ্ণ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে পুঁটুদিকে বলল—"দিদি আপনাদের সবাইকে ছেড়ে চলেছি। বিপ্লবীদের চির-বিয়োগ যতই মর্মান্তিক হোক্ না কেন, আমার অক্ষমতায় তার চাইতে অনেক বেশি দুঃখ বুকে নিয়ে আমাকে পরপারে পাড়ি দিতে হচ্ছে। জানিনা পরপারে কি আছে—যদি পরাধীন ভারতে আবার জন্মগ্রহণ করি তবে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধে আবার প্রাণ দেবো। মাস্টারদা ও দাদাদের বলবেন তাঁরা যেন আমার অক্ষমতা ক্ষমা করেন…।"

রামকৃষ্ণের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। পুঁটুদিও বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত মনে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ভুল-ভ্রান্তি, সক্ষম ও অক্ষম, সফল ও নিষ্ফল ঘটনা বাছাই করা যায় না। সংগ্রামের ব্যাপক রূপকে সমষ্টিগতভাবে বুঝতে হয়—বিচ্ছিন্ন ঘটনার সফলতা নিষ্ফলতার মাপকাঠিতে তা বিচার করলে তোমার ভুল হবে। তোমার অক্ষমতার কথাই ওঠে না ভাই! তোমার আত্মত্যাগের সঠিক মূল্যায়ন করতে ইতিহাস কখনই ভুল করবে না।" বেদনাভরা মনে পুঁটুদি রামকৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন।

অনুরূপ অক্ষমতার কথা বলে রামকৃষ্ণ প্রীতির কাছেও বহুবার মনের গ্লানি প্রকাশ করেছে। রামকৃষ্ণের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা প্রীতির কাছ থেকে জানবার সুযোগ আমার না হলেও পুঁটুদির কাছে আমি সব শুনেছি। রামকৃষ্ণের বিস্তারিত সংবাদ মাস্টারদা প্রীতির কাছে পেতেন ও কোন উপায়ে তাকে জেল থেকে উদ্ধার করা যায় কিনা সে বিষয়ে খুব গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করতেন। জেলে বসে আমরাও ভাবছিলাম রামকৃষ্ণকে ফাঁসি থেকে কোনমতে বাঁচানো যায় কিনা!

রামকৃষ্ণের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রোধ করার জন্য গণেশ ও আমি একটি প্ল্যান স্থির করেছিলাম। প্ল্যানটি মাস্টারদাকে লিখিতভাবে পাঠাই ও অর্ধেন্দুকে মৌখিক বিস্তারিতভাবে বলতে বলি। প্ল্যানটি নিম্নে দেওয়া গেল :—

উপযুক্ত বলিষ্ঠ ও সাহসী ছ'জন যুবককে বাছাই করতে হবে। তারা দুটো মোটরে করে গিয়ে—বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা-শাসককে অক্ষত শরীরে কিড্‌ন্যাপ করে নিয়ে আসবে। যদি একেবারে অক্ষত অবস্থায় কিড্‌ন্যাপ

করা সম্ভব নাও হয়, তবু আহত অবস্থায় হলেও অপহরণ করে নিয়ে আসা চাই। কোথায় ও কিভাবে কমিশনারকে বা ম্যাজিস্ট্রেটকে আয়ত্তে আনতে হবে তার বিশদ বিবরণও দেওয়া হ'ল। বন্দী—ইংরেজ I. C. S. হওয়া চাই, নইলে ইংরেজ শাসকবর্গ তার কোন মূল্যই দেবে না। সেই অপহৃত উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসারকে আমাদের বিশেষ আস্তানায় বন্দী রেখে তাঁর জীবনের বিনিময়ে রামকৃষ্ণের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করার দাবী জানাতে হবে। প্রাইম মিনিস্টার, ভাইস্‌রয় ও গভর্নরের কাছে কিভাবে আল্‌টিমেটাম দিতে হবে তার খসড়াও পাঠানো হ'ল। টেলিফোনে ও চিঠিতে তাঁদের জানিয়ে দিতে হবে যে, বন্দীকে "গ্রেনাইট ব্লকের" উপর বসিয়ে রাখা হয়েছে এবং অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত বিপ্লবী যুবকেরা ইলেকট্রিক স্যুইচ্‌ হাতে সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে। আমাদের শর্ত পূরণ না করে বন্দীকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেই ডিনামাইটের সাহায্যে তাঁকে উড়িয়ে দেওয়া হবে। উদ্ধারের কোনরকম চেষ্টা করা হলেই বিস্ফোরণে মৃত্যু নিশ্চিত—এই মর্মে বন্দীকে দিয়ে একখানা চিঠি লিখিয়ে তাঁর স্ত্রীকেও পাঠাতে হবে।

সংক্ষেপে রামকৃষ্ণের জীবনের বিনিময়ে ইংরেজ প্রতিভূকে Hostage রাখার এইরূপ বিস্তারিত প্ল্যান আমরা মাস্টারদার কাছে পাঠিয়েছিলাম। তিনিও এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে একমত ছিলেন। মাস্টারদা খুব আক্ষেপ করে' অর্ধেন্দুর মারফত বলে পাঠিয়েছিলেন—"আজ যদি তোমরা বাইরে থাকতে বা সদরঘাট ক্লাবের ছেলেরা বেঁচে থাকতো তবে এ প্ল্যান কার্যকরী করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থায় একজন ইংরেজ প্রতিভূকে অক্ষতদেহে বন্দী করে আনার কথা ভাবা যাচ্ছে না……।"

সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য মাস্টারদাকে এই প্ল্যান বাতিল করতে হয়েছিল। তারপর—তারপর মাস্টারদার ফাঁসির বিনিময়েও উচ্চপদস্থ কোন ইংরেজকে Hostage রাখা চট্টগ্রাম শাখার ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির ক্ষমতা হয়নি।

দু'টি বছর ধরে—আমাদের মামলা চলাকালে জেল থেকে আমরা এই দুইটি পরিপূর্ণ প্ল্যান মাস্টারদার কাছে পাঠিয়েছিলাম। মিঃ ক্রেগের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে আমাদের প্রথম প্ল্যানটি কার্যকরী করার জন্য মাস্টারদা ও নির্মলদা উপযুক্ত বিপ্লবী যুবকদের নিয়োগ করেছিলেন। প্ল্যান অনুযায়ী সব কাজই ঠিক ঠিক হবে এমন যদি আমরা ধরে নিই তবে পৃথিবীর বাস্তব ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে। আমাদের নিজেদের জীবনের ভূরি ভূরি অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, কার্যক্ষেত্রে অনেক ব্যতিক্রম ঘটে। মিঃ ক্রেগের ক্ষেত্রেও

সেইরূপ ব্যতিক্রম বশতই তিনি নিষ্কৃতি পেলেন এবং তাঁরই মত দেখতে একজন ভারতীয় অফিসার বিপ্লবীদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ হয়ে প্রাণ দিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এইভাবেই দু'শ' বছরেরও অধিককাল ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুষ্টিমেয় ইংরেজ প্রতিভূ তাদের নিরাপত্তা ও শাসনব্যবস্থা চালু রাখার জন্য ভারতীয় "ক্রীতদাস শ্রেণী" সৃষ্টি করে। সেই "ক্রীতদাস শ্রেণী" সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্তম্ভ হিসাবে আজও ভারতের বুকে বিরাজ করছে। তাই বলি রামকৃষ্ণের হাতের পিস্তল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির "ক্রীতদাস শ্রেণীর" একজনকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে।

জেল হতে দেওয়া আমাদের দ্বিতীয় প্ল্যান—রামকৃষ্ণের মৃত্যুদণ্ডের বিনিময়ে উচ্চপদস্থ কোন ইংরেজ অফিসারকে Hostage রাখা—সংগঠনের অভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি। মাস্টারদার কাছ থেকে—plan execute করা সম্ভব হবে না জেনে আমাদের খুব খারাপ লেগেছিল—বুঝতে পেরেছিলাম রামকৃষ্ণের ফাঁসি আর রোধ করা গেল না!

আমাদের অপর ও প্রধান প্ল্যান—ব্যাপক বিস্ফোরকের সাহায্যে জেলের ভিতরে ও বাইরে ধ্বংসাত্মক আক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব বিরামহীনভাবে চলেছিল। এই মূল প্ল্যানটিকে বাস্তব রূপ দিতে জেলের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিলাম এবং বাইরে এই প্ল্যানের অংশকে কার্যকরী করার ব্যাপারে জামিনে মুক্ত অর্ধেন্দু পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এক অসাধ্য সাধনে রাতদিন ব্যাপৃত ছিল।

কেবল অর্ধেন্দু বা আমরা, অথবা একা আর কেউ একটা বৃহৎ কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। সার্বিকভাবে প্ল্যান কার্যকরী করার জন্য যদিও মূল দায়িত্ব বাস্তব কারণবশতঃ আমাদের উপরেই এসে পড়েছিল, তবু বহু উপযুক্ত সাথীর প্রত্যক্ষ সাহায্য ব্যতিরেকে কোন প্রচেষ্টাই সম্ভব হ'ত না। জেলের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতি স্তরে বাধার পর বাধা অতিক্রম করেও যখন আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, তখন মাস্টারদা, নির্মলদা ও তারকেশ্বর দস্তিদার সাংগঠনিক কাজ, অর্থাৎ দলের নিরাপত্তা ও বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করছিলেন। আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে যুব-বিদ্রোহের সর্বপ্রধান দ্বিতীয় প্ল্যানটিকে রূপ দেবার জন্য বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য সরবরাহের ত্রুটিহীন ব্যবস্থা করেছিলেন।

গুপ্ত পথে জেলের মধ্যে যাতে একটি ছুঁচও প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য কর্তৃপক্ষের কি ভীষণ কড়াকড়ি! কি কঠোর—কঠিন নিয়মকানুন!

তাদের কি অপরিসীম তৎপরতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম! জেলের প্রতিকূল অবস্থায় অসম্ভবের বিরুদ্ধেই যেন আমাদের যুদ্ধ বলে মনে হচ্ছিল। ঠিক তেমনি একটি কঠিন অবস্থার মধ্যেই মাস্টারদাদেরও দিন কাটাতে হয়েছে। গ্রামে গ্রামে সৈন্য শিবির—তার মাঝে মাঝে পুলিসের অতিরিক্ত ছাউনী, সাদা পোশাকে শত শত গোয়েন্দা নিযুক্ত, প্রতিটি গ্রামে vigilence কমিটি, পুলিস কর্মচারী-দের (একেবারে সাধারণ কনেস্টবলের পদ হ'তে উচ্চপদস্থ অফিসারদেরও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব) সবাইকে নিয়ে বিপ্লবীদের এবং তাদের আস্তানার সংবাদ পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ এক ভয়াবহ জাল পেতেছিল। পথে পথে বাধা, গ্রামে গ্রামে আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা, গলিতে গলিতে বিষাক্ত সর্পের ক্রূর ফণা ছোবল হানতে সর্বদা উদ্যত! জেলের অভ্যন্তরে আমাদের আশঙ্কা বা বিপদ বাইরের তুলনায় আর কতখানি! আমরা তো খাঁচায় আবদ্ধ—সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পা বাড়িয়েই আছি! কিন্তু মাস্টারদাদের সমস্যা অনেক বেশি। পুলিসের তৎপরতা ব্যর্থ করে সংগঠন রক্ষা করতে হবে। প্রত্যেকের মাথার দাম পাঁচ দশ হাজার টাকা করে ঘোষিত হয়েছে। শহর ও গ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও লোকালয়ে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের ফটো বিতরিত হয়েছে—হাটে-বাজারে, স্কুলে-কলেজে, রেল-স্টেশনে, পোস্ট অফিসে, বড় বড় রেস্তোরাঁয় ঐ সব ফটো দেওয়ালে দেওয়ালে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের এইরূপ তৎপরতাকে বানচাল করার জন্য মাস্টারদারা বিশেষ-ভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন। ধরেই নেওয়া যায়—গুরুত্বপূর্ণ আস্তানার সন্ধান মাত্র কয়েকজন ছাড়া কেউ জানতো না। সেইরূপ নির্ভরযোগ্য আস্তানায়ও তাঁরা বেশিদিন থাকতেন না। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলাটাই তাঁদের কাছে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল। দিনে রাতে সমানে পুলিস ও মিলিটারীর টহল চলতো। কাজেই 'রাতের অভিসার'ও খুব সহজ বা আশঙ্কামুক্ত ছিল না। পুলিস ও মিলিটারী বেষ্টনীও উপেক্ষা করা সম্ভব, যদি গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় কতগুলি পথঘাট বেছে নেওয়া যায়। মাস্টারদারা গ্রামের পথঘাট, নদীনালা ও অলিগলির অবস্থান সম্বন্ধে—বিশেষ করে যে সব জায়গায় তাঁদের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল, ভালো খোঁজখবর রাখতেন।

বিপদসমুদ্রেই যাঁদের বাস তাঁরা শত সাবধানতা সত্ত্বেও অজানা বিপদ অতর্কিতে হানা দেবে না—এইরূপ অবাস্তব চিন্তা কখনই করেন নি। তাই সেই সব প্রধান কেন্দ্রে কোনদিন কোন জরুরী বৈঠকের প্রয়োজন হলে শত্রুর আগমনবার্তা আগে থেকে জানবার জন্য, বিভিন্ন স্থানে দলের বাছাই করা

সভ্যদের প্রহরায় নিযুক্ত রাখতেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তাঁরা পুলিস ও মিলিটারীর বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির বিরুদ্ধে সমানে যুঝে চলেছিলেন।

অনেক সময় ছোটখাটো বা কখনও প্রবল শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে তাঁদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে সত্য এবং শেষ পর্যন্ত মাস্টারদা ধরা পড়েছেন তাও সত্য—তবু দীর্ঘ চার চারটি বৎসর মিলিটারী রাজকে উপেক্ষা করে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে স্থির ছিলেন।

কেবল আত্মগোপন করে থাকাই যে একটা মস্ত বিপ্লবী কাজ সেইরূপ ভেবে নিজেদের নিশ্চেষ্ট রাখার মনোবাসনা তাঁদের কখনও ছিল না। সেরূপ থাকলে হয়ত মাস্টারদা, তারকেশ্বর, প্রীতিলতা প্রমুখ বিপ্লবীরা স্বাধীন ভারতে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আজ ফিরে আসতেন।

চট্টগ্রামের ছোট্ট জেলাটিকে কেন্দ্র করে মাস্টারদা ব্যূহ রচনা করেছিলেন—আর সেখানে থেকেই পুলিস ও মিলিটারীকে উপেক্ষা করে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র ও একের পর এক শত্রু ও শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করে চলেছিলেন।

পুলিসের তৎপরতায় অম্বিকাদা ধরা পড়েছেন। তার বিনিময়ে খাঁবাহাদুর আসানুল্লাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। চন্দননগরে নৈশ রিভলভার যুদ্ধে পুলিসের গুলীতে জীবন ঘোষাল নিহত, ভোর রাতের আবছা অন্ধকারে পুলিস ইন্‌স্পেক্টার তারিণী মুখার্জী রামকৃষ্ণের গুলীতে প্রাণ দিয়েছেন! পুলিসের গোয়েন্দাগিরি ও বেপরোয়া সাহস কিছুটা দমাবার উদ্দেশ্যে দলের আত্মগোপনকারী সভ্যদের উপর মাস্টারদার নির্দেশ ছিল—বিপ্লবীদের গতিবিধি সম্বন্ধে যদি কোন গোয়েন্দার বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ পায়, তবে প্রথম সুযোগেই যেন তাকে গুলী করা হয়। কয়েকটি গোয়েন্দা-পুলিসকে এই প্রকার শিক্ষা দেওয়া গেলে তবেই বিপ্লবীদের গতিবিধি সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্য কিছু পরিমাণে নিশ্চয়ই হ্রাস পাবে। সভ্যদের প্রতি মাস্টারদার এই নির্দেশ ফলপ্রসূ হয়। সেই সময়ে মাস্টারদা কানুনগো পাড়ার কোন একটি বিশেষ আশ্রয়ে ছিলেন। সেই হেডকোয়ার্টারে তারকেশ্বর, বীরেন দে, প্রমুখ যুবক সাথীরা এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। কয়েকটি ·৪৫০ ব্যাসের আর্মি রিভলভার জেলের মধ্যে আমাদের কাছে পাঠাবার জন্য মাস্টারদাকে লিখেছিলাম। কখন, কিভাবে বা কাকে দিয়ে সেই রিভলভারগুলি শহরে পাঠানো হবে, সেই বিষয়ে মাস্টারদা তারকেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তারকের উপরেই এই কাজের ভার দেন।

তখন বেলা দুপুর। কানুনগো গ্রামের আস্তানা থেকে তারক ও বীরেন খুব সাবধানে বেরিয়ে চতুর্দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে পটিয়ার রাস্তা ধরে এগোতে

লাগলো। অতর্কিত আক্রমণ আশঙ্কায় দু'জনেরই কটিবদ্ধ রিভলভার প্রস্তুত। দিনের বেলা সাধারণতঃ তারা রাস্তায় চলাফেরা করতো না। বিশেষ কারণেই বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সেদিন তাদের দিনের আলোতে বেরোতে হ'ল। দিনের বেলা বলেই সেদিন তারা আরো অনেক বেশি সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করেছিল।

মিলিটারী ম্যানুয়েলে পড়েছি—যুদ্ধক্ষেত্রের সীমানায় যেখানে শত্রুর বা বিপক্ষ দলের অতর্কিত আবির্ভাবের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই বলে মনে হবে—সেখানেই বিপদ ও আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি—এবং সেইরূপ পরিস্থিতিতে সৈন্যেরা যেন আরো বেশি সজাগ ও সতর্ক থাকে তার জন্য কঠোর নির্দেশ আছে।

তারকেশ্বর অবশ্য আর্মি ম্যানুয়েল পড়ে নি। কিন্তু বৈপ্লবিক দায়িত্ববোধে আত্মসচেতন ও বিচক্ষণ তারক, পাছে কেউ দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে সেই আশঙ্কায়, প্রতি পদক্ষেপে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে। এত সাবধানতার সঙ্গে—সন্তর্পণে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা সত্ত্বেও হঠাৎ একজন সাধারণ পথচারীর প্রতি তারকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। একজন পথচারীকে প্রথম দৃষ্টিতেই কি গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করা যায়? কিন্তু তারক তাকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহ না করলেও—সে যে কেউই হোক্ না কেন—তার দৃষ্টির মধ্যে যে নিজেদের গন্তব্য স্থানটিতে নিশ্চয়ই উপস্থিত হবেনা তা সহজেই ধরে নেওয়া যায়।

পথিকটি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করবার জন্য তারা একটি কৌশল অবলম্বন করলো—রাস্তার একটি বাঁক ঘুরে তারক খানিক দাঁড়িয়ে পড়লো—এবং একটু পরে ফিরে গিয়ে পেছনের ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে দেখলো সেই "নিরীহ পথিক" দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। তারককে হঠাৎ ঘুরে এসে তার গতি লক্ষ্য করতে দেখে পথিক একটু অপ্রস্তুত হয়ে তার গতি মন্থর করে ফেললো। পথিকের দুর্ভাগ্য! তারক তাকে চিনে ফেললো—সে তারকের সুপরিচিত দারোগা শশাঙ্ক ভট্টাচার্য! শশাঙ্কের ক্ষমতা ছিল না তারক ও বীরেনকে একা বন্দী করে। গোয়েন্দা পুলিসের প্রধান লক্ষ্য—আড়ালে থেকে অনুসরণ করে বিপ্লবীদের আস্তানার সন্ধান পাওয়া। শশাঙ্কেরও আজ সেই উদ্দেশ্যই ছিল, কিন্তু আজ যে তার সে আশা নির্মূল হয়েছে, তা সে তখনও বুঝতে পারে নি।

তারক বীরেনকে ইঙ্গিত করে একটি দুমুখো রাস্তার বাঁকে এসে দ্রুত দু'জন দু'দিকে শশাঙ্কের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। শশাঙ্ক ভট্টাচার্যও প্রায়

মরিয়া হয়ে ছুটে এসে দু'মাথা রাস্তায় থমকে দাঁড়ালো। কোন্‌দিকে যাবে? কপাল ঠুকে সে একটিতে ঢুকে পড়লো। দু'টি রাস্তাতেই যে তার জন্যে রিভলভার হাতে যম অপেক্ষা করছে, তা তখনও সে অনুমান করতে পারে নি। যে পথে তারক এগিয়ে চলেছে শশাঙ্কও সেই পথেই ছুটে চললো। তারক পরিষ্কার বুঝতে পারলো শশাঙ্ক বেপরোয়া হয়ে খুব close chase করবে—তারকের গন্তব্যস্থল তার জানতেই হবে! চরম মুহূর্তের জন্য তারক প্রস্তুত। সামনেই এক গৃহস্থ-বাড়ির একটি খড়ের গোলা। আমি রিভলভারটি নিশানা করে দু'হাতে ধরে তারক খড়ের গোলাটির আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়ালো। গোলাটির আড়াল ঘুরে শশাঙ্ক খোলা জায়গাটিতে এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে তারকের রিভলভার গর্জন করে উঠল। গুলীবিদ্ধ শশাঙ্ক মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

তারকের দু'হাতে রিভলভার ধরে ফায়ার করাটা যেন একটু কেমন শোনাচ্ছে—তবু একথা সত্য। পাঠকবর্গ আগেই জানতে পেরেছেন—কংগ্রেস অফিসে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতকালে বিস্ফোরণে তারক গুরুতরভাবে আহত হয়। তার বাঁচার আশা ছিল না। হাতের ক্ষত তখনও পুরোপুরি শুকায় নি—তাই এক হাতে ফায়ার করার মত তার জোর ছিল না।

শশাঙ্ককে গুলী করে গ্রামের পথে তারক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। মুমূর্ষু অবস্থায় শশাঙ্ককে পরে সরকারী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শহরে ও গ্রামে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল—পুলিস ও মিলিটারী অনেক গুণ বেশি তৎপর হয়ে উঠলো! মাস্টারদারাও তাঁদের হেডকোয়ার্টার অন্যত্র স্থানান্তরিত করলেন।

"চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" নাম দিয়ে সরকার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মোট তিনটি মামলা দায়ের করেন। প্রথম মামলাটি আমাদের তিরিশজনের বিরুদ্ধে; দ্বিতীয় মামলাটি অম্বিকাদা, সরোজ গুহ ও হেমেন্দু দস্তিদারকে নিয়ে এবং তৃতীয়টিতে মাস্টারদা, তারকেশ্বর ও কল্পনা দত্তকে অভিযুক্ত করা হয়।

আমি যুব-বিদ্রোহের এই খণ্ডে প্রথম মামলাটি সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখেছি। এই মামলার সুরু ১৯৩০ সালের জুলাই মাস এবং ১৯৩২ সালের ১লা মার্চ এর সমাপ্তি। মামলা এক বছর ন'মাস চলেছে বটে, কিন্তু আমাদের জেল-হাজত বাস সুরু হয়েছে আরও চার মাস আগে থেকে। এই এক বছর ন'মাস ধরে আদালতে মামলা চলার সুযোগ নিয়ে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলাম।

এই দু'টি বছর জেল-হাজত ও আদালত-গৃহ আমাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। ১৮ই এপ্রিল যুব-অভ্যুত্থানের সীমিত কর্মসূচী কার্যে পরিণত করার পর আমাদের বিরতি গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। মাস্টারদা কিন্তু এই দু'টি বছরে ছোট ছোট অ্যাকশন সমানে চালিয়ে গেছেন। আমাদের মামলা চলাকালে সেই সব ব্যক্তিগত আক্রমণ চলবার সঙ্গে সঙ্গে যুব-বিদ্রোহের দ্বিতীয় প্রস্তুতিকার্য অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল। সেই ব্যাপক প্রস্তুতির মাত্র একটু আভাস দিয়ে সমস্ত ঘটনাটির বর্ণনা স্থগিত রেখে আমি হয়ত কারও কারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছি। কিন্তু যুব-বিদ্রোহের দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রস্তুতির চরম পর্যায়ে যে ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার প্রতিক্রিয়ায় সরকারের নতি স্বীকার এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। তাই অবিশ্বাস্য হলেও, সেই সঠিক সত্য ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে এই বিশেষ অধ্যায়টিতে আগে ছোট ছোট ঘটনাবলীর উল্লেখের পরেই তা' পরিবেশন করা শ্রেয় মনে করছি।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি ছোট ছোট আরো ক'টি ঘটনার উল্লেখ এখানে করবো। দুটি বছরের মধ্যেই আগে পিছে, এই সব ঘটনাগুলি ঘটেছে। সেইজন্যই দিনক্ষণ দিয়ে ধারাবাহিকরূপে ঘটনাগুলি সাজাবার চাইতেও মূল বিষয়বস্তুর প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ না করে সত্য কাহিনী পরিবেশনের দিকে দৃষ্টি রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করলাম।

গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা শশাঙ্ক ভট্টাচার্য গুলীবিদ্ধ অবস্থায় সরকারী হাসপাতালে স্থানান্তরিত হ'ল। আদালতে প্রবেশ করেই দেখলাম কর্তৃপক্ষ খুবই উত্তেজিত, পারলে আমাদের যেন তক্ষুণিই খেয়ে ফেলে, আমরাই যেন শশাঙ্ক ভট্টাচার্যকে গুলী করেছি। পুলিস ও জেলা-কর্তৃপক্ষ সর্বশক্তি দিয়ে কঠোর হস্তে বিপ্লবীদের দমন করতে চেষ্টার ত্রুটি করছে না; তবু একটার পর একটা এই ধরনের আক্রমণ তাদের অক্ষমতাকে যেন ক্রমাগত উপহাস করে চলেছে। তাই তাদের পক্ষে আহত মর্যাদার আঘাত অসহ্য হলেও বিচারকের আসনে আসীন বিচারপতিদের বিচলিত ও পক্ষপাতিত্ব দোষে প্রভাবান্বিত হওয়া অশোভন এবং অন্যায়। তাতে ন্যায় বিচার সম্বন্ধে স্বতঃই মনে সংশয় জাগে। তারিণী মুখার্জী ও খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা হত্যা, শশাঙ্ক ভট্টাচার্যের ফুসফুসে গুলীর আঘাত, প্রভৃতি ঘটনাতে ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে ইউনী একেবারে ক্ষেপে গিয়ে, বিচারপতির পদমর্যাদা ভুলে, আদালতকক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি জাহির করে বৃটিশ ন্যায়বিচারের তথাকথিত গৌরব বার বার ক্ষুণ্ণ করতেন। আমরাও ট্রাইব্যুনালের বিচার ও বিচার-প্রহসনকে প্রতি পদে উপেক্ষা করতাম। সেদিন দেশ-বরণ্যে নেতা মতিলাল নেহেরুর স্মৃতিদিবস; আমরা কোর্টে

আসবার আগে ঠিক করলাম—কোর্টের কার্যক্রম আজ বন্ধ রাখতে হবে। গণেশের প্রস্তাব হ'ল—স্বর্গীয় মতিলালের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কোর্ট বন্ধ রাখতে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ জানানো হবে। আমাদের অনুরোধ তিনি যদি রাখেন ভাল, আর যদি প্রত্যাখান করেন তাহলেও আমরা ছাড়বো না—কোর্ট আজ তাদের বন্ধ রাখতেই হবে, কোনমতেই মামলা চলতে দেওয়া হবে না।

গণেশের এই প্রস্তাবে আমরা সকলেই একমত। 'রণং দেহি' ভাব নিয়ে আমরা সবাই কোর্টে এলাম। প্রতিদিনের নিয়ম অনুযায়ী বিচারকক্ষ লোক-সমাগমে পূর্ণ। বিচারপতিরা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এসে তাঁদের আসনে বসেছেন। পেশকার জজেদের সামনে কাগজপত্র এগিয়ে দিলেন। সাক্ষীর ডাক পড়লো। সাক্ষী এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ালো। পাবলিক্ প্রসিকিউটার সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। এই সময় আমরা বাধা দিলাম।

গণেশ—"মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমাদের অনুরোধ—আজ দেশ-বরণ্যে নেতা স্বর্গীয় মতিলাল নেহেরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আদালতের কাজ বন্ধ রাখা হোক্।"

প্রেসিডেণ্ট মিঃ ইউনী কখনই ভাবেন নি যে, আমাদের দিক থেকে এই রকম একটা প্রস্তাব আসতে পারে। অহিংসাবাদী কংগ্রেস নেতা 'মতিলালের স্মৃতিতর্পণ' উপলক্ষে আমরা কেন সেইরূপ অনুরোধ করে বিচারপতিদের বিব্রত করবো? কংগ্রেসের ডাকে দেশব্যাপী লবণ-আইন-ভঙ্গ আন্দোলন চলেছে। কংগ্রেসেরও যদি এই ইংরেজ শাসনবিরোধী আন্দোলন না থাকতো তবে হয়ত মিঃ ইউনীর পক্ষে আমাদের অনুরোধ মেনে নেওয়া কঠিন হ'ত না; কিন্তু কংগ্রেসও যেখানে শত্রু, সেখানে ইংরেজ জজ কি করে আমাদের অনুরোধে কোর্টের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন—"আসামীদের" অনুরোধে আদালত-গৃহে স্বর্গীয় মতিলালের পুণ্য স্মৃতি উদ্‌যাপনে সম্মত হতে পারেন? ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেণ্ট মিঃ ইউনী উত্তর দিলেন—

"এইরূপ কোন নজীর নাই। তাই অভিযুক্ত আসামীদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলাম।"

মিঃ ইউনী রূঢ়কণ্ঠে এইরূপ জবাব দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক্ প্রসিকিউটারকে নির্দেশ দিলেন—

"Well, you proceed!"

সরকারী উকিল খাঁ বাহাদুর আবদুল সত্তর চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান

করলেন। সরকারী সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণের জন্য তিনি প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন, ঠিক এই সময় তাঁকে বাধা দিয়ে লোকনাথ ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেণ্টকে দৃঢ়তার সঙ্গে আবেদন জানালো—"মাননীয় বিচারপতি! আমরা মহামান্য স্বর্গীয় মতিলালের সম্মানার্থে আজ কোর্ট বন্ধ রাখবার দাবি জানাচ্ছি। আমরা এখনই আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবো। আমরা আপনাদের এবং বিচারকক্ষে সমবেত সকলকে স্বর্গীয় মতিলালের স্মৃতি-বাসরে যোগ দিতে আহ্বান জানাচ্ছি।"

প্রেসিডেণ্ট মিঃ ইউনীর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করলো। তিনি আগুনের মত জ্বলে উঠলেন—

"Well, you speak some thing absurd. Don't you know this is a court? You must realise your position. You are accused in trial. I warn you—don't disturb the court proceedings.........'Well, Khan Bahadur you proceed'."

আমরা এইরূপ একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত ছিলাম। মিঃ ইউনী যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন—আমাদের অনুরোধে তিনি কোর্ট কখনই বন্ধ করবেন না এবং মতিলালের স্মৃতিসভাও এই আদালত-কক্ষে কখনই হতে দেবেন না। আমরা সেই challenge গ্রহণ করলাম। আমরাও বদ্ধপরিকর—এই বিচারকক্ষে 'মতিলালের স্মৃতিসভা' অনুষ্ঠিত করবই।

আমাদের মধ্যে একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—"Normal court proceedings must be stopped. We must commemorate the death anniversary of our great National Leader."

মিঃ ইউনী টেবিল ঠুকে গর্জন করে বললেন—"You stop. I order you to stop."—কী কষ্ট পরিবেদনা! কে কার কথা শুনবে? মিঃ ইউনীর হুকুম তামিল করবে কে? তাঁর ঔদ্ধত্য সহ্য করতে আমরা প্রস্তুত নই। আমাদের মধ্যে কয়েকজন একত্রে ঘোর প্রতিবাদ জানালো—

"You withdraw your order."

"You have no right to order."

"You cannot gag us!"

"You cannot supress our legitimate right to pay homage to our passed National Leader!"

আমাদের প্রতিবাদের মাত্রা চরমে উঠলো। বৃটিশ প্রেষ্টিজ এইভাবে

অবমানিত ও লাঞ্ছিত—মিঃ ইউনীর সহ্যসীমা অতিক্রম করলো! তিনি ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারালেন। উচ্চকণ্ঠে মিঃ ইউনী বললেন—"Well, Shooter make them to keep quiet. Make them understand that this is my order!"—জজ সাহেবের হুকুম তামিল করবার জন্য ইংরেজ পুলিস সাহেব স্যুটার সদলবলে আমাদের বদ্ধ কাঠগড়ার দিকে অগ্রসর হলেন। গণেশ আর কালবিলম্ব না করে ডাক দিল—"সহায়রাম!" সহায়রামেরদল তক্ষুণি প্রস্তুত হয়ে গেল। গণেশ এবারে বলল—"জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ কর।"

সহায়রাম মোটামুটি ভালই গাইতো। ভারী গলায় উচ্চৈঃস্বরে সহায়রাম গান ধরলো—"বন্দেমাতরম্…।" আমরা সকলে উঠে দাঁড়ালাম। এতক্ষণের এত হট্টগোল, চীৎকার-চেঁচামেচি, সব মুহূর্তে থেমে গেল। গানের স্থরুতেই গুরুগম্ভীর আবহাওয়ার স্থষ্টি হ'ল। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে—দর্শক গ্যালারীতে, উকিল-ব্যারিস্টারদের আসনে ও প্রেসের জন্য রক্ষিত বিশেষ স্থানে বেশ চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হ'ল। তাঁরা সকলেই ভাবছেন কি করবেন—দাঁড়াবেন কি দাঁড়াবেন না। সকলেই ইতস্তত করতে লাগলেন। বিচারপতির আসনে বসলেও মিঃ ইউনী বৃটিশ ডিপ্লোম্যাট। তিনি বুঝলেন বর্তমান অবস্থা তাঁর আয়ত্তের বাইরে। মুহূর্তে ভোল পাল্টে শান্ত স্থবোধ বালকের মত তিনি ঘোষণা করলেন—"The court is adjourned today."—!

এই কথা ক'টি বলেই মিঃ ইউনী উঠে দাঁড়ালেন এবং ট্রাইব্যুনালের আরও দু'জন কমিশনার তাঁর সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে আদালত-কক্ষ পরিত্যাগ করলেন। আমাদের গান কিন্তু চলছিল—আমরা সকলেই তখন ATTENTION-এ দাঁড়িয়ে মৃত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছিলাম। ঘটনাটি যদিও খুবই সামান্য, তবু অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। মিঃ ইউনীর অনমনীয় মনোভাবের জন্য শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী মর্যাদার প্রশ্ন এসে পড়লো। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের এই দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতি ভেবে উপস্থিত সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে স্বয়ং মিঃ ইউনীই তাঁর attitude (মনোভাব) পরিবর্তন করলেন।

মামলার এই দু'টি বছরের মধ্যে আরও একটা মজার ঘটনা ঘটে। আমার দিদি আমার সঙ্গে দেখা করতে কখনই জেলে আসতেন না। এক বিকেলে হঠাৎ মা আর দিদি, দু'জনেই আমার সঙ্গে দেখা করতে জেলে এসে হাজির! পুলিসের উপস্থিতিতে ও তাদের শ্রুতির গণ্ডীর ভেতরেই নিয়ম অনুযায়ী সাক্ষাৎ হ'ল। সেই রাত্রের ট্রেনেই দিদি কুমিল্লা চলে গেলেন। ভোর রাত্রে ট্রেনটি

কুমিল্লা পৌঁছলো। আমাদের মামলা চলাকালে দিদি প্রায়ই কুমিল্লা যেতেন। মামলা তদারক করা ও ভাল Defence-এর ব্যবস্থার জন্য অর্থ সংগ্রহ করার ব্যাপারে দিদিকে সর্বত্রই যেতে হ'ত। কুমিল্লার বহু দরদী লোক আমাদের মামলা চালাবার জন্য অর্থ সাহায্য করেছেন। দিদির কুমিল্লা যাওয়ার প্রধান ও একমাত্র কারণ অর্থ সংগ্রহ। দিদি কুমিল্লা গেলেই কাকাবাবুর বাড়ি— অর্থাৎ, স্বর্গীয় কামিনী দত্তের বাড়িতে উঠতেন। কোনবারেই এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটতো না।

সেইদিন সকালে কুমিল্লার জনসাধারণ এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় দারুণ উত্তেজিত। দেখতে দেখতে কুমিল্লা তথা বাংলার জেলায় জেলায় খবর ছড়িয়ে পড়লো—"কুমিল্লার জেলা-শাসক মিঃ ষ্টিভেন্স নিহত। দু'জন তরুণী ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি গিয়ে তাঁকে গুলী করেছে। মিঃ ষ্টিভেন্স তক্ষুণি প্রাণ ত্যাগ করেছেন।" এই খবর যথারীতি যথাসময়ে জেলের অভ্যন্তরে আমাদের কাছেও এসে পৌঁছলো। সেই যুগের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রতিভূদের খতম করা ছিল বিপ্লবীদের কর্মসূচী। অত্যাচারীর প্রতি বিপ্লবী তরুণ-তরুণীদের মনে কোন দয়া-মায়ার স্থান ছিল না। মিঃ ষ্টিভেন্সের মৃত্যু সংবাদ আমাদের কাছে স্বভাবতই সুসংবাদ! আরও ভাল লেগেছিল এই ভেবে যে, পিস্তল হাতে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে বাংলার বিপ্লবী মেয়েরাও প্রত্যক্ষ-ভাবে নেমে পড়েছেন।

আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংবাদটি বিশদভাবে জানতে পারলাম। ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলী করেছেন শান্তি ও সুনীতি,—ঘটনাস্থলেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। কুমিল্লার কর্তৃপক্ষ ও পুলিসমহল ক্ষিপ্ত হয়ে বহু লোককে মারধোর ও বন্দী করেছে। ইন্দুমতী সিং জেলে অনন্ত সিংহের সঙ্গে আগের দিন দেখা করে কুমিল্লা আসার ঘণ্টাচারেক পরেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। পুলিস ইন্দুমতী সিংকে এবং প্রখ্যাত উকিল কামিনী দত্তমহাশয়কেও একই সঙ্গে গ্রেফতার করেছে। উভয়কেই কুমিল্লা জেল-হাজতে রাখা হয়েছে।

ষড়যন্ত্রমূলক কোন যোগাযোগ না থাকলেও এইভাবে ঘটনার যোগাযোগ হয়ে গেল। দিদি আমার সঙ্গে জেলে সাক্ষাৎ করেছেন সত্য এবং সেইদিন রাত্রের ট্রেনেই কুমিল্লা গেছেন তাও সত্য; আর এমনই ঘটনাচক্র যে, শান্তি ও সুনীতি সেদিন সকালেই ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলী করলেন। Circumstantial Evidence এতখানি প্রবল যে, আপাতদৃষ্টিতে দিদির ষড়যন্ত্রমূলক সংযোগ অস্বীকার করা যায় না। পুলিস সোজাসুজি তাই ভেবেছে। আর আজ

আমিও এই সুযোগ নিয়ে নির্লজ্জের মত বড়াই করতে পারতাম—"দিদিকে দিয়ে আমিই নির্দেশটি পাঠালুম…" যেমন নাকি বিনা সঙ্কোচে কেউ কেউ তাঁদের "বিপ্লবী ঐতিহ্যের" জোরে বলে থাকেন—"সূর্য্যিকে প্ল্যানটি বলে দিলুম…।"

ইতিহাস বিকৃত করার ইচ্ছে আমার নেই—মিথ্যে বড়াই করার স্পৃহাও নেই। শান্তি ও সুনীতির এই বিজয়-গৌরবের সঙ্গে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের কোন যোগাযোগ ছিল না।

"Brief History of Terrorism"—এই শিরোনামা দিয়ে পুলিসের এক গোপন রিপোর্টের ৪১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

"Mr. Stevens I. C. S. District Magistrate of Tipperah granted an interview to two grils, viz. Santi and Sunti on 14-12-31. These girls whipped out revolvers and fixed at Mr. Stevens killing him on the spot. They were transported for life."

দিদিকে ও কামিনীবাবুকে কেন পুলিস গ্রেফতার করলো তা অবশ্য আমাদের জানতে বাকি ছিল না! এই হত্যা ব্যাপারে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে দিদি ও কামিনীবাবুর যে কোন যোগাযোগই ছিল না এটা আমরা ভালোভাবেই জানতাম। তাই পুলিস তাঁদের গ্রেফতার করায় আমরা বুঝতে পারলাম কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও প্রতিশোধ স্পৃহা কতখানি সীমা ছাড়িয়েছে!

বিকেল প্রায় চারটা পাঁচটার সময় জেলে ঘণ্টা বেজে উঠলো—অর্থাৎ কোন বিশেষ আগন্তুকের আগমনবার্তা ঘোষিত হ'ল।

জেলের Special Superintendent পদে বহাল W. V. Hicks, S. P. আমাকে জেল অফিসে অসময়ে ডেকে পাঠালেন। হিক্‌স সাহেবের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখি সাহেবের চোখ দু'টি হতে যেন আগুন ঝরছে। আমাকে দেখেই সাহেব হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—

"What instructions you gave to your sister during interview yesterday afternoon? Your sister carried the message. Two girls have killed the District Magistrate of Comilla. Your sister has been arrested. Within 24 hours your sister along with two other girls will be hanged in a public square.... !"

হিক্‌স সাহেবের তর্জন-গর্জন শুনতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি

রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম—"Stop Mr. Hicks. Don't display your temper to me. I am not prepared to tolerate it. If you can hang my sister in a public square then go there and do it. Why do you tell all these nonsense to me.... ?"

ফুঁ দিলে আগুন যেমন দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে—সাহেবও রাগে তেমনি জ্বলে উঠলেন—"Government is not going to tolerate these sort of anarchic actions. Sooner or later you all will face firing Squad !"—বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমিও রাগের মাথায় সাহেবকে শাসিয়ে বললাম—"We are never afraid of facing the firing Squad. But you people be careful of your precious lives. Bullets from our pistols will greet you !"

সাহেব আর দাঁড়ালেন না। হিক্‌স সাহেবের এইরূপ ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে আর কখনও দেখি নি।

হিক্‌স সাহেবের সেই সাধু মনোবাসনা পূর্ণ হ'ল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফাঁসি দেওয়া দূরে থাকুক—হাইকোর্টও শান্তি-সুনীতিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া সমীচীন মনে করলো না। বাংলায় বহু বিপ্লবী যুবকের ফাঁসি হয়েছে—তাতে দেখা যায় মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বিপ্লবী রক্তবীজ-বংশ ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তা'-ছাড়া বিপ্লবী তরুণীদের ফাঁসি দেওয়ার হিম্মৎ তখন বৃটিশ সরকার হারিয়েছেন।

১৯১৫ সালে সন্দেহভাজন কোন বিপ্লবী যুবকের পকেটে "হিঙ্গলবালা" লেখা একটুকরো কাগজ পাওয়া যায়। এই অপরাধে পুলিস 'হিঙ্গলবালা'—এই একই নামের দুইটি গ্রাম্য তরুণীকে বিনা বিচারে আটক করে। তার প্রতিক্রিয়ায় সারা দেশে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইংরেজ সরকারের পুলিসের এই বাড়াবাড়ি ও বাংলার মেয়েদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সর্বত্র ঘোরতর প্রতিবাদের বন্যা বয়ে যায়। এখনও মনে পড়ে 'হিঙ্গলবালাদ্বয়ের' গ্রেফতারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভায় বরেণ্য নেতা বিপিন পালের ক্রোধোদৃপ্ত বক্তৃতার কিছু অংশ—"তোমাদের হুঁসিয়ার করছি, তোমরা সভ্যতা ও নিপীড়নের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে এসেছ। এ দেশের ইতিহাস বড় ক্ষমাহীন—বড় ভয়ঙ্কর! মাতৃজাতির উপর অত্যাচার—সতীর অবমাননা এদেশ ক্ষমা করে না! সতীর অবমাননাকারী অত বড় প্রচণ্ড শক্তিশালী রাজা রাবণ মুহূর্তে বুদ্‌বুদের মত শূন্যে মিলিয়ে গেল!

তাই বলি ভারতের ইতিহাস তোমাদের জন্য বড় নির্মম বড় ক্ষমাহীন হয়ে দেখা দেবে!"

ষোল বছর পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতিভূর বক্ষ লক্ষ্য করে শান্তি-সুনীতির পিস্তল 'হিঙ্গলবালাদের' অবমাননার প্রকৃত জবাব দিয়েছে। 'হিঙ্গলবালা' অধ্যায়ের ষোল বছর পরে বাংলার ও ভারতের বিপ্লবী প্রতি-ক্রিয়ার প্রচণ্ডতায় ইংরেজ সরকার খুবই চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত। একদিকে কংগ্রেসের ভারতব্যাপী লবণ-আইন-ভঙ্গ আন্দোলন, গান্ধী-আরউইন্ প্যাক্ট ও দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠক এবং শেষপর্যন্ত গান্ধীজীর DOMINION STATUS-এর চেষ্টা নিষ্ফল এবং আবার আইন অমান্যের প্রস্তুতি, প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার ভাবতে লাগলেন—বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত? হত্যাপরাধে এইরূপ সন্ধিক্ষণে শান্তি-সুনীতির বিচার—কি করা যায়—Examplary Death Penalty, নাকি বিপ্লবীদের প্রতি-হিংসার পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে প্রাণদণ্ড রহিত করা? সেই একই বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়ে আমাদেরও প্রাণদণ্ড দিয়ে বিপ্লবী বাংলাকে জয় করতে পারবেন, নাকি তাঁদের পক্ষে আপোষের মনোভাব দেখিয়ে বিপ্লবীদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে—এই বিচার করেই তাঁরা আমাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া সমীচীন মনে করেন নি।

মনে হবে এই সবই আজগুবি কথা। বিচারক বিচারে প্রাণদণ্ড দেন নি—সরকার কি আইন ও আদালতের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারেন? এই প্রসঙ্গ আমি যথাস্থানে প্রকাশ করবো এবং পাঠকবর্গ জানতে পারবেন বিচার, আইন, আদালত ইত্যাদি কতখানি কি পরিমাণে সরকারের কুক্ষিগত!

আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক্। হিক্‌স সাহেবের বাসনা অনুযায়ী শান্তি, সুনীতি ও দিদির ফাঁসি যদিও হ'ল না, কিন্তু দিদি তখন থেকেই বিনা বিচারে জেলে বন্দী হয়ে রইলেন। দিদির বন্দী হওয়ার পর আমাদের মামলা চলা একেবারে যেন অসম্ভব হয়ে পড়লো।

লোকনাথ, গণেশ ও আমি ছাড়া আর সবাই যেন নিষ্কৃতি পায় বা লঘুদণ্ড পায়, আমাদের অভিভাবকেরা প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করেছিলেন।

দিদির অনুপস্থিতিতে ডিফেন্স ফাণ্ড প্রায় শূন্য—পরিপূরণের সম্ভাবনাও নেই বললেই হয়। এই পরিস্থিতিতে উপায়ন্তর না দেখে অভিভাবকেরা ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্টের কাছে আমাদের তিনজন (গণেশ, আমি ও লোকনাথ) বাদে আর সবার মামলা চালাবার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করেন। ট্রাইব্যুনালের

প্রেসিডেন্ট মিঃ জে, ইউনী আমাদের সেই আবেদন মঞ্জুর করেন। শব দেখলে শকুনের দল যেমন ছুটে আসে—ঠিক তেমনি সরকারী অর্থে আমরা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজ্ঞ কাউকে নিযুক্ত করবো জানতে পেরেই দু'তিনজন প্রখ্যাত উকিল যাঁরা আমাদের মামলা চলাকালে এতদিনের মধ্যে একদিন ভুলেও আমাদের কাছে আসেন নি—কত আপনজনের মত ছুটে এসে নিজেদের পরিচয় দিতে লাগলেন! গণেশের কাছে একজন পরিচয় দিলেন—"আপনার বাবা আমার গুরুভাই…অতএব…", আমার কাছে একজন গর্বের সঙ্গে পরিচয় দিলেন —"আপনার বাবা ও আমি একই উকিল-বারে সেই প্রথম থেকেই প্র্যাক্‌টিস করছি…অতএব…।" উকিল মহোদয়গণের এত সহৃদয়তার পরিচয় পেয়েও তাদের অভিলাষ পূরণে আমরা সক্ষম হলাম না।

অভিভাবকদের জানালাম তাঁরা যেন জজসাহেবের কাছে আবেদন করেন যে, আমরা আমাদের কৌঁসুলী মিঃ শ্রীশচন্দ্র বোস মহাশয়কে ভিন্ন অন্য কারও হাতে মামলা চালাবার ভার দিতে নারাজ। কারণ, মিঃ বোসই প্রথম থেকে আমাদের মামলার কার্যক্রম অনুসরণ করে আসছেন।

জজসাহেবের কাছে এই আবেদন করার আগে আমরা শ্রদ্ধেয় শ্রীশবাবুর সঙ্গে আলাপ করি ও অনুরোধ জানাই সরকার তাঁর ন্যায্য ফিস্ অনুমোদন না করলেও তিনি যেন আমাদের পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব প্রত্যাহার না করেন।

শ্রীশবাবু প্রথমে শরৎবাবুর জুনিয়র হয়ে আসেন। তাঁরা দু'জনে প্রায় এক বয়সের ছিলেন এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যারিস্টার। শরৎবাবু তাঁকেই আমাদের ডিফেন্সের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। রণধীর, ননী, মধু, প্রমুখ অভিযুক্ত সাথীদের জন্য তাদের অভিভাবকেরা মিঃ জে, কে, ঘোষাল, কুমিল্লা-বারের উকিল কামিনী দত্ত ও অখিল দত্ত প্রমুখকে নিযুক্ত করেন এবং মধু গুহের পিতা খ্যাতনামা উকিল মহিম গুহ নিজেই পুত্রের পক্ষ সমর্থন করেন। মিঃ শ্রীশ বোস অতি নিষ্ঠার সঙ্গে বাকি সবার পক্ষ সমর্থন করেন ও মামলা তদারক করেন।

আমাদের অনুরোধ শোনার পর তিনি বলেছিলেন—"দেখ সরকার থেকে আমার ন্যায্য ফিস্ দিক আর নাই দিক—আমি কি এই গুরুদায়িত্ব উপেক্ষা করতে পারি? আমি যে তোমাদের ভালোবেসেছি! বাংলার মাটি এই চট্টগ্রামেই যে প্রথম স্বাধীন বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! আমি চট্টগ্রামকে ভালোবেসেছি—চট্টগ্রামের লোকদের ভালোবেসেছি! চট্টগ্রামের জল, আকাশ, বাতাস সবই আজ আমার কাছে অতি মধুর ও অতি প্রিয় হয়ে উঠেছে! তোমাদের মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চট্টগ্রামেই আমাকে থাকতে হবে…।"

তারপর একদিন সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরা শেষ হ'ল ; উভয়পক্ষের সওয়াল জবাব সমাপ্ত হ'ল—মামলাও শেষ হ'ল। জজসাহেব এবারে মামলার রায় লিখবেন। এত বড় মামলার রায় লিখতে প্রায় দু'তিন মাস তো লাগবেই। কোর্ট ছুটি হয়ে গেল। রুটিন মত আমাদের আদালতে যাওয়া-আসার পর্বও আজ থেকে বন্ধ—উকিল-ব্যারিস্টার ও অভিভাকদেরও আজ থেকে ছুটি। শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার শ্রীশ বোস শেষ বিদায় নিতে আমাদের কাঠগড়ার সামনে এসে দাঁড়ালেন —গত দু'টি বছরের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের যে ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্য জন্মেছিল তার গভীরতা যে কতখানি তার অভিব্যক্তি পেলাম—বিদায় বেলায় শ্রীশবাবু আবেগভরে বললেন, "কে কোথায় থাকবো কে জানে— তোমাদের সঙ্গে হয়ত আর দেখা হবে না, কিন্তু তোমাদের স্মৃতিই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ—সবচেয়ে মূল্যবান সঞ্চয় হয়ে থাকবে। আর একটি কথা—তোমাদের কাছে আমার অনেক প্রত্যাশা। যদি সম্ভব হয় সরল ও খোলা মনে তোমরা আমাকে কিছু লিখে দিও—অমূল্য সম্পদ হিসাবে সঞ্চয় করে রাখবো।" বলতে বলতে ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো, চোখ মুছে তিনি বিদায় নিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের আর দেখা হয় নি। সত্যই তিনি আমাদের ভালোবেসেছিলেন—চট্টগ্রামের স্মৃতিবিজড়িত সেই অধ্যায়টি নিয়ে তিনি গর্ব অনুভব করতেন। আমরাও তাঁর সান্নিধ্যে এসে যে হৃদয়স্পর্শী দরদ ও সহানুভূতি লাভ করেছি তার মধুর স্মৃতি আমাদের মনের মণিকোঠায় বরাবর উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

শ্রীশবাবুর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মামলা সমাপ্তির উল্লেখ করেছি। কিন্তু মামলা চলাকালের দু'টি বছরের প্রধান ষড়যন্ত্রের বিবরণ এখনও বাকি। এবারে সেই অধ্যায়টির বিস্তারিত বিবরণ দেবো। কিন্তু তার আগে আর একটি জীবনের করুণ কাহিনী না লিখে পারছি না।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বহু তরুণ ও তরুণী বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিয়েছে। মাস্টারদার নেতৃত্বের যে অধ্যায়টি রচিত হয়েছে তার বীরত্বপূর্ণ কাহিনীগুলির প্রধান ইতিহাস অনেকের হয়ত জানা আছে। জনসাধারণের সামনে যে সব রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছে তার বিবরণ চাপা থাকে নি—প্রেসের মারফত ও লোকের মুখে মুখে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রকাশ্য ঘটনার পেছনে, লোকচক্ষুর অন্তরালেও কত বিচিত্র বাস্তব কাহিনী রয়েছে তার যে কোন ঠিকানা নেই! রাগ, দ্বেষ, হিংসা অভিমান, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও নামের প্রধান্যের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বন্ধুবিচ্ছেদের করুণ পালা, অবসাদ ও

অক্ষমতার জন্যে কত আত্মহত্যা, নিজেদের মধ্যেই একে অপরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষার সময় দুর্ঘটনায় কতজনের জীবনহানি হয়েছে এবং বঙ্গোপসাগ তীরে তাদের সমাধি রচিত হয়েছে, তার কোন সীমাসংখ্যা নাই।

জীবন তুচ্ছ করে যাঁরা বিপ্লবীদের সমর্থন করেছেন—তাঁদের অপরিহার্য অবদান না থাকলে বিপ্লবীরা তাদের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই অতখানি সার্থক করে তুলতে পারতো না। দরদী স্বদেশপ্রেমিকদের সাহায্য, আশ্রয় ও সমর্থন পেয়ে আমরা একদিকে যেমন অধিকতর শক্তিশালী হয়েছি—তেমনি আমাদের দলের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিভিন্ন ধরনের আত্মঘাতী প্রতিক্রিয়ার ফলে যে মর্মান্তিক ইতিহাস রচিত হয়েছে, তাতে আমাদের দল যে দুর্বল হয়ে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লোকচক্ষুর অন্তরালে বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে যে সব প্রতিকূল ও প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন ঘটনার ইতিহাস আছে এবং বিভিন্নরূপে নিভৃতে নির্জনে আত্মপ্রকাশ করে নীরবেই আবার তা' ইতিহাসের পাতা হতে মুছে গেছে—তারই একটি করুণ কাহিনী আজ আমি এখানে লিখবো।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের যুবকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে,—চারদিন পরে—২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পর্বত শিখরে অসংখ্য ইংরেজসৈন্যকে পরাস্ত করে বিপ্লবীরা বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছে।

আমাদের তরুণ সাথী কালী দে ১৮ই ও ২২শে এপ্রিল বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছে এবং ঐ দু'দিনই শত্রুর মেশিনগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। জালালাবাদের যুদ্ধ জয়ের কাহিনী আমরা সরকারী তথ্য থেকেই জানতে পেরেছি—সরকারী সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়ে শহরে প্রস্থান করার দু'তিন ঘণ্টা পরে বারোজন শহীদের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের প্রধান-বাহিনী ঘটনাচক্রে দু' দলে ভাগ হয়ে নিরাপদ স্থানে পৌছবার ব্যবস্থা করে।

কালী দে ২৫শে এপ্রিল তার নিজ বাড়িতে গিয়ে পৌছলো। তার মা-বাবা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন যে, পুত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ী সৈনিক। তাঁদের সন্তান মাস্টারদার নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির বীর সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করবার সুযোগ পেয়েছে, এটা তাঁদের গর্বের বিষয়। এখন পিতা-মাতার কর্তব্য শত্রুর কবল থেকে পুত্রকে নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখা। কালী দে পুলিসের নজরের বাইরে ছিল—কোন স্বীকারোক্তি থেকেও পুলিস তার নাম জানতে

পারে নি। তাই তার মা-বাবা মনে করলেন—কালী যদি বিয়ে করে, তবে পুলিসের সন্দেহের বাইরে থাকতে পারবে।

বহুদিন পূর্বেই মা-বাবা কালীর বিয়ের ঠিক করে রেখেছিলেন। গৌরবর্ণা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে প্রেমলতা। প্রেমলতার বাবা বেঁচে নেই। মেসো ও মাসীর কাছেই প্রেমলতা মানুষ হয়েছে—মেসোই তার একমাত্র অভিভাবক। কালী দে যুব-বিদ্রোহের সৈনিক, এ কথা প্রেমলতার মেসো ও মাসীমা জানতেন—তবু তার সঙ্গে মেয়ের বিয়েতে তাঁদের কোন আপত্তি ছিল না। বিয়েতে পাত্রীপক্ষের কোন আপত্তি না থাকাতে কালীর মা-বাবা মেয়ের মেসোকে ছেলের বিয়ের পাকা কথা দিয়েছিলেন। বিয়েতে কালীর মতামতের কোন প্রয়োজন আছে বলেই তাঁরা মনে করেন নি! বাবা ছেলেকে ডেকে বললেন—"দেখ বাবা, আমরা তোমার বিবাহ স্থির করেছি! পাত্রীপক্ষকে বহু আগেই পাকা কথা দিয়েছি—এখানে সম্বন্ধ করতে তাঁরা খুব উৎসুক। এখন বিবাহের দিনটি ধার্য করে তোমার বিয়ে দিয়ে আমরা ঘরে বৌ আনবো।" মা-বাবার এই ইচ্ছের কথা কালী আগে একটু আন্দাজ করেছিল বলেই এই প্রস্তাব শুনে সে স্পষ্ট করেই তাঁদের জানিয়ে দিল—আজীবন বিপ্লবের পথেই সে থাকবে স্থির করেছে, কাজেই সংসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়া তার পক্ষে অনুচিত।

কালীর এই স্পষ্ট কথা শুনে বাবা-মার মন ভেঙ্গে গেল। কন্যাপক্ষও এইরূপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না—বিয়ের সবই ঠিক, এখন হঠাৎ যদি বিয়ে ভেঙে যায় তবে বহু সামাজিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।

কালী একদিন একটু আগে বাড়ি ফিরেছে। রাত তখন প্রায় ন'টা। তার প্রতি কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। ঘরে প্রবেশ করবার সময় তার চোখে পড়লো—প্রেমলতার মেসো বসে আছেন, আর তাঁর সামনে বসে মা ও বাবা চোখের জল ফেলছেন। মেসো কালীর বাবাকে বেশ রূঢ়ভাবে দোষারোপ করছেন—"আমরা তো সব জেনে শুনেই আপনার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবো বলে আমাদের মত জানিয়েছি। আপনি আপনার ছেলের সুস্পষ্ট মত না জেনে কেন পাকা কথা দিলেন? ভেবে দেখুন আমরা এতখানি এগিয়েছি, আত্মীয়-স্বজন সকলের মধ্যেই মেয়ের বিয়ের কথা জানাজানি হয়ে গেছে—এখন যদি বিয়ে না হয় ভবিষ্যতে আমাদের মেয়ের কি গতি হবে? কালীর বাবা মাথা নীচু করে কাঁদছিলেন। প্রেমলতার মেসো মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির। গোপনে গা-ঢাকা দিয়ে এই সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া কোনমতেই উচিত

নয় মনে করে কালী দরজা খুলে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালো। কালীকে হঠাৎ সেই অবস্থায় দেখে তাঁরা একটু অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেলেন। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কালী বলল—"দেখুন, ঘর থেকে আমি আপনাদের সব কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি। আমার বাবা-মা আজ আপনার কাছে (প্রেমলতার মেসোর কাছে) বড় লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করছেন। আপনি যেভাবে তাঁদের দোষারোপ করছেন তাতে আমার মনে হচ্ছে আমিই সেই জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। আপনারা আমার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পূর্ণ জানেন, তবু কেন যে আমার মত একজন ছন্নছাড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছেন জানি না! তবে আমি সুস্পষ্টভাবে আপনাদের জানাচ্ছি—আমি আমার বিপ্লবী আদর্শ মত পথ ও কর্ম-সূচীর কোন পরিবর্তন করবো না। সমস্ত জানা সত্ত্বেও যদি আপনারা আমার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিতে চান তবে আমি নিশ্চয়ই বিয়ে করবো। আমার বিশেষ অনুরোধ সমস্ত ভাল করে বুঝে দেখে তবেই আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন—বাবা-মাকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁদের আর কষ্ট দেবেন না। আমার আর একটি অনুরোধ—আপনাদের মেয়ে আমার বিপ্লবী জীবনে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পেরে অসুখী হলে ভবিষ্যতে আপনারা কিন্তু আমাকে দোষারোপ করতে পারবেন না।"

যাইহোক্, সব জেনেও উভয়পক্ষই খুব আন্তরিকতার সঙ্গে চেয়েছেন এই শুভ পরিণয়টি সম্পন্ন হোক্। সবাই ভেবেছিলেন—ওরকম বড় বড় কথা সব ছেলেই বলে থাকে। একবার বিয়েটা তো হোক্—সুন্দরী বউটি তো ঘরে আসুক, তারপর দেখা যাবে বিপ্লবী আদর্শ। অভিভাবকেরা কালীর সম্বন্ধেও ঐরূপ ভেবেছিলেন এবং তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বিয়ের পরেও যখন কালী আবার বিপদ সাগরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো (ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ, ডিনামাইট্ ষড়যন্ত্র ইত্যাদি) তখনও কালীর বিয়ে করাটাকে দুর্বলতা বলে ভাবা বাস্তবতাকেই অস্বীকার করা। আমরা এমন যুবককেও জানি যারা জালালাবাদ যুদ্ধে রক্ত দেখে বিয়ে না করেই নিজের পিস্তল রিভলভার চিরকালের মত বিসর্জন দিয়েছে। কালী তাদের দলে ছিল না। যাই হোক্, শেষপর্যন্ত প্রেমলতার সঙ্গে কালীর বিয়ে হয়ে গেল—মা-বাবা সমারোহের ভেতর পুত্রবধূকে বরণ করে গৃহে তুললেন।

বিয়ের কিছুদিন পরে কালী মাস্টারদার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। প্রেমলতাকে কালী "প্রীতি" বলে সম্বোধন করতো। বিয়ের পর প্রীতিকে কালী তার জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে খুব ভালো করে বোঝালো। প্রেমলতার

অবশ্য এই বিয়েতে অমত করা সম্ভব ছিল না। হিন্দু ঘরের অতি সাধারণ মেয়ে—তার নিজের মতের ওপর বিয়ে নির্ভর করে না। অবশ্য বিয়ের আগেই সে কালীর বিপ্লবী জীবনের কাহিনী শুনেছে। সেই সময়ে এমন একটি যুগ চলছিল, যখন সাধারণ যে কোন তরুণী স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিকের গলায় মালা দিয়ে স্বামীরূপে বরণ করতে গর্ববোধ করতো। চট্টগ্রামের বিপ্লবী আবহাওয়ার মধ্যে কালীর সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে প্রেমলতা খুশিই হয়েছিল। স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে সেও সাম্রাজ্যবাদী শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এই ছিল তার সাধ।

মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য কালীকে দূর গ্রামে যেতে হবে, সেখানেই তাকে থাকতে হবে। প্রেমলতার কাছ থেকে তাকে বিদায় নিতে হ'ল—"দেখ প্রীতি, এবার আমার যেতে হবে—কবে ফিরবো বলতে পারছি না।" প্রীতি বললে—"নিশ্চয়ই তুমি যাবে। যাও—তবে তুমি কথা দিয়েছ আমাকে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ দেবে—সে কথা যেন মনে থাকে।" মাঝে মাঝে প্রায়ই প্রেমলতার সঙ্গে এইরূপ বিচ্ছেদ ঘটেছে। এক সময় বিশেষ প্রয়োজনে মাস্টারদা তারকেশ্বর দস্তিদারকে কলকাতা পাঠাতে চেয়েছিলেন। স্টীমার ও রেলপথে তারককে কলকাতা যেতে হবে। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতার রেলপথ তারকের জন্য খুব নিরাপদ ছিল না। খুব সাবধানতার সঙ্গে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তবে তাকে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। তাই স্থির হ'ল রেলপথে যাওয়ার সময় কালীর স্ত্রী তারকের স্ত্রী সেজে তারকের সঙ্গে কলকাতা যাবে। কালী ও তারক প্রেমলতাকে সব বলে এইরূপ বন্দোবস্ত করবার জন্য কাঁঠালী গ্রামে এলো। কালী তার স্ত্রীর সঙ্গে তারকের পরিচয় করিয়ে দিল এবং এই বাস্তব জীবনের নাটকে তাকে কি চরিত্রে অভিনয় করতে হবে, তা ভালো করে বুঝিয়ে দিল। প্রেমলতার উচ্চশিক্ষা ছিল না; যে পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে তাতে পরস্ত্রী সেজে কলকাতায় যাওয়ার প্রস্তাবে তার সংকোচ ও দ্বিধা আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রেমলতা নিজেকে নানাভাবে নানা বিষয়ে উপযুক্ত করে নিয়েছে—সে সব সময়েই যেন সর্বপ্রকার বৈপ্লবিক কাজের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু শেষ অবধি অনিবার্য কারণবশতই তারকেশ্বরের আর কলকাতা যাওয়া হ'ল না।

প্রেমলতা যে সময়ে বিপ্লবী সংগঠনের কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই সময়ে মাস্টারদার সঙ্গে আমাদেরও সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। যুব-বিদ্রোহের

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি পুরোদমে চলেছে। দশ মণ বারুদ তৈরির দায়িত্ব অর্ধেন্দু গুহের উপর ন্যস্ত। অর্ধেন্দুর বিপ্লবী নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ ধারণা ছিল। কালী দে তার সর্বশক্তি নিয়ে অর্ধেন্দুর সঙ্গে যোগ দিল। কালীর কাকা, বাবা মা ও স্ত্রী—সকলেই বন্দুকের বারুদ তৈরির "উৎসবে" লেগে গেলেন। রাতদিন খেটে তাঁরা সোরা, গন্ধক ও কয়লা যোগাড় করে ঐগুলি সব গুঁড়ো করেছেন, পরে আবার সেইগুলিকে খুব গোপন স্থানে গুদামজাত করেছেন। কুল গাছের কয়লা প্রয়োজন। কালীর বাড়িতে কুলগাছ কেটে পুড়িয়ে কয়লা তৈরি করা থেকে সেই কয়লা গুঁড়ো করে ছেঁকে টিনে বোঝাই করার সমস্ত কাজই একটি কারখানার নিয়মে চলেছে। প্রেমলতার মুখে কথাটি নেই—রাতদিন সে নিষ্ঠার সঙ্গে খেটে চলেছে। গানপাউডার তৈরি করতে হবে—ল্যাণ্ডমাইন তৈরি করতে হবে—সারা শহরে যে বিস্ফোরণের বিভীষিকা সৃষ্টি করতে হবে! তাই প্রেমলতার বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই—নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সব কাজ সম্পন্ন করা চাই!

আমার এই বাস্তব কাহিনীর নায়িকা প্রেমলতা। তাই তার জীবনের বৈশিষ্ট্যটুকু বোঝবার প্রয়োজনেই এইটুকু লিখছি। অন্যান্য সাংগঠনিক কার্যকলাপের বহু বিবরণ আমার লেখায় পাওয়া যাবে। সেইগুলির পুনরাবৃত্তিতে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

দশ মণ গানপাউডারের প্রোগ্রাম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় কালীর কাকার বাড়ীতে দিনের বেলায় পুলিস হানা দিল। কালীর কাকা —নিশীথ দে এই প্রোগ্রাম কার্যে পরিণত করতে যে অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন তার তুলনা বিরল। তাঁর বৈপ্লবিক অবদানের কথা স্বাধীনতার ইতিহাসে অনুক্ত থাকলে ইতিহাস ত্রুটিমুক্তি হবে না। তাঁর কথা আমার যতটুকু জানা আছে দেশবাসীর অবগতির জন্য ভবিষ্যতে তা' লেখবার ইচ্ছা রইল। সেইদিন অতর্কিত পুলিস আক্রমণের মুখে ৺নিশীথ দে, প্রফুল্ল ও অর্ধেন্দু গ্রেফতার হ'ল। কিন্তু পুলিসের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে কালী দে ও ভাবী ধলঘাট যুদ্ধের শহীদ অপূর্ব সেন পালাতে সক্ষম হয়।

এই ঘটনার পর কালী দে সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করে। বেশ কিছুদিন প্রেমলতার সঙ্গে কালীর স্বাভাবিক যোগাযোগ ছিন্ন হ'ল। পুলিস কালীদের খোঁজে প্রেমলতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তাদের বাড়ি যায় এবং প্রেমলতাকে গ্রেফতার করে বোধহয় থানাতেও নিয়ে গিয়েছিল। সাধারণ ঘরের গ্রাম্য মেয়ে প্রেমলতা—সে রাজনীতি করে না। সামান্য লেখাপড়া জানে, বোঝে কম,

সে কেমন করে বিপ্লবী দলের সভ্যা হবে? পুলিসের তর্জন-গর্জন কোন কাজেই এলো না। প্রেমলতা পুলিসের প্রশ্নের উত্তরে বলল—"তিনি ব্যবসার জন্য বাইরে যাবেন বলেছিলেন—এ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আমি তো আর কিছু বলতে পারবো না।" শত চেষ্টাতেও পুলিস তার মুখ থেকে আর কিছু বের করতে পারলো না। পুলিসের পক্ষে প্রেমলতাকে সন্দেহ করা একটু কঠিনই বটে। তার চোখে মুখে স্বাভাবিক সরলতার চিহ্ন। এত শান্ত নম্র, সরল, একটি গ্রাম্য মেয়ে পুলিসের বীর দাপটের সামনে কি মিথ্যা বলার সাহস করতে পারে? পুলিস প্রেমলতাকে "বুদ্ধিমানের" মতই নিষ্কৃতি দিল।

বেশ কিছুদিন গেল। কালী ও তারকেশ্বর আবার কাঁঠালী গ্রামে ফিরে এলো। এই ঘাঁটিতে কালী ও প্রেমলতার আবার যোগাযোগ হ'ল।

ইতিমধ্যে দলের তরফ থেকে শান্তি চক্রবর্তী প্রেমলতার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। তারক ও কালী ফিরে আসার পর কল্পনা দত্তও এই ঘাঁটিতে বহুবার এসেছে। কল্পনার সঙ্গেও প্রেমলতার পরিচয় হয়। তারকেশ্বর দস্তিদারের পরিচালনায় কল্পনা, প্রেমলতা ও শান্তি চক্রবর্তী সমুদ্রতীরে রিভলভার ছোঁড়া প্র্যাক্টিস করেছে। এক সময় নির্মলদা, তারকেশ্বর ও মাস্টারদা স্থির করেছিলেন—প্রীতি, কল্পনা ও প্রেমলতা পুরুষ বেশে দলের অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে পাহাড়তলী-ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণ করবে। অ্যাক্‌শনের দিন এগিয়ে এলে সবার অজান্তে কিন্তু বাধা এলো। কল্পনা দত্ত পুরুষ বেশে দলের বন্ধুদের কাঁঠালীর ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছিল। ডবলমুরিং-এর কাছাকাছি মুসলমান এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় কল্পনাকে সেখানকার অবাঞ্ছিত স্থানীয় লোকেরা সন্দেহ করে নিকটস্থ পুলিস-থানায় নিয়ে যায়। ঐরূপ স্থানে পুরুষবেশে কল্পনার গতিবিধি দেখে পুলিসের সন্দেহ হয়। বালই বাহুল্য, সেদিনই কল্পনা গ্রেফতার হ'ল। এইরূপ একটি অপ্রত্যাশিত অঘটন ঘটায় সেই প্ল্যান সাময়িকভাবে বর্জন করতে হয়।

মাস্টারদা ও নির্মলদা ভাবলেন—পুরুষবেশে একসঙ্গে তিনজন মেয়েকে সাহেব-ক্লাব আক্রমণ করতে পাঠাবার প্ল্যানটি বোধহয় ত্রুটিহীন নয়—অস্বাভাবিক গতিবিধির কারণ থাকলে সুরুতেই হয়ত প্ল্যানটি নষ্ট হবে।

এই পরিস্থিতিতে মাস্টারদা প্রেমলতাকে সাময়িকভাবে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন; কারণ কিছুদিন অবস্থার গতি দেখতে হবে। দু'এক দিনের মধ্যেই কল্পনা জামিনে মুক্তি পেলো; কিন্তু কেন কল্পনা পুরুষবেশে শহরের সীমান্ত অতিক্রম করছিল—এই রহস্যভেদের জন্য পুলিস ব্যস্ত হয়ে উঠলো। এদিকে

বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা থেকে প্রেমলতাকে বাড়ি পৌছে দিতে শান্তি চক্রবর্তী যাবে স্থির হ'ল। কাঁঠালীর বিস্তৃত সমুদ্রতীর ধরে শান্তি ও প্রেমলতা রাত্রি-বেলা বাড়ী ফিরে চলেছে। কালী হাসিমুখে প্রেমলতাকে বিদায় দিয়েছে। প্রেমলতা বিপ্লবীদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে—আর কখনও ফিরবে কিনা জানে না—যদি কখনও ফিরেও আসে তবু সবার সঙ্গে তার আবার দেখা হবে কিনা তা কে জানে! প্রতি মুহূর্তে বিপদ আছে—যে কোন সময়েই পুলিসের সঙ্গে বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংঘর্ষ হতে পারে—সেই সংঘর্ষে কে কখন চিরকালের মত হারিয়ে যাবে তা কে বলতে পারে! প্রেমলতা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে বটে কিন্তু বাড়িতে তার তো কোন সাথী নেই। সেখানে তাকে থাকতে হবে একা—একেবারে একা! শান্তি তাকে পৌছে দিয়েই ফিরে যাবে। প্রেমলতার অন্তরে ঝড় উঠেছে—সে নিজেকে আর সামলাতে পারলো না। অভিমানভরে শান্তিকে বলল—"আমি তো বিপ্লবী—সবাই মরতে পারে—সবাই বিপদ মাথায় নিয়ে দিন কাটাতে পারে, তবে আমি কেন পারবো না—অক্ষম মনে করে তাঁরা কেবল আমাকেই কেন সরিয়ে দেবেন? না—না—আমি বাড়ি ফিরে যাব না। একবার যখন বাড়ি থেকে এসেছি—তখন আর বাড়ি ফিরবো না। বাড়িতে আমার কে আছে? কি আছে? কোন্ আশায় আবার বাড়ির খাঁচায় আবদ্ধ হ'ব? একবার বাড়ি ছেড়ে এসেছি, আবার ফিরে গেলে আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। মাস্টারদার কাছে গিয়ে বলবো—এ তাঁর ভারি অন্যায়, আমার প্রতি অবিচার! তাঁর কাছে আমার অন্তরের মিনতি জানাবো—আমাকেও সমান সুযোগ দিতে হবে। শান্তি ভাই, আমি সত্যি বলছি—মরতে আমি ভয় পাই না। তুমি দেখো, তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে আমি প্রাণ দেবো।"

শান্তি প্রেমলতাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলো যে, মাস্টারদা সময় মত নিশ্চয়ই তাকে ডেকে নেবেন। প্রেমলতা শান্তির কথা মানল না—সমুদ্রসৈকতে বালির ওপর বসে পড়লো। অবাক হয়ে শান্তি জিজ্ঞাসা করলো—"কি হ'ল?" প্রেমলতা দৃঢ়স্বরে বলল—"না, আমি বাড়ি যাবো না—তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল। প্রেমলতা উঠে বিপরীতমুখে হাঁটতে সুরু করলো। শান্তিও খুব ব্যস্ত হয়ে তার পথ অবরোধ করে দাঁড়ালে প্রেমলতা পাশ কাটিয়ে দৌড়তে লাগলো। প্রেমলতার দৃঢ়তার কাছে হার মেনে দু'জনে আবার সেই আস্তানায় ফিরে এলো।

মাস্টারদা প্রেমলতার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিল। তবু

নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রেমলতার বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত বলে তিনি মনে করলেন। সব আশ্রয়ে মেয়েদের সঙ্গে আত্মগোপন করা সুবিধেজনক নয়—এতে পাড়ার বা বাড়ির অনেকের অহেতুক কৌতূহল বাড়ায়। সেইজন্য মাস্টারদা কালীকে বললেন—"তুই সব বুঝিয়ে বল্—সময় ও সুযোগ মত আমরা নিশ্চয়ই ওকে আবার ডেকে পাঠাবো।"

প্রতিকূল পরিস্থিতির সব দিক দেখিয়ে কালী প্রেমলতাকে নানাভাবে বোঝালো। কোন মেয়ে গোপন আশ্রয়ে থাকলে সকলের নিরাপত্তা যদি বিপন্ন হয়, তবে শত লাঞ্ছনার ভয় থাকা সত্ত্বেও সে কি কখনও সেই আস্তানায় থাকতে চাইতে পারে? তার পরের দিন—রাত্রির অন্ধকারে স্বামীর সঙ্গে সে বাড়ি ফিরে এলো। কিন্তু কি জানি কেন তার মন যেন চির বিচ্ছেদের আশঙ্কায় হু হু করে কেঁদে উঠলো। সে বুঝতে পারছিল—একবার সুযোগ হারালে সেই সুযোগ আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

কালী বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। বাড়ির কারোর সঙ্গে সে দেখা করবে না—স্ত্রীকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়েই সে বিদায় নেবে। চুপি চুপি এসেছে এক্ষুনি আবার চুপি চুপি ফিরে যাবে। শান্ত, স্থির, ধীর এক অপরূপ মূর্তিতে প্রেমলতা স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে! আকাশের অগণিত নক্ষত্ররাজি এই করুণ বিদায়ের গোপন সাক্ষী!

কালী বলল—"প্রীতি এবার আসি—আবার দেখা হবে।" প্রেমলতা ভেঙে পড়লো—"দাঁড়াও তোমাকে শেষবারের মত প্রণাম করি।" প্রেমলতা কালীকে প্রণাম করে রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলল—"জানি আমার সঙ্গে আর তোমাদের দেখা হবে না। তোমরা যে পথে যাবে আমিও সেই পথেই যাত্রা করেছি—ফেরার পথ আমার নেই। এ জগতে দেখা না হলেও—তোমাদের দেখা পেতে আমি পরলোকে অপেক্ষা করে থাকবো।" প্রেমলতা আর বলতে পারলো না। গভীর বেদনার্ত হৃদয়ে বিদায় নিয়ে ধীরপদে কালী ফিরে চললো —যতদূর দৃষ্টি যায় প্রেমলতা কালীর অপস্য়মাণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল।

ধারাবাহিকভাবে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিতে হলে প্রেমলতার প্রসঙ্গ এখানে স্থগিত রেখে আগে ঘটনাবহুল দু'টি বছরের বিবরণ দিতে হয়। মাস্টারদা ও তারকেশ্বরের ফাঁসি হয়ে যাওয়ার পর প্রেমলতার জীবনের পরিশিষ্টটুকু বলতে হয়। কিন্তু অত বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে ছোট্ট প্রেমলতা হয়ত হারিয়েই যাবে—তাই এখানেই তার জীবন-কাহিনীটুকুর ওপর যবনিকা টেনে দেওয়া ভালো মনে করলাম।

তারপর আরো কয়েক মাস গত হ'ল। মাস্টারদা ধরা পড়েছেন। তারকেশ্বর ও কল্পনা ধরা পড়েছে। কালী দে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আত্মগোপন করে আছে। সেই অবস্থায় কোন এক সুযোগে আবার প্রেমলতার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সুখ-দুঃখের অনেক কথা হ'ল। মেসো মারা গেছেন। বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। যতই আর্থিক অনটন হোক্ না কেন দুঃখ-কষ্টেও মানুষ দিন কাটাতে পারে, কিন্তু লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, রাতদিন শাপ-শাপান্ত প্রেমলতার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। তাও হয়ত সে সহ্য করতে পারতো যদি বিপ্লবী দলে তার পূর্ণ সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। অবসাদ ও নিরাশার ঘোর অন্ধকার প্রেমলতাকে আচ্ছন্ন করলো। কালীর কাছে আগেও বহুবার সে তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা জানিয়েছে—'তার বেঁচে থাকবার ইচ্ছা নেই, আত্মহত্যা করে শান্তি পেতে চায়'—একথা কালীর অবিদিত নয়।

একেবারে অধৈর্য হয়ে প্রেমলতা এবারে কালীকে জানালো—"আর সহ্য করতে পারছি না—মৃত্যু ছাড়া আর কোন গতি নেই; আমাকে আত্মহত্যাই করতে হবে।" কালী সস্নেহে অনেক বুঝিয়েও প্রেমলতাকে নিরস্ত্র করবার কোন উপায় না দেখে বলল—"প্রীতি আমাকে অদেয় তোমার কিছু নেই। না চাইতেই আমাকে তুমি সবই দিয়েছ—তবু আজ তোমার কাছে আমি একটি ভিক্ষা চাই—বল তুমি আমাকে ভিক্ষা দেবে।"—"কেন তুমি আমাকে পাপের ভাগী করছ? তুমি আদেশ কর, আমি সব করতে প্রস্তুত।"—"তবে তুমি আমাকে কথা দাও—আমার কথা রাখবে!" প্রেমলতা কথা দিল—কালী যা চাইবে সে তাই করবে।—"যত কষ্টই হোক্ না কেন, সব তোমায় সহ্য করতে হবে—তুমি কোনদিন আত্মহত্যা কোরো না, এই আমার প্রার্থনা"—প্রেমলতা কলীকে কথা দিল সে আত্মহত্যা করবে না।

কালী দে তখন হাবিলাস দ্বীপে আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু পুলিসকে আর বেশিদিন ফাঁকি দেওয়া গেল না—একদিন সেও ধরা পড়লো। চট্টগ্রাম জেলে ভিন্ন ভিন্ন 'সেলে' মাস্টারদা, তারকেশ্বর ও কল্পনা দত্তকে রাখা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। কালী দেকে জেলে অন্যত্র রাখা হ'ল, যেন এঁদের সঙ্গে তার গোপন সাক্ষাতের কোন সুযোগ না থাকে। যথারীতি কালী দের বিরুদ্ধেও বিচারের প্রহসন সুরু হ'ল। মামলার সময় আদালতে বা জেলে পুলিস এবং জেল-কর্তৃপক্ষের সামনে অবাঞ্ছিত করুণ পরিস্থিতির আশঙ্কা করেই কালী প্রেমলতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সাহস করে নি।

জেলে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে। তবে পুলিসের মাধ্যমে censored না হওয়া পর্যন্ত কোন পক্ষই কোন চিঠি পাওয়ার অধিকারী নয়। তাই কালী প্রেমলতাকে সাধারণ খোলা চিঠি লিখতো না।

জেল-হাজতে আমাদের দলের সাথী সুধেন্দু দাসও কালীর সঙ্গে ছিল। সে তারকেশ্বরের সঙ্গে গ্রেফতার হয়। তার বিরুদ্ধেও মামলা চলছিল। সুধেন্দু কালীর কাছে প্রেমলতার সব কথা শুনেছে। কালীর এই চিঠি না লেখা এবং দেখা না করাতে প্রেমলতার মানসিক অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে, তা অনুমান করা বন্ধু সুধেন্দুর পক্ষে শক্ত ছিল না। এই পরিস্থিতিতে সুধেন্দু কালীর নামে জেল-কর্তৃপক্ষের মারফত প্রেমলতাকে চিঠি লিখতো—কালীর কোন মানাই সে শোনেনি। প্রেমলতাও কালীকে যথারীতি উত্তর দিত।

মাস্টারদা ও তারকেশ্বরের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। কল্পনার যাবজ্জীবন এবং কালীর দশ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল। প্রেমলতার সব আশা-ভরসা নির্মূল হয়ে গেল। কত পরিকল্পনা—কত আশা—ভবিষ্যতে বিপ্লবী সাথীদের পাশে দাঁড়িয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবে! একি হ'ল। একটার পর একটা বাতি তার চোখের সামনে নিভে যেতে লাগলো! অন্ধকার! চারিদিক ঘিরে নিরাশার ঘোর অন্ধকার নেমে এলো! মাস্টারদা, তারকেশ্বর—কেউ থাকবে না! কালী—তার স্বামী সেও দ্বীপান্তরে চলে যাবে! এই ব্যর্থ জীবন নিয়ে তাকে একা চলতে হবে! তার ওপর আত্মীয়-পরিজনের অবিরাম পীড়ন ও লাঞ্ছনার সুতীক্ষ্ম দংশন! কালীর চিঠি পাওয়ার পর থেকেই সে মনস্থির করে ফেলেছে আত্মহত্যা করেই সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াবে। কালী আন্দামানে চলে যাবে সুদীর্ঘ দশ বছরের জন্য। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকলেও এখনও তো সে চট্টগ্রামেই আছে! অত দূর দেশে—দ্বীপান্তরে চলে যাওয়ার পরে যদি প্রেমলতা আত্মহত্যা করে তবে হয়ত সেই সংবাদ কালী জানতেই পারবে না! তাই প্রেমলতার মন অধীর অস্থির হয়ে উঠল! প্রতিটি মুহূর্ত তার অসহ্য। না না কালী দ্বীপান্তরে পাড়ি দেওয়ার আগেই তাকে আত্মহত্যা করতে হবে। তবু—তবু তার স্বামী জেনে যাবে প্রেমলতা আর নেই—প্রেমলতা এই জগৎ থেকে চির বিদায় নিয়েছে!

বহুদিন আগে থেকেই প্রেমলতা তীব্র বিষ পটাসিয়াম সাইনায়েড সংগ্রহ করে রেখেছিল। রাতে দরজায় খিল দিয়ে সে শুতে গেল। আজ সে ঘুমাবে —চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়বে। বিছানায় গেল, তারপর সব শেষ—প্রেমলতা চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়লো! একটি ছোট্ট চিঠি সে কালীর উদ্দেশ্যে লিখে

যায়—"অপরাধ ক্ষমা কোর। তোমাদের মত উপযুক্ত হয়ে আমি জন্মাইনি। যদি পরকাল থাকে তবে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো—বিদায়··· ।"

প্রেমলতা আজ নেই। যাবার দিনে তার জন্য কেউ চোখের জল ফেলেছে কিনা জানি না। প্রেমলতা যে ব্যথা নিয়ে এ সংসার থেকে বিদায় নিল—সেই করুণ ইতিহাস দেশবাসী কতখানি বুঝবে? ইতিহাসবিদ্‌গণ ভবিষ্যতে যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ভাববেন—কিভাবে বিপ্লবের কষ্টিপাথরে প্রেমলতার মূল্যায়ণ হবে? ইতিহাসে প্রেমলতার সঠিক স্থান কোথায়?

শত লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন সত্বেও প্রেমলতার একান্ত আপনজনেরা চিরকালের মতই তাকে ছেড়ে যাওয়াতে প্রেমলতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে। জেলে কালীর কাছে সে একটা চিঠি লেখে। এইটিই বোধহয় প্রেমলতার শেষ চিঠি—

"···একদিন তুমি আদেশ করেছিল—আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম। তোমার আদেশ আমি এতদিন পর্যন্ত পালন করেছি। আজ তোমার কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা এতদিন ধরে আমাকে তুমি যে কথার বাঁধনে বন্দী করে রেখেছ, আজ তা থেকে মুক্তি দাও। তোমরা সবাই স্বাধীনভাবে চলেছ—আমাকে কেন বন্দী করে রেখে যাবে? তোমার কাছে প্রার্থনা—আমার দিকটা বিবেচনা করে তুমি তোমার আদেশ প্রত্যাহার করবে ও আমাকে মুক্তি দেবে।"

কতখানি ব্যথা, কতখানি মানসিক অশান্তি এবং কি নিদারুণ পরিতাপ নিয়ে প্রেমলতা চিঠিখানি লিখছে, তা হৃদয়ঙ্গম করা কালীর পক্ষে কষ্টসাধ্য নয়। কালীর মনে উভয় সমস্যা—কি করবে? তার এই করুণ প্রার্থনা প্রত্যাখান করবে, নাকি অতীতের 'আদেশ' প্রত্যাহার করে প্রেমলতাকে মুক্তি দেবে যাতে অবস্থা বিশেষে সে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়! কালী চিঠির উত্তর দিল—"প্রীতি তোমাকে সুখী করতে পারলাম না। তোমার কোন আশাই পূর্ণ হ'ল না। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। অপরাধের বোঝা আর বাড়াবার সাহস নেই। তোমাকে মুক্তি দিলাম। স্বাধীনভাবে স্থির মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে··· ।"

রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামানে নির্বাসন দেওয়ার আইন আবার পাশ হয়েছে। আমরা তখন আন্দামান জেলে। জেলে সাক্ষাৎকালে বাড়ির লোকেরা জেনে গেল কালীকেও আন্দামানে পাঠানো হবে। প্রেমলতাও এই সংবাদ পেল।

বিপুল উদ্যমে যুব-বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতিপর্ব চলেছে। কালী দে এবং তার পরিবারস্থ সকলের সাহায্যে ও সহযোগিতায় বন্দুকের বারুদ ও গান-কটন তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছে। গান-কটন তৈরি করা খুব

সহজ ব্যাপার নয়। প্রায় আশী বা নব্বই পাউণ্ড নাইট্রিক ও সালফিউরিক এ্যাসিডের সংমিশ্রণে ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাত্র এক পাউণ্ড গান-কটন তৈরি হতে পারে। ডিনামাইট্ বা গান-কটন স্ল্যাবস্ সরকারী স্টক বা রেল-কোম্পানীর স্টক থেকে অপহরণের জন্য মাস্টারদার কাছে খবর পাঠানো হ'ল। আমার দিদির মাধ্যমেও ডিনামাইট্ যোগাড় করবার চেষ্টা করা হয়। কিভাবে এবং কার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ও পরামর্শ করে এ কাজে অগ্রসর হতে হবে সে বিষয়ে দিদিকে গোপনে নির্দেশ পাঠালাম। কামিনীবাবুর (কুমিল্লার প্রখ্যাত উকিল কামিনী দত্ত—আমাদের কাকাবাবু) জ্যেষ্ঠপুত্র—ননীদা (সরোজকুমার দত্ত যিনি বর্তমানে বেঙ্গল ইমিউনিটির সর্বেসর্বা) আমাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। যুবা বয়সে বাংলার বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁরও যোগাযোগ ছিল। ননীদার নানান resource ছিল। দিদিকে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে বলি। কয়লাখনির মালিক ও বিভিন্ন কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল এবং তাদের মারফত ডিনামাইট্ যোগাড় করা সহজ বলেই এই ব্যাপারে দিদি তাঁকে অনুরোধ করেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দলের সভ্যেরা আমরা ফাঁসির অপেক্ষায় আছি ভেবে খুবই বিচলিত—আমাদের সামান্য সাহায্যেও যদি আসতে পারেন তার জন্য তাঁরা সর্বদাই সচেষ্ট।

ডিনামাইট্ সংগ্রহ করার কাজে আমার দিদির সঙ্গে ননীদার ও আমার বড় মামার ছেলে উমেশ সিং-এর (বর্তমানে বোধহয় আগরতলার মন্ত্রিসভার একজন) যোগাযোগ ছিল। এদিকে আমরা বাবা ও অর্ধেন্দুর কাছে বারবার খবর নিচ্ছি কাজ কতখানি এগোলো। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন—কিন্তু ডিনামাইট্ যোগাড় করা কোনমতেই সম্ভব হচ্ছে না। ইচ্ছে করলেই ডিনামাইট্ কেনা যায় না। ক্রেতা এবং যেখানে পাওয়ার সম্ভাবনা—এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ সূত্র খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকতে হবে।

সেই জন্য আমরা একইসঙ্গে বিভিন্ন ব্যবস্থার আয়োজন করি। অন্তত দশ মণ বারুদ তৈরি করবার ভার পড়লো অর্ধেন্দু গুহের ওপর। স্থির হ'ল গান-কটন তৈরির সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করা এবং কলকাতা গিয়ে প্রচুর পরিমাণে এ্যাসিড যোগাড়ের দায়িত্ব নেবে কল্পনা দত্ত। এই তিনটি সাংগঠনিক ব্যাপারে তদারক করা ও যোগাযোগ রাখার ভার রইল অর্ধেন্দুর ওপর।

কল্পনার বাবা সরকারী কর্মচারী। তার ঠাকুরদা রায়বাহাদুর খেতাবধারী সরকারের আস্থাভাজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাই প্রথমদিকে এই পরিবারটি পুলিসের নজরের বাইরে ছিল। তা'ছাড়া কল্পনা একজন কৃতী ছাত্রী—বৃত্তি পেয়ে বি-এসসি পড়ছে। এমন একটি আদর্শ পরিবারের বিদুষী মেয়ে কি কখনও ক্ষেপার দলে যোগ দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে পারে? বিচক্ষণ ইংরেজ সরকারের পুলিস তাই এই পরিবার সম্বন্ধে প্রথমে উদাসীন ছিল। শেষমুহূর্তে কল্পনার সঙ্গে বিপ্লবী দলের ঘনিষ্ঠতার বিষয় জানতে পেরে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার সুযোগ পুলিস আর পেল না।

সেই যুগে, ১৯৩০ সালে ও তার প্রায় ত্রিশ বছর আগে থেকে, বাংলা তথা ভারতের তরুণ-তরুণীরা যে ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ কামনায় জীবন তুচ্ছ করে অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, হাসিমুখে দলে দলে ফাঁসিমঞ্চে আত্মাহুতি দিয়েছে—এ্যাড্‌ভেঞ্চারের উন্মাদনার প্রভাবই কি তার মূল কারণ? বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ রায়বাহাদুর পরিবারের কৃতী মেয়ে কল্পনার মতই আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ আরো বহু 'কল্পনা' বিপ্লবীদলের প্রথম সারিতে যোগ দিয়েছে—এ কি জীবনে নিছক রোমাঞ্চ সৃষ্টির উন্মাদনায়?

বহুবার এইরূপ বিশ্লেষণী প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। এই সেদিনও আমি স্নেহাংশুদার (ব্যারিস্টার স্নেহাংশু আচার্য) চেম্বারে যাই। তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না—কিছু পরে আসেন। ইতিমধ্যে তাঁর জুনিয়ার ব্যারিস্টার একজন আমাদের অতীত যুগের প্রসঙ্গ তুললেন। কথা প্রসঙ্গে আমার অভিমত জানবার জন্য প্রশ্ন করলেন—"মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, কতখানি সাহস, বিক্রম ও দৃঢ়তা নিয়ে সে যুগের তরুণেরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে! মুষ্টিমেয় তরুণদল সত্যিই কি ভেবেছিল প্রচণ্ড বৃটিশ শক্তিকে তারা উচ্ছেদ করতে পারবে? বিপ্লবীদের ঐ চরম ত্যাগের পেছনে কিসের উৎস ছিল? তা' কি কেবল রোমাঞ্চকর কাজের উন্মাদনা......?"

খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ 'হয়ত' এই মূল তথ্যের সঠিক স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে পারে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণও বিপ্লবীদের প্রেরণার মূল কারণ সঠিকভাবে নির্ধারিত করতে পারবে কিনা তা ভেবে "হয়ত" বলে আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছি। 'বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি', 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি' প্রভৃতি বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতে পর্যবসিত। নিজস্ব অন্তরের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয়। ডায়লেকটিক্‌সের নামে—যুক্তিবাদের নামে যা আমরা অব্যর্থ সত্য বলে চালাতে চাই তাও অন্তরেরই বস্তু, অন্তরের

প্রতিক্রিয়াতেই প্রভাবান্বিত। যেমন নাকি ক্রুশ্চেভ বললেন—মাও সে-তুং সব Dialectics ভুলে গেছেন—আবার মাও সে-তুং বললেন—ক্রুশ্চেভ সব dialectics বিসর্জন দিয়েছেন এবং সেইক্ষেত্রে আপনি, আমি ও জনসাধারণ বিচার করে, যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ অনুসরণ করে কার নির্ধারিত পথ নির্ভুল তা স্থির করবো। এইরূপ অবস্থায় আমরা নিজের নিজের অন্তরের 'dialectics' দিয়েই সত্যতা উপলব্ধি করি। অর্থাৎ, বিপ্লবী মন যে dialectics অনুসরণ করে মত পথ ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব বুঝবে, আপোষবাদী মন তার নিজস্ব গতির dialectics প্রয়োগে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা কিসের তাগিদে উন্মাদের মত চরম আত্মত্যাগ করে গেলেন সেই জবাব আমার অন্তরের dialectics দিয়ে যা বুঝেছি, তা লিখছি —এই perspective নিয়েই তা বিচার করতে হবে। আমি জানি, আমরা সবাই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবো না। তবু আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি তাই বলছি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর রথচক্রে দলিত নিষ্পেষিত ভারত বহুকাল ধরে স্তরে স্তরে কংগ্রেসের liberals-দের নেতৃত্বে বিভিন্নভাবে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। বিদেশী শাসনমুক্ত হওয়ার অভিলাষে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন গতিতে চলেছে। অস্ত্রের সংঘাতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য ভারতের তরুণ-তরুণীরা বদ্ধপরিকর। হতে পারে তারা মুষ্টিমেয়—হতে পারে তারা শ্রেণী সংগ্রামের স্তরভেদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বুঝতে অক্ষম, কিন্তু তারা বুঝেছিল বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো ভারতবাসীরই দায়িত্ব। সেই উপলব্ধি সাধারণের ধারণার মত নয়—বিপ্লবীরা অন্তরের প্রেরণা ও অনুভূতি দিয়েই তা অনুধাবন করেছিল। উন্মাদনার বশবর্তী হয়ে রোমাঞ্চ সৃষ্টির জন্য চরম আত্মত্যাগ সম্ভব নয়! কানাইলাল, ক্ষুদিরাম প্রমুখেরা কেবল উন্মাদনার জন্যই ফাঁসিমঞ্চে আত্মাহুতি দেন নি। তবে ভারতে বৃটিশ শাসন উৎখাতকল্পে বিপ্লবীরা সত্যই উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে যদি চরম ঘৃণা পোষণ করা না যায়—যদি বিদেশী শাসন, শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সমস্ত মনপ্রাণ বিদ্রোহী হয়ে না ওঠে, তাহলে কখনও কি তারা আত্মাহুতি দিতে পাগলের মত ছুটে যেতে পারে? পাগল তারা—উন্মাদ তারা, তাতে কোনই সন্দেহ নেই, তা' নাহলে কি মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বোমা ও রিভলভার হাতে মুষ্টিমেয় ক'টি যুবক প্রচণ্ড শক্তির

বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে? প্রবল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে অসমান যুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে উন্মাদনা অবশ্য কিছুটা থাকতেই হয়! মুষ্টিমেয় এই মরণ-পাগলের দলের পক্ষেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ দেখানো সম্ভব হয়েছিল। ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করার দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছিল। যদি ঠিক সময়ে ঠিকভাবে প্রজ্বলিত হয় তবে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট! যেখানে গণ-সংগ্রাম বা গণ-অভ্যুত্থান স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ স্থিতাবস্থার জড়তা ভেঙে এই সংগ্রাম বা অভ্যুত্থান বৈপ্লবিক পথে পরিচালিত করতে হলে বারংবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করার প্রয়োজন অপরিহার্য। কানাইলাল, ক্ষুদিরাম প্রমুখ বিপ্লবীরা সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করেছিলেন এবং সেই অগ্নিশিখাই "ভারত ছাড়" সংগ্রাম, "দিল্লী চল" অভিযান ও "ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহের" মহা কল্লোলে প্রতিভাত হয়েছে—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছে।

বিপ্লবীদের সীমিত শক্তির পেছনে আত্মদানের অসীম বৈপ্লবিক শক্তির উৎস ছিল বলেই তারা মৃত্যু পণ করে সেই রক্তরাঙা পথের নির্দেশ দিয়ে যাবার জন্য উন্মাদ হয়েছিল।

কবিগুরুর বিপ্লবী অন্তরের ডাক—

"শিকল দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া,
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি'
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

—বাংলার তরুণ-তরুণীদের হাতে অস্ত্র নিতে পাগল করে তুলেছিল! ক্ষেপার দল ছাড়া কি এইরূপ পাগলামি কেউ করতে পারে? আমার বাবাও আমাকে বিপ্লবী জীবনের আরম্ভ থেকেই এই ভয়াবহ পথ হতে নিরস্ত করার জন্য বার বার বলেছেন—"আর কত পাগলামি করবি? তোদের মত ক'টি ক্যাপা বালক প্রচণ্ড বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কতখানি কি করতে পারবে?" পিতা-মাতার স্নেহ, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের ভালবাসায় স্নেহান্ধ মনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে চরম ত্যাগের বিপ্লবী মহিমা অনুধাবন করার ক্ষমতা হারাতে বাধ্য। তাই সহজে যা অনুমান করা যায়না তাকে অসম্ভব মনে হয়, এবং সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যই যখন কানাইলাল, ক্ষুদিরাম আত্মাহুতি দেন, তখন তাকে পাগলামি ও উন্মাদনা আখ্যা দেওয়া হয়।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ বিপ্লবের যে বন্যা সৃষ্টি করেছিল, তার ঢেউ রায়বাহাদুরের বাড়ির অন্তঃপুরে আছড়ে পড়লো। ঐশ্বর্যে প্রাচুর্যে লালিত কৃতী ছাত্রী কল্পনা এবং তার মত আরও অনেককেই সেই বিপ্লব-বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেল!

১৯৬১ সালে দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' লেখবার সময় কল্পনার সঙ্গে দেখা করে সেই যুগে তার ব্যক্তিগত ভূমিকা ও বিপ্লবীদলের কার্যকলাপের অভিজ্ঞতা তার কাছ থেকেই শুনেছি। সেই সব অতীত স্মৃতিকথা বলার সময় কল্পনার যে সব অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল স্থানাভাব-বশতঃ তার সবটুকু এখানে বলা সম্ভব নয়। তবু কতগুলি বিষয় জানতে পারলে পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগবে মনে করে সামান্য কিছু লিখছি।

কল্পনা আমাদের বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত হলেও মাস্টারদার সঙ্গে তখনও তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয় নি। প্রীতিলতা ও অন্যান্য বিপ্লবী সভ্যাদের কথা মাস্টারদা জানতেন। কিন্তু যুব-বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ে অংশ গ্রহণের জন্য কোন ভগ্নীকেই মনোনীত করা হয় নি। পরবর্তীকালে যুব-বিদ্রোহের বাস্তব আদর্শকে চির-জাগ্রত রেখে এগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শহীদদের উদাত্তকণ্ঠের ডাক তরুণ-তরুণীদের কানে এসে পৌছয়। কল্পনা বিপ্লবীদলে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। মাস্টারদা ও নির্মলদার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তার ব্যগ্রতা তীব্রতর হতে থাকে। পূর্ণেন্দু দস্তিদার, মনোরঞ্জন রায় (কেব্‌লাদা) তখনও কলকাতায় আত্মগোপন করে আছে। কল্পনা তাদের সঙ্গে দেখা করে এবং মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্য তাদের ওপর খুব চাপ দেয়। মনোরঞ্জন চট্টগ্রামে গিয়ে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে নানা আলোচনা করে। তার বিস্তৃত বিবরণ আমার জানা নেই। কল্পনার কাছে শুনেছি, সতীদার মাধ্যমেই সে মাস্টারদার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করে।

দিন যায়, কিন্তু সেই সুদিন আর আসে না—মাস্টারদার সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ হয় না। আশা-নিরাশার মধ্যে দিন কাটে। কি করবে—কি কর্মসূচী নেওয়া উচিত, কিছুই ভেবে স্থির করতে পারে না। কল্পনার মনে হয়—"আমি বোধহয় অনুপযুক্ত, তাই মাস্টারদা আমাকে দলে নিতে ইচ্ছুক নন···। আমার এখনও বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা হয় নি। কে আমাকে সেই দীক্ষা দেবে? কবে আমি সে দীক্ষা পাবো?···না, না, আমি নিজে নিজেই সে দীক্ষা নেবো···।" এইরূপ ভেবে কল্পনা আর কোনমতেই সুস্থির থাকতে পারছিল

না। তার সামনে কোন বৈপ্লবিক কর্মসূচী নেই। অন্তরে বিপ্লবের বান ডেকেছে, কিছু না কিছুতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেই হবে—বিপ্লবের মহামন্ত্রে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

কল্পনা তখন কলকাতায় মেয়েদের একটি হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে। খাওয়া-দাওয়া সারা হয়েছে, কেবল কল্পনা ছাড়া মেয়েরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত প্রায় একটা। সুন্দর শান্ত ঘুমন্ত পরিবেশ। কল্পনা বিছানা ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে সন্তর্পণে তার সুটকেসটি খুললো। এতে সযত্নে রাখা মা কালীর ছবিটি ও একটি শাণিত ছোরা টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখে মায়ের চরণে আকুল প্রার্থনা জানালো—"মাগো! তুমি আমাকে শক্তি দাও—প্রেরণা যোগাও—বিপ্লবের পথে পরিচালিত কর!" তারপর শাণিত ছোরাটি দিয়ে নিজের বুক চিরে রক্ত নিয়ে মায়ের চরণ রাঙিয়ে শপথ নিল—"মাগো! স্বাধীনতার জন্য জীবন দেব—এই শপথ নিলাম। মাগো! তুমি আমাকে শক্তি দাও—আশীর্বাদ কর! তুমি সাক্ষী রইলে—আমার দীক্ষা আজ আমিই নিলাম।"

এই ছিল বিপ্লবী তরুণ-তরুণীদের, দেশের মুক্তির জন্য উন্মাদনা। যার মনে এতখানি তীব্রতা, একাগ্রতা ও বৈপ্লবিক প্রেরণা, তার সাধনা ব্যর্থ হতে পারে না! কল্পনার কাছে বৈপ্লবিক দায়িত্বপূর্ণ কাজের সুযোগ এসে গেল।

যুব-বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতির জন্য মাস্টারদার নির্দেশে অর্ধেন্দুর প্রধান কাজ বন্দুকের বারুদ তৈরি করা—দিদির বিশেষ দায়িত্ব ডিনামাইট্ যোগাড় করা এবং কল্পনার ওপর গান-কটন তৈরির সমস্ত ব্যবস্থাভার ন্যস্ত হ'ল। কল্পনার বিশেষ পরিচয় দিয়ে মাস্টারদা আমাকেও সংবাদ পাঠালেন—তাকে যেন এই কাজে উদ্যোগী করে তুলি। অর্ধেন্দুর মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে তাকে খুব close guidance-এ রাখা সম্ভব ভেবেই মাস্টারদা এই সংবাদ পাঠিয়েছিলেন।

কল্পনাও অর্ধেন্দুর কাছ থেকে মাস্টারদার ইচ্ছাটি জানলো—আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করাই তার পক্ষে সুবিধাজনক এবং বাস্তবতার ভিত্তিতে তাই হওয়া উচিত।

মাস্টারদার চিঠিতে ও অর্ধেন্দুর মুখে কল্পনার বিস্তারিত পরিচয় পেলাম। সব জেনে শুনে আমার মনের হ'ল—দায়িত্ব যখন দেওয়া হয়েছে তখন কাজের বিশেষ গুরুত্বের সম্যক্ উপলব্ধি এবং সেই দায়িত্ব বহন করবার বুদ্ধি ও দৃঢ়তা তার অবশ্যই থাকা উচিত। এই ভেবে অর্ধেন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করে কল্পনাকে একটি চিঠি লিখি। এই চিঠি লেখার কথা ১৯৬১ সালে মনে ছিল না। কল্পনাই

সেই চিঠির কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। সেই চিঠির বিশদ বিবরণ জানা না থাকলেও তাতে দায়িত্ব পালনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি রাখতে ও বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এ্যাসিড যোগাড়ের ব্যবস্থা করতে লিখি।

কল্পনা এইরূপ একটি দায়িত্ব পেয়ে এবং আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন হয়েছে বুঝে অত্যন্ত খুশি হয়। তার উৎসাহ ও উদ্যমের সীমা ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের ছোট বয়সের সাথী নিবারণকে নিয়ে কল্পনা কলকাতা গিয়ে উপস্থিত। পূর্ণেন্দু, রেণুদি (রেণু রায়) কমলাদি (কমলা ব্যানার্জী) প্রমুখ বিপ্লবী সাথীরা এ্যাসিড যোগাড়ের কাজে লেগে গেলেন। প্রচুর এ্যাসিডের প্রয়োজন। যত পাউণ্ড পাওয়া যায় পিওর নাইট্রিক ও পিওর সালফিউরিক এ্যাসিড দরকার। গোপনে যোগাড় করা, গুপ্তস্থানে রাখা, তারপর কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে পুলিস ও মিলিটারীর রাজত্বে পাঠানো এবং সেখানে পুলিসের চক্ষু ও চিন্তার বাইরে কোনও একস্থানে গোপনে ল্যাবরেটরী স্থাপন করে তবেই গান-কটন তৈরি করতে হবে।

একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা সম্ভব—কি ভয়ঙ্কর দায়িত্বপূর্ণ কাজ! অতি তুচ্ছ সামান্য একটু ভুলে সমস্ত প্ল্যানটাই বানচাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা! প্রতি পদে বিপদ—এই বিপদকে সম্মুখে রেখে ধীর মস্তিষ্কে কৌশলের সঙ্গে কাজ না করলে অঙ্কুরেই যে সব বিনষ্ট হয়ে যাবে, এই সম্যক্ উপলব্ধি কল্পনার ছিল বলেই কলকাতার বিভিন্ন কলেজ-ল্যাবরেটরী ও রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতার দোকান হতে নানা অজুহাতে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মচারীদের উপযুক্ত মূল্য দিয়ে ৭৩ পাউণ্ড এ্যাসিড যোগাড় করেছিল।

কমলাদি ও রেণুদির সাহায্যে এ্যাসিডের বোতলগুলি গোপনস্থানে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। তাঁরাই সেই সব এ্যাসিড ট্রাঙ্কে ও স্যুটকেসে প্যাক্ করতে সাহায্য করেছেন।

মনে হয় কাজ খুবই সামান্য—কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যদি এই সব ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করতে হয় তবে সমস্যার অবধি থাকে না। তা'ছাড়া এই বিপদে সক্রিয়ভাবে কে সাহায্য করবে—কে এই সমস্ত ভয়ঙ্কর দাহ্য বস্তু নিজ গৃহে রাখতে সাহসী হবে? যাই হোক্, অক্লান্ত পরিশ্রমে কল্পনা এই অসাধ্য সাধন করলো।

প্রথমে একপ্রস্থ এ্যাসিডের বোতল নিবারণকে দিয়ে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। নিবারণ মাত্র ক'টি বোতল সঙ্গে এনেছিল। কিন্তু তার পৌঁছবার খবর না পেয়ে কল্পনা খুব অস্থির হয়ে পড়ে। পৌঁছ-সংবাদের জন্য অনিশ্চয়তার মধ্যে

বহুদিন থাকা সম্ভব নয়। এ্যাসিডের সমস্ত বোতলগুলি চট্টগ্রামে না পাঠানো পর্যন্ত কল্পনার শান্তি নেই। যদি কলকাতায় সেই সব এ্যাসিড কোনক্রমে ধরা পড়ে যায় বা যাঁরা গোপনে যত্ন করে রেখেছেন তাঁরা যদি আর বেশিদিন রাখতে অস্বীকার করেন, তবে কি উপায় হবে—এই ভেবে কল্পনা একটু desperate হয়ে উঠলো। খুব কৌশলের সঙ্গে ট্রাঙ্কের নিচে এ্যাসিডের বোতলগুলি সাজিয়ে ওপরে অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রাদি ভর্তি করে নিল। তারপর নিরীহ যাত্রী সেজে পুলিসের চোখের সামনে দিয়ে নিজেই সঙ্গে করে সব এ্যাসিড চট্টগ্রামে নিয়ে এলো। রায়বাহাদুরের আদরিণী নাতনী তাঁর প্রবল প্রভাব প্রতিপত্তির সুযোগ গ্রহণ করলো!

মিলিটারী ও পুলিস বেষ্টিত চট্টগ্রাম শহর। এখন সমস্যা এই আশি পাউণ্ড এ্যাসিড গোপনে কোথায় রাখা যায়? কেবল গোপনে রেখে দিলেই তো চলবে না—তা দিয়ে গান-কাটন তৈরি করতে হবে। আশি পাউণ্ড এ্যাসিড বড় বড় কাঁচের পাত্রে রেখে তার মধ্যে বহুঘণ্টা ধরে বিশেষভাবে সাজিয়ে তুলো ডুবিয়ে রাখতে হবে—একটি বিশেষ তাপমাত্রা বজায় রাখবার জন্য পাত্রগুলির চারপাশে বরফ জমা রাখতে হবে—তারপর সেই তুলোগুলি তুলে বিশেষভাবে ধুয়ে নিতে হবে—ইত্যাদি আরও কত প্রক্রিয়া!

জামিনে মুক্ত বন্ধুদের মারফত গণেশ Encyclopædia Britanica 'G" দু'টি বৃহৎ খণ্ড পড়বার জন্য জেলে আনালো। এ তো আর রাজনৈতিক বা proscribed কোন বই নয়, তবে কর্তৃপক্ষের censor-এ পাশ করে দিতে আপত্তি হবে কেন? কাজেই বই দু'টি নিরাপদেই গণেশের কাছে এসে পৌছলো। এরই একটি খণ্ডে গান-কটন তৈরি করার বিস্তারিত ফরমূলা আছে। তা থেকে গণেশ কল্পনাকে গান-কটন তৈরি করার বিস্তারিত ফরমূলা লিখে পাঠালো। কল্পনাও কেমিস্ট্রির ছাত্রী—মোটামুটি বুঝে নিতে তেমন অসুবিধে হ'ল না। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ আরম্ভ করাই প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা—কোথায় ছোটখাটো একটি ল্যাবরেটরীর ব্যবস্থা করা যায়? কল্পনাই সেই সমস্যার সমাধান করলো। রায়বাহাদুরের বাড়ির পর্দার অন্তরালেই বিপ্লবীদের ল্যাবরেটরী রচিত হ'ল!

সারা রাত জেগে অল্প এ্যাসিড ও সেই অনুপাত অল্প তুলো নিয়ে কল্পনার অক্লান্ত experiment সুরু হ'ল। একটা জিনিস শুনে ও বই পড়ে জানা এক কথা, আর নিজের হাতে তৈরি করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। গান-কটন তৈরি করার কাজে কল্পনা এই প্রথম হাত দিয়েছে, প্রতি পদেই বুঝতে পারছে এর

process কত বিস্তারিত। প্রতিটি কাজই যদি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা না হয় তবে গান-কটন তৈরি সম্ভব নয়। যে তুলো নাইট্রিক ও সালফিউরিক এ্যাসিডে প্রায় তিন দিন ধরে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে সে তুলো বিশেষ পদ্ধতিতে ও জলে ধোয়ার নিয়ম! এই ধোয়াটাও যদি নিয়মমত না হয় তবে শক্তিশালী গান-কটন তৈরি হবে না। পরীক্ষা করতে গিয়ে বার বার নিষ্ফল হলেও কল্পনার বৈপ্লবিক নিষ্ঠা পরাজয় না মেনে নতুন উদ্যমে আরো সহস্রগুণ বেশি দৃঢ়তার সঙ্গে কাজের মধ্যে আত্মনিয়োগ করলো।

দিদি তখনও ডিনামাইট্ সংগ্রহ করতে পারেন নি। গান-কটন ও ডিনামাইট্ সংগ্রহে অনিশ্চয়তা থাকলেও বন্দুকের বারুদ তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। কালী দে-র বাড়ির সকলে এই কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে সারা চট্টগ্রাম পুলিস ও মিলিটারীর সজাগ পাহারায় থাকা সত্ত্বেও প্রায় দশ মণ বারুদ তৈরি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমরা গোপন পথে জেলের মধ্যে রিভলভার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আনাবার ব্যবস্থা করেছি। সে এক অসাধ্য সাধন করা! এ বিষয়ে জেল-কর্তৃপক্ষের কড়াকড়ি সম্বন্ধে আগেই লিখেছি। আমাদের তিনজনকে—লোকনাথ, গনেশ ও আমাকে, ছোট ছোট নির্জন কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখতো। আমাদের মধ্যে অন্যান্যদের চারিদিক ঘেরা একটি বড় ঘরে বদ্ধ রাখতো। সর্বক্ষণ কড়া শাসন—কড়া নিয়ম! কথায় কথায় হাতকড়া—ডাণ্ডা-বেড়ী—শিকল-বেড়ী অঙ্গের ভূষণ! নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য যখন-তখন পাগলা-ঘন্টি ও পাহারা বদলের বন্দোবস্ত। আপাতদৃষ্টিতে জেল থেকে বেরিয়ে আসা ও জেলের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করার সামান্যতম সম্ভাবনার কথাও মানুষের ধারণার বাইরে!

মরুভূমিতেও মরূদ্যান থাকে। নিরাশায় ভেঙে পড়লে মরূদ্যানের সন্ধান কোনমতেই পাওয়া যায় না। আমরাও নিরাশ হলাম না। মানুষের মনস্তত্ত্ব বিচার করে বুঝেছিলাম যে, জেল ওয়ার্ডার, পুলিস, সশস্ত্র কনস্টেবল—সকলেই সরকারের ভক্ত ও অনুগত হলেও তাদের অর্থলিপ্সা বা অর্থের প্রয়োজন থাকবে না, এ হতেই পারে না; তবে নানান ছোট ছোট বিষয়ে পূর্বাহ্নে যাচাই করে নেওয়া না হলে বিপদের আশঙ্কা থাকার সম্ভাবনা। তাই খুব সাবধানতা ও কৌশলের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে প্রহরীদের হাত করবার চেষ্টা করলাম। আজ খুব গর্বের সঙ্গেই বলতে পারি—একজন সেপাই-এর ক্ষেত্রেও আমাদের বাছাই করা ভুল হয় নি। শুনে আরো আশ্চর্য মনে হবে দু'জন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারও আমাদের আনুগত্য স্বীকার করেছিল এবং আমাদের সব রকম সাহায্য করেছিল।

জেলের কঠোরতাকে উপহাস করে ইতিমধ্যে আমরা দুটি '৪৫০ ব্যাসের আর্মি রিভলভার, বেশ কিছু পরিমাণ কার্তুজ ও বারোটি ড্যাগার এনে ফেললাম। এই সাফল্যে আনন্দ ও গর্ব হলেও এর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কাজ ছিল এই অস্ত্রশস্ত্রগুলিকে সুরক্ষিত অবস্থায় জেলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা। যাঁদের জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সবাই বুঝতে পারবেন দু'টি আর্মি রিভলভার, কার্তুজ ও প্রায় বারোইঞ্চি লম্বা বারোটা ছোরা জেলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা কতখানি দুরূহ ব্যাপার! এখন সেইসব কথা ভাবলে মনে হয় যেন স্বপ্ন! কিন্তু অতি বাস্তব সত্য—কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির অন্তরালে জেলের অভ্যন্তরে অস্ত্রশস্ত্রাদি সমস্ত আমরা লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম।

যতই দিন যেতে লাগলো 'গান-কটন ও ডিনামাইটের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করবো'—এই প্রশ্নে আমাদের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিকল্প ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হলাম। ডিনামাইট্ বা গান-কটন হলে মাত্র কয়েক আউন্স জিনিষেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ত এবং লোকচক্ষুর অগোচরে তা আনা-নেওয়া, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করাও অনেক সহজ ও সুবিধানজক ছিল। কারাপ্রাচীর উড়িয়ে দেবার পক্ষে যেখানে মাত্র একপাউণ্ড ডিনামাইট্ যথেষ্ট, সেই কাজে প্রায় আধ মণ বারুদের প্রয়োজন। আধ মণ বারুদ কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে কি উপায়ে আনা যায় এবং গোপন রাখা যায়? বারোটি রিভলভার ও ছ'সাতটি পাখী শিকারের বন্দুক নিয়ে যদি বৃটিশ শাসিত চট্টগ্রাম শহর দখল করে নেওয়ার কথা ভাবা যায় এবং কার্যতঃ তা দখল করাও সম্ভবপর হয়, তবে আধ মণ বারুদ গোপনে জেলের মধ্যে আনা যাবেনা—এও কি মণ থেকে স্বীকার করে নেওয়া যায়? অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে পরমর্শ করে ছোট ছোট টিনের কৌটোর ব্যবস্থা করা হ'ল; তাতে দু'চার আউন্স করে বারুদ ভর্তি করে অনেকদিনের চেষ্টায় আধ মণ বারুদ জেলের মধ্যে নিয়ে এলাম।

রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার উদ্দেশ্যে কানাইলাল কি উপায়ে জেলের মধ্যে রিভলভার নিয়ে গিয়েছিলেন, তা বাংলার নরনারীর এক গবেষণার বিষয় ছিল। আমিও ছেলেবেলায় মা-বাবার মুখে এই রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতাম এবং অবাক হয়ে ভাবতাম—বিপ্লবীদের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! কেউ কেউ বলেছেন —একটি আস্ত পাকা কাঁঠালের মধ্যে রিভলভার পুরে জেলের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল। মনে হয়েছিল—সত্যিই তো—জেলের মধ্যে পাঠাতে হবে—তায় একটি রিভলভার—গোপনে পাঠাতে হবে—কোন খাবার জিনিসের মধ্যে করে

লুকিয়ে পাঠানোই অপেক্ষাকৃত সুবিধেজনক—তাই কাঁঠাল জাতীয় একটি বড় ফল না হলে তা' কি করে সম্ভব?

'সবেমাত্র বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছি—স্কুলে পড়ি—কি বা বয়েস! তা'ছাড়া কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দিয়ে সহস্র সহস্র ভারতবাসীর জেলের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তখনও সেই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আমার হয় নি। দলে যোগ দেবার পরে দাদাদের মুখে যখন ঐশ্বরিক শক্তির ব্যাখ্যা শুনতাম বা চক্রধারী করুণাময় শ্রীবিষ্ণুর মহিমার কথা শুনতাম—বিশ্বাসে ভক্তিতে তন্ময় হয়ে যেতাম, শ্রীভগবানের করুণা লাভের জন্য মন আকুল হয়ে উঠতো। শুনেছিলাম শ্রীঅরবিন্দ নির্জন কারাকক্ষের অন্ধকার গহ্বরে রাতদিন একাকী আবদ্ধ থাকতেন—বাইরের কোন জনপ্রাণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার কোন উপায় ছিল না। এমন কি খাবার সময়েও জেল-কর্তৃপক্ষের সামনেই তাঁকে আহার্য গ্রহণ করতে হ'ত! তবু কি আশ্চর্য! শ্রীঅরবিন্দের চুলে কে কখন তেল মাখিয়ে সযত্নে তা পরিপাটি করে আঁচড়ে দিয়ে যেত। জেল-কর্তৃপক্ষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়তেন—মনে করতেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের ঘুমন্ত অবস্থায় স্বহস্তে সযত্নে তাঁর কেশবিন্যাস করে যেতেন! মনে হ'ত শ্রীভগবানের কত করুণা! ভক্তের জন্য তিনি কি না করেন?

তারপর পঁচিশ ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। যুগের পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের যুগে তাই 'কাঁঠালের' পরিবর্তে এলো অর্ধেন্দুর তৈরি ছোট ছোট টিনের কোটো আর শ্রীভগবানের পরিবর্তে এলেন জেলের সেপাই ও সার্জেণ্টরা। দুর্ভেদ্য কারাপ্রাচীরের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কয়েক মাসের চেষ্টায় জেলের মধ্যে নিয়ে এলাম অনেক কিছু—রিভলভার, কার্তুজ, বড় বড় ড্যাগার, আধ মণ বারুদ, ইলেট্রিকের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য অনেক রকম যন্ত্রপাতি—Inductive coil, প্রায় দুই ডজন টর্চের ব্যাটারী, প্রায় ৫০ গজ insulated ইলেকট্রিক তার। ম্যাগনিফাইং গ্লাস, প্রায় বারোটি মোটরের হেড-লাইটের বালব্, কার্বন-ডাই-সালফাইড ইওলো ফসফরাস, নানাপ্রকার improvised জিনিস তৈরির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি—যেমন, বিভিন্ন ধরনের ফাইল, কাটিং প্লায়ারস, স্ক্রু-ড্রাইভার, লোহা কাটার করাত ইত্যাদি, ইত্যাদি। জেলের মধ্যে সেই সমস্ত জিনিস গোপনে রাখার ব্যবস্থা হ'ল এবং গাঁজাখুরি গল্পের মত শোনালেও এইটি একটি নির্ভেজাল সত্য যে, জেলের মধ্যে আমরা ছোটখাটো এক mobile ও invisible কারখানা স্থাপন করলাম।

আগে আমি দুর্ভেদ্য কারাগারের কঠিন শৃঙ্খলা ও অতন্দ্র পাহারার ব্যবস্থার

কথা বলেছি। তা' যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে জেলের মধ্যে এই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী ও কারখানা তৈরির কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে করে কেউ যদি ভাবেন যে, আমি অতিরঞ্জিত মিথ্যা গল্প রচনা করছি, তবে তাঁকে বিন্দু-মাত্রও দোষ দেওয়া যায় না। অথচ আমি যা লিখে গেলাম তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এর অনেক সাক্ষী এখনও জীবিত আছেন।

প্রায় বছরখানেক আগে আমার একজন প্রীতিভাজনের কাছে আলিপুর জেলের কঠিন শৃঙ্খলার কথা বলছিলাম। সেই প্রসঙ্গে বলছিলাম সেই সুদৃঢ় বেড়াজাল ভেদ করে কিভাবে এই সমস্ত ষড়যন্ত্র করতে সমর্থ হয়েছিলাম—কিন্তু তাঁর আর শোনবার ধৈর্য রইল না। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রূঢ়ভাবে বললেন—"যত সব বাজে কথা—আপনার বানানো গল্প।" আমি লজ্জা পেয়েছিলাম—ব্যথিত হয়েছিলাম। নিজের মনে বার বার অনুতাপ করেছিলাম —কেন আমি বলতে গেলাম সে সব কথা! আসলে জেলের সেপাইদের মধ্যেও কি রকম সব বিচিত্র চরিত্রের মানুষ দেখছি, প্রসঙ্গটা ছিল তাই নিয়ে—আমরা কি করেছি না করেছি সেটা বক্তব্য ছিল না—ঐ প্রসঙ্গেই সে কথা এসে পড়েছিল মাত্র! মূল বক্তব্যটা সেদিন তাঁকে আমার বলা হ'ল না। সেইটি আজ এখানে বলছি।

জেলের অতি দীর্ঘদিনের পুরনো বিশ্বস্ত জমাদার। চারটি স্ট্রাইপ ও ক্রাউন চিহ্ন শোভিত তার পোশাক! রিটায়ার করে পেন্‌সন নেবার আর মাত্র মাস ছয় বাকি। সেইরূপ একজন জমাদার "বক্স-ইয়ার্ড"-এ আমাদের পাহারা দেওয়া এবং অন্যান্য সেপাইদের গতিবিধি তদারকের কাজে মোতায়েন হ'ল। সারাজীবন কঠোর কর্তব্যপালনে রত থেকে জীবনসায়াহ্নে পৌছে মাত্র ছয় মাস পরে যিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবেন, জীবনের বাকি দিন ক'টি নিজ গৃহের শান্ত পরিবেশে আত্মজনের মধ্যে আনন্দে কাটাবেন, তিনি কি কখনও কোন বে-আইনী কাজ করবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন? ভবিষ্যতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে এমন কোন বিপজ্জনক কাজে কি তিনি হাত দিতে পারেন যা প্রকাশ পেলে পেন্‌সন তো দূরের কথা, সমস্ত জীবনটাই তাঁর তছনছ হয়ে যেতে পারে? চিন্তা করে দেখলে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবু অতি সত্য ঘটনা যে, এইরূপ একজন জমাদারই আমাদের পাঁচ ছয় বোতল মেথিলেটেড্ স্পিরিট, কয়েক পাউণ্ড প্লাস্টার অব প্যারিস, হাপর, কয়লা, স্পিরিট-স্টোভ, ইত্যাদি অনেক জিনিষ গোপনে জেলের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য মানব চরিত্র! আশ্চর্য "কৃষ্ণচরিত্র"! চট্টগ্রাম জেলের ১৯৩১ সালের

এই অভিজ্ঞতার বশেই ১৯৩৯ সালে আলিপুর জেলের জমাদারকে আমাদের সাহায্য করবার জন্য আবেদন জানাতে সাহস করেছিলাম।

হোন না কেন তিনি একজন কুড়ি বাইশ বছরের পুরনো সেপাই বা ইউরোপীয়ান সার্জেণ্ট বা জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বা এস, ডি, ও, বা পুলিসের এ্যাডিশন্যাল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বি, জে, স্টার বা ডব্লিউ ভি, হিক্স, বা লুইস্—ঠিক সময়মত মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্রে আক্রান্ত হলে নিশ্চয়ই তাঁরা ধরাশায়ী হন এবং সেই সব কর্তৃপক্ষের ওপরওয়ালারাও তাঁদের অজান্তেই আমাদের সাহায্য করতে বাধ্য হয়ে পড়েন।

শত্রুপক্ষের শক্তিকে তাঁদেরই শক্তির গণ্ডিতে এইরূপভাবে বিধ্বস্ত করার নীতি ও কৌশল ময়দানের জঙ্গী-কৌশল ও নীতি নয়। আমাদের একজন "প্রাক্তন বিপ্লবী দাদা" প্রায়ই বলে থাকেন—"মাছের তেলেই মাছ ভাজতে হয়।" কিন্তু যে দুর্বল ও স্বার্থপর, মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজার অনেক আগে তাকে নিজেকেই যে ভাজা হয়ে যেতে হয়! স্বার্থপর, ভীরু, দুর্বল ও কাপুরুষের পক্ষে এইরূপ ভয়াবহ নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে যাওয়ার মত বাতুলতা আর নেই।

জেলের মধ্যে ব্যাপক ষড়যন্ত্রমূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট প্রসিডিংসের বিলম্ব ঘটাবার চেষ্টাও সমানে চলেছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে যাতে আমাদের ওপর জেল ও জেল-কর্তৃপক্ষের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে ও জেলের নিয়মকানুন খানিকটা শিথিল হয় তার জন্যও আমরা ক্রমে ক্রমে তাদের মনে প্রভাব বিস্তার করবার জন্য সচেষ্ট হলাম।

মহান বিপ্লবী নেতা লেনিনের কোন লেখা তখনো পড়ি নি। তবু বিপ্লবী-নিষ্ঠার তাড়নায় আমাদের অজান্তেই লেনিনের ষড়যন্ত্রমূলক কাজের শিক্ষা ও কৌশল—stratagy and adroitness, illegal proceedings, reticense and subterfuge, at any rate, at any cost, by all possible means—কার্যোদ্ধার করবার জন্য আমরা প্রয়োগ করলাম।

এই processটি আপনা থেকে হয়ে যাবার process নয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আস্তে আস্তে অগ্রসর হলাম। দুর্গাপূজা—ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসব মুখর পরিবেশের প্রভাব সকলের মনেই অল্পবিস্তর প্রতিফলিত। সেইরূপ এক অনুকূল পরিস্থিতিতে বাঙালী জেলারের মন ভিজিয়ে, এস, ডি, ও, সাহেবের মানবিকতার সূক্ষ্ম হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে ও জেল-সুপার ডাক্তার জ্ঞান চ্যাটার্জীর মহানুভবতার মধুর গান গেয়ে এমনভাবে তাঁদের করুণা উদ্রেক

করে আমাদের আবেদন পেশ করলাম যে, তা তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

তাঁদের বললাম—"দেখুন, আমাদের জীবনে এই শেষ দুর্গাপূজা। আমাদের ফাঁসি সুনিশ্চিত। অবশ্য তার জন্য আমাদের যে কোন চিন্তা-ভাবনা নেই তা তো বুঝতেই পারছেন। আজ দশমী। এই কয়দিন আদালতও বন্ধ—যদি বন্ধ না থাকতো তবে কাঠগড়ায় আমরা সবাই একসঙ্গে মিলিত হতে পারতাম। আমাদের অনুরোধ এই শেষ দশমীর দিনে আমাদের তিনজনকেও কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকার ও খাওয়া-দাওয়া করবার অনুমতি দিন এবং lock up-এর সময় যেমন সেলে বন্ধ করেন তেমনিই করবেন", ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে জেলা-শাসক ও জেলা-পুলিস সাহেবকে না জানিয়ে—তিনজন ভারতীয় অফিসার যে এতবড় দায়িত্ব নিতে সাহস করবেন না, তা আমরা ভালো করেই জানতাম। তাই আগে থেকেই, আমরা অতি শান্ত সুবোধ বালকে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছি এবং আমরা কোনমতেই কারা-আইন অমান্য করবো না বা জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করবো না—এই সব বিষয়ে ইংরেজ কর্তাদের মানসিক দুশ্চিন্তার উপশম ঘটাবার জন্য ground work করে রেখেছিলাম।

এইভাবে প্রথম সুড়ঙ্গ পথ তৈরি হ'ল। তারপর একটার পর একটা সুবিধে আদায় করতে লাগলাম। একদিন আবেদন জানালাম—"দেখুন, প্রতিদিনই তো আদালতে আমরা একত্রে থাকি। কেবল রবিবারটি জেলে থাকি বলে সবার সঙ্গে মেলামেশার সুবিধে থাকে না। তাই রবিবার যদি lock up-এর আগে পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে থাকি তবে নিরাপত্তার দিক থেকে তো কোন আশঙ্কার কারণ নেই! একা একা সেলে খুব খারাপ লাগে। ক'দিনই বা আর পরমায়ু আছে। এইটুকু সুবিধা দেওয়া আপনাদের পক্ষে কি খুব কঠিন ব্যাপার?"—এই সুবিধাও আদায় হ'ল। তারপর আবার একদিন বললাম—"প্রতিদিনই কোর্ট ফেরতা এসে নিজ নিজ সেলে খুব ক্লান্তি লাগে। যদি কড়া পাহারার মধ্যেই অফিসের সামনে প্রাচীরের অভ্যন্তরে খোলা জায়গাটুকুতে বসতে পারি তবে খুব ভালো লাগবে। তারপর সন্ধ্যার আগে নিয়ম অনুযায়ী একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে নিজের নিজের সেলে গিয়ে বন্ধ হবো। এতে নিরাপত্তা বা নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক থেকে নিশ্চয়ই আপনারা কোন আপত্তি করবেন না। তা'ছাড়া আমরা কথা দিচ্ছি জেলারবাবু আমাদের সঙ্গে থাকবেন, সার্জেণ্ট ওয়ার্ডার সবাই আমাদের চারপাশে থাকবেন, নির্ধারিত এলাকার বাইরে

আমরা যাবো না”—ইত্যাদি। অনুরোধ-উপরোধে কি না সম্ভব? কথায় আছে—উপরোধে ঢেঁকিও গিলতে হয়! কর্তৃপক্ষ আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। তারপর ধীরে ধীরে এমন এক স্তরে পৌঁছলাম যে, আমাদের “সরল” যুক্তি ও “করুণ” আবেদনে কর্তৃপক্ষকে সমবেদনা প্রকাশ করতে হ'ল এবং আমাদের সবাইকে একসঙ্গে হাজত ঘরে রাখার ব্যবস্থা অনুমোদন করতে হ'ল। হাজত ঘরটিতে আমরা প্রায় ত্রিশজন ছিলাম। বড় ঘরটির লাগোয়া একটি ছোট ঘরেও চার-পাঁচজনকে রাখার ব্যবস্থা ছিল। এই দু'টি ঘরেই আমরা থাকতাম। এই ঘর দু'টি উঁচু কম্পাউণ্ড দেওয়ালে ঘেরা। চার পাশে দেওয়ালের ধারে ধারে ও সামনের গেটে রাইফেল হাতে প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত। হাজতগৃহের এই ছোট কক্ষটিতেই আমাদের কারখানাটি বসালাম। নানা বিস্ফোরক দ্রব্যের এক্সপেরিমেণ্টের সময় বা ইলেকট্রিকের সাহায্যে কোনপ্রকার ignition বা দূর থেকে অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা করার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবনের সময়—ওয়ার্ডার, সার্জেণ্ট বা হঠাৎ কোন পরিদর্শকের আগমন আশঙ্কায় আমাদের মধ্যে বেছে বেছে কয়েকজনকে মোতায়েন করে রাখা হ'ত, যাতে নানা অছিলায় আগন্তুকদের আটক রাখতে পারে। এই সব ষড়যন্ত্রমূলক কাজের কথা সাথীরা সকলে জানতো না—মাত্র দশ বারো-জনকেই এই কাজের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। তার মধ্যেও সবাই আবার সবটুকু জানতো না।

এই তো গেল কারখানার কথা। কিন্তু অতসব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ও আধ মণ বিস্ফোরক দ্রব্য রাখলাম কোথায় এবং কি উপায়ে তা সম্ভব হ'ল? প্রথমতঃ জেলের কড়াকড়ি আমাদের শিথিল করাতে হয়েছে। কি করে কর্তৃপক্ষকে ধীরে ধীরে জয় করেছিলাম—কি উপায়ে আমাদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতিশীল করে তুলেছিলাম সামান্য কয়েকটি কথায় আমি তার একটুখানি মাত্র আভাস দিয়েছি। এইটি বড় কঠিন অধ্যায়—বড় পরিশ্রম ও ধৈর্যের ব্যাপার! এই বইয়ের কয়েকটি পাতায় সেই বিরাট কর্মকৌশলের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। মোটকথা অক্লান্ত পরিশ্রম ও বহুদিনের চেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছিল। আমাদের নিরীহভাবের ভাণ কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করেছিল। আদালত থেকে ফিরে এসে বিকেলে জেলের মধ্যে খোলা মাঠটুকুতে আমরা সবাই গোল হয়ে বসতাম। প্রথম প্রথম জেলার, সার্জেণ্ট ও ওয়ার্ডার সবাই খুব সজাগভাবে চারিদিকে দাঁড়িয়ে পাহারা দিত। কিন্তু সব ক্ষেত্রে যা ঘটে এখানেও তাই ঘটলো। ধীরে ধীরে তাদের পাহারার কড়াকড়ি শিথিল হ'ল।

জেলার উপস্থিত থাকতেন না। আমরা সব সময়ে খুব শান্ত নম্র ও নিরীহভাবে থাকতাম বলে প্রহরীদের কর্তব্যেও গাফিলতি এসে গেল। আমরা সুযোগ নিলাম। সার্জেন্ট, জেলার, ওয়ার্ডার প্রভৃতিকে কথাবার্তা বলে engage রাখবার জন্য আমাদের বাছাই করা সাথীরা নিযুক্ত হ'ল—আর সেই সময়টিতে আমরা কয়েকজন গোল হয়ে বসে গল্প করার ভাণ করে আস্তে আস্তে মাটি খুঁড়ে ঐ সমস্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র মাটির নিচে পুঁতে রাখবার ব্যবস্থা করতাম। মাটি খোঁড়ার কাজে সুবোধ চৌধুরী খুব নিপুণ ছিল। তিন-চার মিনিটের মধ্যেই সে বড় একটি স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ছয় সাত ইঞ্চি ব্যাস ও প্রায় আঠারো ইঞ্চি গভীর একটি গর্ত খুঁড়ে ফেলতে পারতো। মাটি খুঁড়ে মাটিগুলি রুমালের ওপর বা কাপড়ের ওপর রাখা হ'ত—তারপর আমাদের জিনিষপত্র গর্তের মধ্যে রেখে ওপরে এমনভাবে মাটি চাপা দেওয়া হ'ত যাতে বাইরে থেকে কোনমতে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারে। সুপরিকল্পিত প্ল্যানের ভিত্তিতে সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত। কে কোন্ প্রহরীকে ব্যস্ত রাখবে—যদি হঠাৎ জেলার বা ডেপুটি-জেলার এসে পড়েন কে তাঁদের বিভ্রান্ত করবে—যদি পাগলা-ঘন্টি পড়ে তবে কিভাবে তড়িৎগতিতে অর্ধখোঁড়া গর্ত বুজিয়ে দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কে পি, সি সরকারের মত ম্যাজিক দেখাবে, এই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক রেখে তারপরেই প্রহরী বেষ্টিত মাঠের বিভিন্ন স্থানে খোঁড়ার কাজ ও পুঁতে রাখার কাজ আরম্ভ করতাম। একেবারে বাছাই করা চার-পাঁচজন যেখানে গোল হয়ে বসে এই কাজ করতো পাছে তারা অতর্কিতে কোন অবাঞ্ছিত জনের সম্মুখীন হয় তার জন্য উপযুক্ত সিগ্ন্যালের ব্যবস্থা ছিল। সেইরূপ কারো আগমনবার্তা গানের মাধ্যমেও জানিয়ে দেওয়া হ'ত।

জেলের ভেতরকার ছোট মাঠটির চারিদিকে গর্ত করেই যে আমরা সব জিনিষ-পত্র ছড়িয়ে রেখেছিলাম, তা নয়। সেলের সামনে এন্টিসেলের দেওয়াল ঘেরা ছোট্ট স্থানটিরও সদ্ব্যবহার করেছিলাম। স্নান বা বাথরুমে যাওয়ার সময় ঐ দরজাটি বন্ধ করে দেবার জন্য অনুরোধ করলে প্রহরী তা রাখতো। সেই সময়টিতে এন্টিসেলের খোয়া পেটানো জমি খুঁড়ে জিনিসপত্র রাখার জন্য সব চেয়ে বেশি চেষ্টা করেছি।

আমাদের তিনজনকে সেলের বাইরে সবার সঙ্গে হাজতে রাখার সুবিধা আদয়ের পর এই সুযোগটি ব্যাহত হ'ল। তবু বুদ্ধি থাকলে ও চেষ্টার ত্রুটি না থাকলে অসুবিধা বা বাধা এলেই সব আশা নির্মূল হতে পারে না। সুবোধ চৌধুরী ও ফণীন্দ্র নন্দী জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে অভিযোগ করলো

হাজতে সবার মাঝখানে তাদের ঘুমের ব্যঘাত হচ্ছে এবং এতে তারা ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে—নির্জন সেলে থাকতে পারলে তারা সুস্থ বোধ করবে। সিভিল সার্জেনই জেল-সুপার। শান্ত নির্জন সেলেই তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। প্রায় এক বছর প্রতিদিনই আমাদের নতুন নতুন ব্যবস্থা করতে হয়েছে—কারণ, জেলের কড়াকড়ি খানিকটা শিথিল হলেও আমাদের প্রায়ই কর্তৃপক্ষের নতুন নতুন নির্দেশের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন নাকি—হঠাৎ সমস্ত পুরনো প্রহরীদের অন্যত্র বদলী করে সব নতুন সেপাই বহাল করা হ'ল। এইরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের সাহায্যকারী সেপাইদের হারাতে হয়েছে এবং আবার নতুন করে অন্যান্য সেপাইদের হাত করতে হয়েছে।

শক্ত কাজ। একটু ধৈর্য্য হারালেই সব মাটি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস high tension-এ কাজ করতে করতে মনে হ'ত—"না বাবা, আর পারছি না—এর চেয়ে ফাঁসি হয়ে যাওয়া অনেক ভালো ছিল!"

শত বাধা সত্ত্বেও এই সব দুরূহ কাজ কর্তৃপক্ষের অগোচরে জেলের মধ্যে করে চলেছি। জেল ভেঙে পালাবার প্ল্যান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অর্ধেন্দুর মারফত মাস্টারদার সঙ্গে পরামর্শ করে প্ল্যানটিকে মোটামুটি এইভাবে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হ'ল:

(১) জেলের দেওয়াল আমরা ভিতর থেকে উড়িয়ে দেবো এবং দক্ষিণ দিক থেকে আমরা বারো চোদ্দ জনের দলটি বেরিয়ে আসবো।

(২) যে মুহূর্তে জেলের দেওয়াল বিস্ফোরণে ভেঙ্গে পড়বে, সেই চরম মুহূর্তে (জিরো আওয়ারে) জেলের বাইরে আমাদের সাথীরা দু'টি কোণের দু'টি মিলিটারী পোস্ট লক্ষ্য করে দু'তিনটি হাত বোমা ছুঁড়বে। এইভাবে diversionary আক্রমণকালে মিলিটারী রক্ষীবাহিনী আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত থাকবে। আর সেই সুযোগে জেলের ভগ্ন প্রাচীরের নির্ধারিত পথে আমরা দ্রুত পালাবো।

(৩) আমাদের সাথী ধীরেন দাস ও রবি সেন নির্ধারিত স্থানে মোটর-ট্রাক নিয়ে উপস্থিত থাকবে। তারা দু'জনেই ভালো ড্রাইভিং জানতো।

(৪) কর্ণফুলী নদীতীরে কোন এক স্থানে দুটি সাম্পান (এক ধরনের নৌকা) নোঙর করা থাকবে। মণীন্দ্র মজুমদার ও সুখেন্দু দস্তিদার সাম্পান বাইবার বিশেষ কায়দা জানতো। তারাই মাঝি সেজে সাম্পান দু'টিতে অপেক্ষা করবে এবং ট্রাকে করে আমরা সেখানে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের গোপন আস্তানায় মাস্টারদার কাছে আমাদের পৌছে দেবে।

জেল ভেঙ্গে পালাবার প্ল্যান যেমন দ্রুত শেষ হতে চলেছে ঠিক তেমনি অর্ধেন্দুর তত্ত্বাবধানে ল্যাণ্ডমাইন প্রস্তুতির কাজও প্রায় সমাপ্ত হয়ে এলো। দশ কে, জি, ও বিশ কে, জি, বারুদ রাখার উপযোগী টিনের ক্যানেস্তারা তৈরি করবার ব্যবস্থা হ'ল। এই দুই সাইজের প্রায় পঁচিশটি বিশেষ ধরনের ক্যানেস্তারা তৈরি হ'ল। পিক্‌রিক পাউডার ও গান-কটন সংযোগে ইলেট্রিকের সাহায্যে ইগ্‌নিশান করার জন্য টিনের ছোট ছোট বিশেষ আকারের কৌটোও প্রস্তুত হ'ল। বিস্ফোরক দ্রব্য সহ ignition-এর কৌটো প্যাক্ করার পদ্ধতি ও damp proof করার জন্য paint, ব্লটিং, ওয়াটার প্রুফ্, ইত্যাদিও বিশেষ বিশেষ ভাবে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

তিনটি টার্গেট লক্ষ্য করে আপাতত ল্যাণ্ড মাইন প্রস্তুত করা হয়। আদালত-ভবনটি যে পাহাড়ের উপর অবস্থিত, সেই পাহাড়টির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের কোর্ট বিল্ডিং ঘেঁষে যে রাস্তা চলে গেছে তারই একটা বাঁকে ছ'টি ল্যাণ্ডমাইন পুঁতে রাখা স্থির হ'ল। আর তিনটি রাস্তাটির ওপর diagonally পুঁতে রাখবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ জে, ইউনী ও দু'জন ভারতীয় কমিশনার এই পথেই জেলা-জজের চেম্বারে আসা-যাওয়া করেন। তাঁদের উপযুক্ত সম্মানের জন্যই এই ব্যবস্থা! ইলেকট্রিকের সাহায্যে এই তিনটি মাইনে প্রায় পঞ্চাশ যাট গজ দূর থেকেই সুইচ্ টিপে বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য যা যা করা দরকার সব ব্যবস্থাই হ'ল। আদালত-ভবনের পাহাড়ের অবস্থান ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে অর্ধেন্দু রাতের পর রাত পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করেছে। কোর্টের ট্রেজারী ও আমাদের মামলার মহামূল্যবান সরকারী exhibits পাহারা দেবার জন্য ছাউনী খাটিয়ে প্রায় শ'খানেক শসস্ত্র পুলিস ডিউটিতে বহাল ছিল। তাদের অতন্দ্র পাহারা উপেক্ষা করে গেরিলা সৈন্যবাহিনীর কৌশলে অর্ধেন্দুরা বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করলো। তারপর মাটির নীচে ল্যাণ্ডমাইন পোঁতা ও মাটির তলা দিয়ে সুইচ্ টিপে অপারেশন্ করার জন্য ট্যাকটিক্যাল স্পট পর্যন্ত ইলেকট্রিকের তার নিয়ে যাওয়ার স্কেচ্ তৈরি হ'ল। কোর্টের প্রধান পাহাড়টির একটু নীচে আর একটা পাহাড়ের সারি ছিল। তারই একস্থানে ছয়টি বারো ভোল্টের Storage ব্যাটারী (মোটরে যা ব্যবহৃত হয়) পুঁতে রাখার ব্যবস্থা হ'ল। প্রেসিডেণ্টের গাড়ী দেখা গেলে কিভাবে সিগ্‌ন্যাল দিতে হবে তাও স্থির হ'ল। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিলাম যে, এই অভিনব ধ্বংসলীলার পর চট্টগ্রাম জেলার সব কর্ণধারেরাই সেখানে উপস্থিত হবেন। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য আরও

একটি ফাঁদ পাতা গেল। সেই স্থানেরই অল্প একটু দূরে দূরে আরও তিনটি ল্যাণ্ডমাইন পোঁতার স্কেচ্ করা হ'ল। সম্পূর্ণ আলাদা আর একটি তার ও সুইচের সাহায্যে এই তিনটিতে বিস্ফোরণ ঘটাবার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ cold blooded murder করার বাস্তব পরিকল্পনা ও কার্য ভেবে আজ হয়ত অনেকে শিউরে উঠবেন এবং মনে হবে আমরা কত নির্মম—কত নিষ্ঠুর! দুই শত বছরেরও অধিক কাল নিরীহ ভারতবাসীর উপর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা কি চরম অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছে তা' ভুলে গিয়ে আমাদের নির্মম ও নিষ্ঠুর প্ল্যানের নিন্দা করলে তাঁরা অজ্ঞান্তে নিজেদের প্রতিই অবিচার করবেন।

কোর্ট এলাকায় যেরূপ ধ্বংসাত্মক আক্রমণের কৌশল অবলম্বন করেছিলাম, সেইভাবেই ল্যাণ্ডমাইন মাটির নীচে আরও তিনটি স্থানে পুঁতে রেখে মিলিটারী এবং জেলা-কর্তৃপক্ষের ইংরেজ কর্মচারীদেরও বিস্ফোরণের সাহায্যে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হ'ল।

পল্টন মাঠে সাহেবদের টেনিস্ গ্রাউণ্ড। এখানে খেলার সময় বিশ্রাম নিতে কাঠের খুঁটির উপর একটি ছোট ঘর ছিল। এই ঘরের নীচে আমাদের তৈরি পাঁচ ছ'টি মাইন মাটির নীচে বসিয়ে দূর থেকে ইলেকট্রিকের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো সাব্যস্ত হ'ল। বিভাগীয় কমিশনারের বাংলোর পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে love lane রাস্তাটি পল্টনের রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে মিলিটারী, পুলিস ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা সব সময়ে যাতায়াত করতেন। রাত্রেও দশ পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর পুলিস ও মিলিটারীর গাড়ী এই পথ অতিক্রম করতো। মিলিটারীর প্রধানঘাঁটির সঙ্গে এই পথটির সংযোগ ছিল। কোনরকমে যদি এই রাস্তার বুকে ল্যাণ্ডমাইন প্রোথিত করে রাখা যায়, তবে শত্রুকে বিধ্বস্ত করার এক সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে। রামকৃষ্ণ ও দেবপ্রসাদ গুপ্তের সহপাঠী ও বন্ধু রমেশ এই গুরু দায়িত্ব নিল। রাস্তার দু'দিকে সিগ্ন্যাল পাঠাবার জন্য দায়িত্বশীল সাথীদের নিযুক্ত করা হ'ল। তারা আগে থেকে লাইট বা সাউণ্ডের সিগ্ন্যাল মারফত শত্রুর আগমণ বার্তা জানাতে উপস্থিত থাকবে এবং আর দু'জন রাস্তা খুঁড়ে ল্যাণ্ডমাইন বসাবে। সিগ্ন্যাল পেলেই তারা একটি শক্ত লোহার পাত দিয়ে অর্ধেক খোঁড়া গর্তটি ঢেকে দিত এবং মাটিগুলি বোঁচকা বেঁধে সরিয়ে ফেলতো।

আরও একটি স্থানে ল্যাণ্ডমাইন বসিয়ে এমন একটা ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টির পরিকল্পনা নেওয়া হ'ল, যার কোন নজীর আর নেই। এই উদ্দেশ্যে একটি নির্জন স্থানে আমাদের একটি ঘর ভাড়া নেওয়া প্রয়োজন। প্রীতিলতার বাবার

ভাড়া দেওয়ার জন্য একটি বাড়ি ছিল ; কিন্তু কোন বিবাহিত দম্পতি ছাড়া সে বাড়ি তিনি ভাড়া দিতেন না। আমাদেরও আবার ঠিক সেইরকমই একটি বাড়ি চাই—নাহলে প্ল্যান কাজে পরিণত করা যাচ্ছে না। আমাদের মধ্যে বিবাহিত কেউই নেই। অগত্যা প্রীতিলতার বৃদ্ধ বাবাকে বিভ্রান্ত করে বাড়িটি হস্তগত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হ'ল। আমাদের তরুণ সাথীদের মধ্যে একজন স্ত্রী সাজলো ; তারপর দু'জনে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে বৃদ্ধকে ভুলিয়ে বাড়ি দখল করলো। এই বাড়িতেই আমাদের ল্যাণ্ডমাইন প্রস্তুতির কাজ চলতো। স্থির হ'ল—যতদিন সম্ভব নিরাপত্তা বজায় রেখে এই বাড়ির সুযোগ নেওয়া সম্ভব, তা' আমরা নেবো। তারপর এক সময় এই ঘরের মেঝেতে ও বাইরে কম্পাউণ্ডের মধ্যে কয়েকটি ল্যাণ্ড মাইন বসিয়ে সময় ও সুযোগ মত এই ঘর বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র কার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে—এই মর্মে নিজেরাই পুলিসে খবর দেবো। এই খবর পাওয়ার পর পুলিস-কর্তারা স্বভাবতই বাড়িটি সার্চ করতে আসবেন—সেই সুযোগে তাঁদের এই মরণ ফাঁদে ফেলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সমূলে শেষ করে দেবো। এই ফাঁদটির ব্যবস্থাও এমন ছিল যে, ভিন্ন দু'টি ইলেকট্রিক লাইনে তিনটি করে মাইন সংযুক্ত ছিল। প্রথম সুইচে শত্রুদের বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়ে ঘটনাস্থলে সরেজমীনে তদন্তের জন্য বড়কর্তাদের সেখানে উপস্থিত হতে আকৃষ্ট করবো। তারপর আবার আলাদা আর একটি সুইচের সাহায্যে ভয়াবহ ধ্বংসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবো।

আমাদের সঙ্গে অভিযুক্ত মধু গুহ অর্ধেন্দুর মত জামিনে মুক্ত ছিল। গোরিলা-যুদ্ধের কায়দায় ল্যাণ্ডমাইনের সাহায্যে চট্টগ্রাম জেলাশাসক-গোষ্ঠিকে বিধ্বস্ত করার ব্যাপক প্রস্তুতির কাজ বাইরে অর্ধেন্দুরা যখন প্রায় সমাপ্ত করে এনেছে, তখন মূল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে আরো নতুন সাথী গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিল। সেই সময় আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে অর্ধেন্দু মধু গুহকে confidence-এ নেয়। তারই সাহায্যে আমাদের ল্যাণ্ডমাইন প্রভৃতি গুদামজাত করে রাখতে আরো একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। হৃদয় চৌধুরী ও আমাদের নবীন সাথী রবি সেন এই বাড়িটি ভাড়া নেওয়ার দায়িত্ব নেয়। রবি বিবাহিতা স্ত্রীর ভূমিকা দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে কৃতকার্য হয়েছিল।

বাইরে প্রস্তুতি প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। জেলের অভ্যন্তরেও আমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রায় সবই আনা হয়েছে। একসঙ্গে বা একটু আগে পিছে কৌশলের সঙ্গে কখন আক্রমণ আরম্ভ করা যাবে, সেই জিরো আওয়ারটি স্থির করাই মাত্র বাকি।

শেষের দিকে আমাদের তৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল। অনেক সময় সরলতা ও নিরীহভাবের অভিনয় করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। আরও একটা অসুবিধা ছিল—সাথীদের সবাইকে আমরা এই বিরাট প্রস্তুতির কথা জানাইনি—জানানো সম্ভবও ছিল না। কাজেই সবাই সব সময় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অভিনয় করবে কেন? প্রয়োজনটাই বা বুঝবে কি করে?

জেলের এক কন্‌ভিক্ট ওভারসিয়ার তার পদমর্যাদার অধিকারে সাধারণ কয়েদীদের উপর খুব প্রতিপত্তি খাটাতো। একদিন সে একটি নিরীহ কয়েদীকে ধরে অযথা প্রহার করে। লালমোহন সেন তা দেখতে পেয়ে সেই ওভারসিয়ারকে ধরে একটু উত্তম মধ্যম দিয়ে দিল। জেলে একেবারে হৈচৈ পড়ে গেল। জেলার, ডেপুটি-জেলার, অন্যান্য সেপাই, জমাদার, সবাই ছুটে এলো। আমরাও এগিয়ে গেলাম। ব্যাপার আর বেশীদূর গড়াল না বটে, তবে ঐ কন্‌ভিক্ট ওভারসিয়ার জেলারকে খুব assert করে বলতে লাগলো, সে লালমোহন ও অন্যান্য দু' এক-জনকে গোপনে বোমা নিতে ও স্তুপীকৃত নারকেলের ছোবড়ার নীচে তা লুকিয়ে রাখতে নিজের চোখে দেখেছে। ঐরূপ কোন ব্যাপারই সেই ওভারসিয়ার দেখতে পারে না—কারণ, লালমোহন এই প্রস্তুতির কথা বিন্দুমাত্রও জানতো না; তা'ছাড়া আমরা কখনও নারকেলের ছোবড়ার নীচে কোন জিনিষই রাখিনি। তা যাই হোক্ না কেন—"কয়েদী পাহারাদার" চোখে দেখেছে বলছে—সত্যি হোক্ বা মিথ্যা হোক্, খবর তো বটে! এমন একটি খবর জেলার তখনি জেল-সুপারকে পাঠালেন। তারপর যথারীতি জেলে তল্লাসী নেওয়ার হুকুম হ'ল—সারা জেল তল্লাসী হ'ল। কোর্ট থেকে ফিরে এসে দেখি নারকেলের ছোবড়া সব সরিয়ে নিয়ে গেছে। জেল-কর্তৃপক্ষ এতবড় একটি খবর চেপে রাখার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে রাখতে চাইলেন না। জেলের জিম্মা অর্দ্ধেক পুলিসের। তা'ছাড়া আমাদের বিশেষ দায়িত্ব পুলিস-কর্তৃপক্ষের, তাই জেল সুপার—জেলা-শাসক ও পুলিস-কর্তৃপক্ষকে এই চাঞ্চল্যকর সমাচার পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। জেলে গোপনে রক্ষিত বোমা উদ্ধার করবার জন্য পুলিস লেগে গেল।

সকাল দশটার সময় আমাদের কোর্টে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ প্রতিদিনই জেলের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে সার্চ করতেন। শুনে হয়ত অবাক হবেন তবু এইটি অভ্রান্ত সত্য যে, মিলিটারী পুলিসের বড় কর্তারা—স্বয়ং জেলা পুলিস-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ জনসন, কর্নেল ডালাস্ স্মিথ, মিঃ লুইস্, মিঃ সুটার, জেল সুপার, জেলার ও তাঁদের সঙ্গে আই, বি, ব্রাঞ্চের বড় কর্তারা মিলে জেলের আনাচে কানাচে সর্বত্র Search চালিয়েছে। তাদের তিন মাসের চেষ্টাতেও

একটি কার্তুজ বা এক গ্রেন বিস্ফোরক দ্রব্যও উদ্ধার হয়নি। আমি আগেও বলেছি এবং এখনও আবার বলছি, পুলিস গুনতে জানে না—ষড়যন্ত্রের অংশীদারেরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে তবে পুলিস ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারে না। আমাদের সব জিনিষই মাটির নীচে প্রায় দশ বারোটি স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে রেখেছিলাম। এই সব গুপ্তধনের গুপ্তগুহার কথা জানতাম কেবল গণেশ, সুবোধ চৌধুরী, ফনীন্দ্র নন্দী, আনন্দ, সহায়রাম ও আমি। আমাদের এই কয়জনের ফাঁসি অবধারিত বলে আইনজ্ঞেরা মত প্রকাশ করেছিলেন।

যা হোক্, মাটির নীচেকার খবর আমাদের এই কয়জনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাই পুলিসের অত তৎপরতা সত্ত্বেও কোন জিনিষেরই সন্ধান মিললো না। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল—অনুসন্ধান চলা কালে নরম মাটি চোখে পড়লেই জনসন সাহেব ছুরির ফলা প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা করে দেখতেন নীচে কিছু রাখা আছে কিনা। আমাদের সেপাই ও কয়েদী বন্ধুদের থেকেই আমরা এই খবর পেলাম। খবর পেয়ে জিনিষগুলি আরো গভীরতর গর্তে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হ'ল! বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার! প্রতিটি গর্ত অন্তত কুড়ি বাইশ ইঞ্চি গভীর করা দরকার। জেলের প্রহরীদের সজাগ দৃষ্টি ও বিভিন্ন কড়াকড়ির মধ্যে আরো গভীর করে মাটি খুঁড়ে অতগুলি বারুদের বোতল ও অস্ত্রশস্ত্র রাখা এক দুরূহ কর্ম। একস্থান থেকে তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্যস্থানে গভীর গর্তে পুঁতে রাখা সম্ভব নয়। কাজেই অনেকখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়েই সুযোগ সুবিধে অনুযায়ী মাটির গভীরে সেগুলি সমাধিস্থ করতে হয়েছে।

লালমোহনের সেই ঘটনার পরই এই বিপর্যয়। অবশ্য লালমোহন স্বেচ্ছায় এই বিপত্তি ঘটায় নি—সে জানতোই না কেন আমাদের সব সময় শান্ত সুস্থির পরিবেশের প্রয়োজন! তাই অজান্তে যে বাধা এসেছে তার সম্মুখীন হতেই হবে।

এছাড়া আমাদের অসাবধানতা ও অসংযমের জন্য আদালত প্রাঙ্গনে আবার একটি আকস্মিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হ'ল।

চন্দননগরে যে সব ইউরোপীয়ান সার্জেন্ট মাখনকে হত্যা করেছিল এবং যথেচ্ছ অশ্লীল গালাগালি, মারধোর ও নিতান্ত অমর্যাদাকর ব্যবহারে আমাদের সাথীদের চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছিল, তারা সবাই সাক্ষী দিতে এলো। সামনা সামনি তাদের দেখে প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্ষিপ্ত হয়ে সাথীরা তাদের গালাগালি দিতে সুরু করলো। আমরা সবাই পুলিস বেষ্টিত—হাতে হাতকড়া, তবু এই নিয়েই পুলিসের সঙ্গে বেশ একটু ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়ে গেল। স্টার সাহেব রেগে গিয়ে ফকির সেনের নাকে এক ঘুষি বসিয়ে দিলেন—ফকির সেনের নাক দিয়ে রক্ত

ঝরে পড়তে লাগলো! এই অবস্থার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। গাড়ীতে ওঠার সময় এই ঘটনা। সহানুভূতিশীল দর্শকবৃন্দ প্রতিদিনের মত আজো আমাদের চারপাশে ভিড় করে আছেন। আবদ্ধ ও সৈন্য বেষ্টিত অবস্থায় প্রতিশোধ নেবার বিশেষ কোন উপায় আমাদের ছিল না। সেই সময়ে আমি নাকি স্যুটার সাহেবকে লক্ষ্য করে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলাম :—"Well, shooter I warn you. Stop I say. You must have to pay heavy penalty for this british behaviour....."

এই কথা আমি বলেছিলাম কিনা তা আজ আমার মনে নেই। মাত্র দিন কয়েক আগে অর্ধেন্দু গুহের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার সময় তারই মুখে এই ঘটনার কথা শুনে আমার অতীত স্মৃতি মনে পড়ে গেল। এই ঘটনার উল্লেখ করে, স্যুটার সাহেবকে ঐভাবে শাসানো আমার উচিত হয়নি বলে অর্ধেন্দু সেদিন মন্তব্য করলো। তা'ছাড়া মাস্টারদাও আমার এ কাজের সমালোচনা করেছিলেন বলে সে জানালো। মাস্টারদা সমালোচনা করেছেন শুনে ভাবলাম— মাস্টারদার সমালোচনামূলক কথাগুলি গোপন রাখার আমার কোন অধিকার নেই। অর্ধেন্দু বললে—কোর্টে আমাদের এই সংঘর্ষের খবর মাস্টারদা নাকি আগেই পেয়েছিলেন। এই ঘটনার দু'তিন দিন পরেই অর্ধেন্দুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। মাস্টারদা তাকে বলেছিলেন—"এমন সময় ধৈর্য হারানো অনন্তের পক্ষে উচিত হয়নি। তার পাজিশনে থেকে স্যুটার সাহেবকে ঐভাবে আলটিমেটাম দেওয়ার মধ্যে উপস্থিত প্রেস্টিজ রক্ষার যৌক্তিকতা থাকলেও আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতির দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত, তার এইরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি সমর্থন যোগ্য নয়।"

আজ ধীর মস্তিষ্কে মাস্টারদার গভীর দূর-দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর এই মন্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গেই যে গ্রহণ করবো তার আর কথা কি! যদি সেই দিনও আমি তাঁর এই কথাগুলি শুনতে পেতাম তবু তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ আমার মনে কখনও স্থান পেতো না, এ আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি।

যাই হোক্, এই ঘটনায় পুলিস-কর্তৃপক্ষ একটু ঘাবড়ে গিয়েছেন বলেই মনে হ'ল। দু'তিন দিনের মধ্যেই বিনা বিচারে আটক রাখার একটি নতুন আইনে জামিনে মুক্ত অর্ধেন্দুদের ছ'জনকে জেলে আবদ্ধ করলো। অর্ধেন্দুর অবর্তমানে বাইরের কাজের দায়িত্ব কল্পনার উপর এসে পড়লো—তারই সব ব্যবস্থা ও তদারক করার কথা। মাখনের ভাই বেণু ঘোষাল, প্রভাত দত্ত, ননী দেব প্রমুখ কর্মীরা তখন পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে চলেছে—তবু অর্ধেন্দুর অভাব অপূরণীয়! জেলের মধ্যেও কড়াকড়ি বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল—জেল-প্রাঙ্গনে আমাদের অবাধ

ঘোরাঘুরি বন্ধ করে দিল। একদিন ভোরে সাহেব জেলার Mr. Jhones এসে Lock-up খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তিনজনকে—লোকনাথ, গণেশ ও আমাকে, সুপার মিঃ W.V. Hicks সাহেবের আদেশ শুনিয়ে গেল—আমাদের তিনজনকে সেলে থাকতে হবে। অর্ধেন্দুর মতে এ সবই আমার সেই আলটি-মেটাম দেওয়ার জের! আজ আমার তা অস্বীকার করার ইচ্ছে নেই।

জেল-সুপারের আদেশ অনুযায়ী আমরা তিনজন সেলে স্থানান্তরিত হলাম। চা খাওয়ার আগেই আমাদের নিয়ে সেলে বন্ধ করলো। প্রায় আটটার সময় দেখলাম—ইট এনে সেলের সামনে স্তুপীকৃত করা হচ্ছে। ব্যাপারখানা কি তখনও বুঝতে পারিনি, একটু পরেই জানতে পারলাম সেলের সামনের এণ্টি-সেলটিও তারা পাকা করবে। রাজমিস্ত্রী এলো—কাজ সুরু হলে আমি ও গণেশ মনে মনে প্রমাদ গুনলাম—যদি এণ্টি-সেল পাকা করে ফেলে তবে বারুদের বোতলগুলি আবার খুঁজে বার করবো কি করে? তার চাইতেও বেশী চিন্তার কথা—আজই বিকেলে বা তারপরদিন সকালে গভীর গর্তের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করবো বলে এণ্টিসেলের মাঝখানে মাটির অল্প নীচেই সিগারেটের কৌটোয় মোটরের হেড্‌লাইটের তিনটি বালব্‌ রাখা ছিল। মনে ভাবনা হচ্ছিল—কি জানি রাজমিস্ত্রীরা ইট বসাবার আগে কতখানি মাটি খুঁড়বে? আধঘণ্টার মধ্যে মনের সব দ্বন্দ্ব ভাবনার নিষ্পত্তি হ'ল। সেপাই, জমাদার, প্রভৃতি যারা রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে থেকে কাজ দেখছিল, তারা যেন একটু চঞ্চল হয়ে পড়লো। তারপর দেখি জেলার, ডেপুটি-জেলার সেখানে ছুটে এলেন এবং দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই জেলের বড় ঘণ্টা বাজতে লাগলো—জেল-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এলেন। দু'এক মিনিটের মধ্যেই জেলার, বড় জমাদার, সেপাই ক'জন আমাদের তিনজনের সেলের সামনে এসে হাজির। মিঃ জোন্‌সের মুখে কোন কথা নেই—আমরাও চুপ। জেলার সাহেব আমাদের সেল থেকে বেরিয়ে আসতে বললেন—আমাদের আবার হাজতঘরে ফিরিয়ে আনা হ'ল। সবাইকে সেখানে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাদের সঙ্গে আমাদের তিনজনকেও পুরে দিয়ে সাহেব দ্রুত চলে গেলেন। একটু পরেই জেলের এলারম্‌ বেল বেজে উঠলো। হৈ হৈ করে সব জেল-সেপাই, পুলিস-কনষ্টবল ও বাইরের মিলিটারীরা বন্দুক নিয়ে জেল ঘিরে ফেললো এবং সেপাইদের একটি বড় দল সঙ্গে করে জেল-সুপার ও জেলার জেলের অভ্যন্তরে ছুটলেন।

পাগ্‌লা-ঘণ্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মানুযায়ী কয়েদীদের সবাইকে নিজ নিজ ওয়ার্ডের ঘরের মধ্য প্রবেশ করতে হবে এবং সবাইকে তালা বন্ধ করে রাখা

হবে। কাজেই আমরা ও অন্যান্য সব কয়েদীরা নিজেদের ঘরে বন্ধ আছি—ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ফাঁকে ফাঁকে কর্তৃপক্ষের আনাগোনা দেখবার চেষ্টা করছি। মনে হ'ল জেলা-কর্তৃপক্ষের সব বড় সাহেবই ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়েছেন। আমাদের প্রহরীর সংখ্যাও দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং সবাই খুব সন্ত্রস্ত—প্রতিমুহূর্তেই তারা বড় সাহেবের আগমন বা নতুন কোন নির্দেশ আশা করছে।

যদিও স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম না এবং আমাদের বন্ধু সেপাই, সার্জেণ্ট বা ওয়ার্ডারদের কাছ থেকেও কোন সংবাদ জানতে পারছিলাম না, তবু কর্তৃপক্ষের তোড়জোড় দেখে মনে হচ্ছিল সিগারেটের কৌটোর মধ্যে ইলেক্ট্রিক বালব্ পেয়েই তারা সমস্ত এণ্টিসেলটিই খুঁড়ে ফেলেছে।

সামান্য একজন কয়েদী ওয়ার্ডারের কথায় বিশ্বাস করে নারকেল ছোবড়ার বিরাট স্তূপ কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ সাফ করিয়ে ফেললো—আর মাটির নীচে পোঁতা ইলেকট্রিক বালব্ পেয়ে তারা কি কেবল ওপরে ওপরে সামান্য মাটি খুঁড়েই নিরস্ত হতে পারে? কাজেই ধরে নিয়েছিলাম তারা এণ্টিসেল ক'টি গভীর করে খুঁড়বেই এবং সব জিনিষপত্র ও বারুদের বোতল ক'টি বার করে ফেলবে। আমাদের ধারণা সত্য হ'ল—এণ্টিসেলে যা যা জিনিষ ছিল সবই তাদের হাতে পড়লো। কিন্তু জেলের আরো ছয় সাতটি স্থানে আমাদের আরো যে সব জিনিষ পোঁতা ছিল, তার সন্ধান তারা কোথায় পাবে?

বিরাট জেল-কম্পাউণ্ডে আমরা কি করে গর্ত করবো—এবং সবার অগোচরে মাটির নীচে পুঁতে রাখার সুযোগই বা পাব কি করে, এই ভেবে কর্তৃপক্ষ যদি নিরস্ত থাকতেন তবে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু ছোট্ট একটি এণ্টিসেলের মধ্যেই এতসব বিপজ্জনক নিষিদ্ধ জিনিষ পেয়ে কর্তৃপক্ষ নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না—হুকুম হ'ল সমস্ত জেল-কম্পাউণ্ডের দেওয়াল এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক হাঁটুরও বেশী গভীর করে খুঁড়ে ফেলতে হবে। মিলিটারীতে "সেপার্স—মাইপার্গরা" ল্যাণ্ডমাইন উদ্ধার করবার জন্য চারিদিকে ট্রেঞ্চের মত গর্ত করে যেমন ভাবে এগোতে থাকে, তেমনি লম্বা ও গভীর করে কম্পাউণ্ডের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তটা খুঁড়ে খুঁড়ে সেপাইরা তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলো। কোন বটগাছের তলা থেকে কিছু কার্তুজ বেরুলো—কোথাও বা কোন সরু প্যাসেজের মাটির তলায় কয়টি ড্যাগার দেখা গেল, কোথাও বা রিভলভার হস্তগত হ'ল। একটার পর একটা আবিষ্কারে আরো অনেক জিনিষ উদ্ধারের আশায় কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—

আর হতভাগ্য কয়েদীদের উদয়াস্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে জেলের মাটি ওলট-পালট হতে লাগলো !

সাত আট দিন ধরে আমরা সবাই হাজত ঘরে বন্ধ। বাথরুমে যাওয়ার সময় চারজন করে বাইরে আনতো আবার স্নানাদি সারা হ'লে বন্ধ করে রাখতো। খাবার সময় কড়া পাহারায় সবাইকে লাইনে বসে একসঙ্গে খাওয়া সারতে হ'ত। কোর্টও সাত আট দিন বন্ধ রাখা হ'ল।

আমরা যেদিন আবার কোর্টে গেলাম, গিয়েই বুঝতে পারলাম যে জেলের ভেতরকার খবর সবাই জেনে ফেলেছেন। আমাদের যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে, তা সবাই অনুমান করেছেন।

আমাদের সব চেষ্টার ফল কি এই, নাকি আরো কিছু নতুন নতুন আয়োজন আরো কোনো কোনো স্থানে লুকানো আছে—এই ভাবনায় কর্তৃপক্ষ বেশ বিচলিত ও চিন্তিত।

জেলের ভেতরের এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে পুলিশ রিপোর্টে যা সংগৃহীত হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত করলাম—পুলিসের ABSTRACT OF INTELLEGENCE থেকে বাঙ্গলা পুলিসের SECRET Report যা Voll.—XXXIX পেয়েছি তার হুবহু নকল লিপিবদ্ধ করলাম :—

In June 1931 when the trial of Ananta Singh and others was going on arms, amnunition, explosive substances and other increminating impliments were discovered underground in the jail near the cells occupied by Ananta Singh, Ganesh Ghosh and Lokenath Ball. The articles discovered consisted of two Revolvers, Cartridges, Bombshells, Gun-Cotton, Gun-Powder, Electric Wire, Electric Batteries, acids of various kinds, Files, Screw drivers, Daggers etc etc.

"When such things were going on inside the jail premises terrorists who were still out and undetected succeeded in setting up several improvised dynamites under the Court Buildings. Three such dynamites were recovered from a vacant house.

"The motive of the revolutionaries in planting dyna-

mites under the Court Building was obviously for blowing up the same and had not the police been able to discover the dynamites in time the result would have been most disasterous. One may ask why three dynamites were set up in a vacant house. It can easily be concluded that the intension of the revolutionaries was to attract the attention of the police to the house, by creating some suspicious things and then to charge the dynamites from a distance when a band of police men under their superior officers would arrive there to search the house.

"One thing to be marked was that many articles found in these systematic affairs were similar to some articles discovered in the jail and a few days back the plan of the Armonry Raid Case accused in the jail also appeared to blow off the walls of the jail and attempt to escape in a body."

শাসকগোষ্ঠি কতখানি চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন পুলিস রিপোর্টই তার সাক্ষর বহন করছে।

উচ্চপদস্থ জেলা-কর্তৃপক্ষ এবং ডি, আই, জি, মিঃ ফারমারের পক্ষ থেকে নানাভাবে আমাদের কাছে প্রস্তাব এলো—কেন আমরা কোর্টের প্রোসিডিংস অযথা সুদীর্ঘ করছি, কেনই বা আমরা অবিরাম ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র করে চলেছি? আমরা কি কখনও শান্তি চাই না? মৃত্যুদণ্ডের বিনিময়ে সন্ধি করা সম্ভব হলে আমাদের কি তা চেষ্টা করা উচিত নয়? —ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঐরূপ পরোক্ষ প্রস্তাবের উত্তরে আমরা সব সময়ে বলেছি—"আমরা মরবো জানি—ফাঁসি আমাদের অবধারিত; তার জন্য অনেক আগে থেকেই আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু মরার আগে এমন এক বিভীষিকা সৃষ্টি করে যাবো যা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না—উল্কার মত জলে তারপর মরব! —একটি ভূমিকম্প সৃষ্টি করে তারপর ফাঁসির দড়ি গলায় পরবো! আমরা সেইদিন হবো শান্ত, যেদিন তোমরা হবে নিস্তব্ধ!"

কোর্টে, জেলে, বিভিন্ন অফিসারদের সঙ্গে প্রায় সব সময়েই এই ধরনের কথা

হ'ত—তাদের challenge করেই এইসব বলতাম। পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তায় একটা বিষয় ক্রমশ পরিস্ফুট হচ্ছিল—একটা সন্ধি হলে যেন মন্দ হয় না। কথাবার্তার মধ্যে এইরূপ চিন্তার রেশটি বেশ বোঝা যেত ; কিন্তু আমরা তাতে কোন আমল দিতাম না। কারণ মনে হ'ত, তাও কি কখনও সম্ভব!

কোন প্রলোভনে আমাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। কর্তৃপক্ষ বোধহয় ভাঁওতা দিয়ে কার্য উদ্ধার করতে চায়—যাতে আমরা কোর্টের কাজে বাধা সৃষ্টি না করে তাড়াতাড়ি বিচার শেষ করতে সাহায্য করি।

জেলের এতদিনের প্রস্তুতির এই শোচনীয় পরিসমাপ্তি আমাদের সাময়িক ভাবে বিষণ্ণ করেছিল তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবনের এই সন্ধিক্ষণে পরাজয় মেনে নেব, এ যেন ভাবতেও পারছিলাম না। নতুন উদ্যমে আবার চেষ্টা সুরু করতে হবে—কোর্টের কাজে যত ভাবে সম্ভব বাধার সৃষ্টি করতে হবে—যত দেরী করা সম্ভব তার ব্যবস্থা করা দরকার—নাহলে সময় পাওয়ার কোন উপায় নেই।

ত'ছাড়া অর্ধেন্দু বাইরে থাকাকালীন আমরা যে সাহায্য পেয়েছি, তার অবর্তমানে তা সম্ভব নয়। কারণ অর্ধেন্দু জামিনে মুক্ত ছিল বলেই তার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হ'ত এবং নানা পরামর্শ করে কাজ করা যেত। এখন সেও বিনা বিচারে জেলে আটক। তাই আর কি করা যায় ভাবছিলাম। স্থির করলাম, বিনা বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে আইনগতভাবে চেষ্টা করে তাদের আবার জামিনে মুক্ত করা যায় কিনা দেখতে হবে। বিনা বিচারে কাউকে যদি এক মাসের বেশী সময় আটক রাখতে হয়, তবে সেই আটক রাখার আদেশ confirm করা চাই। তাদের অভিভাবকেরা শ্রীশচন্দ্র বসুর মাধ্যমে জজসাহেবের কাছে আবেদন জানালেন ও আইনগত প্রশ্ন তুললেন—'ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট যখন তাদের জামিনে থাকার অধিকার মঞ্জুর করেছেন সেই অবস্থায় অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা অপহরণ করা যায় কি ?" যা হোক্, মিঃ জে, ইউনী তাঁদের আবেদন গ্রাহ্য করে সরকারকে তাঁর আদেশ জানালেন। তারা আবার জামিনে মুক্তি পেলো।

এই প্রহসন আমাদের খুব সন্দেহজনক মনে হ'ল। অর্ধেন্দুকে বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়ে বললাম যে, এতে নিশ্চয়ই পুলিসের কারসাজি আছে এবং পুলিস নিশ্চয়ই আরো বিশেষভাবে তাকে অনুসরণ করে সমস্ত ষড়যন্ত্র ও প্রস্তুতির আয়োজন ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাকে নানাভাবে শেখানো হ'ল এবং সে নিজেও বুঝলো যে, পুলিসই হয়ত নতুন করে ফাঁদ পাতার জন্য

এত সহজে তাদের জামিনে মুক্তি দিয়েছে। তবে ভয় ও শঙ্কা আছে বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা বিপ্লবীর ধর্ম নয়। তাই আরো সহস্রগুণ বেশী সাবধানতার সঙ্গে চেষ্টা করবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বাইরের পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য অর্ধেন্দুরা অক্লান্তভাবে রাত দিন খেটে চলেছে। পুলিসের তৎপরতাও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে—পুলিস একেবারে জোঁকের মত অর্ধেন্দুদের পেছনে লেগে আছে। অতি সাবধানে থাকা সত্ত্বেও পুলিস একবার অতর্কিতে তাদের গোপন আস্তানায় এসে পড়লো। পুলিসের আগমন বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দশমণ বারুদ জলে ফেলে দিতে হ'ল—বারুদ বিসর্জন দিয়ে সবাই কোনমতে বেঁচে গেল। দশমণ বারুদ নষ্ট হওয়ার অপরিসীম ক্ষতিপূরণের জন্য আবার তারা পূর্ণ উদ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে কয়েকদিনের মধ্যেই আবার ছয়মণ বারুদ তৈরি করে ফেললো। বারুদ-পর্ব শেষ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে ল্যাণ্ডমাইন স্থাপন করার জন্য সাংগঠনিকভাবে চেষ্টা সুরু হ'ল। কয়েক দিন থেকেই কোর্ট-বিল্ডিং যে পাহাড়ে অবস্থিত তার বিশেষ একটি স্থানে ল্যাণ্ডমাইন বসাবার আয়োজন চলেছে। প্রতিদিন রাতে বিস্তারিত ব্যবস্থা করে তারপর একটি করে ল্যাণ্ডমাইন ও storage ব্যাটারী মাটির নীচে বসানো হচ্ছিল। মাইন দু'টি মাটির নীচে বসাবার জন্য শেষ দিন যে দু'জনের যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের মধ্যে একজন অনুপস্থিত হ'ল। একজন কম ছিল বলে একটি মাইন সে রাতে কোনমতেই বসানো সম্ভব হ'ল না। সেই মাইনটি মাথায় চাপিয়ে গায়ে কাদা মাটি মাখা অবস্থায় নিবারণ জেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখনো ভোরের আলো ফোটেনি—রাতের আবছা অন্ধকারের ছায়াই বেশী। নিবারণকে ঐ অবস্থায় হঠাৎ জেলের একটি সেপাই দেখতে পায়। সেপাইটি তখন ডিউটিতে ছিল না। সামনের দিঘীতে প্রাত্যহিক প্রাতঃকৃত্যাদি সারবার জন্য রোজ যেমন যায় সেদিনও তেমনি গিয়েছিল। নিবারণকে ঐভাবে ঐ স্থানে দেখে সেপাইটির সন্দেহ হওয়াতে তাকে আটক করে। তারপর যথারীতি পুলিসের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলে অনুসন্ধান পর্ব আরম্ভ হয়।

কোন inner treachery ছিল কিনা সে বিষয়ে অর্ধেন্দুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করলাম। জেলের সেপাইটি কোন সাজানো আই, বি, পুলিস কিনা সে বিষয়েও নিশ্চিত হবার চেষ্টা করলাম। অর্ধেন্দুর সঙ্গে আলোচনা করে বোঝা গেল—মাইনটি সেই রাতে নিশ্চয়ই বসানো হয়ে যেত, একজন সাথীর নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে অনুপস্থিতির দরুণই তা সম্ভব হয় নি।

ঐ ঘটনা না ঘটলে মাইনটি তারা বসিয়েই ফেলতো; তাই যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে পুলিস ফাঁদটি পাততে পারে না। তাছাড়া যদি inner treachery থাকতো তবে আদালত-ভবন অবস্থিত পাহাড়টির বিশেষ স্থানটির গোপন তথ্য নিশ্চয়ই পুলিস জানতে পারতো! তাই মনে হয় নিবারণের অসাবধানতার জন্যই এই বিভ্রাট ঘটেছিল। শত্রুশিবিরের মধ্যেই যখন আমাদের কাজ তখন লক্ষগুণ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। অতি সামান্য কাজও তুচ্ছ নয়! অতি তুচ্ছ কাজও গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করার মানসিক প্রস্তুতি বিপ্লবীদের নিতান্ত প্রয়োজন! এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেই অনুশোচনার কারণ দেখা দেয়।

নিবারণ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনই পুলিস কোর্ট-কম্পাউণ্ডে পোঁতা landmine উদ্ধার করে এবং যে বাড়িতে অর্ধেন্দুরা গোপনে landmine প্রভৃতি তৈরি করতো, দিনের বেলায় অতর্কিতে সেই বাড়িতে হানা দেয়। জেলের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার পর চট্টগ্রামে কারফিউ জারি হয়েছিল এবং শহরের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল Lt. col, Buckland এর অধীনস্থ ফৌজের উপর। এই রকম বিপদজনক অবস্থার মধ্যেও খুব সাহস ও কৌশলের সঙ্গেই অর্ধেন্দুরা এই সব ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু সেদিন আর পুলিস অভিযান ব্যর্থ করা সম্ভব হ'ল না। পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে অপূর্ব সেন ও কালী দে কোন মতে নিষ্কৃতি পেলেও অর্ধেন্দু ও তার সঙ্গে আরও ক'জন সে বাড়িতে ধরা পড়লো।

আমাদের তৈরি Improvised Landmine এক নতুন ধরনের শক্তিশালী মারণাস্ত্র, এ তথ্য আংশিক ভাবে গোপন রেখে—Dynamite Conspiracy Case নাম দিয়ে কর্তৃপক্ষ মোট আট জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলেন। মিঃ এ, এন্, সেন ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হলেন আর দু'জন কমিশনারের নাম special Gazettee-এ ঘোষিত হ'ল। মামলায় অভিযুক্ত হ'ল—(১) অর্ধেন্দু গুহ, (২) অনিল রক্ষিৎ, (৩) রবি সেন, (৪) নিবারণ ঘোষ, (৫) সুশীল সেন, (৬) প্রফুল্ল মল্লিক, (৭) হৃদয় দাস, (৮) প্রভাত দত্ত।

জেলের মধ্যে ও বাইরের এই ব্যাপক প্রস্তুতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর বাঙ্গলার শাসকগোষ্ঠি ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিচলিত হয়ে পড়লেন—ফুটবল ময়দানে অত লোকের মাঝে পনেরো বছরের একটি বালক সামনে দাঁড়িয়ে খাঁ বাহাদুর আসানুল্লাকে হত্যা করতে এতটুকু ইতস্তত করলো না! শান্তি, সুনীতি—দু'টি কিশোরীর গুলীতে ত্রিপুরার জেলা শাসক প্রাণ হারালেন! রাইটার্স

বিল্‌ডিংস্‌-এ, ঢাকায়, মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের পিস্তল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গর্জন করে চলেছে। অন্যদিকে আবার কংগ্রেসের আইন-অমান্য আন্দোলন। গান্ধী-আরউন্‌ প্যাক্ট, গান্ধীজীর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক চলেছে। সেই সময় বক্‌সার বন্দী শিবির থেকে স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাক্‌সন, বিপ্লবীদের সঙ্গে সাময়িক সন্ধি স্থাপন করা যায় কিনা, এই বিষয়ে বাঙ্গলার লাটবাহাদুরের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। ১৯৩৯ সালে আলিপুর জেলে শ্রী গোবিন্দলাল ব্যানার্জী এই প্রকার সন্ধির চেষ্টা সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করেন।

তিনি বলেছিলেন—সন্ধির বিষয় আলোচনার সময় সরকার যেন মাস্টারদা ও আমার উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করেন এবং যদি সন্ধি আলোচনা ব্যর্থ হয় তবে মাস্টারদাকে তাঁর আস্তানায় নিরাপদে ফিরে যেতে দিতে হবে, এই সর্ত পালনে বাধ্য থাকেন।

স্যার ষ্টানলী জ্যাক্‌সনের সঙ্গে একটি সাময়িক সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলাকালে ডি, আই, জি, মিঃ ফারমার, মিঃ জনসন ও জেলা-শাসক পর্দার আড়াল থেকে রায় বাহাদুর ডি, এস, পি, মন্মথ সেনের মারফত সরাসরি আমার কাছে একটি প্রস্তাব পাঠালেন। প্রস্তাবটির সারমর্ম এইরূপ—আমাদের কারো যদি ফাঁসি না হয় তবে ন্যূনতম সর্ত মেনে নিয়ে বাংলা দেশে বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ করার দায়িত্ব নেওয়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?

ঐরূপ অবাস্তব প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যাত হ'ল। আমি পাল্টা প্রস্তাব করলাম—যদি একজনেরও ফাঁসি না হয়, আর কর্তৃপক্ষের immediate gesture হিসাবে Dynamite Conspiracy Case-এ একজনেরও শাস্তি হ'লনা, এই প্রমাণ যদি এখনই পাই তবে আমরা—কেবল আমরাই ষড়যন্ত্রমূলক কাজ বন্ধ করতে পারি কিনা সেই বিষয়ে বিবেচনা করে দেখতে পারি।

এইভাবে সন্ধির সর্ত নিয়ে যখন আলোচনা চলছে তখন মাস্টারদার কাছে আমি ও গণেশ সব বিষয়ে বিস্তারিত লিখে পাঠালাম ও তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশ চাইলাম।

মাস্টারদা সুস্পষ্ট ভাষায় লিখলেন "তোমাদের ফাঁসির বিনিময়ে যদি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে তোমরা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ স্থগিত রাখবে, তাহলে বিনা দ্বিধায় নিশ্চয়ই সেই প্রতিশ্রুতি দেবে।"

সরকারীপক্ষের মুখপাত্রের সঙ্গে আলোচনা শেষে উভয়পক্ষ একমত হলাম। (১) মূল সর্ত হ'ল—বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রমূলক কাজ বর্জন করবো বলে আমরা প্রতিশ্রুতি দেবো—পরিবর্তে আমাদের কারো প্রাণদণ্ড হবে না।

(২) ডিনামাইট কন্‌সপিরেসি কেসে Law and Order রক্ষার্থে সরকার পক্ষকে মামুলী সাজার ব্যবস্থা করতেই হবে। তাই তাঁরা করবেন—অভিযুক্তেরা আদালতে দোষ স্বীকার করবে।

(৩) অভিযুক্ত বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে আগে আমরা স্থির করে দেবো কার কি সাজা হবে।

(৪) আমরা কোর্ট প্রসিডিংস বিলম্বিত করার কৌশল বর্জন করবো। মামলা শেষে সুদীর্ঘ Statement দিয়ে মাসের পর মাস বিলম্ব ঘটাবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকবো। একটি সর্তে আমরা এই প্রস্তাবে সম্মত হলাম—ডিনামাইট্ কেস যদি আমাদের উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিটে যায়, যে দিন ডিনামাইট্ কেস মিটবে, সেদিন থেকেই আমরা—লোকনাথ, গণেশ ও আমি—নিজেরা আর নিজেদের ডিফেণ্ড করবো না। সরকারী পক্ষ আমাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন।

সন্ধির সর্তগুলি দুই পক্ষই অনুমোদন করলো। খসড়া মাস্টারদার কাছে পাঠালাম। মাস্টারদা অনুমোদন করলেন—কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করে লিখলেন, "ওদের কি বিশ্বাস করা যায়?" আমাদের মনেও শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রশ্ন ছিল। যা হোক্ সন্ধির সর্ত অনুমোদিত হবার পর রঙ্গমঞ্চে দ্রুত পট পরিবর্তন হতে লাগলো।

আমরা তিনজন—লোকনাথ, গণেশ ও আমি, ডিনামাইট্ কন্‌সপিরেসি কেসে অভিযুক্ত আটজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলাম—সেই সুযোগ সুবিধা কর্তৃপক্ষই করে দিলেন। অর্ধেন্দুর মেয়াদের দণ্ড তিন বছর—আর অন্যান্যদের ছ'মাস, এক বছর, দু'বছর করে ধার্য্য হ'ল। বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে একমত হ'ল এবং স্থির হ'ল আদালতে তারা দোষ স্বীকার করবে। সরকারও এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন।

ডিনামাইট্ কেস সুরু হ'ল। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট অভিযুক্তদের প্রশ্ন করলেন—"তোমাদের কিছু বলবার আছে? তোমরা দোষী না নির্দোষ?" সবাই দোষ স্বীকার করলো। সঙ্গে সঙ্গে রায় লেখা হ'ল। সরকার পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে যার যা দণ্ডকাল স্থির হয়েছিল, জজেরা সেইরূপ আদেশ দিলেন। এই হ'ল ট্রাইব্যুনালের বাস্তব চেহারা—এই হ'ল ট্রাইব্যুনাল বিচারের প্রহসন! বিশ্বাস করা কঠিন—কিন্তু এটাই বাস্তব সত্য।

সন্ধির সর্ত অনুযায়ী আমরা নাটকীয় ভাবে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে সাক্ষীদের আর জেরা করলাম না। সরকার পক্ষ মামলায় আর সাক্ষী দিল না।

আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ frame করলো। আনন্দের, রজতের ও আমার বাবা—এই তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হ'ল।

তারপর এলো Statement দেওয়ার পালা। আমরা ঠিক করেছিলাম Statement দেবো না। গণেশ হঠাৎ একটি Statement দিল। আমার ডাক পড়লে আমিও ছোট একটি Statement দিলাম। লোকনাথ কোন Statement দিল না।

ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট তাঁর রায়ে গণেশের statement সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"In his statement in Court the accused made no attempt to explain any of the circumstances appearing in the evidence against him but instead made a series of allegations against the Court and the police, comment on which is superfluous."

আমার statement সম্বন্ধে জজসাহেবের মন্তব্য—"In the course of his examination under section 342 Cr P. C. the accused made no attempt to explain any of the circumstances appearing in the evidence against him but indulged instead in theatrical vituperation (which recalls the arrogant braggadocio of his letters) characterising the trial as a mockery, Court as prejudiced and Government as tyrannical and unjust."

এখন বাকি রইল দুই পক্ষের সওয়াল জবাব। এর জন্য উভয় পক্ষকে কিছুদিন সময় দেওয়া হ'ল। সরকার পক্ষ থেকে এলেন মিঃ এন, এন, ব্যানার্জী—আমাদের পক্ষ থেকে এলেন শ্রদ্ধেয় বি, এন শাশমল, জে, কে, ঘোষাল, অখিলচন্দ্র দত্ত, কামিনী দত্ত, মহিম গুহ প্রমুখ আইনজ্ঞেরা। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ সন্তোষ কুমার বসু এলেন—ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, আনন্দ, সহায়রাম প্রভৃতির পক্ষ থেকে। আর বাকি সবার পক্ষে দাঁড়ালেন আমাদের পরম হিতাকাঙ্খী শ্রীশ চন্দ্র বসু। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে আদালতের কাজ চলেছিল—। সরকার পক্ষ আগে আরগুমেণ্ট করলেন তারপর আমাদের পক্ষের ব্যারিষ্টার ও এড্‌ভোকেটরা একের পর এক সওয়াল জবাব করলেন। শুনতে কি অপূর্ব লাগতো!

মামলা শেষ হ'ল। এখন রায়দানের পালা। এ যেন সব নাটককে

ছাড়িয়ে গেল। জেলা-জজ মিঃ ইউনী ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট। জাজ্‌মেণ্ট তাঁকেই লিখতে হবে। আমাদের কারো মৃত্যুদণ্ড হবে না বলে রায় আগেই ঠিক হয়ে গেছে—তবু কে জানে—সুরেন ব্যানার্জীর ভাষায় "British has unbroken promises with broken records!"

গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ইউনী সাহেবের বাংলোর টিলাটি কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলা হ'ল। কম্পাউণ্ডে ছোট ছোট তাঁবু খাটানো হ'ল। যতদিন জাজ্‌মেণ্ট লেখা শেষ না হয়, ততদিন জজসাহেবের ষ্টাফদের এখানে স্থায়ী ভাবে থাকার ব্যবস্থা হ'ল। জাজ্‌মেণ্টটি ছাপানো হবে—তাই এই ঘেরার মধ্যে প্রিণ্টিং প্রেস বসানো হ'ল এবং তা পরিচালিত করার জন্য—যতদিন জাজ্‌-মেণ্টটি প্রিণ্ট করা শেষ না হয়—compositor, machinemen প্রভৃতির থাকার ব্যবস্থা করা হ'ল। প্রায় তিন মাস এই সমস্ত কর্মচারীকে ঐ স্থানে আবদ্ধ করে রাখা হয়।

কোন্‌দিন রায় দেবে তার কোন হদিসই কেউ পাচ্ছেনা। চট্টলবাসী ব্যাকুল চিত্তে দিন কাটাচ্ছে। সন্ধিপ্রস্তাব ও সন্ধি-সর্তের পরিণতি দেখবার জন্য আমরাও প্রতীক্ষা করছি।

বোধহয় এক রবিবারে—হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে জেল-অফিসে আমার ডাক পড়লো। গিয়ে দেখলাম মা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মার কাছে শুনলাম ইন্‌টারভিউ গ্রাণ্ট করে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে থেকে সকলের বাড়িতেই চিঠি পাঠিয়েছেন। এত দরদ কেন? এত সহানুভূতি কিসের আশায়? পাঁচ মিনিটের জন্য ইন্‌টারভিউ। সবার ইন্‌টারভিউ হবে। সময় খুবই কম, তাই কাউকে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এতদিন জেল-অফিস ঘরে বসে ইন্‌টারভিউ হয়েছে। আজ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো। কাউকে ঘরের মধ্যে আসতে দেওয়া হ'ল না। যাঁরা দেখা করতে এলেন তাঁরা বাইরে দাঁড়ালেন আর আমরা অফিস ঘরের মধ্যে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখা সাক্ষাতের করুণ পালা সাঙ্গ করলাম।

মাকে আজ বড় বিচলিত ও বিষণ্ণ মনে হ'ল। মা আমাকে বার বার প্রশ্ন করতে লাগলেন যে, না চাইতেও সাহেব নিজে থেকেই কেন এই সাক্ষাত করার ব্যবস্থা করলেন? সত্যিই তো এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের কারণ কি? আমাদের মামলার শুনানী শেষ হয়েছে প্রায় তিন মাস। সকলেই মামলার রায় শুনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। যাঁদের অতি আপন ও প্রিয়জন

যাবজ্জীবন কারাবাস বা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শোনবার অনিশ্চিত আশঙ্কার মধ্যে আছেন তাঁদের পক্ষে শান্ত থাকা খুবই কঠিন। মা তাঁর সন্তানের চরম অমঙ্গলের কথা ভেবে কোনমতেই যেন স্থির থাকতে পারছিলেন না। মার মুখে বিশেষ কোন কথা ছিল না। কেবল সেই কথা—"তোরা কিছু শুনেছিস? তোদের মামলার রায় কবে দেবে? কিছু জানিস? জজসাহেব কি রায় দেবে কিছু বলতে পারিস?" মা কি জানতেন না যে এই সব প্রশ্নের সঠিক জবাব আমি দিতে পারবো না? তবু—'আমাদের ফাঁসি হবেনা' এই কথাটিই একটিবার অন্তত আমার মুখে শুনবার জন্য মায়ের অন্তর ব্যাকুল প্রত্যাশায় ছিল!

এইরূপ অভয়বাণী শোনাবার কোন উপকরণ যদি আমার হাতে থাকতো তবে মাকে ভরসা দিতে পারতাম, কিন্তু আমার তো তা ছিল না! সন্ধিচুক্তি হয়ে যাওয়ার পর এই তিন মাসের মধ্যে কোন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারের সঙ্গে আলাপ করার কোন সুযোগই হয়নি। কাজেই ট্রাইব্যুনালের বিচারকেরা কি রায় দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা আমাদের জানার কোন উপায় ছিল না। তা'ছাড়া আমাদের সন্ধিচুক্তি সরকারপক্ষ যদি মেনেও নেয়—চুক্তির সর্ত পালিত হবে কিনা কে জানে? এমনও তো হতে পারে যে, হাইকোর্ট প্রাণদণ্ড মকুব করলো না! কাজেই সরকার শেষ পর্যন্ত কি করবে তা আন্দাজ করা যাচ্ছিল না। তবু মাকে সান্তনা দিয়ে বললাম—"মা, তুমি অত ভাবছ কেন? ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায় যখন তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম তখন তো তুমি এত বিচলিত হও নি! তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যুদ্ধে জয়ী হয়েছি —আজও আশীর্বাদ কর—তোমার আশীর্বাদই আমার অক্ষয় কবচ!"

পাঁচ মিনিট শেষ হ'ল। ইন্টারভিউ সমাপ্ত করবার জন্য জেলার অনুরোধ জানালেন। জেলারকে অনুরোধ করলে তিনি আরো কয়েক মিনিট সময় নিশ্চয়ই দিতেন—কিন্তু আমাদের কারো কিছু বলার ছিল না। মা হয়ত ভাবছিলেন আমার প্রাণদণ্ড হবে—আর প্রাণদণ্ড হবে না বলে আমিও ভাবতে পারছিলাম না। রায় দানের পর আর হয়ত সহসা দেখাও হবে না। অন্যত্র কোন সেণ্ট্রাল জেলে আমাদের ট্রান্সফার করবে ও সেখানে condemned সেলে শেষ দিনের অপেক্ষায় থাকলো—এই সব কথাই মনের মধ্যে ভীড় করে আসছিল। অবশ্য আমার অশান্ত বা অধীর হওয়ার কোন কারণ ছিল না। বাল্যকালে পিস্তল হাতে যে দিন সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম, সেইদিন থেকেই বহুবার এইরূপ অন্তিম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। তাই আজ আবার নূতন করে কি ভাববো? কিন্তু মায়ের সামনে

দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে নিজের মনের সঙ্গে বোঝা পড়ার কথা ওঠে না। মায়ের বিষণ্ণ করুণ মুখ, উদ্‌বেলিত অন্তর, অশ্রুসিক্ত দু'টি চক্ষু আমার হৃদয় দুর্বল করে দিচ্ছিল! সেই জন্যেই আরো সময়ের জন্য জেলারকে অনুরোধ করলাম না, কেবল জানালাম—'যদি জেলগেটের সামনে মাকে একটু দাঁড়াতে দেন তবে তাঁকে আমি প্রণাম করতে পারি।' জেলার আপত্তি করলেন না।

মা গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি জেলের সিংহদ্বারের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে মায়ের পায়ের ধূলো নিলাম। কিন্তু মার একি হ'ল? রেলের টাকা লুঠ করার আগে মায়ের কাছ থেকে যেদিন বিদায় নিয়েছিলাম তখন তো তিনি এত অস্থির হন নি! শেষ বিদায়ের দিনে (১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায় রণবেশে প্রস্তুত হয়ে) যখন মায়ের পদধূলি নিয়েছিলাম তখনও তো মাকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখিনি। আবার ধরা দেওয়ার পর যখন জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং আমাকে বন্দী অবস্থায় দেখে বার বার বলছিলেন—"তুই কি জানিস না বাবা তোর কি হবে? কেন তুই ধরা দিলি?"—সেদিনও তো মাকে পুত্রের বিপদ আশঙ্কায় আজকের মত ধৈর্যহারা হ'তে দেখিনি! পায়ের ধূলো নেবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধভাঙ্গা প্রবল বন্যাস্রোতের মত মায়ের নিভৃত অন্তরের সঞ্চিত পুঞ্জীভূত আবেগরাশি উচ্ছসিত হয়ে ভেঙ্গে পড়লো! চীৎকার করে উচ্চকণ্ঠে পাগলের মত বলতে লাগলেন—"না, না, আমি বিশ্বাস করিনা। আমার ছেলের মৃত্যু হবে না। যমের সাধ্য নাই আমার ছেলেকে স্পর্শ করে। তোর কোন ভয় নেই। তুই দীর্ঘজীবি হবি…।"

উপস্থিত সবাই দেখছে, সবাই শুনছে! আমি খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম—অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। এইরূপ একটি অবস্থার কথা আমি চিন্তা করিনি—তাহলে জেলারকে অনুরোধ করে মায়ের পায়ের ধূলো নিতে জেল সেলে কখনই আসতাম না। মায়ের এই আত্মহারা অবস্থা, দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবর্ষণ এবং ঐরূপ হৃদয় বিদারক আর্তনাদে জেলার ও উপস্থিত সকলেই অভিভূত হয়ে পড়লেন—আমি নিজেও অজান্তে কোথায় যেন ভেসে গেলাম! মাকে শান্ত করবার জন্য বললাম—"তোমার আশীর্বাদ পেয়েছি, আমার আর কোন ভয় নাই! তুমি এখন এসো মা।"

বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বার বার পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে মা গাড়িতে উঠলেন। মাকে নিয়ে গাড়িটি চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি জেলগেটে দাঁড়িয়ে দেখলাম—খানিক পরে ভারাক্রান্ত মনে হাজতে ফিরে এলাম।

জীবন নাটকের এই করুণ পালা সমাপ্ত করে হাজতে এসেই দেখি আমাদের পাহারায় রত সহানুভূতিশীল সেপাইরা ও দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরা বিষণ্ন ও চিন্তিত-ভাবে আমাদের আগমন প্রতীক্ষায় আছে। এখানে আবার কি ব্যাপার! গোপনে কেউ কেউ এসে বলল—"আমাদের খুব মন খারাপ। শুনতে পাচ্ছি আগামীকাল আপনাদের ফাঁসি হয়ে যাবে।" আবার একজন সেপাই বলল—"জেল-সুপার অসময়ে এসে জেলারের সঙ্গে রুদ্ধ কক্ষে বসে গোপনে পরামর্শ করেছেন। মনে হচ্ছে কালই আপনাদের ফাঁসি হবে।"

আর একজন বলল—"জেলার হঠাৎ গুদাম থেকে বড় বড় ডেকৃচি, বালতী প্রভৃতি বার করছেন। কি যেন একটা হবে! সবাই বলছে—কাল আপনাদের ফাঁসি হবে।"

বড় বড় ডেকৃচির সঙ্গে ফাঁসির কি যোগাযোগ থাকতে পারে তা বোধগম্য হ'ল না। তবে মনে হ'ল যা রটে তার কিছুটা বটে—কিন্তু কি তা ঠিক বুঝতে পারলাম না—বুঝবার চেষ্টাও করলাম না!

তারপর দিন সকাল আটটার সময় জেলার এসে বললেন—আমাদের চার নম্বর হাজত ঘরে যেতে হবে—সেখানে কোর্ট বসবে। নির্দেশ অনুযায়ী প্রহরী বেষ্টিত হয়ে আমরা সেখানে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সশস্ত্র পুলিস এসে চার নম্বর ওয়ার্ডটি ঘিরে পজিশন্ নিল।

জেলগেটে একটি ঘণ্টা বাজলো। ঘোষণা হ'ল—বড় সাহেব এসেছেন। আমরা ধরে নিলাম ট্রাইব্যুনালের বিচারকেরাও এসেছেন। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে বসবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পুলিসেরা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে একটু তফাত সৃষ্টির চেষ্টা করলো এবং আমাদের দিকে মুখ করে বিচারকদের জন্য তিনটি চেয়ার রেখে দিল। সন্ধিসর্ত অনুযায়ী যদিও আমাদের কারো মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা নয়, তবু সরকারপক্ষের এই তিনমাস ব্যাপী দীর্ঘ নিরবতায় আমাদের মনে নানা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। বৃটিশ treachery সম্বন্ধে আমাদের মনে সঠিক ধারণা ছিল—ক্লাইভ বংশধরেরা এতটুকু সুযোগেই যে পেছন থেকে ছুরি মারতে কসুর করবেন না, তা আমাদের জানা। কাজেই সরকার যে সন্ধিসর্ত মেনে নেবেই, তার স্থিরতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্ধিহান ছিলাম। ভাবছিলাম আমাদের তিনজনের তো প্রাণদণ্ড হবেই—তবে সুবোধ চৌধুরী, ফণী নন্দী, আনন্দ ও সহায়রামকে মৃত্যুদণ্ড হতে অব্যাহতি দেবে কিনা।

বিচারকেরা এলেন—চেয়ারে কেউ বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিঃ জে, ইউনী বৃহৎ জাজ্‌মেণ্টের প্রয়োজনীয় অংশটুকু পড়ে গেলেন। জানা গেল

আমাদের কাউকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি। এও কি সম্ভব? এতবড় সরকার বিরুদ্ধ যুব-অভ্যুত্থান ভারতে ইদানীং ঘটে নি—তবু সরকার কারো ফাঁসির হুকুম দিলেন না! সবই অবাস্তব মনে হচ্ছিল। জাজ্‌মেণ্ট শুনেও বুঝতে পারছিলাম না সত্যি শুনেছি নাকি ভুল করেছি। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম আমাদের কারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়নি। কিছুক্ষণের জন্য আমরা অবাক ও নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম! খানিক পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গণেশ বলল—"অনন্ত, এ যাত্রাও তবে বেঁচে গেলাম! বন্দেমাতরম্, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!" গণেশের শ্লোগানের অনুরণনে ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে—সমস্ত জেলখানা মুহূর্তে মুখরিত হয়ে উঠলো! কোন খবর জেলে বেশীক্ষণ চাপা থাকে না—'আমাদের কারো ফাঁসির হুকুম হয়নি'—এই সংবাদ কিছুক্ষণের মধ্যেই জেলে ছড়িয়ে পড়লো। এই খবর সবাই জানতে জানতেই বোধহয় আমরা ষ্টীমারে কর্ণফুলী নদীবক্ষে ভেসে চলেছি!

জাজ্‌মেণ্ট পাঠ করেই বিচারকেরা চলে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে জেলার, সার্জেণ্ট, হেড-ওয়ার্ডার তখনই খাওয়া দাওয়া সেরে নেবার জন্য আমাদের খুব তাড়া দিতে লাগলেন। ঐদিকে ঝন্ ঝন্ করে লোহার ডাণ্ডা-বেড়ি আমাদের হাজত কম্পাউণ্ডে স্তূপীকৃত হতে লাগলো। তিনজন কামার ডাণ্ডা-বেড়ি সংযুক্ত লোহার বালা রিবিট করে আমাদের পায়ে পরিয়ে দেবার জন্য হাতুড়ি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে উপস্থিত। কামাররা আমাদের লোহার মল পরিয়ে দিচ্ছে, আর জেলার ও জমাদার পরীক্ষা করে দেখছেন ঠিকমত রিবিট করা হ'ল কিনা।

আধ ঘণ্টারও কম সময়ে খাওয়া ও ডাণ্ডা-বেড়ি পরানোর কাজ শেষ হ'ল। সশস্ত্র পুলিস প্রহরায় আমাদের কয়েকটি ট্রাকে তোলা হ'ল এবং আমরা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাকগুলি সারিবদ্ধভাবে start দিল। এডিশন্যাল পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডব্লিউ, ভি, হিক্‌স তাঁর নিজের মোটরে আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন। পল্টনের পথ দিয়ে দু'পাশের পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমাদের কর্ন্‌ভয় নদী তীরে উপস্থিত হ'ল। সশস্ত্র পুলিস ঘেরা ছোট্ট জেটিতে সমুদ্রগামী ষ্টীমার—S. S. BADORO নোঙ্গর করা। ধারে কাছে কোন লোকজনের আসার উপায় নাই। আমরা এই ষ্টীমারে উঠলাম। এই জাহাজটি কেবল আমাদের জন্যই ভাড়া করা হয়েছিল। একশ'জন সশস্ত্র কনষ্টেবল নিয়ে হিক্‌স সাহেব আমাদের চার্জ নিলেন। সাহেবের আদেশে নোঙ্গর তোলা হ'ল ও বাঁশী বাজিয়ে বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে জাহাজটি

বরিশালের দিকে ছুটে চললো। সারারাত ষ্টীমার নোঙ্গর করে রাখার পর সকালে আবার যাত্রা সুরু হ'ল। দু'দিন পর বরিশালে পৌছলাম। বিশেষ সংকেতে বাঁশী বাজবার পর—পাশে বড় বড় চাকা সংযুক্ত ও নদীপথে চলার উপযুক্ত আর একটি জাহাজ এসে মাঝনদীতে আমাদের জাহাজের পাশে দাঁড়ালো। দু'টিকে এমনভাবে বাঁধা হ'ল—একটি থেকে অন্যটিতে যেতে যেন কোন অসুবিধা না হয়। এই দ্বিতীয় জাহাজটির নাম MYOLA.

Myola জাহাজ S. S. Badoro-র চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়। এইটিও chartered করা।

Myola-র গতিপথ দেখে মনে হ'ল সুন্দরবনের পাদদেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যশোর খুলনা অতিক্রম করে হুগলী নদীতে প্রবেশ করবে। ঠিক তাই হ'ল। দু'টি দিন ও দু'টি রাত্রি সুন্দর বনের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের সব ভুলিয়ে রাখলো! যতদূর চোখ যায় নদীর দু'ধারে ঘন নিবিড় অরণ্য মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। নদী কোথাও দিগন্ত বিস্তারী আবার কোথাও সঙ্কীর্ণ জলস্রোতের আকারে বয়ে চলেছে, জল কিন্তু কোথাও গভীর নয়। দু'দিকে বিস্তৃত দুর্ভেদ্য বনরাজী একটি মানুষ কোথাও চোখে পড়ে না—সেই ঘন বনে চরে বেড়ায় দলে দলে হরিণ, বানর ও বাঘ। নদীর জলে ভেসে বেড়ায় ও নদীতীরে রোদ পোহায় দলে দলে বিরাটকায় হিংস্র কুমীর। Myola থেকে আমরাও অনেকবার কুমীরের ঝাঁক দেখলাম। হিক্‌স সাহেব তো কেবল পুলিস-কর্তা নন—তিনি ইংরেজ—তাই শিকারী তো বটেই। জাহাজের ডেক থেকে তিনি কুমীরের ঝাঁকের উপর রাইফেল চালালেন। গুলী হয়ত লেগেছিল—কিন্তু কুমীরের কতখানি ক্ষতি হয়েছিল বোঝা গেল না। তারা বৃটিশ রাইফেলের গুলী ও ইংরেজ শিকারীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই যেন জলের তলায় ক্ষিপ্র গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। বানরের ঝাঁক লক্ষ্য করেও হিক্‌স সাহেব রাইফেল চালালেন। বানরেরাও শিকারীর "অব্যর্থ লক্ষ্যের" প্রশংসা করে মুচকি হেসে বহাল তবিয়তে উধাও হ'ল!

বানরের ঝাঁকে গুলী ছোঁড়াতে হিন্দুস্থানী সেপাইরা খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেছে—কেউ কেউ স্বগতোক্তি করেছে—"এ কাম আচ্ছা নহি!" আপন মনে নিশ্চিন্তে তৃণ ভোজনে বা রোদ পোহাতে ব্যস্ত হরিণের পাল বহুবার চোখে পড়লো। নদীপথে এইরূপ জাহাজ চলতে দেখতে তারা হয়ত অভ্যস্ত। আজ তারা কি করে জানবে যে এই জাহাজে শিকারী সাহেব হিক্‌স আছেন? সাহেবের হুকুমে জাহাজ থামানো হ'ল এবং জাহাজের ডেকের উপর থেকে

হরিণের ঝাঁক লক্ষ্য করে সাহেব গুলী ছুঁড়লেন। আহত হয়েছিল কিনা জানিনা তবে একটি হরিণও সেখানে দেখা গেল না। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পলকে ঝাঁক শুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে পড়ল।

হুগলী নদীতে প্রবেশ করলাম। আর কিছু সময়ের মধ্যেই যে কলকাতার কোন জেটিতে অবতরণ করবো তাতে সন্দেহ নেই। পোর্ট-পুলিসের এলাকায় নির্দিষ্ট কোন জেটিতে আমাদের নামবার ব্যবস্থা করা ছিল। নদীর সেইরূপ স্থানে Myola উপস্থিত হওয়ার পর বিশেষ ধরনের বাঁশি বাজিয়ে সঙ্কেত দেওয়া হ'ল। জল-পুলিসের একটি লঞ্চ্ আমাদের জাহাজের কাছে এলো এবং তাকে অনুসরণ করতে বলল। হিক্‌স সাহেব আমার কাছে এসে বিদায় নেবার ভঙ্গীতে কথা সুরু করলেন—'Well Singh, you are all saved, none of you has been condemned to death! Under the circumstances do you think Surjya Sen will now come out of his hole?"

হিক্‌সের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সমুচিত উত্তর দিলাম—"Well Hicks, you are greatly mistaken. Surjya Sen is not in the hole. He is in the heart of people—he is in the very centre of the town and every where. He is invincible!"

হিক্‌স চুপ করে গেলেন। জেটিতে নেমে দেখি—আমাদের যাদের সাজা হয়েছে—তাদের আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আর যাদের DTENU করেছে তাদের প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে আমাদের মধ্যে বিদায়ের পালা সাঙ্গ হ'ল। যাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম—মুক্তি পাওয়ার পর তাদের কারো কারো সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে।

আমাদের এই কয়জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়—(১) গণেশ ঘোষ (২) লোকনাথ বল (৩) অনন্ত সিং (৪) ফণী নন্দী (৫) আনন্দ গুপ্ত (৬) সুবোধ চৌধুরী (৭) সহায়রাম দাশ (৮) ফকির সেন (৯) লালমোহন সেন (১০) সুখেন্দু দস্তিদার (১১) সুবোধ রায় (১২) রণধীর দাশগুপ্ত।

আমার দাদা নন্দলাল সিংয়ের ২ বৎসর ও অনিলবন্ধু দাসের তিন বৎসর সাজা হয়।

যারা ছাড়া পেয়েছিল তাদের নাম যথাক্রমে—(১) নিতাই পদ ঘোষ, (২) শান্তিভূষণ নাগ (৩) অশ্বিনী চৌধুরী (৪) ননীগোপাল দেব (৫) মলিন-বিকাশ ঘোষ (৬) শ্রীপতি চৌধুরী (৭) মধুসূদন গুহ (৮) সুবোধ বিশ্বাস (৯) সুবোধ মিত্র (১০) সৌরীন্দ্র দত্ত চৌধুরী (১১) সুকুমার ভৌমিক

(১২) সুবোধ বল (১৩) হেরম্ব বল (১৪) বিজয় কুমার সেন (১৫) আশুতোষ ভট্টাচার্য্য (১৬) ধীরেন্দ্র দস্তিদার।

দু'তিন দিন পরে আলিপুর জেল থেকে আমাদের সবাইকে তিন চারজন করে বিভিন্ন জেলে আলাদা রাখা হ'ল। এর প্রায় ছ'মাস পরে নির্বাসন দণ্ড ভোগের জন্য আমাদের আন্দামানে পাঠানো হয়।

বৃটিশ প্রতিভূ লর্ড আরউইন্ "লিবারেল" পন্থায় ভারত শাসননীতি অনুসরণ করছিলেন। আমাদের ফাঁসি হ'ল না। শান্তি, সুনীতি ও হরিপদ ভট্টাচার্য্যেরও প্রাণদণ্ড মুকুব হ'ল। গান্ধী-আরউইন্ প্যাক্ট ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সবই ঐ উদার নীতির ফল।

বাংলার লাট লর্ড লিটনের অবসর গ্রহণের পর স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাক্সন যে উদারনীতি অনুসরণ করে বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন, সেই উদার নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই শান্তি, সুনীতি, হরিপদ ও আমাদের ফাঁসি না হওয়ার কারণ খুঁজে দেখতে হবে। লর্ড আরউইন্ ও বাংলার লাটবাহাদুর স্যার ষ্টানলী জ্যাক্সন সহানুভূতিশীল মনোভাব দেখিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদের প্রতিক্রিয়া বুঝতে চেয়েছিলেন। সাম্যবাদের গোলটেবিল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। আমাদের ফাঁসি না দিয়ে মহানুভবতার সুফলও সরকার পেলেন না—বাংলায় বিপ্লবীদের পিস্তল ও বোমার গর্জন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে লাগলো। ভারত জুড়ে আইন-অমান্য সংগ্রামের সাজ সাজ রব!

সরকার উদারনীতি বর্জন করতে বাধ্য হলেন। এবারে এলেন লর্ড উইলিংডন ও কুখ্যাত স্যার জন এণ্ডারসন। ভারত ও বাংলার সরকার চরম নিষ্পেষণ নীতি গ্রহণ করলেন। বিপ্লবীদের দমন করবার জন্য অর্ডিন্যান্স (ordinance) পাশ হ'ল—"attempt of murder" বা "intention of murder" প্রমাণিত হলেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া স্থির হ'ল—নতুন আইন পাশ করে রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামানে নির্বাসন ব্যবস্থা হ'ল।

বাংলার জেলে থাকাকালে বাংলার বিভিন্ন বৈপ্লবিক কার্যাবলীর সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌছতো। একবার খবর এলো চট্টগ্রামে একটি বড় রকমের সংঘর্ষ হয়ে গেছে। সেই ঘটনার বিবরণ দিয়েই যুব-বিদ্রোহ বইটির এই খণ্ড সমাপ্ত করবো।

টিনের ছাদ—মাটির দেওয়াল ছোট্ট বাড়ি। বিধবা মা সাবিত্রী দেবী একমাত্র পুত্র রামকৃষ্ণ ও কন্যাটিকে নিয়ে ধলঘাটের এই বাড়িটিতে থাকেন।

ছেলের বয়েস বছর পনেরো ষোল, মেয়েটি তার ছোট। এই বাড়িতেই যুবক অপূর্ব সেনকে নিয়ে মাস্টারদা ও নির্মলদা নিরাপদে আত্মগোপন করেছিলেন।

বৃটিশ সরকার মাস্টারদা ও নির্মলদার মাথার মূল্য দশ হাজার টাকা ঘোষণা করেছে—জীবন্ত বা মৃত তাদের ধরা চাই-ই। শত্রুর সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে মাস্টারদা ও নির্মলদা ধলঘাটের এই বাড়িতে দলের অন্যান্য বিশেষ বিশেষ কর্মীদের সঙ্গে নানা আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করতেন। ধলঘাটের এই বাড়িটিই দলের প্রধান ঘাঁটি। আমাদের আরো একটু জানা থাকা উচিত যে, একটা বাড়ি যখন কিছু সময়ের জন্যও প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন অন্যান্য নিরাপদ আস্তানাগুলিও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে কাজে লাগাবার অভিপ্রায়ে আগে থেকেই সাধ্যমত বন্দোবস্ত রাখতে হয়েছিল। সাংগঠনিক দিক থেকে ভেবেই এইরূপ ব্যবস্থার জন্য দলের প্রত্যেকটি সদস্য নিজ নিজ সাধ্যমত চেষ্টা করতো। সব সময়েই যে আমরা উপযুক্ত ও নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি তা' নয়। বিশেষ করে চট্টগ্রামে পুলিসী-জুলুম ও তাণ্ডব যখন অবাধে চলেছে, মাস্টারদাদের পক্ষে তখন সাহসী নিঃস্বার্থ ও তাঁদের সমর্থক গৃহস্বামী খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। তবু মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল তেমন তেমন দরদী, ত্যাগী ও সাহসী সমর্থকদের সহানুভূতি লাভ করেছে—চার বছর পুলিস ও মিলিটারীর রাজত্বকে উপেক্ষা করেও যাঁরা বিপ্লবীদের নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়েছেন, অকুণ্ঠচিত্তে অকৃপণহস্তে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন।

মাস্টারদাদের যাঁরা নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জানতেন, যে কোন সময়ে পুলিস বা মিলিটারীর সঙ্গে বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংঘর্ষের সম্ভাবনা এবং তা'তে তাঁদের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। বিপ্লবীদের আশ্রয়-দানের অপরাধে তাঁদেরও নানা প্রকার অকথ্য নির্যাতন ও কঠোর দণ্ডভোগের সম্মুখীন হতে হবে। সমস্ত জেনেও ঐসব স্বদেশপ্রেমিক গৃহস্বামী দ্বিধাহীন-চিত্তে মাস্টারদাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।

মাস্টারদাদের আশ্রয় দিয়ে শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীও চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি পুত্র-কন্যাসহ নিচের তলায় থাকতেন এবং ওপরতলা ভাড়া দিয়েছেন বলেই সকলকে বলতেন। মামলার সময় আত্মপক্ষ সমর্থনে এই সাফাই হয়ত বা কাজে লাগতে পারে; কিন্তু মামলা তো অনেক পরের কথা, তার আগে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানেই যে পুলিস ডাণ্ডার আঘাতে মাথা ফাটাবে নয়তো বুটের লাথিতে বুকের পাঁজর চুরমার করে দেবে! কিন্তু সে ভয়ে সাবিত্রী দেবীর হৃদয় কম্পিত নয়! তিনি সকলকে অভয় দিয়ে

বলতেন—"তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবে। আমি রাত জেগে পাহারা দেব। প্রস্তুত হবার অবসর না দিয়ে পুলিস হঠাৎ যাতে তোমাদের ধরতে না পারে তার জন্য আমি পাহারায় থাকবো—তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো, তেমন কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলে আমি তোমাদের আগেই সজাগ করে দেব।"

সত্যিই সাবিত্রী মাসীমা একটা বড় খাঁড়া হাতে রাত জেগে পাহারা দিতেন। তিনি ভাবতেন দায়িত্ব তাঁর—তিনি বেঁচে থাকতে তস্করের মত নিভৃত রজনীতে অতর্কিতে হানা দিয়ে শত্রুসৈন্য যদি গৃহে প্রবেশ করে তাঁর আশ্রয়ে বিপ্লবীদের গ্রেফতার করে, তবে সে'টা হবে তাঁর মৃত্যু তুল্য! সেই অক্ষমতা তাঁর জীবনের সাধনাকে—নিজের প্রাণ দিয়েও বিপ্লবীদের রক্ষা করা, ব্যর্থ করে দেবে। ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই প্রতি রাত্রে সাবিত্রী মাসীমা তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন—উন্মুক্ত খড়্গ হস্তে শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ থেকে বিপ্লবীদের বাঁচাবার জন্য অতন্দ্র প্রহরায় রাত কাটিয়েছেন!

যে সময়ের কথা বলছি তখন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আলিপুর জেলে ফাঁসির প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। প্রীতিলতা রামকৃষ্ণের আত্মীয়া সেজে জেলে বার-কয়েক তার সঙ্গে দেখা করেছে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতির চোখের দেখাই হয়েছে; জেলে কথা বলার সুযোগ থাকলেও পুলিস বেষ্টিত রামকৃষ্ণের সঙ্গে কোন বৈপ্লবিক আলোচনা হওয়া সম্ভব ছিল না। তবু পুলিসকে ধোঁকা দিয়ে আত্মীয়া সেজে জেল-সাক্ষাতের সুযোগ গ্রহণের মধ্যে একটা adventure করার ভাব আছে। এইরূপ adventure-ই ছিল সে যুগের বিপ্লবী ধর্ম। প্রীতির এই adventure-কে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে মাস্টারদাও অনুমোদন করেছিলেন। নিরাপত্তার দিকটা বিবেচনা করে কারো কারো মতে প্রীতির এই জেল-সাক্ষাৎ অনুচিত; কারণ, এতে পুলিসের কৃপায় প্রীতির নামও সন্দেহ-ভাজন বিপ্লবীদের তালিকাভুক্ত হবে। কিন্তু নিরাপত্তার যেমন প্রয়োজন, তেমনি আবার বিপ্লবী মনের গতিবেগ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টা ও তার প্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ—এই দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলাও বৈপ্লবিক কর্তব্যের অপরিহার্য অঙ্গ। শুধুমাত্র নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ভীরুতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, আর adventure করতে গিয়ে নিরাপত্তা বিপন্ন করা—দুই-ই বর্জনীয়। যাঁরা এই দুই বিপরীতমুখী ত্রুটির বৈপ্লবিক সামঞ্জস্য বা বাস্তব সমাধানের ক্ষমতা রাখেন, তাঁরাই সাফল্যের সোপান অতিক্রমে সমর্থ।

প্রীতিলতার মধ্যে adventure করার অদম্য স্পৃহা এবং সমপরিমাণেই দলের নিরাপত্তা বজায় রাখার একাগ্রতার সমন্বয় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

রামকৃষ্ণ মেধাবী ছাত্র—বৃত্তি পেয়ে পাশ করেছে। প্রীতিলতা চট্টগ্রাম কলেজে পড়ার সময় রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসে। রামকৃষ্ণ প্রীতিকে আমাদের বিপ্লবীদলে নেওয়ার জন্য কথাবার্তা বলেছে এবং প্রীতিও তখন থেকেই নিজেকে আমাদের সংগঠনের একজন সভ্যা বলেই মনে করেছে। আমার যতদূর জানা আছে, আমরা এবং মাস্টারদাও আমাদের সংগঠনে মা-কালীর সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেরা দীক্ষা নেওয়া বা অপরকে দীক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ একেবারে তুলে দিয়েছিলাম। প্রীতিও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী—সেও বৃত্তি পেয়ে পাশ করেছে। ভাল ছাত্রী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মোহে জীবন অতিবাহিত না করে প্রীতি রামকৃষ্ণের প্রভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। রামকৃষ্ণের বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্র আদর্শ প্রীতির মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাই জেলে সাক্ষাতের সময় বৈপ্লবিক আলোচনা বা কথাবার্তার সুযোগ না থাকলেও সেই পরিবেশে কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে পুলিস প্রহরীবেষ্টিত রামকৃষ্ণের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাও প্রীতিকে প্রেরণা যুগিয়েছে, স্বাধীনতার মরণ-পণ সংগ্রামে এগিয়ে যাবার সাহস দিয়েছে—দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ করে তুলেছে। বৃটিশ কারাগারে ফাঁসির প্রতীক্ষায় নির্ভীক সৈনিক রামকৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে প্রীতির যে গভীর স্বদেশ প্রেমের উপলব্ধি হয়েছিল, সেইটিই বাস্তবে বৈপ্লবিক পদক্ষেপের প্রথম দীক্ষা।

ফাঁসির প্রতীক্ষায় রামকৃষ্ণ যেভাবে নিঃসঙ্গ দিনগুলি অতিবাহিত করছিল, সেই অনুভূতিই মাস্টারদাকে রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতির জেল-সাক্ষাৎ অনুমোদনে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। রামকৃষ্ণ ও কালীপদ, তারিণী মুখার্জীর হত্যা মামলায় দণ্ডিত হয়েছে, স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল রামকৃষ্ণের প্রাণদণ্ড এবং কালীপদর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়েছে। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টেও আপীলের দরখাস্ত করা হয়েছে। চট্টগ্রামের আদালতে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে এই সময় আমাদের বিচার চলছে। অনেক আগে থেকেই আমাদের সঙ্গে মাস্টারদার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, জেল থেকে আমরা আমাদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক প্ল্যানের খসড়া মাস্টারদার কাছে পাঠিয়েছিলাম।

সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে মাস্টারদা ও নির্মলদা এই সমস্ত বিভিন্ন প্ল্যান ও সাংগঠনিক কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করতেন। এই আলোচনাকালে একদিন

প্রীতিলতা ধলঘাটের এই বাড়িতে মাস্টারদা ও নির্মলদার সঙ্গে পরামর্শ করতে যায়। সে রামকৃষ্ণের সংবাদ মাস্টারদাকে দিয়েছে। ভবিষ্যতে কি করা যায় এবং অবিলম্বে রামকৃষ্ণের ফাঁসির প্রতিশোধ কিভাবে নেওয়া সম্ভব, তারও কর্মসূচী নিয়ে সেদিন বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছিল। সকলেরই মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত—রামকৃষ্ণের ফাঁসি হবে। কিছু একটা করতেই হবে—ফাঁসি রোধ করা না গেলেও অন্তত ফাঁসির প্রতিশোধ তো নিতেই হবে! ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদী শত্রুর সঙ্গে মীমাংসা নয়—রক্তের বদলে রক্ত চাই। নিধনযজ্ঞের পরিকল্পনা ও নানারকম নতুন প্ল্যান নিয়ে মাস্টারদা, নির্মলদা, অপূর্ব ও প্রীতি আলোচনায় ব্যস্ত।

তখন রাত প্রায় দশটা। রোজ তারা নিচে খেতে যায়। দোতলায় ওঠার জন্য ঘরের বাইরে মাটির সিঁড়ি। এই সিঁড়িটি ব্যবহার না করে মাস্টারদারা নিচের ঘরের ভেতর থেকে একটা মইয়ের সাহায্যে ওঠা-নামা করতেন। খাওয়ার সময় হয়েছে, তাঁরা নিচে যাওয়ার উপক্রম করছেন, এমন সময় মাসীমা মই বেয়ে ওপরে এসে চাপাকণ্ঠে বললেন—"পুলিস বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। প্রস্তুত হও—এখনই হয়ত অতর্কিতে আক্রমণ করবে।"

সবার সঙ্গেই রিভলভার আছে। অপূর্ব সেন (ভোলা), নির্মলদা, প্রীতি ও মাস্টারদা নিমেষে রিভলভারের ট্রিগারে আঙুল রেখে প্রস্তুত হলেন। প্রতিটি মুহূর্ত অতি সঙ্কটময়—যে কোন সময়ে গুলী ছুটবে। সঙ্কট-মুহূর্তে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে না পারার অর্থই হ'ল অক্ষমতা। স্বয়ং মাস্টারদা ও নির্মলদা সেখানে উপস্থিত। তাঁরা দু'জনেই পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে প্রীতির কর্তব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মাস্টারদা প্রীতিকে বললেন—"রাণী (প্রীতির ডাক নাম), তুমি রিভলভারটি দিয়ে আর একটুও দেরি না করে নিচে চলে যাও। সাবিত্রী মাসীমাদের আত্মীয়া বলে নিজের পরিচয় দেবে। তোমায় বাঁচতে হবে। ভবিষ্যতে অনেক কাজ।" প্রীতির প্রতি মাস্টারদার স্নেহভরা কঠোর আদেশ—"বিনা অস্ত্রে নিচে যাও—বাঁচতে হবে।" কি কঠোর ও নির্মম আদেশ! তিনজন সাথী যুদ্ধ করে প্রাণ দেবে, আর প্রীতিকে নিচে যেতে হবে, বাঁচতে হবে! প্রীতি মাস্টারদাকে অনুরোধ করলো—"জীবনের এই সন্ধিক্ষণে আমাকেও আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে মরবার সুযোগ দিন!" সময় এত সংক্ষিপ্ত যে, কোন আলোচনা বা কথা বলার অবকাশ ছিল না মাস্টারদা প্রীতির হাত থেকে রিভলভারটি একরকম 'কেড়েই' নিলেন এবং সস্নেহে বললেন—"না বোন, এত sentimental হলে চলবে না। তোমায়

বাঁচতেই হবে—নিচে যাও।" মাস্টারদা একরকম জোর করেই প্রীতিকে মই দিয়ে নেমে যেতে সেদিকে ঠেলে দিলেন। প্রীতি একেবারে নির্বাক! সজল নয়নে সবার কাছে বিদায় নিয়ে সে মইয়ের দিকে পা বাড়ালো। নির্মলদা বললেন—"যুদ্ধ-প্রাঙ্গনে রাগ বা অভিমান শোভা পায় না বোন! একসঙ্গে মরার আনন্দ থেকেও অধিক শত্রুক্ষয় করাই আমাদের লক্ষ্য। ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর ভার তোমার ওপর রইল।"—"আমাকে আশীর্বাদ করুন, শক্তি দিন!"—এই বলে মইয়ের সাহায্যে প্রীতি নিচে নেমে গেল। এইসব পড়তে যত সময় লাগছে তার অনেক আগেই—মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে, বিদায়ের এই করুণ পালা শেষ হ'ল!

মাস্টারদারা তিনজন ওপর থেকে বিভিন্ন ছিদ্র পথে সৈন্যদের তৎপরতা লক্ষ্য করছিলেন। নির্মলদা একবার মাস্টারদাকে বললেন, অপূর্বকে নিয়ে তিনিও যেন চলে যেতে চেষ্টা করেন—নির্মলদা একাই ওখানে position নিয়ে Rear Guard action করবেন। কিন্তু তাঁর কথা মুখেই থেকে গেল—বাইরে সিঁড়ির ওপর বুটের মচ্‌মচ্‌ ক্ষীণ আওয়াজ শোনা গেল—কেউ খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ওপরে উঠছে। নির্মলদা নিঃশ্বাস বন্ধ করে রিভলভার হাতে ট্রিগারে আঙুল রেখে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। মিলিটারী ইউনিফর্ম পরা অতি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় একজন ইংরেজ অফিসার খোলা রিভলভার হাতে একা নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন। এ একেবারে নিয়মবিরুদ্ধ! রীতি অনুযায়ী ভারতীয় সৈন্যদের আগে পাঠিয়ে তারপর ইংরেজ অফিসারের বিপ্লবীদের সম্মুখীন হন। এই সাধারণ পদ্ধতির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম করে ইংরেজ ক্যাপ্‌টেনের একাকী বিপ্লবীদের গৃহে প্রবেশের দুঃসাহসিকতার উৎস কোথায়?

ধল্‌ঘাটে একটা সৈন্য-শিবির ছিল। ক্যাপ্‌টেন কেমারন সাবিত্রী দেবীর গৃহে মাস্টারদা ও নির্মলদার উপস্থিতির বিশেষ সংবাদ পান। তাঁর ইচ্ছে বহু সহস্র টাকা পুরস্কার তিনি একাই হস্তগত করবেন। এই আশায় তিনি ভেবেছিলেন যদি একবার অতর্কিতে গৃহে প্রবেশ করতে পারেন, তবে উদ্যত রিভলভার হাতে তিনি সবাইকে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াতে বাধ্য করবেন। খ্যাতির আশা, টাকার লোভ ক্যাপ্‌টেন কেমারনকে পাগল করে তুলেছিল—তিনি একাই সবাইকে গ্রেফতার করবেন! ঘরে ঢোকার জন্য সিঁড়ির শেষ ধাপে যেই পা ফেলেছেন তক্ষুণি গুড়ুম্‌ শব্দে '৪৫০ ব্যাসের ওয়েব্‌লী রিভলভার গর্জন করে উঠলো। ক্যাপ্‌টেনের হাতের রিভলভার হাতেই রইল। নির্মলদার রিভলভারের অব্যর্থ দু'টি গুলী ক্যাপ্‌টেনের বক্ষ ভেদ করলো! ক্যাপ্‌টেন কেমারন সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়লেন।

গুলীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই নিচ থেকে সৈন্যেরা ফায়ার সুরু করেছে। তারা কেমারনের গুলীবিদ্ধ ভূ-লুণ্ঠিত দেহ বোধহয় লক্ষ্য করেছে। কিন্তু সাহস করে কেউ সিঁড়ির নিচে ক্যাপ্‌টেনকে দেখতে আসতে পারছে না। কারণ, এখন দুই পক্ষেই গুলী বিনিময় চলছে। মাস্টারদা, অপূর্ব ও নির্মলদা গুলী চালাচ্ছেন। বোঁ করে রাইফেলের একটি গুলী এসে নির্মলদাকে আহত করলো। নির্মলদা খুব জোর করে বললেন—"মাস্টারদা, আমি এখনও বলছি, আপনারা সৈন্য-বেষ্টনী ভেদ করে পালাবার শেষ চেষ্টা করে দেখুন। এখনও হয়ত সফল হবেন। আমি এখান থেকে গুলী চালিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করি, আর আপনারা বাড়ির পেছন দিয়ে পালাবার চেষ্টা করুন। কথা শুনুন—একটুও দেরি করবেন না। এক্ষুণি চলে যান।" মাস্টারদা নিমেষে কি যেন ভাবলেন। তারপর নির্মলদার কাছে শেষ বিদায় নিয়ে অপূর্বকে সঙ্গে করে নিচে নেমে এলেন। নির্মলদা তখনও সমানে গুলী ছুঁড়ছেন। আবার হঠাৎ একটি গুলী নির্মলদাকে আঘাত করলো। নির্মলদা উচ্চকণ্ঠে বললেন—"বিদায়! রাণী, অপূর্ব, বিদায়—তোমরা মাস্টারদাকে দেখবে—বিপ্লবের আগুন চিরপ্রজ্বলিত রাখবে।"

মাস্টারদা ও অপূর্বকে অক্ষত দেহে নিচে নামতে দেখে প্রীতি খুব খুশি। কিন্তু কই? নির্মলদা কেন তাঁদের সঙ্গে নেই? ঐ যে নির্মলদার কণ্ঠস্বর—"বিদায়!" প্রীতির কোমল মন হুহু করে কেঁদে উঠল। রণ-প্রাঙ্গণে চোখের জলের স্থান নেই। তবু চোখে জল এসেছে! মাস্টরদা প্রীতিকে স্থির থাকতে বললেন। তারপর অপূর্ব ও তিনি প্রীতির কাছে বিদায় চাইলেন। এবারে প্রীতি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলো না। সে মাস্টারদার পায়ে ধরে কেঁদে বললো—"আমি বাঁচতে চাই না। আমি আপনাদের সঙ্গে যাবো। আমাকে ফেলে যাবেন না। পুলিস আমাকে রেহাই দেবে না। আমি আপনাদের সঙ্গে যাবই।" প্রীতির শেষ ক'টি কথা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত হ'ল। সময় বড়ই সংক্ষিপ্ত—মুহূর্তগুলি বিদ্যুতের মতই চঞ্চল, বিলম্বের অবকাশ নেই। অপূর্ব আগে পথ দেখিয়ে চলেছে, তার পেছনে প্রীতি ও সর্বশেষে মাস্টারদা অতি সন্তর্পণে বাড়ির পেছনে দিয়ে পালাবার সুযোগ নিতে চেষ্টা করলেন।

গাছের তলায় বিক্ষিপ্ত শুকনো পাতা পদদলিত হয়ে বিপ্লবীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলো। শুকনো পাতা মাড়িয়ে যাবার শব্দে ঐদিকের প্রহরী-দল বাড়ি থেকে কেউ পালাতে চেষ্টা করছে অনুমান করে সচকিত হ'ল। অন্ধকার রাত্রি—গাছের ছায়ায় আরও নিবিড় আঁধার। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে

কিছুই দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল না। নইলে, এত কাছের টার্গেট তাদের শিক্ষিত হাতের রাইফেলের অব্যর্থ গুলীতে নিশ্চয়ই বিদীর্ণ হ'ত। অন্ধকারে বিপ্লবীদের অবস্থানের ঠিকানা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে না পারলেও সৈন্যেরা শব্দ লক্ষ্য করেই মাস্টারদা, প্রীতি ও অপূর্বের দিকে গুলী চালায়। একটি গুলী এসে ভোলার (অপূর্বের ডাক নাম) ঠিক বক্ষস্থলে আঘাত করে। ভোলার মুখ থেকে একটি শব্দও বার হ'ল না—চোখের নিমেষে পথপ্রদর্শক ভোলা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তখনও সমানে গুলী চলছে। মাস্টারদা ও প্রীতি অন্ধকারে লক্ষ্যবস্তুর সঠিক অবস্থান না বুঝে ফায়ার করা সমীচীন মনে করেন নি। তা'ছাড়া গুলী ছুঁড়ে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে শত্রুসৈন্যের নির্ভুল টার্গেট হওয়ার সুযোগ তাঁরা দিলেন না। আশ্চর্য! শোঁ শোঁ শব্দে কানের পাশ দিয়ে মাথার ওপর দিয়ে রাইফেলের গুলী চলে গেল—প্রীতি বা মাস্টারদাকে একটিও স্পর্শ করলো না। শত্রুপক্ষ তখনও জানতে পারে নি তাদের গুলীতে কেউ হতাহত হয়েছে কিনা। বাড়ির পেছনে এই পথের দিক হ'তে বিপ্লবীদের কোন পাল্টা জবাব না পেয়ে শত্রুপক্ষ ধরেই নিল 'ভুল হয়েছে—তারা আন্দাজে ফায়ার করেছে।'

নির্মলদাকে ছেড়ে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেড় বা দু' মিনিটের বেশি সময় পার হয় নি। দোতলা থেকে নির্মলদা আহত অবস্থায় তখনও ফায়ার করছিলেন। সৈন্যেরাও সেইদিক লক্ষ্য করেই রাইফেল চালাচ্ছিল। মাস্টারদা ও প্রীতি ইতিমধ্যে অতি সন্তর্পণে মিলিটারী বেষ্টনী অতিক্রম করলেন। —কেউ দেখলো না, কেউ বুঝলো না। বৃটিশসৈন্য সজাগ হয়ে পাহারা দিচ্ছে আর দোতলা গৃহের দিকে লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে ফায়ার করছে। দোতলার ঘর থেকে আর পাল্টা জবাব আসছে না—সব নিস্তব্ধ। বাড়ির চারিদিকে প্রহরারত সৈন্যেরাই কেবল একটু শব্দ শুনলেই সেইদিক লক্ষ্য করে আন্দাজে ফায়ার করছে।

মাস্টারদা ও প্রীতি সেই অন্ধকার রাত্রে খানা-ডোবা, মাঠ, নর্দমা, কাদা, জঙ্গল ভেঙে পথ করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। পথ-চলাকালীন ক্রমেই রাইফেল ও রিভলভারের গর্জন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। ফেলে আসা ধল্‌ঘাট রণপ্রাঙ্গণ কি অবস্থায় আছে, সেটা এখন তাঁদের অনুমানের বাইরে। মনে অনেক ভাবনা ভিড় করে আছে—অপূর্ব কি সত্যিই চিরতরে বিদায় নিয়েছে, নাকি এখনও তার প্রাণ আছে?—এমন তো অনেক দেখা গেছে যাকে মৃত সাব্যস্ত করা হয়েছে সেও মৃত্যুমুখ হতে ফিরে এসেছে!—নির্মলদার

গুলী লেগেছে; তবু তো তিনি শেষ পর্যন্ত ফায়ার করা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন! তারপর গুলীর শব্দ তাঁরা আর পাননি বটে, কিন্তু নির্মলদা বেঁচে নেই—এই সিদ্ধান্তেও পৌছনো যায় না; সাবিত্রী মাসীমারাই বা কি অবস্থায় আছেন? আশা-নিরাশার দোলায় ভারাক্রান্ত মনে মাস্টারদারা পথ অতিক্রম করছেন। মাস্টারদার এখন প্রথম কাজ প্রীতিকে নিয়ে রাত ভোর হবার আগেই কোন নিরাপদ আশ্রয়ে উপস্থিত হওয়া।

ধল্‌ঘাটের এই বাড়ি থেকে জৈষ্টপুরা গ্রাম প্রায় মাইল চারেক হবে। সেখানে একটি খুব নিরাপদ আশ্রয় আছে। মাস্টারদারা এই নিরাপদ ঘাটির নাম দিয়েছিলেন—"কুটির"। টিলা বললে ভুল হবে, তবে বেশ উঁচু জমির ওপর একখানা ছোট্ট বাড়ি। এই বাড়ির কর্তা সুশীল দের বন্ধু এবং আমাদের প্রতি তাঁর খুব সহানুভূতি ছিল। তিনি সেই গ্রামে কবিরাজী চিকিৎসা করতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি কবিরাজ অশ্বিনীবাবু বলেই গ্রামে পরিচিত ছিলেন। অশ্বিনীবাবুর স্ত্রীর প্রকৃত নামটি আজ আর আমার মনে পড়ছে না, তবে মনে আছে মাস্টারদা তাঁর নাম দিয়েছিলেন—'Lady Mackbeth'। কেন Lady Mackbeth নাম দিয়েছিলেন মাস্টারদা, তা' সঠিক বলতে পারবো না। তবে কালী দে, সুশীল দে ও শান্তি চক্রবর্তীর কাছে আন্দামান জেলে থাকাকালীন যা শুনেছি, তা থেকে আমার মনে হয়েছিল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তাই এই নামকরণের কারণ। অশ্বিনীবাবুর স্ত্রী ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের নারী—কোন বাধাই তাঁর কাছে বড় মনে হ'ত না, যা' ভাবতেন তা' দৃঢ়তার সঙ্গেই সম্পন্ন করতেন। তাঁর হুকুমে বা কথায় বাড়ির সকলকে চলতে হ'ত। সকলের ভাল-মন্দ দেখা, খাওয়ানো-দাওয়ানো, বিপ্লবীদের নিরাপদে নিজ গৃহে আশ্রয় দেওয়া—তাঁর মতে, এই তো কাজ! সেই সময় চট্টগ্রামের প্রতিটি গ্রাম মিলিটারীতে ছেয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পূর্বের ধল্‌ঘাট-খণ্ড-যুদ্ধের সংবাদ এখনও পর্যন্ত জৈষ্টপুরায় পৌছয় নি। আগামীকাল থেকে শত্রুর কতখানি উৎপাত এই গ্রামেও সুরু হবে, তা' কল্পনারও অতীত। মাস্টারদার মত বিপ্লবী নেতাকে আশ্রয়দান যে কি দুরূহ কাজ এবং যাঁরা এই ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতেন তাঁদের সাহস, স্বার্থত্যাগ ও দায়িত্ববোধ যে কতখানি গভীর, তা' সাধারণের পক্ষে ভাবা সহজ নয়। এতবড় ঝুঁকি মাথায় তুলে নেওয়ার দায়িত্ববোধ ও চিত্তের দৃঢ়তার পরিচয় পেয়েছিলেন বলেই মাস্টারদা হয়ত এই রমণীকে Lady Mackbeth বলতেন —অতি শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলতেন। Lady Mackbeth-এর বিশেষ

গুণের ·দিকটাই যে তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল, তা'তে সন্দেহ নেই।

রাত প্রায় ছু'টোর সময় প্রীতি ও মাস্টারদা জৈষ্টপুরার "কুটিরে" এসে পৌছলেন। সেই বাড়িতে বোধহয় তখন সুশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুরীও ছিলেন। প্রীতির পরিধানে পুরুষের পোশাক—ধুতি, সার্ট এবং রুমাল দিয়ে চুলের খোঁপা ঢাকা। মহেন্দ্র ও সুশীল অত রাত্রে মলিন বেশে শ্রান্ত-ক্লান্ত মাস্টারদাও প্রীতিকে দেখে চমকে উঠলেন—নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটেছে! গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রী তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গৃহকর্ত্রীর চোখে প্রীতির ছদ্মবেশ ধরা পড়লো। কিন্তু তাই বলে প্রীতির প্রকৃত নাম-ধাম জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মাস্টারদা সুশীল ও মহেন্দ্রর সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে পরামর্শ করলেন। স্থির হ'ল, শত্রুর আগমন-বার্তা আগে থেকে জানবার জন্য "কুটিরের" চারিপাশে নিজেদের প্রহরী মোতায়েন করা হবে এবং ধল্‌ঘাট-যুদ্ধের শেষ পরিণতি কি হ'ল, যতদূর সম্ভব তার খবর সংগ্রহ করতে হবে।

সুশীল ও মহেন্দ্র ভোর হতেই রাতের কর্মসূচী কাজে পরিণত করতে স্ব স্ব স্থানে চলে গেল। মাস্টারদা প্রীতিকে বললেন—"দেখ প্রীতি, আমার মনে হয় পুলিস যদি জানতেও পারে যে, কোন একজন মেয়ে সঙ্গে ছিল, তা'হলেও তুমিই যে ছিলে সেই সন্দেহ তারা সহজে করতে পারবে না। তোমার নাম-ধাম-পরিচয়—কিছুই সাবিত্রী মাসীমারা জানেন না। কাজেই খুব প্রতিকূল অবস্থা ধরে নিলেও তোমার পরিচয় জানা পুলিসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তুমি ভাল ছাত্রী—বৃত্তি পেয়ে ভালভাবেই পাশ করেছ, তোমাকে সন্দেহ করবে না। তুমি শহরে যাও—যত শীঘ্র সম্ভব তোমাকে শহরে হাজির হতে হবে যাতে ধল্‌ঘাটের ঘটনার সঙ্গে তোমার অনুপস্থিতিকে জড়াতে না পারে। তুমি চেষ্টা করে নন্দনকানন উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নাও। তারপর সময়মত আমি তোমাকে ডেকে পাঠাবো।" দুঃখ বেদনা ও অভিমানে প্রীতির দু'চোখ ছাপিয়ে জল এলো। মাস্টারদার ঐরূপ সিদ্ধান্তের সঙ্গে সে একমত হতে পারে নি। মাস্টারদাকে প্রীতি আবার জানালো সে বাড়ি ফিরতে চায় না।

ধল্‌ঘাটের খণ্ডযুদ্ধের সংবাদ নিয়ে সুশীল ও মহেন্দ্র ফিরে এলো—আত্মরক্ষার সুবন্দোবস্ত করে, নিরাপদ স্থান হতে সারারাত মিলিটারীরা পাহারা দিয়েছে; খুব ভোরে ম্যাজিস্ট্রেট ও একটা লুইস-গান প্লেটুন নিয়ে মিলিটারীর উচ্চপদস্থ

অফিসার এসেছিলেন। চারটি লুইস-গান বাড়ির দিকে মুখ করে বসিয়ে হুকুম হয়েছিল—'ফায়ার!' ওপরের ঘর লক্ষ্য করে তারা অজস্র গুলী ছুটিয়েছিল। গুলীর ঘায়ে ঘরের ওপরের দিকের একটা কোণ উড়ে গেছে এবং জানালা ও দরজা দিয়ে শত শত গুলী ঘরের ভেতর দেওয়ালে ও মেঝেতে এসে লেগেছিল। কিছুক্ষণ গুলী বর্ষণের পর মুখে চোঙা লাগিয়ে আবার হুকুম জারি হয়েছিল—'যারা ঘরে আছ, মাথার ওপর হাত তুলে একে একে বাইরে এস। ভয় নেই।'

মাসীমা, ছেলে রামকৃষ্ণ ও ছোট বোন স্নেহলতা আদেশ মান্য করে বাইরে আসে। ক্রুদ্ধ সাহেবের দল ঘরে আর কে কে আছে, কারা ছিল; কোথায় গেল, ইত্যাদি বহু প্রশ্ন করতে থাকে তাদের। কিন্তু এই সব প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?—তারা সাধারণ গেরস্ত লোক, ওপরতলা ভাড়া দিয়েছিল মাত্র, ভাড়াটেদের কোন সংবাদই রাখতো না; এমন বিপদে পড়বে জানলে কখনই তাদের মত লোককে ভাড়া দিত না! পুলিস খানিকক্ষণ গালি-গালাজ করে ধমকে ভয় দেখালো—'সত্যি বললে নিষ্কৃতি পাবে, নইলে কপালে দুঃখ আছে।' যমের বাড়ি পাঠাবে বলে রামকৃষ্ণদের শাসিয়েছিল। কিন্তু মাসীমারা সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে গেলেন—অতি নিরীহ লোক তাঁরা, তাঁদের জানা সম্ভব হয়নি যে ওই সব ভয়ঙ্কর লোকেরা তাঁদের বাড়ি ভাড়া নিয়েছে।

এই সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন অপর একদল সৈন্য নিয়ে কয়েকজন মিলিটারী অফিসার ওপরতলায় উঠেছিলেন। তাঁরা হয়ত আশা করেছিলেন, হত বা আহত অবস্থায় সকলকেই সেখানে পাবেন। কিন্তু তাঁরা নিরাশ হলেন। রাইফেলের গুলীতে শতছিদ্র নির্মলদার মৃতদেহটাই কেবল তাঁরা দেখতে পান। এতে অফিসারেরা সকলেই তো হতভম্ব! তাঁদের কাছে বিশেষ সংবাদ ছিল যে, মাস্টারদা এবং নির্মলদা ওপরেই আছেন উপরন্তু আরো দু'জন যুবকও তাঁদের সঙ্গে আছে। মিলিটারী বেড়াজাল ভেদ করে অন্যেরা কি করে পালালো? সমস্ত বাড়ি তচ্‌নচ্‌ করেও আর কাউকে পাওয়া গেল না। কেবল সিঁড়ির নিচে থেকে তাঁরা ক্যাপে্টেন কেমারনের মৃতদেহটি উদ্ধার করেছিলেন। তারপর বাড়ির পেছনে গিয়ে দেখতে পেলেন ভোলা (অপূর্ব সেন) মুষ্টিবদ্ধ রিভলভার হাতে চির-নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন। ভোলার মৃতদেহ পেয়ে তাঁরা ধরেই নিলেন যে, অপর দু'জন বিপ্লবীও সেই পথেই পালিয়েছে। সেই পথে আরো অনেক দূর পর্যন্ত অনুসরণ করে হতাশ হয়ে তাঁরা বুঝেছিলেন যে, আপাতত দু'জন বিপ্লবীর মৃতদেহ নিয়েই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

নিঃশ্বাস রোধ করে মাস্টারদা সংবাদ শুনছিলেন। শত নিরাশার মধ্যেও

তিনি আশা করেছিলেন, হয়ত গুরুতর আহত অবস্থায় নির্মলদা ও অপূর্বকে বন্দী করে হাসপাতালে নিয়েছে। কিন্তু একি হ'ল! মাস্টারদার দক্ষিণহস্ত নির্মলদাও নেই! প্রীতি কিন্তু এই সংবাদে মোটেই বিচলিত হ'ল না—এইরূপ নিদারুণ সংবাদের জন্য সে প্রস্তুত ছিল। তবু শত প্রস্তুতি সত্ত্বেও মনের অগোচরে নির্মলদা ও অপূর্বকে ফিরে পাবার শেষ আশাটুকুও নিভে যাওয়াতে প্রীতি নিজেকে সংবরণ করতে পারে নি—ছেলেমানুষের মত কেঁদেছে। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে শান্ত করার পর তার অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ দু'টি জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠলো। প্রীতি নিমেষে সিদ্ধান্ত নিল—যুব-বিদ্রোহের যে আগুন প্রজ্বলিত হয়েছে তাকে কোনমতেই নিভতে দেওয়া হবে না। প্রীতি বদ্ধপরিকর—সে বাড়ি ফিরে যাবে না, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে প্রাণ দিয়ে সে প্রতিশোধ নেবেই।

মাস্টারদা বেশ উপলব্ধি করছিলেন যে, প্রীতির অন্তরে বিপ্লবের প্রবল ঝড় বইছে। সে যেন সকলের চাইতে বেশি desparate। Desparate না হলে বা মরবার জন্য মানসিক প্রস্তুতির অভাব থাকলে সফল আক্রমণ চালানো যে কখনই সম্ভব হয় না, তা' মাস্টারদা জানতেন। প্রীতির বর্তমান ভাব লক্ষ্য করে মাস্টারদা তাঁর সুদূর প্রসারী চিন্তায় অদূর ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার যে পরিকল্পনা মানসচক্ষে দেখেছেন তারই সফল নায়িকারূপে প্রীতিকে কল্পনা করলেন।

প্রীতি প্রথম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে ইংরেজ কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে ফাঁসির প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণের সামনে। তারপর ধল্‌ঘাটের খণ্ডযুদ্ধে তারই পাশে রাইফেলের গুলী অপূর্বের বক্ষ ভেদ করেছে; তারই চোখের সামনে নির্মলদার অব্যর্থ গুলী ক্যাপ্‌টেন কেমারনের স্পর্ধার সমুচিত জবাব দিয়েছে। তারপর অজস্র গুলী উপেক্ষা করে প্রীতি মাস্টারদার সঙ্গে মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করে অক্ষত দেহে জৈষ্টপুরার "কুটিরের" আশ্রয়ে এসেছে। ধল্‌ঘাটের যুদ্ধেই হ'ল প্রীতির সত্যিকারের দীক্ষা। বাংলার তরুণী প্রীতিলতার বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা এবং শিক্ষা তরবারি ও রুধিরধারার মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ভবানী পাঠক দেবী-চৌধুরাণীকে শিক্ষা দিয়ে পাকা সোনা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু প্রীতিলতার শিক্ষা কবি বা কথাশিল্পীর কল্পনা নয়—স্বয়ং মাস্টারদা ও নির্মলদার সঙ্গে ফায়ারিং লাইনে থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্র্যাক্‌টিকেল শিক্ষার পূর্ণতা লাভ।

ধল্‌ঘাট রণ-প্রাঙ্গণে নির্মলদা নিজের বুকের রক্তে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের

ক'টি পাতা লিখে গেছেন—নিজ প্রাণ দিয়ে এমনভাবে ব্যূহদ্বার রক্ষা করেছেন যাতে দলপতি ও আগামী দিনের নায়িকা অক্ষত দেহে শত্রুর বেড়াজাল ভেঙে মুক্তি পেতে সমর্থ হন।

নির্মলদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মাস্টারদা একবার মাত্র স্বগতোক্তি করলেন—"আমার ডান হাত ভেঙে গেল! নির্মলবাবুকে যখন আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখনই তাঁকে হারালাম!" তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"বিপ্লবের রথচক্র দলিত মথিত করে দুর্বার গতিতে সম্মুখ পানে চলবে। বিজয়নিনাদে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর সমাধি রচিত হবে—আমাদের উন্মুক্ত কৃপাণ আর কটিবদ্ধ হবে না। দ্বিগুণ উৎসাহে পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে আমাদের।"

মাস্টারদার কথার শেষেও সকলেই চুপ করে রইল। নিস্তব্ধ ঘরের পরিবেশ আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। মাস্টারদা প্রীতির দিকে তাকিয়ে বললেন—

"তুমি বোন আজই বাড়ি ফিরে যাও। স্কুলে কাজ নাও। তোমার অন্তরের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা আমি দেখতে পেয়েছি। তোমার মত desparate মরণ-পাগল কর্মীই আমি চাই। Desparate না হলে মরণ-পণ যুদ্ধ করা যায় না। তোমাকে বিরাট দায়িত্ব নিতে হবে। ১৮ই এপ্রিল আমরা চট্টগ্রামের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বুকের রক্তে তাদের অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্তের সুব্যবস্থা করতে পারি নি। তোমাকে সেই অসমাপ্ত কাজে নেতৃত্ব দিতে হবে। এখন তুমি বাড়ি যাও। প্রস্তুত থাকবে—ডাক দিলেই যেন আসতে পার।"

প্রীতির আর বলবার কিছুই ছিল না। তাকে ফিরে যেতেই হবে। হতে পারে সামান্য কয়েক দিনের বিচ্ছেদ, তবু এরই মধ্যে হয়ত কত কি ঘটে যাবে—মাস্টারদার সঙ্গে আর হয়ত দেখাও হবে না! রামকৃষ্ণ নেই, নির্মলদা নেই—মাস্টারদাও হয়ত চলে যাবেন! প্রীতির চোখে জল এলো। কিন্তু উপায় নেই—সে বিদায় নিল।

মাস্টারদা আবার প্রীতিকে বললেন—"প্রীতি, আমি শুনতে পাচ্ছি নির্মলবাবুর কণ্ঠস্বর! তিনি আমাদের বলছেন—আদেশ করছেন—প্রস্তুত হতে, শত্রুকে আঘাত হানতে। হ্যাঁ, তাই হবে। নির্মলবাবুর খুব আশা ছিল তোমার নেতৃত্বে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবেন। নির্মলবাবুর সেই ইচ্ছা তোমাকে পূরণ করতেই হবে।"

মাস্টারদাকে প্রণাম করে প্রীতি বিদায় নিল। যাবার সময় বলে গেল-

"নির্মলদার আদেশ আমার শিরোধার্য!" রুদ্ধকণ্ঠে শেষ ক'টি কথা বলল— "নির্মলদা নেই। তিনি অ্যাক্‌শনে পাশে থাকবেন বলেছিলেন···—" সে আর কিছু বলতে পারলো না। অশ্রুসিক্ত নয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রীতি বাড়ি ফিরলো —আদেশের অপেক্ষায় থাকবে। নির্মলদার "আদেশ" তাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেই হবে।

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট